কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নদীয়া

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ

নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ
কৃষ্ণনগর

কাঙাল হরিনাথ
(হরিনাথ মজুমদার)

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

জলধর সেন

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মতিলাল রায়

জগদানন্দ রায়

মীর মসারফ হোসেন

দীনবন্ধু মিত্র

প্রকাশক
কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, এম এ
নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

প্রথম প্রকাশ
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩

প্রাপ্তিস্থান
জেলা তথ্য অফিস
কৃষ্ণনগর

মহকুমা তথ্য অফিস
রাণাঘাট

সকল ব্লক উন্নয়ন অফিস
নদীয়া

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়
নদীয়া

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মূল্য
দশ টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী
সুকুমার বিশ্বাস

মুদ্রাকর
দেবদাস নাথ, এম এ, বি এল
সাধনা প্রেস প্রা. লিমিটেড
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

শিবনিবাসের মন্দিরের পাদদেশে বিষ্ণুমূর্তি ও ফলক

শিকারপুরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান

উৎসর্গ

যাঁদের
আত্মদানে
স্বাধীনতা এসেছে
এবং
যাঁদের
অবদানে
স্বাধীনতা-উত্তর নদীয়া
এগিয়ে চলেছে
উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে
তাঁদের সকলকে
স্মরণ করি
সশ্রদ্ধচিত্তে

মুতিনির্মাণরত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী

রবীন্দ্রভবন, কৃষ্ণনগর

নিবন্ধ অনুযায়ী লেখকপঞ্জী

লেখক	অধ্যায়
ননীগোপাল চক্রবর্তী	সাহিত্যসাধনা
নির্মল দত্ত	ইতিহাস
	সাংবাদিকতা ও পত্রপত্রিকা
সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়	স্বায়ত্তশাসন
	পূজা, মেলা, পাল-পার্বণ
	বিশিষ্ট ব্যক্তি
	বিশিষ্ট স্থান
মোহিত রায়	বিদ্যাসমাজ ও বিদ্যাচর্চা
	ধর্ম
	লোকগীতি
	খেলাধুলা ও শরীরচর্চা
অলোককুমার আচার্য	কৃষি ও সেচ
গোবিন্দবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	জনসমীক্ষা
	অর্থনৈতিক সমীক্ষা
	ব্যাঙ্ক ও বীমা
প্রণবকুমার ভট্টাচার্য	পশুপালন ও পশুচিকিৎসা
	মৎস্য
	বন
অজিত ঘোষাল	প্রাকৃতিক পরিচিতি
	শিল্প
	বিদ্যুৎ
প্রণব রায়	পুরাকীর্তি
জ্যোতিপ্রকাশ রায়	সাধারণ নির্বাচন
কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল	প্রাকৃতিক পরিচিতি
	জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
	সমবায়
	পরিবহন ও যোগাযোগ
	তপশীল জাতি ও উপজাতি কল্যাণ
	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন
	জেলা প্রশাসন
	প্রাকৃতিক দুর্বিপাক

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয়সূচী

মানচিত্রসূচী

ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের প্রবেশপথের অবশিষ্ট দুটি থাম

নদীয়া :
স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ সমিতি

সভাপতি :
শ্রীদীপক ঘোষ, জেলাশাসক, নদীয়া

সদস্য :
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়
শ্রীনির্মল দত্ত
শ্রীমোহিত রায়
অধ্যাপক শ্রীঅলোককুমার আচার্য
অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রণব ভট্টাচার্য
সহকারী অধীক্ষক, ফলিত অর্থনীতি
ও সংখ্যাতত্ত্ব ব্যুরো, নদীয়া
শ্রীঅজিত ঘোষাল
জেলা শিল্প আধিকারিক, নদীয়া

আহ্বায়ক সদস্য :
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল
জেলা তথ্য আধিকারিক, নদীয়া

যাঁরা যে ভাবে সাহায্য করেছেন

পরামর্শ দিয়ে :
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা গেজেটিয়ারের
প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমানে
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগেব অধিকর্তা
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জেলা গেজেটিয়ারের বর্তমান সম্পাদক
শ্রীদুর্গাদাস মজুমদার

আলোকচিত্র দিয়ে :
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, 'আলেখ্য',
শ্রীপ্রণব রায়, শ্রীকনককমল চট্টোপাধ্যায়,
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, কৃষ্ণনগব ও
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
(সিনিয়র আর্টিস্ট শ্রীতারা দাসের সৌজন্যে)

ব্লক দিয়ে :
শ্রীঅজিত ঘোষাল
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, 'আলেখ্য'

মানচিত্র অঙ্কনে :
শ্রীগয়ানাথ পাত্র

অফিসের কাজে :
শ্রীস্বপনকুমার দত্ত

উচ্চফলনশীল 'কল্যাণসোনা'
গমের ফলন
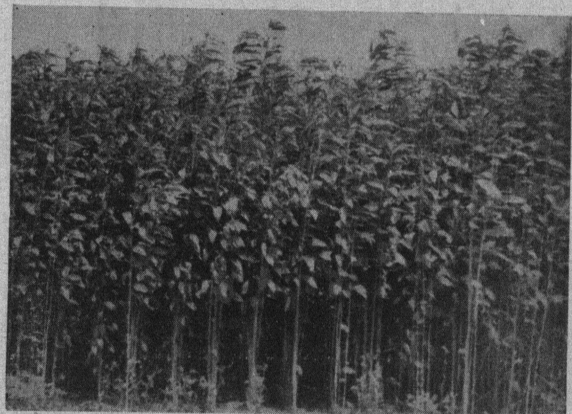
নদীয়ায় পাটের চাষ
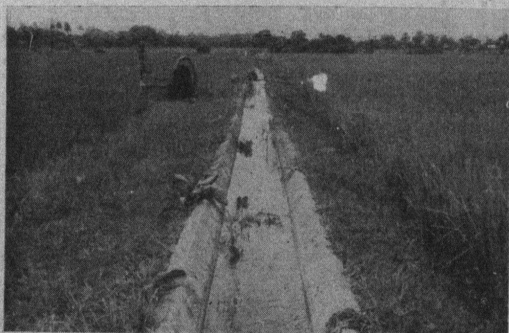
অগভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ

প্রস্তাবনা

নদীয়া জেলার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। কখনও গৌরবে উজ্জ্বল, কখনও বা হতাশায় ম্লান। এই নদীয়ার বুকেই দু'বার বাংলার ইতিহাসের পটপরিবর্তন হয়েছে। ১২০৩ সালে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির অতর্কিত নবদ্বীপ আক্রমণে বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়ে বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সুরু হয়। আর ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গেই মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়ে আরম্ভ হয় ইংরেজ রাজত্ব।

কিন্তু শুধু বিপর্যয় বা হতাশার কাহিনীই নদীয়ার ইতিহাসের উপাদান নয়। নদীয়া একদিন সাহিত্যে, ধর্মে, বিদ্যাচর্চায়, শিল্পে সারা বাংলা তথা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস এ জেলার ফুলিয়াতে বসেই বাংলাভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নদীয়াতেই রচিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য সারা বাংলার গৌরব।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব শুধু বাংলার নয়, সারাভারতের পক্ষে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই প্রেমাবতার মহাপুরুষ হিন্দুধর্ম ও সাহিত্যকে নতুন প্রাণদানে সঞ্জীবিত করেছিলেন। সমগ্র জাতিকে দীক্ষা দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহে।

বিদ্যাচর্চাতেও নবদ্বীপ তথা নদীয়া ছিল একদিন সারাভারতের গৌরব। ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল এখানে।

শিল্পের দিক দিয়ে শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র ছিল ঢাকার মসলিনের সঙ্গে তুলনীয়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি আজও দেশে-বিদেশে অম্লান।

স্বাধীনতা সংগ্রামেও নদীয়ার অবদান মূল্যবান। নদীয়ার বীরসন্তান বাঘাযতীন, বসন্ত বিশ্বাস, অনন্তহরি মিত্র প্রমুখের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

নদীয়ার অতীত যেমন গৌরবময়, বর্তমানও তেমনই ঘটনাবহুল। স্বাধীনতার পর নদীয়ার আয়তন হয়েছে অর্ধেক, অথচ লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমনে জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। এই বিরাট সমস্যা সত্ত্বেও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাধীনতা-উত্তর নদীয়ায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে।

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সব দিক দিয়েই নদীয়া জেলার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং নদী-জলোত্তোলনের সাহায্যে সেচ, রাসায়নিক সারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ নদীয়ার কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। উচ্চফলনশীল ধান ও গমের ফলন একদা-ঘাটতি এই জেলাকে আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভর করে তুলেছে। এ জেলার পাট দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শিল্পের ক্ষেত্রে একদিকে গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প এস্টেট, অন্যদিকে ১৬ দফা প্রকল্পে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়ে শত শত শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় সাফল্য নদীয়ার কুখ্যাত ম্যালেরিয়ার নির্মূলীকরণ। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলি আধুনিক হাসপাতাল আর গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কলেরা ও বসন্ত মহামারী একেবারেই দূর হয়েছে।

যোগাযোগের দিক দিয়েও এ জেলার অগ্রগতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। জেলাশহর কৃষ্ণনগর থেকে আগে কোন কোন থানা সদরেও যাওয়া ছিল কণ্টকর ও দুঃসাধ্য, কিন্তু রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে জেলায় যে কোন সুদূর গ্রাম আজ অল্পসময়ের মধ্যে সহজগম্য।

নদীয়ার বিদ্যাচর্চা এখন আর স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গ্রামে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, শতাধিক উচ্চবিদ্যালয়, অনেকগুলি মহাবিদ্যালয়, এমনকি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও।

অতীতের পটভূমিকায় স্বাধীনতা-পরবর্তী নদীয়ার উন্নয়নের পরিচয়সহ মোটামুটি সকল জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত বাংলাভাষায় একটি গেজেটিয়ার বা আকর-গ্রন্থের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হচ্ছিল। ১৯১০ সালে প্রকাশিত কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী'র পরে বাংলাভাষায় এধরনের কোন

গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ

নদীয়ার মাঠে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ

প্রচেষ্টা হয়নি। ইংরেজী ভাষায় জেলার শেষ গেজেটিয়ারও লেখা হয়েছে ১৯১০ সালে। ইংরাজীতে প্রকাশিত ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের জেলার সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক দু'টি তথ্যসমৃদ্ধ হলেও দাম ও ভাষার জন্য সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণীয় হতে পারেনি। তাছাড়া ১৯৬১ সালের পরেও এই জেলাতে বিভিন্নক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে।

সর্বসাধারণের জন্য বাংলাভাষায় সুলভমূল্যে জেলার সর্বশেষ তথ্যসম্বলিত একটি গেজেটিয়ার প্রকাশের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করেই স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বৎসরে নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদের প্রযোজনায় একটি স্মারকগ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমান গ্রন্থটি সে সিদ্ধান্তেরই ফলশ্রুতি।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ৯ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে এই গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশের ভার দেওয়া হয়। কমিটিতে ছিলেন জেলার দু'জন বিশিষ্ট সাংবাদিক, দু'জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, দু'জন অধ্যাপক এবং তিনজন সরকারী অফিসার। স্থির হয় যে, ১৯৭৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্রদিবসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে। অনিবার্য কারণে পূজোর ছুটির পরে অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে কমিটির কাজ সুরু হয়। মাত্র তিনমাসের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে এরূপ একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে অতীব দুরূহ কাজ—এমনকি অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কমিটির সদস্যরা একান্ত আন্তরিক নিষ্ঠায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এই কাজকে সফল করে তাঁরা শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন তাই নয়, তাঁরা সারা নদীয়া জেলাবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

প্রাকৃতিক পরিচিতি থেকে সুরু করে ইতিহাস, সাহিত্য, বিদ্যাচর্চা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায়, স্বায়ত্তশাসন, জেলা প্রশাসন, ধর্ম, পুরাকীর্তি, বিশিষ্ট স্থান, বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রভৃতি তিরিশটি বিষয়ের ওপর তথ্য ও বিবরণী সহ নিবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অতীতের পটভূমিতে স্বাধীনতার পর থেকে সর্বশেষ বর্তমান অবস্থা, প্রামাণ্য তথ্য ও বিবরণীর ভিত্তিতে এই নিবন্ধগুলিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বল্পসময় ও পরিসরের জন্য বিষয়গুলির আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যায় নি এবং একই কারণে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যে এত বড় বিরাট কাজ সম্পাদনের কথা চিন্তা করে সহৃদয় পাঠকবর্গ সকল ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন, এ আশা করি। নদীয়াবাসীর কাছে গ্রন্থটি সমাদর লাভ করলে আমাদের সকল উদ্যোগ ও শ্রম সার্থক হবে।

আমাদের বিশেষ আমন্ত্রণে অধ্যাপক শ্রীপ্রণব রায় ও অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ রায় যথাক্রমে 'পুরাকীর্তি' ও 'সাধারণ নির্বাচন'—এই নিবন্ধ দু'টি রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এছাড়া এই গ্রন্থটি প্রকাশে সরকারী বেসরকারী বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তথ্যাদি দিয়ে এবং অন্যান্য নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। সাধনা প্রেস কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ছাপার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সুযোগে এঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ গ্রন্থের প্রযোজক ও প্রকাশক নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদের প্রতি জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দীপক ঘোষ
জেলাশাসক, নদীয়া ও সভাপতি
স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ কমিটি

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

হরিণঘাটা ডেয়ারী ফার্ম

হরিণঘাটা ডেয়ারীতে দুধ বোতলজাত করা হচ্ছে

প্রাকৃতিক পরিচিতি

অবস্থিতি ও আয়তন :

নদীয়া জেলা ২২° ৫৩′ ও ২৪° ১১′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০৯′ ও ৮৮° ৪৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কট-ক্রান্তি রেখা এই জেলাকে প্রায় দুভাগে বিভক্ত করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই জেলার উচ্চতা ৪৬ ফুট।

১৭৭২ সালের রেনেল্‌সের ম্যাপে দেখা যায় নদীয়া জেলার আয়তন ছিল অনেক বড়। তখন নদীয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অনেক অংশ বিশেষতঃ ২৪ পরগণা, হুগলী, যশোহর ও মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষ নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে এ জেলার কিছু কিছু অংশ অন্যজেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই জেলার আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হয়েছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বসিরহাট ও তৎসংলগ্ন বহুস্থান নদীয়া থেকে যশোরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং আনারপুর মৌজা ২৪ পরগণার সঙ্গে যুক্ত হয়। এইরূপে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার অনেক স্থান বর্ধমান ও হুগলীর অন্তর্গত হয়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী নদীয়ার কতকগুলি স্থান মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৩৪ সালে নদীয়ার অনেকগুলি পরগণা নিয়ে বারাসাতে জেলা গঠন করা হয়।

১৮৭১ সালে নদীয়া জেলার আয়তন ছিল ৩৪১৪ বর্গমাইল। ১৮৮২ সালের ১লা জুন বনগ্রাম মহকুমাকে যশোরের সঙ্গে এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল অগ্রদ্বীপকে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত নদীয়া জেলার আয়তন ছিল ২৮০০ বর্গমাইল। বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্বতন কুষ্ঠিয়া ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমার সমগ্র অঞ্চল এবং করিমপুর ও তেহট্ট থানা বাদে মেহেরপুর মহকুমার বৃহত্তর অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার মত নদীয়া জেলার আয়তন নিয়েও কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের মৌজা অনুযায়ী আয়তন যোগ করে দাঁড়ায় ১৫০৯.১ বর্গমাইল (৩৯০৮.৫ বর্গ কি: মি:), কিন্তু সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়ার হিসাব অনুযায়ী এই জেলার আয়তন ১৫১৪ বর্গমাইল (৩৯২১ বর্গ কি: মি:)। করিমপুর থানার টলটলি ও পরাশপুর মৌজা দুটি ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী জেলার আয়তন ১৫১৪.৯ বর্গমাইল (৩৯২৬ বর্গ কি: মি:)।

সীমানা :

এই জেলার সীমানায় দেখা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলা নদীয়া জেলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে আছে। অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলা নদীয়া জেলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ২৪ পরগণা জেলা। পশ্চিমে ভাগীরথী নদী যার অপর পারে বর্ধমান জেলার সঙ্গে সরাসরি জুড়ে আছে শুধু নদীয়ার একটি মাত্র স্থান––নবদ্বীপ। পূর্বে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্বতীরেই ছিল, কিন্তু নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে নবদ্বীপ এখন পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বর্ধমান জেলার সঙ্গে বর্তমান নবদ্বীপের অধিকতর সংযোগ থাকার ফলে ১৮৭৩ সালের বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল নবদ্বীপকে বর্ধমান জেলাভুক্ত করবার আদেশ দেন, কিন্তু পর বৎসর তাঁর পরবর্তী গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল নবদ্বীপের সঙ্গে নদীয়ার প্রাচীন সংযোগের কথা বিবেচনা করে সেই আদেশ বাতিল করেন। ১৮৮২ সালে বনগাঁ মহকুমা জেলান্তরিত হবার পর থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ১৫ই পর্যন্ত নদীয়ার সীমানা মোটামুটি অক্ষুণ্ণই ছিল। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী বিভক্ত হবার পরেও পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে নদীয়ার করিমপুর থানা ও কুষ্ঠিয়ার দৌলতপুর থানার সীমানা নিয়ে কিছু মতবিরোধ উপস্থিত হয়। ১৯৫০ সালে বাগে অ্যাওয়ার্ডের ফলে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে।

নদীয়ার নদী :

একথা মোটেই অস্বীকার করা যায় না যে সমগ্র নদীয়া জেলার প্রাকৃতিক গঠনে নদীয়ার নদীগুলির অবদান অপরিসীম। সারা জেলা জুড়ে রয়েছে অনেক নদী-নালা যার অধিকাংশই এখন মৃতপ্রায়। তবে নদীয়ার নদী বলতে বোঝায় তিনটি নদীকে––ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা। বলাবাহুল্য এর মধ্যে ভাগীরথীই প্রধান। এই নদীগুলির সঞ্চিত পলিমাটি নদীয়া জেলার ভূগঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছে। পলিমাটি পড়ে নদীর খাত যখন ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়েছে তখন স্বাভাবিক কারণেই অপেক্ষাকৃত ঢালুদিকে নদী তার গতি পরিবর্তন করেছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে পলিগঠিত নতুন নতুন ভূমি। এই-ভাবেই যুগ যুগ ধরে নদীয়ার ভূপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে। নদীয়ার ভূমি সমতল, যদিও চাষের দিক দিয়ে এই জমিকে উঁচুই বলা যায়। এই জন্যই নদীয়ার জমিতে আউশ ধান আর রবিশস্যের চাষ বেশী।

শুধু ভূপ্রকৃতিতেই নয়, এই জেলার অর্থনীতি এবং উন্নয়নের পটভূমিতে নদীগুলির গুরুত্ব এক সময় যথেষ্ট ছিল। রেল-পথ যখন সৃষ্টি হয় নি, সড়ক যখন ছিল কম, তখন এই
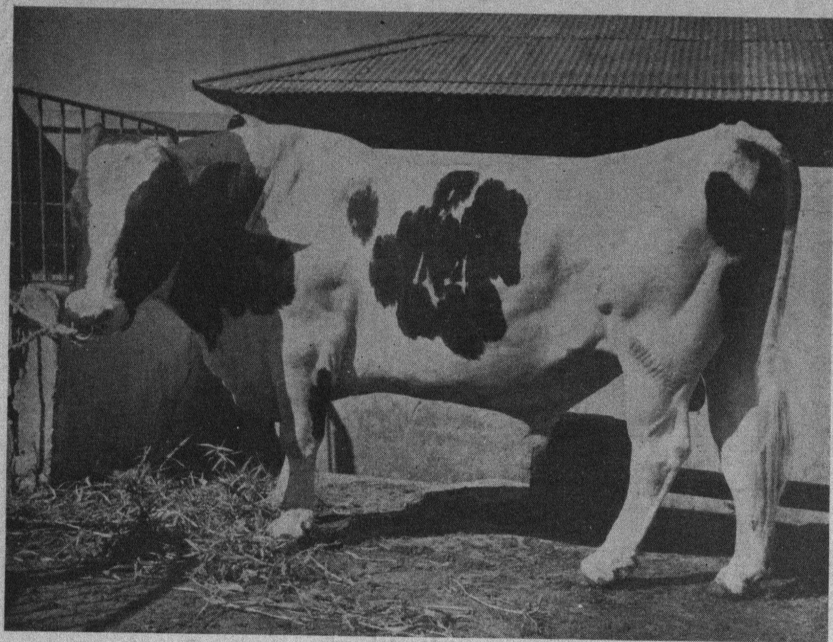
হরিনঘাটা ফার্মের একটি হলস্টীন ষাঁড়
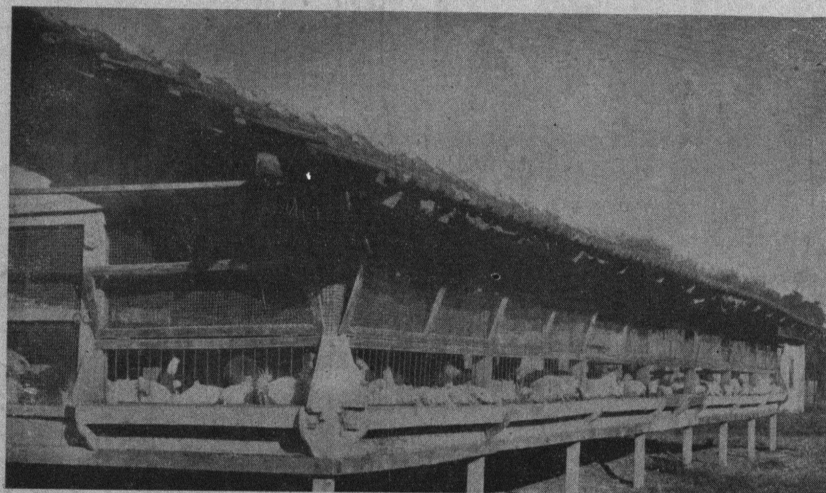
নদীয়ার একটি সরকারী হাঁস-মুরগী খামার

বর্তমান নদীয়া জেলা
স্কেল — ১ ইঞ্চি = ১২ মাইল

কৃষ্ণনগরে জলঙ্গী নদীর ওপরে দ্বিজেন্দ্র সেতু
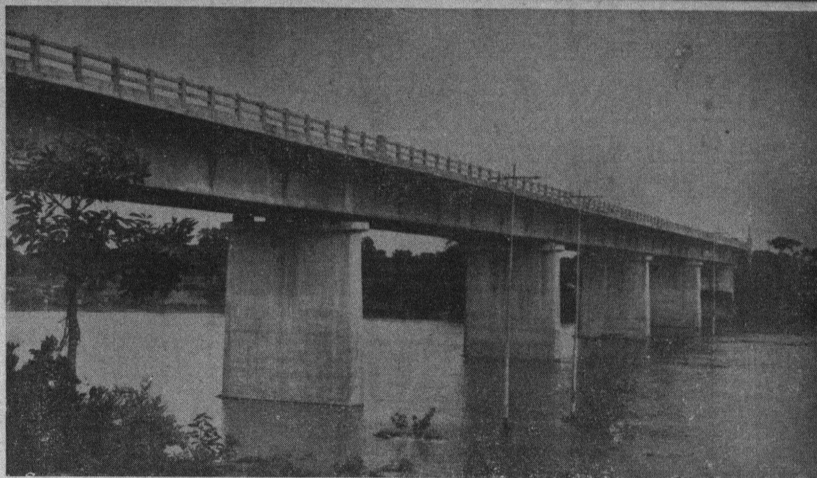
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর
প্রধান ফটক

শক্তিনগরে অবস্থিত নদীয়ার
জেলা হাসপাতাল

নদীপথেই যাতায়াত, ব্যবসা বাণিজ্য সব-কিছু চলত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত এই নদীগুলি, বিশেষতঃ মাথাভাঙ্গা, নৌ-পরিবহনের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। তবে এই সময় সারা বছর নৌকা চলাচল সম্ভব হত না। তার কারণ, নদীর মাঝে মাঝে চড়া পড়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মকালে নৌকা চালানো দুষ্কর হত। যাইহোক, সেই সময়ে নদীবক্ষের পলিমাটি সরিয়ে নদীর গভীরতা বজায় রেখে নৌ-পরিবহন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যয়বহুল বলে এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি।

১৮২৫ সালে ভাগীরথী গতি পরিবর্তন করে ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যায়। এর ফলে ভাগীরথী তার গভীরতা আরও হারিয়ে ফেলে নৌচলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। জলঙ্গীর অবস্থা এ সময় একটু ভাল থাকলেও ১৮৩২ সালের প্লাবনে জলঙ্গীর গতিপথ পাঁচমাইল উত্তরে সরে যাওয়ায় তার ভাগ্যেও একই দশা দেখা দেয়। মাথাভাঙ্গার অবস্থারও কোন উন্নতি দেখা যায় না। অবশ্য এই সময় এই নদীগুলির নাব্যতা কৃত্রিম উপায়ে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকারী চেষ্টার ত্রুটি হয় নি, কিন্তু প্রকৃতির বিরোধিতায় তা ফলপ্রসূ হতে পারে নি। রেললাইন চালুর ফলেও বাঁধ ও সাঁকো পড়ে নদীগুলি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নদীয়ার নদীগুলির অবস্থা সম্বন্ধে ১৯১৬ সালে লিখিত কলিকাতা বন্দরের নদীপর্যবেক্ষক এইচ. জি. রিক্সের এক রিপোর্টে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর রিপোর্টে দেখা যায় নদীগুলির বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, শুধু একমাত্র ভাগীরথীই তার গতিপথ মোটামুটি ঠিক রেখেছে। আগে ভৈরব বেশ গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল কিন্তু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নদীয়ার অংশে ভৈরব এখন প্রায় মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। ইছামতীরও আগে গুরুত্ব ছিল, কিন্তু মাথাভাঙ্গা থেকে চূর্ণী বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে হুগলী নদীতে পড়ার পর ইছামতীর অনেক অবনতি ঘটেছে। চূর্ণীর উদ্ভব সম্ভবতঃ বেশি দিন হয় নি, কেন না ১৭৭২ সালের রেনেল্সের ম্যাপে চূর্ণীর উল্লেখ দেখা যায় না। যমুনা শাখা নদীটি ইছামতীর নিম্নাংশ থেকে বেরিয়ে মদনপুরের কাছ দিয়ে হুগলীতে গিয়ে পড়েছে। এই নদীটিও আজ মজে গিয়ে শুধু খালে পরিণত হয়েছে। জলঙ্গীর সঙ্গে চূর্ণীর সংযোগকারী অঞ্জনা শাখানদীটিও মজে গিয়ে এখন শুধু অতীতের সাক্ষী হয়ে আছে। নদীয়ার বর্তমান প্রধান নদীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

ভাগীরথী :

ভাগীরথী পলাশীর কাছে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করেছে এবং জেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে এসে নবদ্বীপ পর্যন্ত এই নামেই প্রবাহিত হয়েছে। নবদ্বীপ শহরের বিপরীত দিকে জলঙ্গী নদীর সঙ্গম থেকেই দক্ষিণমুখী এই নদী হুগলী নামে পরিচিত হয়েছে। হুগলী নদী তারপর হুগলী, হাওড়া এবং ২৪ পরগণা জেলার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। নদীয়া জেলার একমাত্র নবদ্বীপ শহরসহ দুইটি ছোট গ্রাম ভাগীরথীর অপরপারে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। জেলার কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, কোতোয়ালি, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, চাকদহ ও কল্যাণীথানার সীমানা স্পর্শ করে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে।

জলঙ্গী :

এই জেলার উত্তর প্রান্তে জলঙ্গী নদী পদ্মা থেকে বের হয়ে নদীয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বরাবর তেহট্টর কিছু উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে আরও ৭ মাইল পশ্চিমে গিয়ে নবদ্বীপ শহরের বিপরীত দিকে ভাগীরথীতে মিশেছে।

জলঙ্গী নদী 'খোড়ে' নদী নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত।

মাথাভাঙ্গা :

মাথাভাঙ্গা বা হাউলী নদী জলঙ্গীর মতো পদ্মানদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে হাট বোয়ালিয়া নামক স্থানে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং একটি শাখা 'কুমার' বা 'পাঙাছি' নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীয়া জেলার সীমানা দিয়ে আলমডাঙ্গা পৌঁছে যশোরে প্রবেশ করেছে। অন্য শাখাটি আঁকাবাঁকা গতিতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনগরের পূর্বদিকে কৃষ্ণগঞ্জে পৌঁছেছে। ঠিক এই স্থান থেকেই নদীটি চূর্ণী এবং ইছামতী নামে আবার দুভাগে বিভক্ত হয়েছে।

চূর্ণী :

চূর্ণী নদী দক্ষিণ থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে হাঁসখালি ও রাণাঘাটের পাশ দিয়ে শান্তিপুর ও চাকদহের মাঝখানে হুগলী নদীতে মিশেছে।

ইছামতী :

ইছামতী নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নদীয়া জেলার সামান্য কিছু অংশের সীমানা গঠন করে শেষ পর্যন্ত ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমায় প্রবেশ করেছে।

নদীয়ার নদীগুলি সম্বন্ধে ১৯৫১ সালের আদমসুমারী প্রতিবেদনে অনেক তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন শ্রীঅশোক মিত্র, আই. সি. এস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নদীয়ার নদীগুলি সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য এই প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায়। বিশেষ করে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রেনেল, ১৮৪৭-এ ক্যাপ্টেন লঙ্, ১৮৮১-তে মিঃ ভার্টানেস, ১৯১৬ সালে এইচ. জি. রিক্স্ এবং ১৯২৮ সালে স্যর উইলিয়াম উইলকক্সের মতামত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদীতে নৌকার উপরে টোল আদায় করে নদীর সংরক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করা হত। সেই সময় এই নদীগুলির পরিচালনা, সংরক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্টের (বর্তমানের সেচবিভাগের নির্বাহী বাস্তুকারের অনুরূপ) পদ ছিল। ১৮২০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত মিঃ মে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট থাকাকালীন ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা ও

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলে সন্ন্যাসী, ভিখারী, ডাকহরকরা
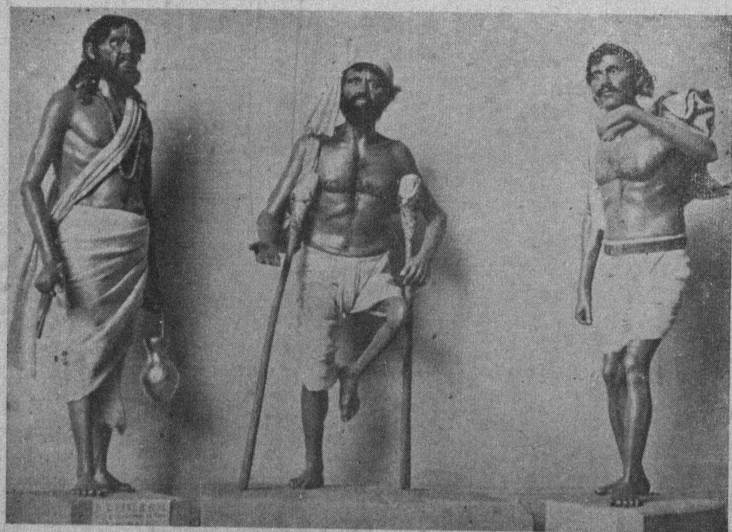
জলঙ্গী নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তার পরে ক্যাপ্টেন স্মিথ ও ক্যাপ্টেন ল্যাঙও চেষ্টা করে গিয়েছেন। এ সময় এই নদীগুলি থেকে টোল আদায় করে সরকারের খরচ বাদ দিয়েও বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকত। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৭ সালের প্রতিবছরে টোল আদায় থেকে সরকারের উদ্বৃত্ত আয় হয়েছে গড়ে ১,৬৫,০৯০ টাকা। ১৮৮৮ সাল থেকে নদীয়ার নদীগুলির দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগের হাত থেকে পূর্ত বিভাগের হাতে আসে এবং একজন নির্বাহী বাস্তুকারের অধীন রেখে "নদীয়ার নদী বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। সে সময় ড্রেজার দিয়ে নদীর বুকে জমে যাওয়া চড়া পরিষ্কারের ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা করা হয়--কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হয় না।

রাজমহলের কাছে গঙ্গাবক্ষে বাঁধ দিয়ে ভাগীরথী নদী পুনরুজ্জীবিত করবার পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়। ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে নদীয়ার নদীগুলির উন্নতির রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল কটন নদীয়া জেলার নদীগুলির সংস্কারের জন্য গঙ্গার উপরে বাঁধ দেবার সুপারিশ করেছিলেন। এর পরেও এ বিষয়ে নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত গঙ্গার ওপরে বাঁধ পরিকল্পনাটি অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য শুধু ফাইলেই আটকে থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় কলিকাতা বন্দরকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে ফরাক্কায় বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনার বিষয়টি নতুনভাবে বিবেচনা করেন এবং কার্যকরী করবার জন্য উদ্যোগী হন। এরপরে কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয়ে ফরাক্কা বাঁধের নির্মাণ শেষ হয়েছে গত ১৯৭১ সালে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে মুমূর্ষু ভাগীরথী আবার জলধারা সঞ্জীবিত হয়ে নদীয়ার অন্য নদীগুলিকেও করবে প্রাণবন্ত। নদীয়ার নদীপথকে করবে আবার সুগম। শুধু কলিকাতা বন্দরের নবজীবন নয়, গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত সমগ্র নিম্নবঙ্গের সেচ ও নদীপথের উন্নয়নের এক বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এই বাঁধের সার্থক কার্যকারিতার ওপরে।

হ্রদ ও খালবিল :

নদীয়ায় অনেকগুলি হ্রদ ও খালবিল আছে। বিভিন্ন সময়ে নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে অথবা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূভাগ বসে গিয়ে অনেক হ্রদ ও বিলের সৃষ্টি হয়েছে। ছোট ছোট শাখা নদীগুলি মজে গিয়েও কোন কোন জায়গায় খালের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান হ্রদ খালবিলের নাম নীচে দেওয়া হল।

সদর মহকুমা--হরখালি বিল, হাঁসডাঙ্গা বিল, উশতপুর বিল, ভালুকা বিল, দোগাছি বিল, পলদা বিল, কলিঙ্গ বিল, জিদে বিল, পাগলাচণ্ডী দহ, দুমরী বিল, ডিগরি বিল, ট্যাংরা বিল প্রভৃতি।

রাণাঘাট মহকুমা--বাগের খাল, হরিপুর খাল, নিঝোর খাল, অঞ্জনা খাল, তারাপুর বিল, প্রিয় নগর বাওর, আমদা বিল, ওখিন্দি বিল, চামতা বিল, ছিনিল্লি বিল, ঝকরি বিল, কুলিয়া বিল, ডোমরা বিল, সগুনা বিল, যমুনা খাল ইত্যাদি।

এইসব খাল-বিলের কতকগুলিতে মাছের চাষ হয়, কতকগুলিতে আবার আমন ধান ও বোরোধানের চাষ হয়। বেশির ভাগ বিলেই বর্ষাকাল ছাড়া জল থাকে না। কোন কোন বিলের ধারে পাখীর সমাবেশ দেখা যায়।

ভূতত্ত্ব :

নদীয়ার মাটি পলিপ্রধান এবং বেলে দোয়াশ প্রকৃতির। জেলার পশ্চিম দিকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে শুরু করে কালীগঞ্জ ও তেহট্ট থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী ভূভাগ 'কালান্তর' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের জমির রং ঈষৎ কাল। শুধু আমন ছাড়া 'কালান্তর' জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না।

নদীয়ার মাটিতে পলি থাকা সত্ত্বেও বালির ভাগ বেশী থাকায় উর্বরা হতে পারে নি। তারপর সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা ভাল না থাকায় কৃত্রিম উপায়ে উর্বরা শক্তিকে বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয় নি। নদীয়ার ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব নীচে নয়। তাই এখানে গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হচ্ছে। সেচযুক্ত জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীয়ার জমি উঁচু বলে এখানে আউশ ধান ও রবিশস্য ভাল হয়।

জলবায়ু :

নদীয়ার জলবায়ু মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের নিম্নাঞ্চলের অন্যান্য জেলাগুলির মতই। তবে কর্কটক্রান্তি রেখা এ জেলার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ার ফলে জলবায়ুতে কিছু চরমভাব অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে বেশ গরম এবং শীতকালে বেশ শীত নদীয়ার বৈশিষ্ট্য। বাতাসে যথেষ্ট আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টিপাত এ জেলায় সব বছর সমান না হলেও মোটামুটি ভাল হয়।

নদীয়ার ঋতু সহজেই চিহ্নিত করা যায়। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শীত শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত থাকে।

গ্রীষ্ম শুরু হয় মার্চে এবং চলে মে মাস পর্যন্ত। জুন থেকে সেপ্টেম্বর চলে বর্ষা। এখানকার গরম কষ্টকর, বাতাসে আর্দ্রতা থাকার জন্য ঘামের সৃষ্টি হয়।

এই জেলার বাৎসরিক গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের হার ১৩১০.৪ মিঃ মিঃ (৫১.৫৯")। জুন থেকে সেপ্টেম্বরেই বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের তিনভাগ হয়। আগস্ট মাসে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাত জেলার সব জায়গায় এক রকম হয় না। দক্ষিণে হরিণঘাটায় গড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১১০.৪ মিঃ মিঃ (৪৩.৭২") অথচ মধ্যভাগে কৃষ্ণনগরে বৃষ্টিপাত ১৪৭৩.৬ মিঃ মিঃ (৫৮.০১"), জেলার উত্তরভাগে বৃষ্টিপাত বেশী হয়ে থাকে। এ জেলায় গড়ে বছরে ৭৫ দিন বৃষ্টি হয়ে থাকে।
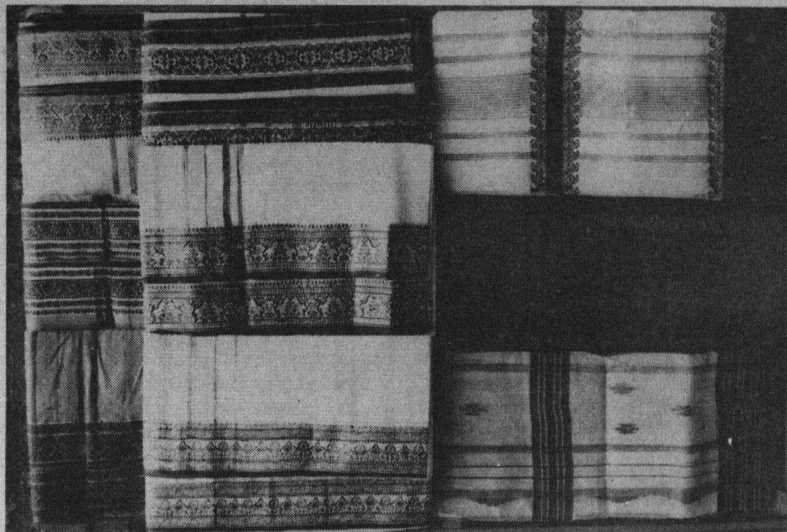
শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়

নবদ্বীপ থানা কাসা-পিতল শিল্প সমবায় সমিতি

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়েছিল এবং হিসেবে দেখা যায় এদিন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ২৪ ঘন্টায় ২৯৩.৯ মিঃ মিঃ (১১.৫৭") স্মরণকালের মধ্যে নদীয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমান কম হয়েছে ১৯৭২ সালে।

কালবৈশাখীর সঙ্গে ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যা এ জেলায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়ই দেখা যায়। একটু বেশী বৃষ্টি হলেই জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে জেলার নিম্নাঞ্চলের মাঠগুলি ডুবে যায়।

এ জেলার কৃষ্ণনগরে একটি আবহাওয়া পরিমাপের কেন্দ্র আছে। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে। এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে এবং দৈনিক তাপমাত্রার উর্ধ্বগড় দাঁড়ায় ৩৭.১° সেঃ (৯৮.৮° ফাঃ), তবে মাঝে মাঝেই হঠাৎ তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ওঠে যথাক্রমে ২৫.৯° সেঃ (৭৮.৬° ফাঃ) এবং ১১.০° সেঃ (৫১.৮° ফাঃ)। শৈত্যের প্রবাহে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাপমাত্রা এর থেকেও অনেক নেমে যায়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে ৪৫.৯° সেঃ (১১৪.৮° ফাঃ)। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয় ৩.৯° সেঃ (৩৯.০° ফাঃ)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Hunter's Statistical Account of Nadia, 1872, District Gazetteer, Nadia by Garrett, কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া কাহিনী, Census Handbook, Nadia, 1951 ও 1961
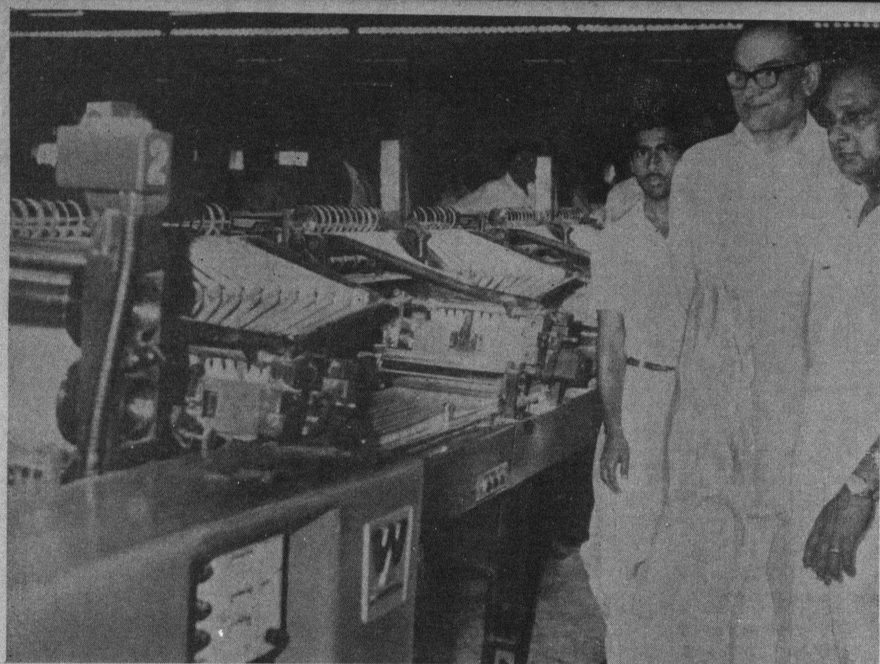
কল্যাণী স্পিনিং মিলের উদ্বোধনী দিবসে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
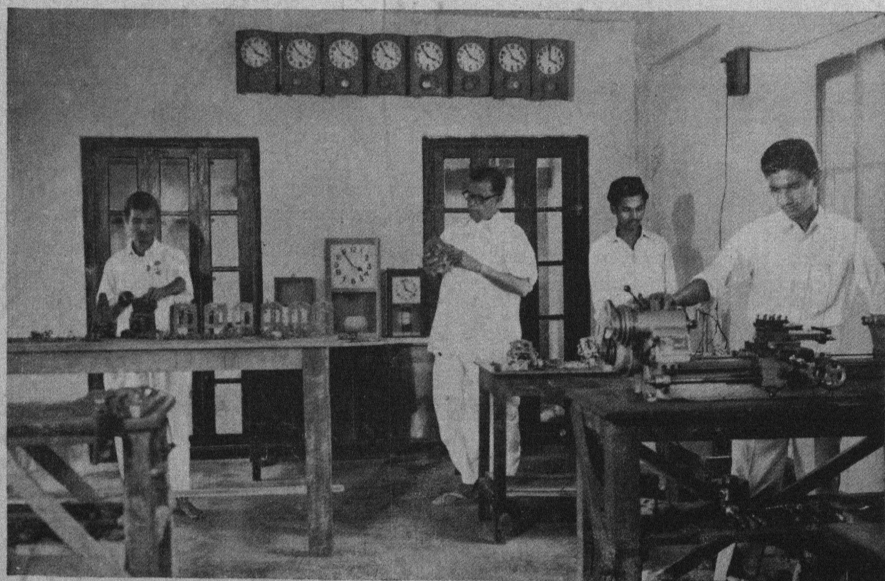
নবদ্বীপের ন্যাশনাল ক্লক কো-অপরেটিভ সোসাইটিতে দেওয়ালঘড়ি তৈরী হচ্ছে

দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে নদীয়া জেলা
জিলা রাজশাহী
জিলা পাবনা
জিলা ফরিদপুর
জিলা মুর্শিদাবাদ
জিলা যশোহর
জিলা হুগলী
কুষ্টিয়া
কৃষ্ণনগর
নবদ্বীপ
রানাঘাট
চাকদহ
মেহেরপুর
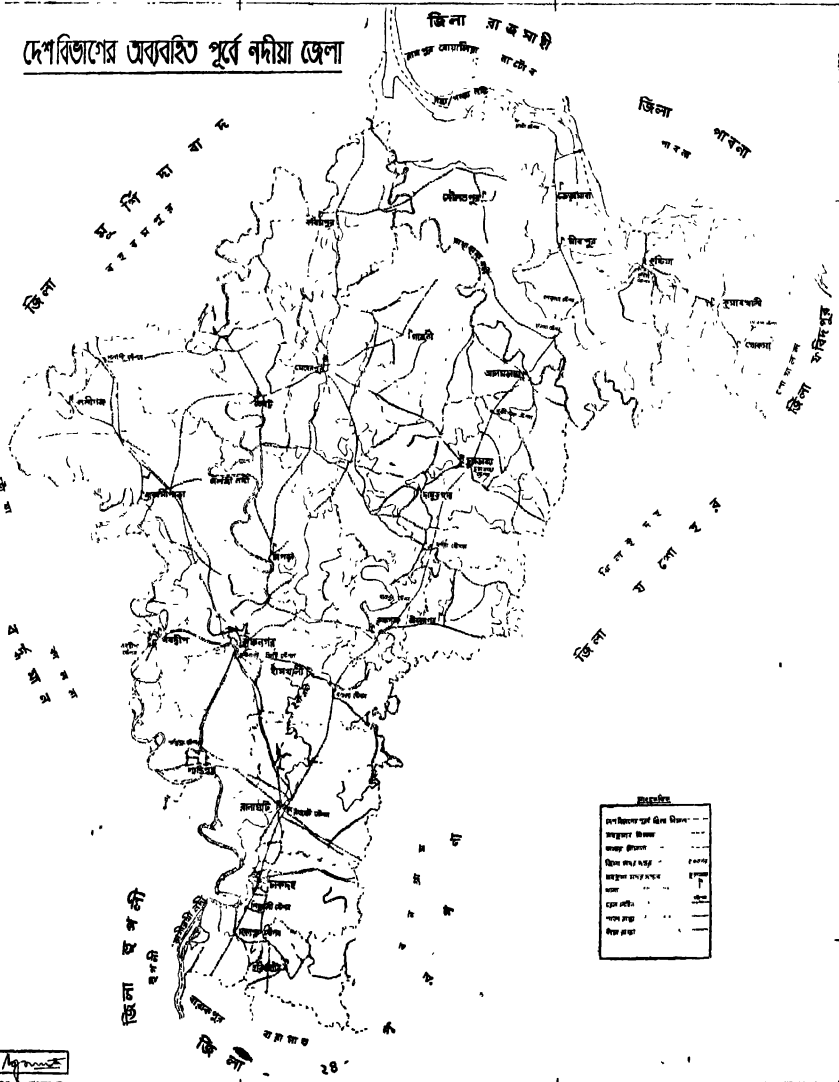
কল্যাণী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট
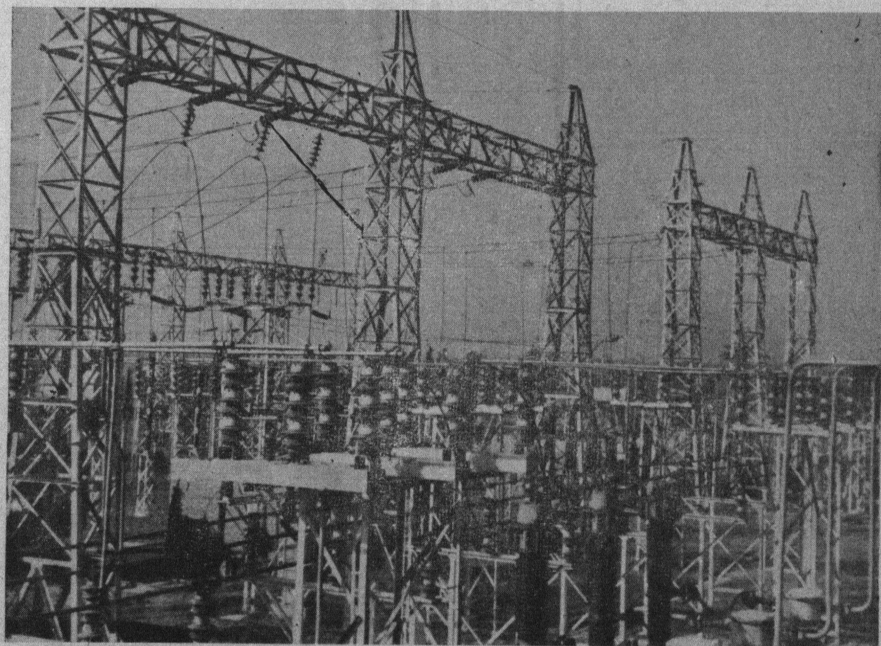
রাণাঘাটের বিদ্যুৎ সাবস্টেশন

জনসমীক্ষা

জনসমীক্ষার নিরিখে নদীয়ার অবস্থা বিচারকালে এই জেলার মাটির উর্বরতা, জীবিকার সুযোগ-সুবিধা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি, জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা ও সমগ্র রাজ্যের তুলনায় এই জেলার আয়তনের কথা স্মরণ রাখতে হ'বে। বাস্তবিকপক্ষে, দেশবিভাগের খড়্গাঘাত এই জেলাকে যেভাবে প্রভাবিত ক'রেছে, খুব অল্প জেলার ভাগ্যেই তেমনটি ঘটেছে।

এই জেলা প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর। তথাপি মাটির উর্বরতা ও আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই জেলা বহু অসুবিধার সম্মুখীন। মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে এই জেলাতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধ'রে চলেছে জনহ্রাস। অপর পক্ষে পরবর্তী পর্যায়ে এই জেলাকেই সইতে হয়েছে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপ। নদীয়ার জনসমাজ সম্পর্কে আলোচনাকালে এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

আয়তনের তুলনায় নদীয়ার জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট বেশী। কারণ ১৯৭১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুসারে জনসংখ্যার দিক দিয়ে রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে নদীয়ার স্থান অষ্টম, যদিও আয়তনের দিক দিয়ে পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির মধ্যে নদীয়া দশমস্থানের অধিকারী।

জনসংখ্যা—১৯৭১

রাজ্যের মোট আয়তনের শতকরা ৪.৪৭ (৩৯২৬ বর্গ কিঃ মিঃ) অংশ নিয়ে গঠিত এই জেলার লোকসংখ্যা ২২,৩০,২৭০; তার মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১১,৪৪,৯৭৭ এবং ১০,৮৫,২৯৩। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার ৫.০২% এই জেলায় বাস করে। রাজ্যের জেলার তালিকায় (কলিকাতাসহ) নদীয়া অপেক্ষা জনবহুল অপর সাতটি জেলা যথাক্রমে ২৪ পরগণা (১৯.৩১%), মেদিনীপুর (১২.৪১%) বর্ধমান (৮.৮২%), কলিকাতা (৭.০৭%), মুর্শিদাবাদ (৬.৬২%), হুগলী (৬.৪৭%) এবং হাওড়া (৫.৪৫%)।

জনসংখ্যা—১৯৬১

১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসেব অনুসারে নদীয়ার জনসংখ্যা ছিল ১৭,১৩,৩২৪; তার মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী যথাক্রমে ৮,৭৯,৪৩০ এবং ৮,৩৩,৮৯৪। অর্থাৎ গত দশ বছরে (১৯৬১-৭১) এই জেলার জনসংখ্যা বেড়েছে ৫,১৬,৯৪৬ জন। তার মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে ২,৬৫,৫৪৭ এবং ২,৫১,৩৯৯।

দেশবিভাগের ফলে নদীয়া জেলা যে শুধুমাত্র তার পূর্ববর্তী আয়তনের (২৮০০ বর্গমাইল) প্রায় অর্ধাংশ হারাতে বাধ্য হয়েছে তা'ই নয়, সেই সঙ্গে সীমান্তবর্তী এই জেলায় বিপুল সংখ্যায় শরণার্থীর আগমন এই জেলার অর্থনীতি ও জমির উপর এক বিরাট চাপ সৃষ্টি ক'রেছে। ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালের জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির এটিই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

১৯০১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাটি নিম্নরূপ:

বৎসর	মোট জনসংখ্যা
১৯০১	৭,৭৩,২০২
১৯১১	৭,৭৫,৯৮৬
১৯২১	৭,১১,৭০৬
১৯৩১	৭,২১,৯০৭
১৯৪১	৮,৪০,৩০৩
১৯৫১	১১,৪৪,৯২৪
১৯৬১	১৭,১৩,৩২৪
১৯৭১	২২,৩০,২৭০

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪১ সালে এই জেলার জনসংখ্যা ছিল—৮,৪০,৩০৩, সেক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের হিসেবে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৪৪,৯২৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৩১-৪১ সালে যেখানে ছিল +১৬.৪% সে ক্ষেত্রে ১৯৪১-১৯৫১ সালে এই হার দাঁড়ায় +৩৬.৩% এবং ১৯৫১-৬১ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে (৪৯.৬৫%) সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি ক'রে। সেই তুলনায় ১৯৬১-৭১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম (২৯.৯৪%)। অবশ্য শরণার্থী আগমনজনিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিপুলভাবে হ্রাস পাওয়াই এর কারণ, যদিও জেলার বর্তমান জনবৃদ্ধির হার রাজ্যস্তরের (২৭.২৪%) উর্ধ্বে।

সামগ্রিকভাবে বিচার ক'রলে আমরা দেখি ১৯৩১ সালের পর থেকে এই জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে:

বৎসর	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৮৮১-১৮৯১	–৪.৩%
১৮৯১-১৯০১	+০.০%
১৯০১-১৯১১	+০.৪%
১৯১১-১৯২১	–৮.৩%
১৯২১-১৯৩১	+১.৪%
১৯৩১-১৯৪১	+১৬.৪%
১৯৪১-১৯৫১	+৩৬.৩%
১৯৫১-১৯৬১	+৪৯.৬৫%
১৯৬১-১৯৭১	+২৯.৯৪%

শিবনিবাসের মন্দির

দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দির
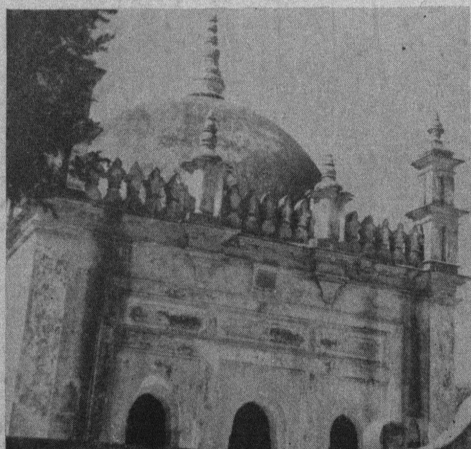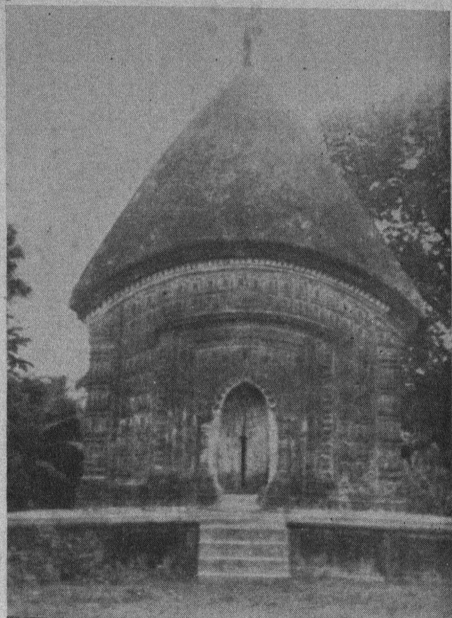
তোপখানা মসজিদ, শান্তিপুর
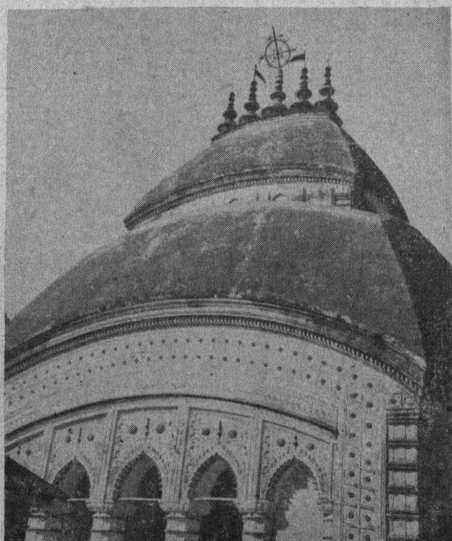
শ্যামচাঁদের মন্দির, শান্তিপুর

জিলা নদীয়া
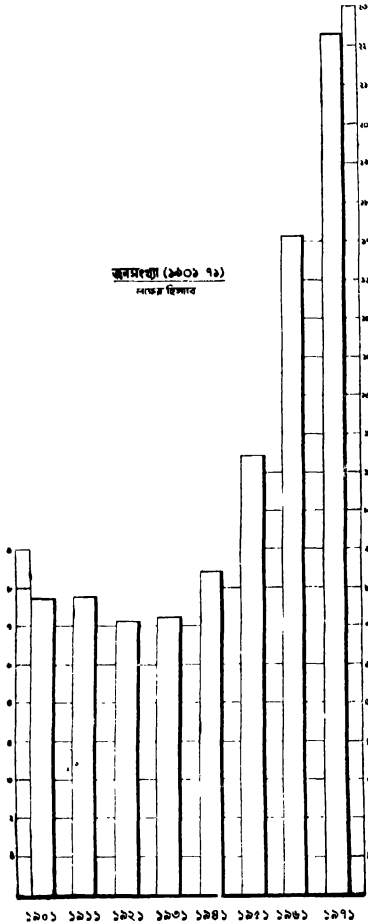
জেলার জনসমীক্ষার নিরিখে ১৮৮১-১৮৯১, ১৯১১-১৯২১ এবং ১৯৫১-১৯৬১ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। কারণ ১৮৮১-৯১ এবং ১৯১১-২১ সালে আমরা লক্ষ্য করি জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯৫১-৬১ সালে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যায় যে, ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত 'বর্ধমান জ্বরের' (Burdwan fever) প্রবল প্রকোপে বহুলোক প্রাণ হারায় এবং বহুলোক সপরিবারে এই জেলা ত্যাগ ক'রে পার্শ্ববর্তী অন্য জেলায় বসতি স্থাপন ক'রে। বাস্তবিক পক্ষে, একাধিক কারণে ১৮৭১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই জেলায় জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এই সকলের মধ্যে 'বর্ধমান জ্বর' অন্যতম কারণ এ'কথা সত্য, কিন্তু এ'টিই একমাত্র কারণ নয়। এ ছাড়া উক্ত সময়ে কলেরা মহামারী, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ, জেলার জনস্বাস্থ্যের অস্বাভাবিক নিম্নমান এবং জমিদারের অত্যাচারে বাস্তুভিটা ত্যাগ বহুলাংশে দায়ী। এই প্রসঙ্গে ১৮৯১, ১৮৯২ এবং ১৮৯৬ সালে কলেরা মহামারী, ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ও ১৮৯৫-৯৬ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী, শস্যহানি জনিত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা স্মরণীয়। বাস্তবিকপক্ষে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জনসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, জন্মহার ও মৃত্যুহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় যে, ১৮৭১ থেকে ১৯৭১ সালের প্রতিটি দশকেই নদীয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেয়েছে। সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বন-জঙ্গল ও জলসরবরাহের অপ্রতুলতাজনিত মহামারী এবং এই মহামারী উদ্ভূত আতঙ্ক উপরোক্ত সময়ে গ্রামগুলিকে জনবিরল ক'রে তুলেছিল। এছাড়া জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামগুলিতে জলকষ্ট, জমির অনুর্বরতা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এই জনহ্রাসের অন্যতম কারণ।

অপর দিকে, ১৯৫১-৬১ সালের দশকে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মূলতঃ দায়ী দেশবিভাগ-জনিত শরণার্থীদের বিপুল সংখ্যায় এই জেলায় প্রবেশ ও বসতি স্থাপন। সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে উদ্বাস্তু আগমনজনিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার্য। কারণ, বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের ফলে একদিকে যেমন নদীয়ায় মোট জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে জনসমাজের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

১৯৪১ সালে জেলার বহিরাগতের সংখ্যা ছিল ১০,৫৭৩ সেক্ষেত্রে ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,৬৪,৪৬২। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগতের সংখ্যা ৪,২৬,৯০৭ এবং অন্যান্য জেলা বা রাজ্য থেকে আগতদের সংখ্যা ৩৭,৫৫৫। অন্যপক্ষে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে জেলার মুসলমান জনসমাজের ১,০১,৭৫৫ জন এই জেলা ত্যাগ করেন। ১৯৪১-৫১ দশকের জনসমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকৃত জনসংখ্যার হার (Natural growth)—১৭.৬ ভাগ কম কিন্তু বহিরাগতদের সংখ্যা ধরলে উক্ত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় +৩৬.৩%। আবার ১৯৬১ সালের হিসেবে জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৬,০৪,৪২৬ জনই এই জেলার বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই সময়ের ভিতর ৩,৪৪,২১৬ জন জেলার

বামনপুকুরে চাঁদকাজীর সমাধির ওপরে ৫০০ বছরের প্রাচীন গোলকচাঁপা বৃক্ষ

সতীমায়ের ডালিমতলা, ঘোষপাড়া

শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ মন্দির
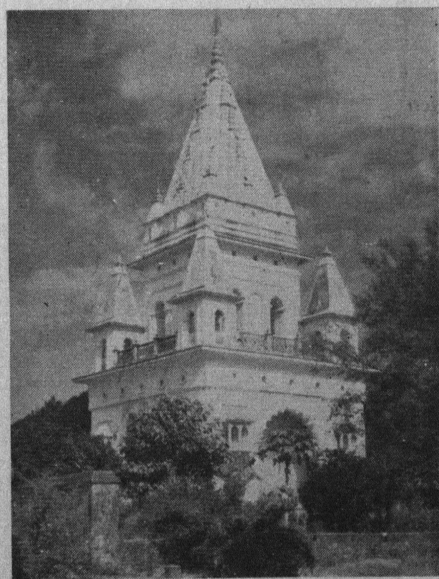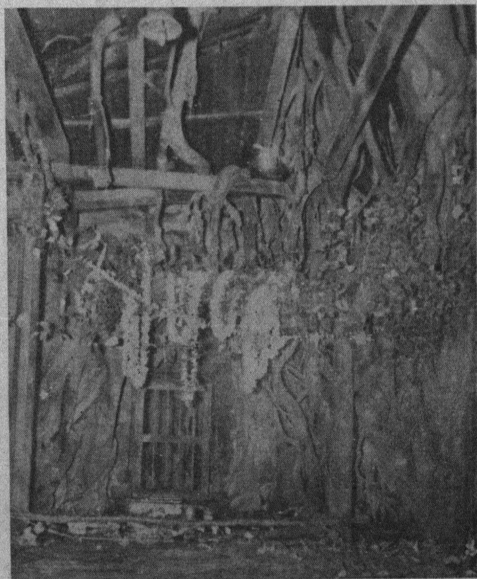
নবদ্বীপের পোড়ামাতলা

বাইরে থেকে এই জেলায় বসবাস করতে আসেন; এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগতদের সংখ্যা ২,৮১,৫৩১। অর্থাৎ জেলার প্রতি পাঁচজনে একজন ১৯৫১-৬১র দশকে জেলার বাইরে থেকে এই জেলায় বাস করতে আসেন এবং ১৯৬১ সালের মোট জনসংখ্যার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ৫,০২,৬৪৫ জন পূর্ববাঙলা থেকে আগত ও জেলার মোট জনসংখ্যার ৩০% এর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ।

জন্মহার ও মৃত্যুহার

অপরপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রবণতা সাম্প্রতিক জন্ম ও মৃত্যু হারের বিরাট পার্থক্যের মধ্যে হদিশ পাওয়া যায়। গত অর্ধ শতাব্দীতে জন্মহার যদিও মোটামুটি একই থেকেছে অথবা সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি হয়েছে, সেক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, উন্নত নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনকল্যাণমূলক কাজের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এই জেলার জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে:

(প্রতি হাজারে)

বৎসর	জন্মহার	মৃত্যুহার
১৯২১-৩০	৩৪.১	৩৩.০
১৯৩১-৪০	৩৫.৬	২৬.৭
১৯৪১-৫০	২৩.৩	২৩.১
১৯৫১-৬০	২২.৯	৭.৪
১৯৬৫	১৯.৫	৬.৬
১৯৬৬	১৯.২	৫.৯
১৯৬৭	১৯.৩	৫.২

জন্ম ও মৃত্যুহারের সাম্প্রতিক প্রবণতার কারণ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, ম্যালেরিয়ার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং কলেরায় মৃত্যুহার আশাতীতভাবে হ্রাস পাওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাজেই জন্ম ও মৃত্যুহারের উপরোক্ত সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সাম্প্রতিককালে নদীয়ার জনসংখ্যার বিপুল আয়তন ও বৃদ্ধির জন্য জন্মহার বিশেষ দায়ী নয়; যদিও এই জন্মহার অনেক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশের তুলনায় বেশী। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ মৃত্যুহার অতি দ্রুত হ্রাস পাওয়া এবং অন্যান্য জেলা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে বহিরাগতদের আগমন এবং দেশবিভাগজনিত শরণার্থীদের বিপুলসংখ্যায় এই জেলায় আশ্রয় গ্রহণ।

স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত

স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতের হিসেবে আমরা নদীয়া জেলার জনসমাজের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। যদিও বর্তমানে রাজ্য ও জাতীয় প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নদীয়া জেলাতেও নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশী পরিলক্ষিত হ'চ্ছে তবুও এটি লক্ষণীয় যে নদীয়া জেলার স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত ১৯০১ সালের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে কিন্তু এই হার রাজ্যহারের তুলনায় সব সময়েই উর্ধ্বে থেকেছে।

(প্রতি একহাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা)

বৎসর	পশ্চিমবঙ্গ	নদীয়া
১৯০১	৯৪৫	১০১৪
১৯১১	৯২৫	৯৯৬
১৯২১	৯০৫	৯৫৬
১৯৩১	৮৯০	৯৫১
১৯৪১	৮৫২	৯৪৫
১৯৫১	৮৬৫	৯৩৫
১৯৬১	৮৭৮	৯৪৮
১৯৭১	৮৯২	৯৫০

জন্মমৃত্যুহার
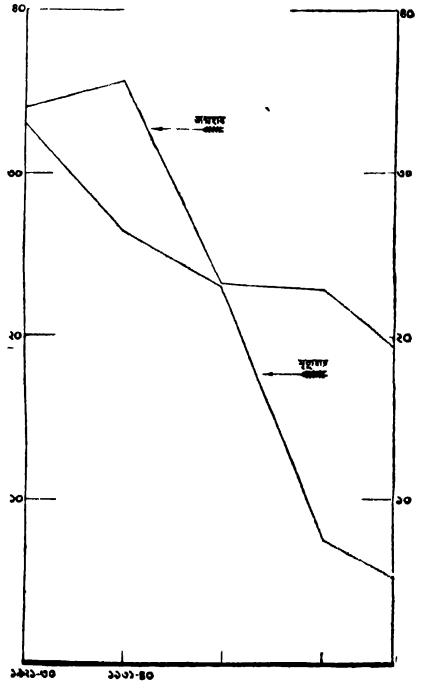
উপরোক্ত তালিকায় লক্ষ্যণীয়, ১৯৪১ সালের পর থেকে পুনরায় স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতে রাজ্যের হিসেবে উন্নতি পরিলক্ষিত
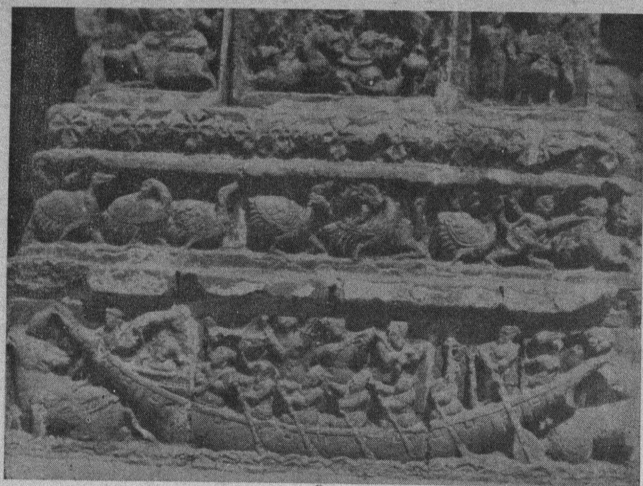
বীরনগরের জোড়বাংলো মন্দিরের টেরাকোটা
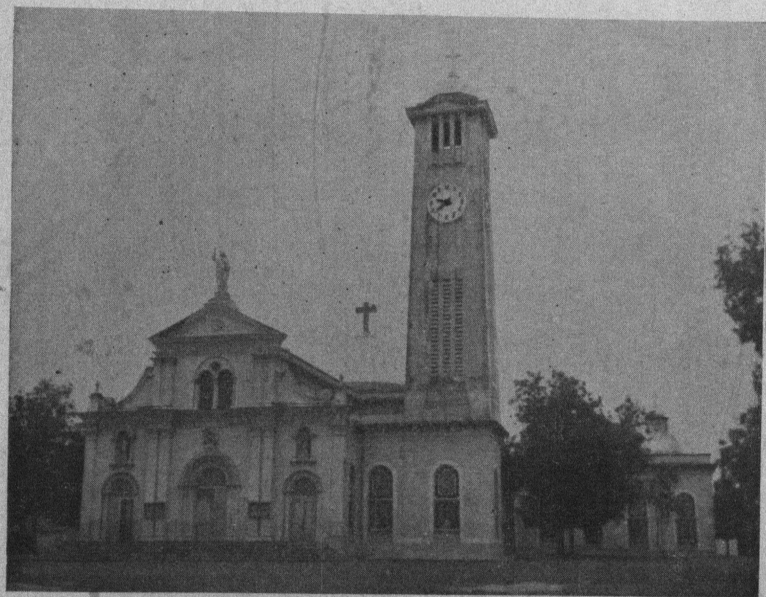
কৃষ্ণনগরের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা

হচ্ছে এবং জেলাস্তরে তারই প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয় ১৯৫১ সালের পর থেকে। ১৯৭১ সালের হিসেবে জেলায় স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৯৫০।

নদীয়ার জনসমাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য শহরাঞ্চলে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের পর থেকেই শহরাঞ্চলে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় হ্রাস পায়।

(প্রতি একহাজার পুরুষের অনুপাতে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের স্ত্রীলোকের সংখ্যা)

বৎসর	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯০১	১০১৪	১০০৬	১০৮২
১৯১১	৯৯৬	৯৮৮	১০৬৭
১৯২১	৯৫৬	৯৪৬	১০৩৫
১৯৩১	৯৫১	৯৪৭	৯৮১
১৯৪১	৯৪৫	৯৪১	৯৭৩
১৯৫১	৯৩৭	৯৪০	৯২৭
১৯৬১	৯৪৮	৯৫২	৯৩৩
১৯৭১	৯৫০	৯৫২	৯২৯

উপরোক্ত তালিকা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাম্প্রতিককালে চাকুরী ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য পুরুষ জনসমাজের মধ্যে ক্রমশঃ বেশী হারে শহরে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসমীক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক জনসংখ্যার ঘনত্ব বিচার অর্থাৎ প্রতিবর্গ কিলোমিটার পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। জনসংখ্যার এই বন্টন দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হতে পারে। এবং এই ঘনত্ব বিচার করেই অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৯৭১ সালে আদমসুমারীর হিসেব অনুযায়ী নদীয়ায় জমির উপর জনসংখ্যার চাপ রাজ্যস্তরের উর্ধ্বে। পশ্চিমবাঙলায় প্রতি বর্গ কি: মি:-এ জনসংখ্যার চাপ গড়ে ৫০৭ জন। সেক্ষেত্রে নদীয়ায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার চাপ ৫৬৮ জন এবং জাতীয়স্তরে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৮২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে নদীয়ার স্থান পঞ্চম। নদীয়ার উর্ধ্বে অবস্থানকারী জেলাগুলি (কলিকাতাসহ) যথাক্রমে কলিকাতা (৩০,৪৯৭), হাওড়া (১,৬২৫,) হুগলী (৯১৩) ও ২৪-পরগণা (৬২৩)।

[জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)]

বৎসর	জনসংখ্যার ঘনত্ব
১৯০১	৫১২
১৯১১	৫১৪
১৯২১	৪৭২
১৯৩১	৪৭৮
১৯৪১	৫৫৭
১৯৫১	৭৫৯
১৯৬১	১১৩৫
১৯৭১	১৪৭৩

(৫৬৮ প্রতি বর্গ কি: মি:)

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, এই জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব সবথেকে হ্রাস পায় ১৯২১ সালে। জেলায় মহামারী, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুতে জনহ্রাসই এর কারণ। বিপুল সংখ্যায় শরণার্থীর আগমনে স্বাধীনোত্তরকালে এই জেলার জমির উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণে ১৯৫১-১৯৬১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ১৯৬১ সালের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই জেলা রাজ্যস্তরের উর্ধ্বে রয়েছে।

জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিবর্তন
(প্রতি বর্গমাইলে)

বৎসর	মোট	গ্রাম	শহর
১৯৭১	১৪৭৩	১২৩৩	৯২৮৯
১৯৬১	১১৩৫	৯৫৪	৭১৮৩
১৯৫১	৭৫৯	৬৩৯	৪৭৪০
১৯৪১	৫৫৭	৪৯৪	২৬৪৯
১৯৩১	৪৭৮	৪৩৪	১৯৫৬
১৯২১	৪৭২	৪৩১	১৮১৯
১৯১১	৫১৪	৪৭৫	১৮২৪
১৯০১	৫১২	৪৭৩	১৮১৫

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, নদীয়ার শহরাঞ্চলের ঘনত্ব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে যোগাযোগের বৃহত্তর সুযোগ-সুবিধা এবং সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে এই জেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জেলার প্রধান প্রধান শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চাকুরী-সংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যার চাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে যদিও এখন পর্যন্ত নদীয়ার শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব রাজ্যস্তরের নীচে রয়েছে। অন্যদিকে নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব রাজ্যস্তরের যথেষ্ট উপরে এবং সমগ্র রাজ্যে এই জেলা গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে পঞ্চম স্থানের অধিকারী। হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান যথাক্রমে প্রথম চারটি স্থানের অধিকারী।

যশড়ার
জগন্নাথদেব বিগ্রহ

নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিগ্রহ

দেপাড়ার নৃসিংহদেব

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে নবদ্বীপ থানা এলাকা ১৯০১ সাল থেকেই প্রথম স্থানের অধিকারী। থানা হিসেবে নবদ্বীপের পরই শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের স্থান। অপরদিকে সদর মহকুমা অপেক্ষা রাণাঘাট মহকুমার জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী। সদর মহকুমার অন্তর্গত করিমপুরের জনসংখ্যার ঘনত্ব জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার বন্টন

নদীয়ার অর্থনীতির মেরুদণ্ড গ্রাম। জনসমাজের বৃহত্তম অংশ গ্রামেই বাস করে এবং জেলার মোট আয়তনের শতকরা ৯৭ ভাগই গ্রামাঞ্চল। এই গ্রামাঞ্চলেই বাস করে জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮১ ভাগ (১৮,১২,২১১ জন)। বাকী শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ (৪,১৮,০৫৯ জন) শহরাঞ্চলে বাস করে।

(জনসংখ্যার শতকরা হারে পরিবর্তন)

বৎসর	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯০১	—	--	—
১৯১১	+ ০.৩৬	০.৩৪	০.৫২
১৯২১	– ৮.২৮	– ৯.২০	– ০.২৯
১৯৩১	+ ১.৪৩	+ ০.৬৬	+ ৭.৫১
১৯৪১	+১৬.৪০	+১৩.৮৩	+৩৫.৪৪
১৯৫১	+৩৬.২৫	+২৯.৩৯	+৭৮.৯৬
১৯৬১	+৪৯.৬৫	+৪৯.২৩	+৫১.৫৩
১৯৭১	+২৯.৯৪	+৩০.০০	+৩৩.০০

১৯৬১ সালে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩,৯৭,৯৮৬ ও ৩,১৫,৩৭৮ জন। এই হিসেব অনুসারে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৭১ এর দশকে এই জেলার গ্রাম ও শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৪,২৪,২২৫ জন ও ১,০২,৬৭১ জন। সেক্ষেত্রে ১৯৫১-৬১র দশকে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,১২,৮০৬ ও ৯১,৮১৫ জন।

উপরোক্ত তালিকায় প্রদত্ত হিসাব থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই জেলার গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনও প্রবণতা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় নি, কিন্তু ১৯৪১ সাল থেকে গ্রামের জনসংখ্যা যদিও জেলার সামগ্রিক জনবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়তে থাকে, কিন্তু শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৫১ সালে এই হার রেকর্ড সৃষ্টি করে (৭৮.৯৬%)।

বর্তমানে নদীয়ায় ১৩টি শহর রয়েছে। ১৯৬১ সালে এই শহরের সংখ্যা ছিল ১২, তার মধ্যে ৬টি অঞ্চল ১৯৬১ সালেই প্রথম শহর বলে ঘোষিত হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই জেলায় মোট ছয়টি পৌরশহর ছিল—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ এবং বীরনগর। ১৯৬১ সালে অপর ছয়টি অঞ্চল কল্যাণী, গয়েশপুর গড়: কলোনী, কাঁটাগঞ্জ ও গোকুলপুর গড: কলোনী, তাহেরপুর, ফুলিয়া, বওলা অ-পৌরশহর বলে ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে আরও একটি অ-পৌরশহর জগদানন্দপুর এই তালিকায় যুক্ত হয়।

নদীয়ার শহর এলাকার মধ্যে ছোট অ-পৌরশহর কাঁটাগঞ্জ ও গোকুলপুর গড: কলোনীর বর্গমাইল প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব সবথেকে বেশী (৫১,৩০৬)। এখানে মাত্র ০.১৬ বর্গমাইল আয়তনে ৮২০৯ জন লোক বাস ক'রে। শহর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বিচারে সমগ্র রাজ্যে কাঁটাগঞ্জ ও গোকুলপুর গড: কলোনীর স্থান দ্বিতীয় (প্রথম স্থান কলকাতা), এর পরই গয়েশপুর গড: কলোনীর স্থান (২৩,৭২৬)। এই ছোট অ-পৌর শহরটির আয়তন ০.৫৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩,০৮২। অ-পৌর শহর তাহেরপুরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৭,৭০৩।

এ ছাড়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৪,০৮৬ এবং মহকুমা সদর রাণাঘাট শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৬,০৪৫। প্রাচীন শহর নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ২০,৯৩৩ এবং ৬,৪৩৮।

ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে জনসংখ্যার বন্টন

নদীয়ার জনসমাজ প্রধানতঃ দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত—হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৭১ সালের হিসেবে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ হিন্দু এবং শতকরা ২৩ ভাগ মুসলমান, এর পরেই খ্রীস্টান ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনসমাজের স্থান (০.৭৩%)। এ ছাড়া শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এই জেলায় বাস করেন। ১৯৭১ সালের হিসেব অনুসারে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রী-পুরুষের তালিকা নিম্নরূপ :

ধর্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা হার
হিন্দু	১৬,৯৩,০০৬	৮,৭০,৯২৯	৮,২২,০৭৭	৭৫.৯১
মুসলমান	৫,২০,৫৭১	২,৬৫,৯৯৭	২,৫৪,৭৭৪	২৩.৩৪
খ্রীস্টান	১৬,৩৩৭	৮,০৬২	৮,২৭৫	০.৭৩
শিখ	৭৭	৪২	৩৫	--
বৌদ্ধ	৫৫	২৪	৩১	--
জৈন	১৬৮	৯৩	৭৫	--
অন্যান্য	৫৬	৩০	২৬	--
অকথিত	৭		৭	--

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা হারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নদীয়ায় ধর্মীয় বিন্যাস গত কয়েক দশকে মোটামুটি একই রকম আছে। ১৯৫১ সালের মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দু ও মুসলমানের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৭৭.০৩% ও ২২.৩৬%। ১৯৬১ সালে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৪.৯৫% ও ২৪.৩৮%। ১৯৭১ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৫.৯১% ও ২৩.৩৪%। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সদর মহকুমার চাপড়া থানায় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা প্রায় সমান। অপর দিকে কৃষ্ণগঞ্জ থানার
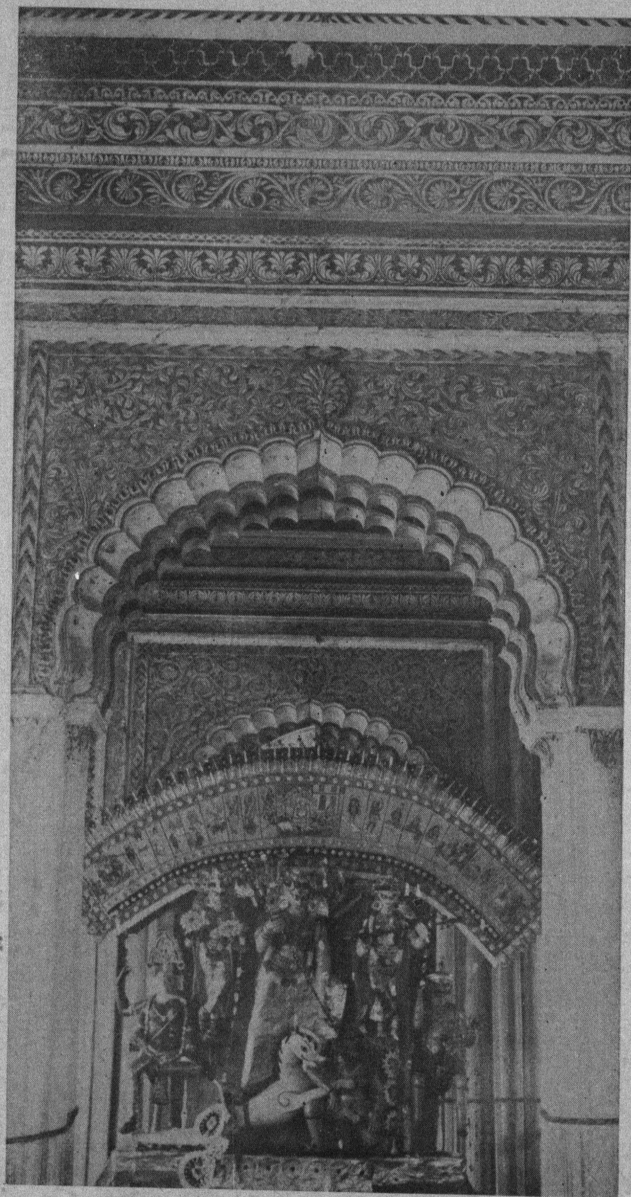
কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে পঙ্খের কারুকার্য ও রাজরাজেশ্বরী মূর্তি

অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। কৃষ্ণনগর ও চাপড়া থানাতেই খ্রীস্ট-ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অধিকাংশের বসবাস।

নদীয়ার জনসমাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য তপশীলভুক্ত জাতি ও তপশীলভুক্ত উপজাতির সংখ্যাধিক্য। ১৯৭১ সালের হিসাব অনুসারে এই জেলায় তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির সংখ্যা ৪,৭৫,৪৮৯ এবং ৩১,৭৯৯ অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকেদের মোট সংখ্যা ৫,০৭,২৮৮ এবং জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬ ভাগই এই শ্রেণীর জনসমাজ। জেলার অর্থনৈতিক উন্নতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ণয় করার সময় এই বিপুল সংখ্যক অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি বিশেষভাবে বিচার্য।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নদীয়ার অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নদীয়া চিরকালই বাংলাদেশের ইতিহাসে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই বিদ্যাচর্চা নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর এবং সাম্প্রতিককালে রাণাঘাট ইত্যাদি শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের হারে নদীয়া তৃতীয় স্থানের অধিকারী, প্রথম দুইটি স্থান যথাক্রমে কুচবিহার ও কলকাতা। অন্যদিকে নদীয়ার গ্রামে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অনেকাংশে কম। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার অনুসারে জেলার তালিকায় নদীয়ার স্থান ষষ্ঠ। প্রথম পাঁচটি স্থানের অধিকারী যথাক্রমে হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্ধমান ও দার্জিলিং।

যেহেতু নদীয়ার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস ক'রে, সেই হেতু সামগ্রিকভাবে এই জেলার শিক্ষিতের হার রাজ্যস্তরের নীচে রয়ে গেছে। ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে এই জেলার শিক্ষিতের শতকরা হার যথাক্রমে ২৭.২৫ ও ৩১.৩১; সেক্ষেত্রে উক্ত সময়ে রাজ্যের শিক্ষিতের হার নিরূপিত হয় যথাক্রমে ২৯.২৮ ও ৩৩.০৫। ১৯৭১ সালের হিসাব অনুসারে নদীয়ায় শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর শতকরা হার যথাক্রমে ৩৯.২৮ ও ২২.৯২।

জেলার মোট জনসংখ্যা যেখানে ২২,৩০,২৭০ জন সেখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৬,৯৪,৩৪১ জন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, প্রাচীন সংস্কৃতির পীঠস্থান এই জেলায় শিক্ষার উন্নতি মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। শিক্ষিতের সংখ্যার দিক দিয়ে জেলার চিত্রটি নিম্নরূপ:

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
গ্রামাঞ্চল	৪,৫৪,৪৩১	২,৯৯,২৩৪	১,৫৫,১৯৭
শহরাঞ্চল	২,৪৩,৯১০	১,৪২,৮৮৩	১,০১,০২৭
মোট	৬,৯৪,৩৪১	৪,৪২,১১৭	২,৫৬,২২৪

স্ত্রীশিক্ষার দিকে নদীয়ার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০১ সালে যেখানে প্রতিহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র উনিশ জন লেখাপড়া জানতেন সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের হিসাবে স্ত্রীশিক্ষার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২.৯২। বাস্তবিকপক্ষে ১৯৫১-৬১র দশক জেলার শিক্ষার উন্নতিতে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৫১ সালের যেখানে শিক্ষিতের হার ছিল ১৫.৩১% সেখানে ১৯৬১ সালে এই হার দাঁড়ায় ২৭.২৫%। এই সময়ে পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় (৩৫.৭৮%) ও শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের হার বাড়ে দেড়গুণ (১৮.২৪%)। জেলার মধ্যে নবদ্বীপ থানা এলাকায় শিক্ষিতের হার সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তারপরই রাণাঘাটের স্থান।

ভাষা

এই জেলার ভাষার প্রধান বাহন বাংলা। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৭ জনেরও বেশীর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলার পরই হিন্দীর স্থান। হিন্দী ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা সবথেকে বেশী চাকদহ থানা এলাকায়। জেলায় হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের এক চতুর্থাংশেই এই এলাকায় বাস করেন। এই স্থানে কয়েকটি শিল্পের অবস্থান হওয়ায় শ্রমজীবী অবাঙালী সম্প্রদায়ের বাস এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

ভাষার দিক দিয়ে সাঁওতালী ভাষা জেলায় তৃতীয় স্থানের অধিকারী, যদিও জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগেরও কম সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা সাঁওতালী।

চাপড়া থানার শতকরা ৯৯.৭৮ ভাগ লোকেরই মাতৃভাষা বাংলা; নাকাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, করিমপুর, তেহট্ট ইত্যাদি থানার ৯৯% ও কৃষ্ণনগর থানায় এই হার প্রায় ৯৬%।

কর্মী জনসমাজ ও উপজীবিকা

জনসংখ্যার নিছক হ্রাসবৃদ্ধি দেখে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-অবনতি বিচার করা যায় না। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি নির্ভর করে সেই সমাজে উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যার উপর। সেদিক দিয়ে বিচার করলে নদীয়ার চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। নদীয়ার মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৪.৭৫ জন উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত। সেই হিসেবে জেলার কর্মী অর্থাৎ যাঁরা উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত এবং যাঁরা অকর্মী অর্থাৎ যাঁরা কোনভাবেই কোনও উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদের সংখ্যা নিম্নরূপ:

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কর্মী			
গ্রাম	৪,৫২,৬৫৬	৪,৩৮,৭৪০	১৩,৯১৬
শহর	৯৯,৮৯২	৯২,৪১৭	৭,৪৭৫
মোট	৫,৫২,৫৪৮	৫,৩১,১৫৭	২১,৩৯১
অকর্মী			
গ্রাম	১৩,৫৯,৫৫৫	৪,৮৯,৫৩৮	৮,৭০,০১৭
শহর	৩,১৪,১৬৭	১,২৪,২৮২	১,৯৩,৮৮৫
মোট	১৬,৭৭,৭২২	৬,১৩,৮২০	১০,৬৩,৯০২

এখানে কর্মী বলতে যাঁরা অর্থনীতির সংজ্ঞায় উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত হয়ে যে কোনও ভাবে কিছু আয় করছেন তাঁদের সকলকেই ধরা হয়েছে। অপর দিকে অকর্মী বলতে শিক্ষার্থী,

ছাত্রছাত্রী, গৃহকার্যে নিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ, জেলখানার কয়েদী ও হাসপাতালের রোগী, ভিখারী, ভবঘুরে, কর্মেচ্ছু বেকার ও পূর্বে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু বর্তমানে বেকার এই ধরনের সকল স্ত্রী-পুরুষকেই ধরা হয়েছে।

উৎপাদনশীল কাজে অংশ গ্রহণের নিরিখে নদীয়ার জনসমাজ যে শুধুমাত্র শিল্পোন্নত জেলাগুলির থেকে পিছিয়ে আছে তাই নয়, এই জেলা সর্বনিম্নস্থানের অধিকারী এবং রাজ্যস্তরের অনেক নীচে অবস্থান করছে। ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে রাজ্যে যেখানে মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ৩৩.২ জন এবং ২৮.৩৭ জন উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত থেকেছে সেখানে নদীয়ার হিসাব যথাক্রমে ২৭.২ এবং ২৪.৭৫।

১৯৭১ সালের সমীক্ষায় নদীয়ার জনসমাজের যে অংশ কর্মী ব'লে চিহ্নিত হ'য়েছে তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫,৩১,১৫৭ (৪৬.২২%) স্ত্রী ২১,৩৯১ (২.১৪%)।

উল্লিখিত কর্মীসমাজ আবার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে। ক্ষেত্র অনুযায়ী বণ্টন নিম্নরূপ:

প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary occupation)

কৃষক	২,০৮,৫৩৫
কৃষিশ্রমিক	১,৫২,২৮৫
পশুপালন, বন ও মৎস্যচাষে নিযুক্ত	১৬,০৫৫
খনিশিল্পে নিযুক্ত	১২২
মোট	২,৭৬,৯৯৭

মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary occupation)

ছোট, বড় ও মাঝারি কুটির শিল্পে নিযুক্ত	২৯,৮৬৪
সংস্কার ও মেরামতী কাজে নিযুক্ত	৩৪,১৪৯
মোট	৬৪,০১৩

করণিক উপজীবিকা (Tertiary occupation)

ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত	৪০,১৪৫
যোগাযোগ, পরিবহণ ও সংরক্ষণ শিল্প	১৪,৭২৭
বাড়ীঘর ও রাস্তাঘাট নির্মাণ কাজে নিযুক্ত	৫,২২৯
অন্যান্য কাজে নিযুক্ত	৫১,৪৩৭

উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নদীয়ার কর্মী জনসমাজের শতকরা ৫০ জনই কৃষি ও কৃষির আনুষঙ্গিক কাজে নিযুক্ত। সেই তুলনায় শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা শুধুমাত্র কম তাই নয় এই সংখ্যা মোট জেলার শ্রম সরবরাহে মাত্র ১১.১৩ ভাগ। অপরদিকে এই জেলায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের তুলনায় করণিক উপজীবিকায় (Tertiary occupation) নিযুক্ত লোকের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী। এই শ্রেণীর উপজীবিকায় মোট কর্মীসমাজের প্রায় শতকরা ১০.৩৯ জন নিযুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকায় যে ৫১,৪৩৭ জন নিযুক্ত রয়েছে সেই হিসাব ধ'রলে করণিক উপজীবিকায় নিযুক্ত লোকসংখ্যার হার আরও বেশী হবে।

সামাজিক অবস্থা

নদীয়ার জনগণের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যায় যে, গ্রামপ্রধান এই জেলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাজ্যের অন্যান্য অনেকগুলি জেলার পিছনে পড়ে রয়েছে। এই অনগ্রসরতার কারণ, যদিও এই জেলা কৃষিনির্ভর তবুও জলসেচের সুবিধার অভাবে, মাটির অনুর্বরতা ও নদীগুলির বর্তমান দুর্গত অবস্থা ইত্যাদির ফলে কৃষির উৎপাদন আশানুরূপ হয় নি। অবশ্য বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং একদিকে যেমন উচ্চ উৎপাদনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হচ্ছে তেমনি পাট, গম ইত্যাদির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষকের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষির উৎপাদনের দিক দিয়ে এই জেলা বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলার অনেক পিছনে।

এই জেলার শিল্পোন্নতিও আশানুরূপ হয় নি। বরাবরই নদীয়া ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার আমলে কল্যাণী শিল্প-উপনগরী প্রতিষ্ঠা ও কয়েকটি মাত্র নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনও বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ দেখা যায় নি। এই জেলা শিল্পের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্ধমান ইত্যাদি অনেক জেলার পিছনে পড়ে আছে।

এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে নদীয়ার জনসমাজের আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচে এবং গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য খুবই প্রকট। জেলার সাধারণ মানুষের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ইত্যাদির অবস্থা এবং জীবন ধারণের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব জনজীবনের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই প্রকাশ করে। অবশ্য শহরাঞ্চলের অবস্থা গ্রামাঞ্চল থেকে কিছুটা উন্নত।

খাদ্যের অভ্যাসে ও পোশাক-পরিচ্ছদে এই জেলার জনসমাজ অনাড়ম্বর। এই জেলার শতকরা ৭৪.৪৬ ভাগ লোকই এক কক্ষযুক্ত গৃহে বাস করে। এক কক্ষযুক্ত গৃহে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা হিসাবে নদীয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থানের অধিকারী। অপরদিকে এই জেলার শতকরা ১৭.০৪ ভাগ লোক দুই কক্ষযুক্ত এবং মাত্র শতকরা ৪.৪৬ ভাগ তিন কক্ষযুক্ত গৃহে বাস করে। তিন কক্ষযুক্ত গৃহে বসবাসকারী পরিবারের হিসেবে রাজ্যের ষোলটি জেলার মধ্যে নদীয়ার স্থান সর্বনিম্ন। বাসগৃহ সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার নিম্নমানেরই পরিচয় বহন করে।

নদীয়ার জনজীবনের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সমীক্ষার উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে, সীমান্তবর্তী ছোট এই জেলাটির সম্প্রসারণশীল জনসমাজকে যদি সত্যকার জনসম্পদে পরিণত করতে হয় তাহলে এই জনসমাজকে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় এক বিকাশশীল সমাজব্যবস্থার সামিল করে তুলতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে সৃজনশীল কাজে, গড়ে তুলতে হবে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের আরও উন্নত ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সুযোগ সুবিধা—আর সেই প্রয়োজনেই পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ।

পরিশিষ্ট 'ক' : নদীয়ার জনসংখ্যা, ১৯৭১

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
মোট	২২,৩০,২৭০	১১,৪৪,৯৭৭	১০,৮৫,২৯৩
গ্রাম	১৮,১২,২১১	৯,২৮,২৭৮	৮,৮৩,৯৩৩
শহর	৪,১৮,০৫৯	২,১৬,৬৯৯	২,০১,৩৬০

থানা অনুযায়ী জনসংখ্যার বন্টন

থানা	মোট	তপশীলভুক্ত জাতি	তপশীল উপজাতি
১। করিমপুর	১,৮৭,৪৮০	২৭,৩৯৪	১,২০২
২। তেহট্ট	১,৭৭,০১৩	৩৯,৪০১	৭১৬
৩। কালীগঞ্জ	১,৪৮,৪৬৫	২৫,০২৮	৪৩০
৪। নাকাশীপাড়া	১,০৬,২৩২	৩৫,২১৭	১,২২৩
৫। চাপড়া	১,৩৫,৬৩৪	২০,৭৭২	--
৬। কৃষ্ণগঞ্জ	৬৮,৭৫৬	২৫,৬১০	--
৭। কৃষ্ণনগর	২,৭২,৯৫৮	৪৭,৬৬৫	৪,৯৬৫
৮। নবদ্বীপ	১,৬০,৫৭০	১১,৮২৭	৬৯
৯। শান্তিপুর	১,৪৪,৩১১	২৮,৭৩৪	২,৬২৪
১০। হাঁসখালি	১,১৪,২০৬	৪৬,৯২৭	২,১২৮
১১। রানাঘাট	৩,১১,০৩৯	৮২,৪৯৮	৪,৫৫৬
১২। চাকদহ	১,৮৬,০৪৪	৪৫,৯৯৪	৭,৬৪২
১৩। কল্যাণী	৬৭,৯২৯	১৭,৪৫৫	৮৬৫
১৪। হরিণঘাটা	৯৫,৫৮৩	২০,৯৬৭	৪,২৫৬
মোট	২২,৩০,২৭০	৪,৭৫,৪৮৯	৩১,৭৯৯

পরিশিষ্ট 'খ' : নদীয়া জেলার শহরের জনসংখ্যা, ১৯৭১

শহর		আয়তন			জনসংখ্যার		
		বর্গমাইল	বর্গ কি:মি:	মোট জনসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)	তপশীলভুক্ত জাতি	তপশীল উপজাতি
১। নবদ্বীপ (পৌর)		৪.৫০	১১.৬৬	৯৪,২০৪	২০,৯৩৩	৪,১৮৭	৪৫
২। কৃষ্ণনগর (ঐ)		৬.১০	১৫.৮০	৮৫,৯২৩	১৪,০৮৬	৬,৭৮৫	৮৪৯
৩। শান্তিপুর (ঐ)		৯.৫০	২৪.৬০	৬১,১৬৬	৬,৪৩৮	৪,৪২১	১২২
৪। রাণাঘাট (ঐ)		২.৯৮	৭.৭২	৪৭,৮১৫	১৬,০৪৫	২,৯৭১	২৫
৫। চাকদহ (ঐ)		৬.০০	১৫ ৫৪	৪৬,৩৪৫	৭,৭১৭	৫,৮৭৮	৫৭৬
৬। কল্যাণী (অ-পৌর)		৮.৪৬	২১.৯১	১৮,৩১০	২,১৬৩	৪,৮৩৬	৩৫৬
৭। তাহেরপুর (ঐ)		০.৭৪	১.৯১	১৩,১০৪	১৭,৭০৩	৭০৫	৬
৮। বীরনগর (পৌর)		২.১৩	৫.৫২	১০,৫৬০	৪,৯৫৮	২,১২৫	১২৬
৯। গয়েশপুর গভ: কলোনী	(অ-পৌর)	০.৫৫	১.৪৩	১৩,০৮২	২৩,৭২৬	৮৫৮	৯
১০। কাঁটাগঞ্জ ও গোকুলপুর গভ: কলোনী	(ঐ)	০.১৬	০.৪১	৮,২০৯	৫১,৩০৬	৪০৮	
১১। বগুলা	(ঐ)	১.৩৯	৩.৬০	৬,৭৯৯	৪,৮৯১	৪,২০৫	২
১২। ফুলিয়া	(ঐ)	১.৩৫	৩.৫০	৪,৬২৭	৩,৪৫৭	১,০৬১	৫৫
১৩। জগদানন্দপুর	(ঐ)			৭,৯১৫		১,০৭৭	১২৭

পরিশিষ্ট 'গ' : জীবিকা অনুযায়ী কর্মরত ব্যক্তিদের সংখ্যা, ১৯৭১

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কর্মরত ব্যক্তির সংখ্যা	৫,৫২,৫৪৮	৫,৩১,১৫৭	২১,৩৯১
কৃষক	২,০৮,৫৩৫	২,০৬,৩৫৯	২,১৭৬
কৃষিশ্রমিক	১,৫২,২৮৫	১,৪৬,১৩৯	৬,১৪৬
পশুপালন, বন ও মৎস্যচাষ	১৬,০৫৫	১৫,২৭৫	৭৮০
খননকার্য	১২২	১২২	
বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প	২৯,৮৬৪	২৭,৯৯১	১,৭৮৩
সংস্কার ও মেরামতী কার্য	৩৪,১৪৯	৩১,৯৬৪	২,১৮৫
নির্মাণকার্য	৫,২২৯	৫,১৬২	৬৭
ব্যবসা-বাণিজ্য	৪০,১৪৫	৩৯,৩৮৮	৭৫৭
যোগাযোগ, পরিবহণ ও সংরক্ষণ	১৪,৭২৭	১৪,৬২৩	১০৪
অন্যান্য কার্য	৫১,৪৩৭	৪৪,১৩৪	৭,৩০৩

ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করে পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতী-ইছামতী-জলঙ্গী-ভৈরব-মাথাভাঙ্গার শত শতা-ব্দীব পলিমাটি আকীর্ণ এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বাস্তবরূপ কবে এই নদীয়া নামে আখ্যাত হয়েছিল, কবে কোন্ মধুর এই নাম সুললিত কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল তা জানা নেই। তবে পরবর্তী প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত গাঙ্গেয় অঞ্চলের নবদ্বীপ গড়ে উঠেছিল—গড়ে উঠেছিল নবদ্বীপের প্রত্যন্ত সংলগ্ন বিজয়পুর। শত শত বছর ধরে এই বিরাট ভূখণ্ডের আকৃতি-প্রকৃতি বারে বারে বদলেছে—নদীর গতি পরিবর্তিত হয়েছে—নগর, প্রান্তর, বন্দর, মঠ, মন্দির ধ্বংস হয়েছে, আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। সেই নদীয়া বা নবদ্বীপের নাম প্রথম যে তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হল তা আজও কল্পনা, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি আর অনুমানের ওপর নির্ভর। ঐতি-হাসিক যুগে ইতিহাসের সঙ্গে সমতা রেখে এর ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই ইতিহাস রাজনীতি বা যুদ্ধবিগ্রহের চেয়েও বিদ্যা, জ্ঞানবত্তা ও ধর্মালোচনায় বিকীর্ণ নদীয়া-রাজলক্ষ্মীর যে বন্দনাগান নদীয়াবাসী চারণের মত গেয়ে এসেছেন, এ তারই এক ভাস্বর কাহিনী।

নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামের উৎপত্তি। কিন্তু কোন্ নামটি যে আগে হয় তা জানা যায় না। এখান দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল। অনেকে নবদ্বীপ অর্থে নব বা নতুন দ্বীপ অর্থ করেন। তাঁদের মতে এই স্থানটি গঙ্গার মধ্যে একটি চরভূমি ছিল এবং কালে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে ঐ চরভূমি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে পড়ে ও মানুষের বাসোপযোগী হয়ে ওঠে। তারপর ক্ষুদ্র পল্লী থেকে ধীরে ধীরে এই নবদ্বীপ একদিন বঙ্গের রাজধানী হয়।

নবদ্বীপ বা নদীয়া নামের উৎপত্তি

অনেকে নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলেও উল্লেখ করেন। এই নয়টি দ্বীপ ও তার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলি হল:

গঙ্গার পূর্বপারে চারটি দ্বীপ

	দ্বীপ	গ্রাম
(১)	অন্তর্দ্বীপ	মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা এই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। জানা যায়, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব (জন্ম) নাকি এখানেই হয়েছিল।
(২)	সীমন্তদ্বীপ	সরডাঙ্গা ও সিমলা।
(৩)	গোদ্রুমদ্বীপ	গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি।
(৪)	মধ্যদ্বীপ	মাজিদা ও ভালুকা।

গঙ্গার পশ্চিম পারে পাঁচটি

(৫)	কোলদ্বীপ	কুলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড়।
(৬)	ঋতুদ্বীপ	রাতপুর, রাহুতপুর ও বিদ্যানগর।
(৭)	মোদদ্রুমদ্বীপ	মাউগাছি, মামগাছি ও মহৎপুর।
(৮)	জহ্নুদ্বীপ	জাননগর বা জান্নগর।
(৯)	রুদ্রদ্বীপ	রাদুপুর বা রুদ্রডাঙ্গা, সঙ্কাপুর ও পূর্বস্থলী এলাকা।

এই থেকে অনুমিত হয় যে, তদানীন্তনকালে নবদ্বীপের পরিধি কি বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল।

আর একটি কিংবদন্তীতে আছে: পুরাকালে প্রদীপকে 'দীয়া' বলত এবং 'ন' অর্থাৎ নয়টি আর 'দীয়া' হচ্ছে দ্বীপ এই থেকে ন-দীয়া বা নব-দীপ নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতে যা পাওয়া যায় তা হল—গঙ্গার মধ্যে সেই বিস্তীর্ণ চরে যখন মনুষ্যবসতি সুরু হতে থাকে তখন ঐ চরে এক সন্ন্যাসী প্রতি রাত্রিতে নয়টি দীপ জ্বেলে তান্ত্রিক সাধনা করত। লোকে তখন ঐ নয়টি দীপকে দেখিয়ে উক্ত চরকে ন-দীয়া বলে উল্লেখ করত।

নদীয়া বা নবদ্বীপ এই নাম দুটির উৎপত্তির কাহিনী যে সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর ওপর নির্ভরশীল তা সহজেই বোঝা যায়। তবে নবদ্বীপ ও নদীয়া যে একই স্থানের নাম তা স্পষ্ট। বৈষ্ণবগ্রন্থকার নরহরি তাঁর নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতিতে লিখেছেন:

> নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
> নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥
>
> নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
> পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥

পালরাজাদের আমলে নদীয়াভূমির অস্তিত্ব ছিল। গুপ্ত-রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। মোটামুটি পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের একাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'বঙ্গ'। উত্তরবঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'গৌড়' রাজ্য। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে মহাসেন গুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে তাঁরই এক বাঙালী সামন্তরাজ গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পাল রাজাদের আমলে

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দেয়। তখন বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গলচিন্তা করে সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে স্থানীয় এক প্রতিপত্তিশালী রাজাকে বাংলারা

সিংহাসনে বসান (৭৫০ খ্রীঃ)। গোপাল দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল এবং দেবপালসহ অন্যান্য পালরাজারা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে এখানে রাজত্ব চালান। পালরাজারা গৌড়ও অধিকার করেছিলেন। নদীয়া বা নবদ্বীপ তখন গৌড়ের অধীনেই ছিল। ধর্মপাল ও তাঁর পরবর্তী বংশধররা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, নবদ্বীপেও পালরাজারা একটি বাসস্থান স্থাপন করেছিলেন। নবদ্বীপ থেকে প্রায় চার মাইল দূরে 'সুবর্ণ-বিহার' নামে যে গ্রাম আছে, সেই গ্রামের নামের সঙ্গে 'বিহার' যুক্ত থাকায় এই অনুমান করা হয়। কারণ 'বিহার' অর্থে বৌদ্ধদের 'মঠ'। এই গ্রামে কিছু ভগ্ন বাড়ীঘরের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই বাড়ীঘর পালরাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলে অনেকে ধারণা করেন।

সেনরাজাদের অভ্যুত্থান

পালবংশের শেষরাজা রামপালের দুর্বলতার সুযোগে একাদশ শতাব্দীতে সেনরাজাদের অভ্যুত্থান ঘটে। সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেনের পর বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে এবং অন্যান্য বহু দলপতি ও রাজাদের পরাজিত করে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এঁরই পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজকে নতুনভাবে গড়বার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন।

বল্লাল সেন গৌড় ছাড়াও নবদ্বীপ ও সুবর্ণগ্রামে আরও দুটি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং জীবনের বহু সময় নবদ্বীপে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে অতিবাহিত করেন। এই সময় ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিতা ছিল, এখন পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিতা। জানা যায়, ১২০৬ সালে ভাগীরথী এইভাবে গতি পরিবর্তন করে। বল্লাল সেন সেই সময় নবদ্বীপে ভাগীরথীর তীরে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। বামনপুকুর গ্রামে অবস্থিত সেই প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখন 'বল্লাল ঢিবি' নামে পরিচিত। এর কাছেই বল্লাল দীঘিও তাঁর নাম এখনও বহন করে নিয়ে চলেছে। কিছুদিন আগে এই বল্লাল ঢিবি বা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে কয়েকটি কাঠের বারকোশ, উইয়ে খাওয়া একটি ভাঙা কাঠের সিন্দুক আবিষ্কৃত হয়। কাঠের সিন্দুকের ভেতর থেকে জীর্ণ শাল ও পশমী পোশাকের অংশবিশেষ এবং কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গেছে।

"On the other side of the river, there is a large mount still called after Ballal Sen. It was recently dug by one Mollah Sahib who discovered some Barkoshes or wooden trays and a box containing remnants of Shawls and silken dresses and also some small silver coin --*Hunter's Statistical Account of Bengal*, Vol. II, p. 142.

এইসব জিনিষ দেখে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, এই ভগ্নস্তূপ বল্লাল সেনের প্রাসাদেরই একাংশ—ঠাকুরবাড়ী বা পুজোর দালান ছিল।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এর আগে নবদ্বীপে সেনরাজাদের স্থায়ী কোন রাজধানী ছিল না। নবদ্বীপ তার আগে গঙ্গার তীরে একটি পুণ্যস্থান ছিল। ধর্মপ্রাণ লোকেরা এখানে এই পুণ্যভূমিতে এসে বসবাস করতেন। লক্ষ্মণ সেন এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলে তাঁর কর্মচারীরা, সভাসদবৃন্দ প্রভৃতি সকলেই এখানে বাসস্থান করে ফেলেন। ফলে, নবদ্বীপ ক্রমেই জনবহুল নগরে পরিণত হয়। সেই সময় নবদ্বীপে বাংলার নিজস্ব শিল্পকলামণ্ডিত বাঁশ-কাঠ-খড়ের তৈরী বাড়ী-ঘরেরই প্রাধান্য ছিল। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের বিল্ব-পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সে প্রাসাদ কালের গতিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বল্লাল সেন ছিলেন শিবের উপাসক। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁর রাজসভায় গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মর্যাদার আসন দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী বৈষ্ণবকবি জয়দেব, স্বনামধন্য কবি ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রমুখ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের প্রধান বিচারপতি। তাঁর ভাই পশুপতিও ছিলেন মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত। বটুক দাস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন সেনাপতি।

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির নদীয়া আক্রমণ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই কুতব-উদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজি বিহার ও বাংলা জয় আরম্ভ করলে তিনি নবদ্বীপে এসেও উপস্থিত হন। নবদ্বীপ অধিকার কাহিনী "তবকাৎ-ই-নাসেরী'র লেখক মিনহাজ-ই-সিরাজ বা মিনহাজ-উদ্দিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার মাত্র ১৮ জন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। বাকি সৈন্য ছিল নবদ্বীপের উপকূলে বনের ভেতর লুকিয়ে। বখ্‌তিয়ার নগরীতে অশ্ব-বিক্রীছলে এমনভাবে প্রবেশ করেন যে, কেউ ভাবতে পারে নি যে নবাগত ব্যক্তি বখ্‌তিয়ার খিলজি। বরং তারা ভাবল যে, কোন বিদেশী ব্যবসায়ী হয়ত ঘোড়া বিক্রী করতে এসেছে। বখ্‌তিয়ার ক্রমে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের ফটকে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর তরবারি বের করে দ্বাররক্ষক প্রভৃতিদের হত্যা করতে লাগলেন এবং তারপর প্রাসাদে ঢুকে সেখানেও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু করে দিলেন। প্রাসাদের রক্ষকবৃন্দ তখন বিশ্রাম ও রন্ধনকার্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিল। তারা বখ্‌তিয়ারকে কোন বাধাই দিতে পারল না। প্রাসাদের ভেতর তাঁর লোকেদের এই ক্রন্দন-রোল ও চীৎকার শুনে রাজা সব বুঝতে পারলেন এবং প্রাসাদের পেছন দরজা দিয়ে খালি পায়ে সপরিবারে পলায়ন করলেন।

মিনহাজের এই বিবরণ কতখানি সত্যের উপর নির্ভর তা বলা শক্ত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বখ্‌তিয়ারের নদীয়া আক্রমণ সম্পর্কে আনুষঙ্গিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নিজে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যা লিখেছেন তা হল : বখ্‌তিয়ার পূর্ব-দিন রাত্রে এসে নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমে কুড়ি মাইল দূরে তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে লুকিয়ে থাকেন। তারপর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮ জন সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিদেশী অশ্বব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কারোর উপব কোন অত্যাচার না করে অত্যন্ত চুপিসাবে ও ধীর গতিতে নগরে প্রবেশ করেন। নগরের ফটক থেকে রাজপুরী পর্যন্ত দেড় মাইল পথ যেতে তাঁর সময় লাগে পঁচিশ মিনিট।(১)

বখ্‌তিয়ারের পেছন পেছন দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করে। প্রাসাদের রক্ষীরা তখন আহারাদি নিয়ে ব্যস্ত, প্রাতঃকালীন রাজসভাশেষে সভাপরিষদরা তাঁদের বাসস্থান অভিমুখে, নগরের লোকেরা যে যার দ্বিপ্রহারিক বিশ্রামে রত। এমন সময় বখ্‌তিয়ারের নগরী আক্রমণ করতেও সুবিধা ঘটে। সুযোগ বুঝে বখ্‌তিয়ারের সৈন্যরা তাদের তরবারি বের করে হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয় এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে। বখ্‌তিয়ার একই সঙ্গে সৈন্য নিয়ে অকস্মাৎ দুদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদ জয় করেন।

বখ্‌তিয়ারের এই আক্রমণ পূর্বপরিকল্পিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বখ্‌তিয়ার নদীয়ায় মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করে ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়ে বহু ধন-রত্নাদি নিয়ে গৌড়ের দিকে রওনা হয়ে যান। নদীয়া-নগরী বখ্‌তিয়ারের এই লুণ্ঠনে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মুসলমানাধিকার

বখ্‌তিয়ারের পরই নদীয়া মুসলমানাধিকারে আসে। বখ্‌তিয়াব তাঁর অধিকৃত প্রদেশকে দুভাগে ভাগ করেন। এক গৌড়, অন্য দিনাজপুরের কাছে দেবকোট। এই দেবকোটে বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু ঘটে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়। বাদশা গিয়াসুদ্দিন বল্‌বন শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে বঙ্গদেশকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি রাজধানী স্থাপন করেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং নবদ্বীপের পরিবর্তে সপ্তগ্রাম। এর পরের বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে চলে। বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। তিনটি রাজধানীর তিনজন শাসনকর্তার পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস স্বাধীনতা ঘোষণা করে সমগ্র বাংলা দেশ নিজ অধিকারে এনে 'সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ' নাম ধারণ করে রাজত্ব করতে থাকেন। সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ তাঁর রাজধানী গৌড়ের পরিবর্তে পাণ্ডুয়ায় স্থাপন করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। এরপর সামসুদ্দিনের পুত্র সিকন্দর শাহ এবং তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম ক্রমে বাংলার সিংহাসনে বসেন। গিয়াসুদ্দিনের পর সইফ-উদ্দিন হাম্‌জার রাজত্বকালে গণেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গণেশ তাঁর পুত্র যদু বা জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহের হাতে সিংহাসন অর্পণ করেন। যদুর পর তাঁর পুত্র সামসুদ্দিন সুলতান হন। সামসুদ্দিন তাঁর ভৃত্যদের হাতে নিহত হলে ইলিয়াসশাহী বংশের নাসিরউদ্দিন বাংলার সিংহাসনে বসেন। তারপর রুকনউদ্দিন বারবাক্ শাহ এবং পরে হাবসী নেতা সিদি বদর মজাফর শাহ বাংলার সিংহাসন পান। নদীয়ার এই ক্ষুদ্র ইতিহাসে এঁদের ধারাবাহিক বিশদ বিবরণের স্থান নেই বলে সে কাহিনী আর উল্লেখ করা গেল না। সে ইতিহাস বঙ্গাধিপতিদের একে অপরকে বিশেষ করে সিংহাসনারূঢ়দের তাঁদের প্রধান কর্মচারিগণ হত্যা করে তাদের সিংহাসন অধিকার করার কাহিনীতে পূর্ণ।

হুসেনশাহ

মজাফর শাহ ছিলেন নৃশংস ও যথেচ্ছাচারী রাজা। মজাফর শাহের সময় নবদ্বীপবাসীর বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করা হয়। কিন্তু এই অত্যাচার বেশীদিন আর স্থায়ী হয় নি। মজাফরের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ হুসেন শাহ মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে)। হুসেন শাহ নবদ্বীপের ভগ্ন দেউল ও মন্দিরাদির পুনঃ সংস্কারের আদেশ দেন। হুসেন শাহ প্রথমে তদানীন্তন রাজসরকারে একটি সামান্য চাকুরী পান। পরে নিজের বুদ্ধির প্রভাবে রাজসিংহাসন লাভ করেন। হুসেন সুশাসকও ছিলেন।

রূপ ও সনাতন

তাঁর সময়ে অনেক হিন্দু রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করেন। রূপ ও সনাতন দু'ভাই তাঁর সভায় 'দবীরখাস' ও 'সাকর মল্লিক' নিযুক্ত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্ধন সপ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত হন। সে সময় কয়েকজন কাজি বিভিন্ন স্থানে থেকে নদীয়া শাসন করতেন। চাঁদ খাঁ নামে একজন কাজি নবদ্বীপের সংলগ্ন বামনপুকুরে বাস করতেন। বামনপুকুরে এখনও তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও সমাধি আছে। শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকতেন আর এক কাজি, তাঁর নাম ছিল মুলুক। এই মুলুক কাজির প্ররোচনায় হরিদাস ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায় বাদশাহের বিচারে বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু পরে পুনর্জীবন

১। বখ্‌তিয়ার বিহার থেকে নবদ্বীপ জয় করার জন্যে নদীয়ার যে যে পথ দিয়ে গমন করেছিলেন, অনেক জায়গায় সে স্থান এখনও তাঁর নাম বহন করছে। যেমন—শান্তিপুর ও বয়রার মধ্যবর্তী যে জায়গায় তিনি গঙ্গা পার হয়েছিলেন এখনও সেই স্থানটি 'বখ্‌তারের ঘাট' নামে পরিচিত।

তবে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস না থাকায় মিনহাজ উদ্দিনের 'তবকাৎ-ই নাসেরী'র ওপর নির্ভর করতে হয়।

লাভ করেন। আর চাঁদকাজিও মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেও শেষে তাঁর কৃপালাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

বাংলায় হাব্সী শাসনকাল শুরু হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক এই বছরেই ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দ) নবদ্বীপে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের বিলুপ্তির পর সেনরাজযুগে অভ্যুত্থান হয় নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের। একদিকে সামাজিক দুর্নীতি, অন্যদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য-স্বতন্ত্রতার কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে সামাজিক ও ধর্মজীবনের কৃত্রিমতা, চিন্তার সংকীর্ণতা আর সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতায় বাঙালীজাতি যখন দলিত ও পৃষ্ট, ধর্মের বিনাশ আর অধর্মের উত্থানে যখন বাঙালী ভীত সন্ত্রস্ত—ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ঘটনা। পাঠান, ইলিয়াস শাহী, সুলতানী রাজত্বের উত্থান-পতনে বাঙালী যখন বিপর্যস্ত, তখন মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেম ভক্তির অমৃত প্রস্রবণে বাঙালীর মন জুড়িয়ে গেল—এক অভিনব রসপ্লাবনে সমগ্র বাংলা প্লাবিত হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ আর রইল না। জাতি, সম্প্রদায়, ধনী, দরিদ্র সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

বাংলার সুলতান হুসেন শাহও ছিলেন বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাবান। ধর্মের ওপর ছিল তাঁর উদারতা, হিন্দু-মুসলমানকে দেখতেন না বিভেদের চোখে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবে তা সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। তাই সেই শতাব্দীতে এই নবদ্বীপে এক নতুন যুগসন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হতে পেরেছিল, বাঙালী জাতি সজীবতা লাভ করেছিল।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ্ সিংহাসনে বসেন। তিনিও সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নুসরৎ শাহের পরবর্তী হুসেনশাহী সুলতানরা কিছুদিন বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। পরবর্তীকালে শের খাঁ (বা শের শাহ) নামে এক দুর্ধর্ষ আফগান গৌড় জয় করে নেন এবং হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লীও অধিকার করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁরই বংশের কয়েকজন গৌড়ের শাসনকর্তা হন। দিল্লীশ্বর আকবর পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করতে সেনাপতি মুনিম খাঁ ও তোডড়মল্লকে বাংলায় প্রেরণ করেন। এই সময় মহামারিতে প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁও এখানে এসে মহামারিতে মারা যান। তখন আকবর তোডড়মল্লের সাহায্যের জন্য হুসেনকুলি খাঁকে পাঠান (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে)। তোডড়মল্ল অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য পেয়ে বঙ্গদেশের জমিদারদের সঙ্গে নিজের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সখ্যতা স্থাপন করেন। প্রতাপশালী জমিদার কাশীনাথ রায় তোডড়মল্লের সঙ্গে মিলিত হন এবং পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ফলে, দিল্লীশ্বর আকবরের কাছ থেকে তিনি 'সমরসিংহ' এই উপাধি লাভ করেন। মোগলবাহিনীর আক্রমণে পলায়নপর শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁর পশ্চাদ্ধাবনকালেও, সমরসিংহ মোগলদের সাহায্য করেছিলেন। তারপর বঙ্গদেশ মোগলদের অধীনস্থ হলে বঙ্গের শাসনভার কিছুদিনের জন্যে হুসেনকুলী খাঁর ওপর ন্যস্ত করে তোডড়মল্ল দিল্লী যান সম্রাট আকবরের সঙ্গে দেখা করতে। এই সুযোগে সমরসিংহেরই কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর ষড়যন্ত্রে রাজদ্রোহী বলে আখ্যাত হয়ে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। পরে তোডড়মল্ল বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে বাংলায় ফিরে এলে সমরসিংহের মহিষী তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থনী হন। রাজা তোডড়মল্ল বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাস্বরূপ এক দরবারের ব্যবস্থা করেন এবং সমরসিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

বাংলার পাঠান রাজত্ব শেষ হল। শুরু হল মোগল রাজত্ব। রাজা তোডড়মল্ল হলেন বাংলার মোগল সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি। তোডড়মল্ল সমগ্র বঙ্গদেশকে জরিপ জমাবন্দী করে রাজস্বের সুব্যবস্থা করেন। তিনি আশলী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকারে ও ৬৮৯টি মহলে বিভক্ত করেন। তোডড়মল্লের আশলী জমায় রাজস্ব আদায় হ'ত আকবরশাহী টাকায় ১,০৬,৯৩,০৬৭। ১৯টি সরকারের মধ্যে ১১টি গঙ্গার উত্তর ও পূর্বে, ৮টি গঙ্গার পশ্চিম ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের কাছে অবস্থিত ছিল।

সপ্তগ্রামের সরকারের অধীনে নদীয়া

এগুলির মধ্যে একটি ছিল সরকার সপ্তগ্রাম। নদীয়া এই সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকারও ছিল বিরাট এক ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত। এর উত্তর সীমা ছিল পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিয়াগড় এবং পূর্ব ও পশ্চিমে কপাতক (২) থেকে ভাগীরথীর উত্তর তীর পর্যন্ত। এই সরকারের অধিকাংশ মহল পরবর্তীকালে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই সুবিস্তীর্ণ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৪,১৮,১১৮ আকবরী টাকা, বন্দর ও হাটের আয় ছিল ৩০,৩০০ টাকা। (৩)

পাঠানরা বিজিত হলেও সুযোগ পেলেই বাংলার ভূস্বামীরা মোগলের অধীনতা অস্বীকার করতেন। তাঁরা নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হলেও কার্যত স্বাধীনভাবে থাকতেন। ক্রমে স্বাধীন ভূস্বামীদের সংখ্যা বেড়েও যেতে লাগল। এই ভূস্বামীদের মধ্যে বারোজন ছিলেন প্রধান। এঁদের বলত 'দ্বাদশ ভৌমিক' বা 'বারো ভূঁইয়া'। এই বারো জনের মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ ও প্রতাপাদিত্য ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের মতে এঁরা সকলেই ছিলেন ভুঁইফোড় স্থানীয় জমিদার এবং বাংলার কররাণী সুলতানদের শাসনের দুর্বলতার সুযোগে এই সব জমিদার নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব প্রধান হয়ে ওঠেন।

জানা যায় প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষ জীবনে পরাক্রমশালী

২। কপাতক—কপোতাক্ষ নদী?

৩। Grant's Analysis of the Bengal Finances.

ও দুর্দমনীয় শত্রু হয়ে উঠেন। তিনি চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা প্রমুখ পর্তুগীজদের নিজের গোলন্দাজ সৈন্যভুক্ত করে পুবী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র দেশ অধিকাব কবে নেন। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়ার উত্তরের অধিকাংশই প্রতাপাদিত্যের শাসনাধীন হয়। তাছাড়া যশোর ও খুলনা জেলাতেও তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি শেষ পাঠানরাজা দায়ুদ খাঁর অধীনে কাজ করতেন। দায়ুদ খাঁর পতনেব পর শ্রীহরি খুলনা জেলার দক্ষিণ সীমান্তে বাসস্থান স্থাপন করেন।

দুর্ধর্ষ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে ইসলাম খাঁর নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনীকে পাঠানো হয়। আব একটি বাহিনীকে পাঠান হয় বাকলার রাজা কন্দর্প নারায়ণেন পুত্র ও প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্রেব বিরুদ্ধে। মোগলের রাজকীয় বাহিনী পদ্মা পার হয়ে জলঙ্গী ও ভৈরবের তীব ধরে কৃষ্ণনগর থেকে ২০ মাইল দূরে পাখোয়ানে এসে উপস্থিত হন ও শিবির সন্নিবেশ কবেন। এখান থেকে সুরু হয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান। প্রতাপাদিত্যও ধূমঘাটে তাঁর বিরাট সমরসজ্জা নিয়ে প্রস্তুত হন। কিন্তু মোগল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে সালকাতে দ্বিতীয়বার শিবির সন্নিবেশ করেন। কিন্তু সেখানেও মোগলবাহিনীব হাতে তিনি পরাজিত হন। সম্রাট আকবরেব মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে জাহাঙ্গীর ও তাঁব সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকেও বাংলায় পাঠান। মানসিংহ বহু সৈন্য নিয়ে বাংলায় আগমন করেছিলেন। মানসিংহ নদীয়াব রাজবংশেব পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারেব সহায়তা লাভ করেন। এই সময়েই বাংলার মোগল শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। মানসিংহ পরাজিত প্রতাপকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার পথে কাশীধামে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই সময়ে বাংলাব অন্যান্য ভূস্বামীদের মধ্যে যাঁরা মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নদীয়ার অন্যতম ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুম্ভকাব বংশীয় রাজা দেবপালও ছিলেন। বলতে গেলে মন্দভাগ্যের জন্যে তিনি মোগল সৈন্যের হাতে নিহত হন। দেবপালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেবগ্রামে কিছু কিছু দেখা যায়। দেবপালের নামানুযায়ী দেবগ্রামেব নামকরণ হয়।

নদীয়াধিপতিদের শাসনাধীনে নদীয়া

বাংলার ভুঁইয়া রাজারা একে একে মোগলের শাসনাধীনে এলেও তদানীন্তন ভূ-স্বামীরাই রাজ্যের শাসনাদি চালাতেন। রাজ্যশাসনে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। এইভাবে নদীয়াও প্রত্যক্ষভাবে নদীয়াধিপতিদের শাসনাধীন হল।

ভবানন্দ মজুমদার

বাংলা বিজয়ে মানসিংহকে সাহায্যের জন্যে তার পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে সম্মান লাভ করেন এবং তাব সাথে এক ফরমান দ্বারা নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, কয়েশা, মসুণ্ডা প্রভৃতি চোদ্দটি পরগণাব অধিকাব লাভ করেন (১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ)। ভবানন্দ বাগোয়ান থেকে মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ভবানন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে মধ্যমপুত্র গোপালকে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী করে যান। কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন গোবিন্দ। গোপাল বাদশার কাছ থেকে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি পরগণাগুলিরও জমিদারীস্বত্ব লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উখ্‌ড়া পরগণার জমিদারী পান। কিন্তু তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন।

রেউই এর নামই কৃষ্ণনগর

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাঘব মাটিয়ারী থেকে রেউই নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন। কথিত আছে, রেউই জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর তীরে শ্যামল বৃক্ষাদিশোভিত একটি মনোরম স্থান ছিল এবং বনে মৃগ ও ময়ূর বিচরণ করত। তখন এখানে বহুসংখ্যক গোপের বাস ছিল এবং তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় এই রেউই-এর নাম শ্রীকৃষ্ণের নামানুযায়ী 'কৃষ্ণনগর' রাখেন। রুদ্র তাঁর জমিদারীর রাজস্ব হিসাবে মোগল সরকারে বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা কর পাঠাতেন। কথিত আছে, রেউইয়ে মৃগাদি বহুল সংখ্যায় পাওয়া যায় শুনে তদানীন্তন মোগল বাদশা এখানে মৃগয়ায় আসলেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু সসৈন্যে বাদশাহ মৃগয়ায় এলে দরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচারের আশংকা করে রাজা বহু অর্থ অঙ্গীকার করে বাদশাকে মৃগয়া থেকে নিরস্ত করেন।(৪) (৫)

৪। Early in the morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October 1682), we got as far as Rewee—a small village belonging to Woodoy Roy, a Jaminder that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly. It is reported by the country people that he pays more than twenty lacks of rupees per annum to the king, rent for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to the Mogoul and his favourite, to divert his intention of hunting and hawking in his country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the Emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great-shady trees, most of them tamrins, well stored with peacocks and spotted

১৬৬৬ খ্রীণ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করতে এসে ঐ বছর ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নদীয়ায় উপস্থিত হন এবং তদানীন্তন নদীয়াকে জনবহুল একটি বৃহৎ নগর ব'লে বর্ণনা করেন।(৬)

রেউয়ে রাজধানী স্থাপন

রাজা রাঘব রেউইয়ে রাজধানী স্থাপন করে তার চারদিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করেছিলেন। এই পরিখা আজও 'শহর পানার গড়' নামে খ্যাত। তাছাড়া কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মাঝে বিরাট দীঘি খনন ক'রে, ঐ জায়গার নামকরণ করেন দীঘিকানগর' বা 'দিগনগর'। তাছাড়া দুটি শিবমন্দির নির্মাণ ক'রে রাঘবেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজা রুদ্রও অনেক জনহিতকর কাজ করেছিলেন। দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রতি তুষ্ট হ'য়ে এক ফরমান দ্বারা গয়েশপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা দান করেন। তিনি সম্রাটের সহায়তায় এক সুনিপুণ স্থপতিকে এনে কৃষ্ণনগরে কাছারি, কেল্লা, পুজোর দালান, নাচঘর, চক্, নহবৎখানা প্রভৃতি তৈরী করেছিলেন। তাঁর সময়েই কৃষ্ণনগরের পার্শ্ব-সংলগ্ন অঞ্জনা নদী স্রোতোস্বতী ছিল। তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা এই অঞ্জনা দিয়ে নদীবিহারে যেতেন এবং তাঁদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অঞ্জনার গতি রুদ্ধ করে দেন। তিনি বিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্যে অধ্যাপকমণ্ডলীকে নিষ্কর ভূমি দান করেন ও নবদ্বীপেও বিদেশী ছাত্রদের জন্যে ভূ-সম্পত্তি দান করেন। রাজা রুদ্রের দুই রাণী। প্রথমার পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার রামকৃষ্ণ।

রুদ্র তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁকেই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করেন। কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি সঞ্চয় করে জমিদারি অধিকার করেন। পরে আবার জ্যেষ্ঠ কর্তৃক বিতাড়িত হন।

এই সময়ে রামচন্দ্রের মৃত্যু হলে রামজীবন আবার রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু তিনি ঢাকার নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হন বলে জানা যায়। রাজা রামকৃষ্ণের সঙ্গেও তৎকালীন নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর সদ্ভাব ছিল না। তিনি কৌশলে রামকৃষ্ণকে ঢাকার বৈকুণ্ঠে বন্দী করেন। কিন্তু কারাগারে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে এবং পরে অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে রামজীবন কারামুক্ত হয়ে আবার নদীয়ার রাজ্যলাভ করেন। রামজীবনের তিন রাণী ছিল। প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার রঘুরাম এবং তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপালের জন্ম হয়। রঘুরাম বিশেষ কর্মদক্ষ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। এইজন্যে রামজীবন রঘুরামকেই তাঁর উত্তরাধিকারী ক'রে যান। রঘুরাম যথানিয়মে রাজকর দিতে না পারায় সুবেদার জাফর খাঁ কর্তৃক বন্দী হন। শেষে কারামুক্ত হয়ে ১৭২৮ খ্রীণ্টাব্দে ভাগীরথীর তীরে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই রঘুরামের পুত্র হলেন নদীয়ার রাজবংশের ইতিহাসখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ১৭১০ খ্রীণ্টাব্দে (১৬৩২ শকে) কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়।

নদীয়া রাজবংশের পূর্বইতিহাস

নদীয়ার রাজবংশের পূর্ব ইতিহাস কিছু বলা দবকার। নদীয়ার রাজারা আদিশূর-আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা অন্যতম ভট্টনারায়ণের বংশজ, ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ প্রদেশেব ক্ষিতীশ নামক এক রাজার পুত্র। তিনি এদেশে আসাব সময় সঙ্গে অনেক অর্থ এনেছিলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁকে কয়েকটি গ্রাম দান করতে চাইলে তিনি সে দান নিতে অস্বীকার করেন এবং মূল্য দিয়ে প্রস্তাবিত কয়েকখানি গ্রাম গ্রহণ করেন। তা'ছাড়া অন্যের কাছ থেকেও আরও কয়েকটি নিষ্কব গ্রাম খরিদ করে বিক্রমপুর প্রদেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন কবেন। ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপু থেকে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে কামদেবের জন্ম হয়। সর্বশুদ্ধ এঁদের বিষয় ভোগ দখল ৩২২ বছর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। এঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান, বিদ্বান ও ধর্মভীরু ছিলেন। কামদেবের চার পুত্র। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতার গদীলাভ করে চতুর্দশ খ্রীণ্টাব্দে দিল্লী যাত্রা করেন এবং নিজের অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার গুণে দিল্লীর দরবার থেকে 'রাজা' উপাধি এবং অনেকগুলি গ্রামও খেলায়েৎ পান। বিশ্বনাথ সর্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তির উন্নতিসাধন করেন। তার পরেই উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা কাশীনাথ। তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণদান করেন। তাঁর পুত্র রামচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের পুত্র দুর্গাদাস। এই দুর্গাদাসই 'মহারাজ ভবানন্দ মজুমদার' নামে খ্যাত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর রাজসভা

নদীয়ার রাজবংশের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি আঠারো বছর বয়সে পিতৃগদীতে বসেন (১৭২৮ খ্রীণ্টাব্দ)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি বিদ্বান ও গুণীর সমাদরও করতেন। তাঁর সভা গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকে বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সঙ্গে

---

deer like our fallow deer. We saw two of them near the riverside on our first landing.

—*Hedge's Diary*, Vol. I, P. 39

৫। জানা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর কৃষ্ণনগরের কাছে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন সে জায়গা তাঁরই নামকরণে 'জাহাঙ্গীরপুর' বলে এখনও অভিহিত আছে।

৬। On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadia and it is the furthest point to which the tide reaches.

—*Tavernier's Travels in Nadia*, Vol. 1, P.133

অনেকেই তুলনা করে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন (হালিশহরের), হাস্যরসিক গোপালভাঁড়, নবদ্বীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ষড়দর্শন-বেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন, শান্তিপুরের রামমোহন গোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, কবি প্রভৃতি সভা অলঙ্কৃত ক'রে ছিলেন। গোপালভাঁড়, ভারতচন্দ্র, রামচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ তো তাঁর নিত্য সহচর ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের কালেই নদীয়ার সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ ঘটে। এই সময়ে নদীয়াব রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে ধুলিয়াপুর থেকে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা, ভাগিরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা সাগরের ধার।
পূর্বসীমা ধুল্ল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥
—অন্নদামঙ্গল।

এই বিস্তৃর্ণ-ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করতে প্রায় বারো দিন সময় লাগত এবং আয় ছিল বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকারও বেশী। সমগ্র ভূখণ্ড মোট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল। এই পরগণা বিভিন্ন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল এবং তাঁরা ঐসব এলাকার বিচারকার্যও চালাতেন।(৭)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় একদিকে যেমন নদীয়া গৌরবের উচ্চশিখরে ওঠে অন্যদিকে তেমনি আবার কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই বাংলার রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ বাংলার মসনদে বসেন। সরফরাজ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ।

হাজি আহম্মদ, জগৎশেঠ, আলমচাঁদ প্রমুখ সরফরাজের রাজকর্মচারীদের মধ্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদের সঙ্গে সরফরাজের মতান্তর দেখা দিলে হাজি আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব নিজ ভ্রাতা আলি-বর্দিকে সিংহাসনে বসানোর উদ্দেশ্যে কৌশলে দিল্লী থেকে আলিবর্দির নামে বাংলার সুবেদারের সনন্দ বের করে আনেন। হাজি আহম্মদের পরামর্শে আলিবর্দি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন। পথে গিরিয়া নামক স্থানে সরফরাজের সৈন্যের সাথে আলিবর্দির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হলে আলিবর্দি নিজেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলে ঘোষণা করেন। আলিবর্দিকে প্রথমে দেশের লোক স্বীকার করতে না চাওয়ায় তাঁকে অনেক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

বর্গীদের হাঙ্গামা

এইসব যুদ্ধের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হতে না হতেই বাংলায় মারাঠাদের উৎপাত আরম্ভ হয়। তারা বারবার এসে বাংলায় লুঠপাট করতে থাকে। এই ঘটনাকে বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়ে থাকে। বর্গীর এই হাঙ্গামা থেকে নদীয়াও অব্যাহতি পায় নি। বর্গীদের নেতা ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্গীদের দৌরাত্ম্যে নদীয়ার ভাগীরথীকূল যেমন ধ্বংস হয়েছিল, তেমনি নবাবের রাজস্ব আদায়ের অযথা অত্যাচারে নদীয়ার প্রজাকুলও উদ্বাস্তু হতে বসেছিল(৮)।

নদীয়া রাজ্যে এইজন্যে আর্থিক অনটনও দেখা দিল। নদীয়া-ধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক ঋণ দশলক্ষ ও নিজ নজরানা বাবদ দুলক্ষ টাকা নবাব সরকারে দিতে না পারায় সেই সময়কার নিয়মানু-যায়ী কিছুদিনের জন্যে কারারুদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্মকুশলতায় নজরানার টাকা শোধ করে শীগগীর মুক্ত হয়ে যান। এ সম্পর্কে অন্নদামঙ্গল-এ আছে:

বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে নিয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুর্শিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥

রঘুনন্দন সম্বন্ধে কথিত আছে, মুরশিদাবাদ সরকারে হুগলী থেকে প্রেরিত রাজস্ব বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা পলাশীতে দস্যুগণ অপহরণ করে নিলে রঘুনন্দনকে এর জন্যে দায়ী করে নবাবের দেওয়ানের ষড়যন্ত্রে তাঁকে তোপের মুখে উড়িয়া দেওয়া হয়।

বর্গীরা ক্রমাগত দশ বছর ধরে বাংলা দেশে লুন্ঠন চালায়। তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে বৃদ্ধ নবাব ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির ফলে বর্গীরা উড়িষ্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব এবং বাংলার চৌথ অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ বারো লক্ষ টাকা লাভ করে হৃষ্টচিত্তে

৭। Holwell, in his work, quoted under—Jafar Khan IP202 says that he (Krishnachandra) possessed a tract of country of about twelve days journey and that he was taxed at 9 lacs per annum, though his revenue exceeded twenty five lacs of rupees." Khitish Bangsabali Charitam—Translation by W. Portsch. P.60 (Index).

৮। অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে মায়েরা আজও এই ছড়াটি ব্যবহার করে থাকেন।

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥

চিরদিনের মত বাংলা ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু বর্গীরা চলে গেলেও বর্গীদের হাঙ্গামার ফলস্বরূপ শস্যের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল এবং শান্তিপুরের বয়নশিল্পের যে ক্ষতি হয় তা অপূরণীয় হয়ে ওঠে।

শিবনিবাসে রাজধানী স্থাপন

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করলেও তিনি শিবনিবাস, হরধাম, আনন্দধাম, গঙ্গাবাস প্রভৃতি স্থানেও প্রাসাদাদি নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে শিবনিবাসই ছিল প্রধান। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নসরত খাঁ নামে একজন দুর্দান্ত দস্যুকে এখানে তাঁর আড্ডার সন্ধান পেয়ে তাকে দমন করতে শিবির সন্নিবেশ করেন। কিন্তু স্থানটি তাঁর পছন্দ হওয়ায় এবং বর্গীর উৎপাত থেকে রক্ষার জন্যে একটি নিরাপদ স্থানরূপেও একে মনোনীত করে প্রাসাদ ও শিবমন্দিরাদি নির্মাণ করে শিবের নামে গ্রামের নাম 'শিবনিবাস' রাখেন।

বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দি ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। আলিবর্দি ছিলেন অপুত্রক। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর তিন কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্দৌলাকে বাংলার নবাবপদ দিলে তাঁর অপর দুই কন্যা মনে মনে রুষ্টা হন। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ঘসেটি বেগম প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে থাকেন।

এদিকে সিরাজ বাংলার মসনদে আরোহণ করবার সময় থেকেই ইংরাজেরা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে সুরু করে, এবং এইসব বিষয় নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ দেখা দিতে থাকে। অন্যদিকে সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর ছিলেন আলিবর্দির ভগ্নীপতি। তিনিও বাংলার নবাবী পাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। মুর্শিদাবাদের অর্থলোভী জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন এবং মিরজাফরের দলে যোগদান করেন।

পলাশীর যুদ্ধ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে, সিরাজ-উদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হল। (৯) এই যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত গেল। মিরজাফর ও তাঁর দলের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের অসাধু যুদ্ধে সিরাজের শোচনীয় পরিণতি পলাশী আজও কলঙ্ক ও বেদনার স্থান হয়ে রয়েছে। জানা যায় এই যুদ্ধে নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখেরা মহারাজকে তাঁদের সঙ্গে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানালে মহারাজও মুর্শিদাবাদে তাঁদের মন্ত্রণা-সভাতে উপস্থিত হন।

ইংরেজ শাসন

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক ইংরেজদের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত হতেন। আবার অনেক সময় অসম্মানিতও হয়েছেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট তারিখের গভর্ণমেন্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে, তদানীন্তন নদীয়ার রাজস্ব ছিল ৯ লক্ষ টাকা। এই ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৪,৩৪৮ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কোম্পানীকে দিতে হত। বাকী ৮,৩৫,৬৫২ টাকা দিতে হত মুসলমান সরকারের রাজস্ব। সে সময় রাজ্যে গোলযোগের দরুণ কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথাসময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। এর ফলে মালগুজারি দিতেও বিলম্ব হত। ফলে, একবার কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহকারীরা তাঁর সম্পত্তি শোভাবাজারের তদানীন্তন রাজা নবকিষণের হাতে তিন বছরের মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত দেন, কিন্তু তাঁরাও আদায় ঠিকমত না দেওয়ায় কোম্পানী আবার মালগুজারি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংল্যাণ্ড ফিরে গেলে ভ্যান্সিটার্ট বাংলায় কোম্পানীর কুঠির গভর্ণর ও অধ্যক্ষ হন। এই ভ্যান্সিটার্ট কিছুকাল নদীয়ার কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভ্যান্সিটার্ট মিরজাফরকে পদচ্যুত করে মীরকাশিমকে বাংলার নবাবী দেন। মীরকাশিম মসনদে বসেই বাকী খাজনা আদায়ের জন্যে বাংলা ও বিহারের বহু ভূস্বামীকে বন্দী করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও বাদ পড়েন নি।

দস্যু-তস্করের উৎপাত

ক্রমে দস্যু ও তস্করের উৎপাতে নদীয়া রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। দস্যু ও তস্করেরা গৃহস্থ লোকদের তো বটেই কোম্পানীর কুঠিও লুঠ করতে দ্বিধা করত না। এই দস্যুদের একজন দলপতি ছিল। তার নাম বিশ্বনাথবাবু, সে জাতিতে বাগ্‌দি হলেও তার উদার চরিত্র ও দানশীলতার জন্যে সে 'বাবু' নামে আখ্যাত হয়েছিল। তার বাড়ী ছিল গাড়রা ভাতছালায়—চাপড়া থানার চার ক্রোশ পূর্বে। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর অর্থ লুঠ করে দরিদ্র ও কন্যাদায়গ্রস্তদের দান করত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

এদিকে অনাবৃষ্টি হওয়ায় (১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) শস্যের দারুণ ক্ষতি হয়। পর বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় বলে জানা যায়। পথে-প্রান্তরে, হাটে-ঘাটে-মাঠে, গৃহে গৃহে, লোকালয়ে—সর্বত্র মানুষ ও গৃহপালিত পশুকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরাজী ১৭৭০

৯। পলাশীতে তখন এক বিরাট আমবাগান ছিল। এই আম্রকাননকে 'লক্ষাবাগ' বলা হত। কথিত আছে, এই বাগানে লক্ষ আম গাছ থাকার জন্যে এই নামকরণ হয়েছিল। অনেকে বলেন, ঐ স্থানে বহু পলাশ গাছ থাকায়, পলাশী নামকরণ হয়েছিল। সে যাই হোক, বর্তমানে সেই পলাশীর প্রান্তরে একটি আম গাছও নেই, পলাশ গাছও চোখে পড়ে না।

খ্রীষ্টাব্দে হওয়ায় একে বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

উইলপত্রের প্রবর্তন

ইংরেজরা নবলব্ধ রাজ্যকে নানাভাবে বিভক্ত করে জমিদার-দের সাথে নতুন মেয়াদী বন্দোবস্ত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের অদূরে অলকানন্দা তীরে ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে মহারাজ তাঁর সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে নতুন প্রথানুযায়ী 'অভিলষিত ব্যবস্থাপত্র' দ্বারা উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে)। মৃত্যুর পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির বিধিব্যবস্থা করার 'উইলপত্র' এই প্রথম সৃষ্টি হয়।

নদীয়ারাজের বংশধররা

শিবচন্দ্র ১৭৮২ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ায় রাজত্ব করেন। শিবচন্দ্র ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্রের আরও পাঁচ পুত্র ছিল: ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র। শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করলে তাঁর পুত্র গিরীশচন্দ্র নদীয়ার রাজা হন। গিরীশচন্দ্র ছিলেন অপুত্রক। গিরীশচন্দ্র পরলোকগমন করলে তাঁর দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ)। নদীয়ার প্রাচীন বংশ সাক্ষাৎ রক্তের সম্বন্ধে নদীয়ার তক্তে আসীন গিরীশচন্দ্রের আমলেই শেষ। শ্রীশচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র। তিনিও অপুত্রক অবস্থায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করলে তাঁর কনিষ্ঠা রাণী ভুবনেশ্বরী তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়ে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে অর্পণ করেন। তারপর ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে তাঁকেই নদীয়ারাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের পুত্র ক্ষৌণিশচন্দ্র এবং ক্ষৌণিশচন্দ্রের পুত্র বর্তমানে নদীয়ার মহারাজকুমার হলেন শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায়।

এই হল নদীয়া রাজবংশের মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস।

নদীয়াতে প্রথম জেলা স্থাপিত

প্রকৃতপক্ষে এদেশে ইংরেজশাসন শুরু হয় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্যে কালেকটরি পদ সৃষ্টি করে ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। নদীয়াতেই সর্ব প্রথম জেলা স্থাপিত হয় ইংরেজ কালেকটারের অধীনে।

গোয়াড়ীতে আদালত স্থাপন

বিচারের সুবিধার জন্যে প্রতি জেলায় এক একটি দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ-সড়কেও (গোয়াড়ী) নদীয়ার আদালত স্থাপিত হল। কালেক-টরই হলেন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি। ফৌজদারী বিচার মুসলমান কাজি ও মুক্তির হাতেই থাকল।

রাজা গিরীশচন্দ্রের আমলে নদীয়ার ভূখণ্ড যে চৌরাশি পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তা মাত্র ৫১৭ খানি পরগণায় দাঁড়িয়েছিল।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় চুরি ডাকাতির সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়। নদীয়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ব্ল্যাকুইয়ার কঠোর হাতে এইসব দুষ্কৃতদের দমন করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর 'নদীয়া বিভাগ' গঠিত হয়। মুর্শিদা-বাদ বাদে পরবর্তী প্রেসিডেন্সি বিভাগের সব ভূভাগই নদীয়া বিভাগ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণনগর হয় তার প্রধান কার্যা-লয়। কিন্তু কমিশনার কৃষ্ণনগরে থাকতে না চাওয়ায় নদীয়া বিভাগের প্রধান কার্যালয় আলিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

নীলবিদ্রোহ

স্বাধীনতা সংগ্রামেও নদীয়ার অবদান কম নয়।

উনবিংশ শতাব্দী মধ্যভাগ থেকেই নদীয়ায় নীল চাষ হত। ১৮৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় নীলচাষের হাঙ্গামা ও গোলযোগ দেখা দেয়। ইংরেজরা একদিকে শাসকগোষ্ঠী ও অন্যদিকে নীলকর ভূস্বামী হওয়ায় নীলচাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছিল। ফলে, নীলচাষীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণনগরের অদূরে আশাননগর গ্রাম সেই নীলবিদ্রোহীদের একটি ঘটনাস্থল। নীলবিদ্রোহী মেঘাই সর্দার এখানে লড়াইকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশ্বনাথকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ স্থান 'ফাঁসিতলা' বলে খ্যাত। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। সদরপুরের (কুষ্ঠিয়া) পিয়ারীসুন্দরী নামে একজন মহিলা-জমিদার নীলবিদ্রোহীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

নদীয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে কৃষ্ণনগরের ছাত্রদের বিচার এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আন্দোলনের সঙ্গে নদীয়াও যুক্ত ছিল। নদীয়ার বীর সন্তান যতীন মুখো-পাধ্যায় বা বাঘা যতীনের সময়ে এখানে জনহিতকর ও সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানাদি, পাঠাগার প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। বাঘা যতীন ইংরেজদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করে উড়িষ্যার বালেশ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন (৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। অসহযোগ আন্দো-লনেও নদীয়ার দান কম নয়। এই আন্দোলনের উদ্যক্তারূপে বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কৃষ্ণনগর, কুষ্ঠিয়া ও নদীয়ার অন্যান্য স্থানে পদার্পণ করেছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার শিকারপুরে ইংরেজ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ভূমিআন্দোলন হয়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে 'গরবিনী কটেজ'-এ প্রথম জাতীয় আন্দোলনের গোপন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। শিক্ষায়তনে ধর্মঘট পালন, মদের দোকানে পিকেটিং, বিলিতী জিনিষ ও কাপড় বিক্রী বন্ধের অভিযান প্রভৃতি এখান থেকে সংগঠিত হয়। ১৯২৬-এ সারা বাংলা যুব ও ছাত্র সমাবেশ হয় কৃষ্ণনগরে। তুলসী গোস্বামী ও সরোজিনী নাইডু যথাক্রমে এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭-এ 'রেডসার্ট' আন্দো-

লন হয় নদীয়ায়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডঃ আনে, এফ. কে. নরীম্যান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কৃষ্ণনগর টাউনহল ময়দানে বক্তৃতা করেছেন। বোমার মামলা, আগ্নেয়াস্ত্র মামলা, রেললাইন উপড়ানো প্রভৃতি নদীয়ার স্মরণীয় ঘটনা।

খাজনা-বন্ধ আন্দোলন

১৯৩২ সালের ১৩ই এপ্রিল চাঁদেরঘাটেই প্রথম খাজনা-বন্ধ আন্দোলন সুরু হয়। তারপর জেলার আরও বহু স্থানে সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা লাভ

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায়। কিন্তু এই স্বাধীনতা অখণ্ড আসে নি। বঙ্গ বিভক্ত হল। তার সাথে নদীয়া জেলাও বিভক্ত হয়। কিন্তু স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের রায় পরিষ্কার বোঝা না যাওয়ায় ১৫ই আগস্ট তারিখে নদীয়ার ভারতভুক্তি হয় নি। তিন দিনের জন্যে পাকিস্তানভুক্ত ছিল। তারপর ১৮ই আগস্ট তারিখে নদীয়া ভারতভুক্ত হয়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা, আবার ১৮ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলেন মুসলিমলীগপন্থীরা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। নদীয়াকাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক।
২। Census Hand Book, Nadia.
৩। Editor, District Gazetteer, Govt. of West Bengal.

সাহিত্যসাধনা

একটি বৃক্ষের বীজরোপণের আগে চাই ভূমিকে উর্বর করা, সরস করা। এরূপ রসসিক্ত ভূমি থেকেই হবে পাদপের উদ্ভব, যে পাদপ পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়ে আনন্দ দেবে, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দেবে সুশীতল ছায়া। এই পাদপের সুপক্ব ফলের রসাস্বাদই দেবে অমৃতলোকের সন্ধান।

হাজার বছর আগের চর্যাপদ, বৌদ্ধপদ, বৌদ্ধগান ও দোহা প্রভৃতি বাদ দিয়ে বলা যায়—বাংলা সাহিত্য-পাদপের ভূমি প্রকৃত রসসিক্ত হয়েছিল প্রায় সাতশো বছর আগে—নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার রত্ন, কবি জয়দেবের সময়ে।

আশ্চর্য এই, গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, কিন্তু ভাব তার খাঁটি বাংলা! 'স্মরগরল—খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারম্'—বাঙালী তার ভাবমূর্তির মানসপ্রতিমাকে এইভাবে মাথায় তুলে রেখেছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ধারায় তার পরিচয় আছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটা সংযোগ-সেতু নির্মাণ করেছে। গীতগোবিন্দ পদাবলীর গীত-উচ্ছ্বাস—বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবির পদাবলীর পরিখা বেয়ে আধুনিক সাহিত্যের গীতি-কাব্যের ক্ষেত্রে রসসিঞ্চন করেছে। গীতগোবিন্দ বাঙালীর কাব্য বলে চিরদিন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে।

> 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি
> দন্তরুচি কৌমুদী
> হরতি দরতি মিরমতি ঘোরম্
> স্ফুরদধরসীধবে
> তব বদনচন্দ্রমা
> রোচয়তি লোচন চকোরম্।'

এই রূপানুভূতি, প্রেয়সীর মুখের সঙ্গে চাঁদের আর প্রেমাস্পদের সঙ্গে চকোরের এই উপমা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব। এই রসধারাই ক্রমে নেমে এসেছে পরবর্তী কালের বাংলা পদাবলী, কাব্য ও সাহিত্যে। নদীয়া এর সূচনা থেকেই যুগে যুগে বাংলা সাহিত্য-ধারাকে বিচিত্রপথে পরিচালিত করেছে।

এর পরই আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসতে পারি। বাংলা সাহিত্যের এটা প্রাচীন যুগ। এই যুগের কর্ণধার কবি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের পৈত্রিক বাসস্থান ফুলিয়ায়। তিনি বড়গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মাপার হয়ে বরেন্দ্রভূমিতে আচার্য চূড়ামণির কাছে পাঠ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। পরে গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের অনুপ্রেরণায় তিনি বাংলা রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর এই প্রবৃত্ত হওয়ার ভেতরই হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে যে অমৃত উৎস লুকিয়ে ছিল, কবি কৃত্তিবাস তা বাঙলার ঘরে ঘরে সঞ্চারিত করে বাঙালীর তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, নিজেও কীর্তিমান হয়েছেন, ধন্য হয়েছেন।

কৃত্তিবাসকে নিয়ে গবেষক মহলে যত মতভেদই থাকুক, একথা কারও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর রামায়ণের মত আর কোন পাঁচালী-কাব্য বাঙলা দেশে এতকাল ধরে অবিচ্ছিন্ন ও একচ্ছত্র আধিপত্য পায় নি। জাহ্নবীর জলস্রোতের মত তাঁর কাব্যপ্রবাহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেও নিজের নবীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বাঙলার মানস-ভূমিকে আজও তাঁর কাব্য সরস করে রেখেছে। কৃত্তিবাস যে বাংলা ভাষার আদিকবি তা অনস্বীকার্য।

তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালীর জীবনে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা আসে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্য ব্রতকথা বা পৌরাণিক আখ্যায়িকার পর্যায় থেকে কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়। চৈতন্যকে অবলম্বন করে পদ রচনা আরম্ভ হয় তাঁর জীবিত কালেই। চৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র একদিন বাঙালীর মন-প্রাণ অভিভূত করেছিল। চৈতন্যমঙ্গল কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করে। বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছে। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল নদীয়ার বাংলা সাহিত্যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান।

মহাপ্রভুর আত্মীয় মাধবাচার্য কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেছিলেন। 'সই কি পুছসি অনুভব মোয়' এই প্রসিদ্ধ পদটি তাঁরই রচিত। ইনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা।

নদীয়ার নিজস্ব কবি বৃন্দাবন দাস। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রচনা 'চৈতন্যভাগবত' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষ সমাদৃত। এই কবির বাংলায় লেখা 'চৈতন্যচরিত' প্রাচীনতম কাব্য। ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

> কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস
> 'চৈতন্যলীলায়' ব্যাস বৃন্দাবন দাস।'

কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নদীয়া জেলার দেবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি' নামে একখানি বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

নবদ্বীপের জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, কুলিয়া গ্রামের বংশীবদন প্রেমদাস, কাঁচড়াপাড়ার সেন শিবানন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তার পরিচয় অনেকেই জানেন।

> 'ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
> সদাই রাখিতে চায়।'

সুপরিচিত এই পদটির পদকর্তা দোগাছিয়া-নিবাসী বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস। দেবগ্রামের হরিবল্লভ দাস ও 'গৌরাঙ্গ-লীলামৃত' 'চমৎকার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

এইসব পদকর্তাদের প্রেমধর্ম সাধনা পরবর্তী অনেককাল ধরে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করে এসেছে। এই সঙ্গে কতকগুলি মঙ্গলকাব্য, গীতিকাব্য ও সংস্কৃতের অনুবাদ প্রকাশিত হলেও এগুলি ক্রমেই মৌলিকতাবর্জিত ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠেছিল।

তারপর এল অষ্টাদশ শতক। এই সময়ে এসেছিল বাঙলার জাতীয় জীবনে একটা বিপর্যয়। একদিকে নবাব আর এক-দিকে ইংরেজ—বাঙলার আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন।

এই দুঃসময়ে গুণগ্রাহী, ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অভ্যুদয়। তারই রাজছত্র ছায়ায় অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অনুপম কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে অনেকগুলি বিখ্যাত শ্যামা সঙ্গীতের পদ রচনা করেছিলেন। তারপর মহারাজ শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই মাতৃপদাবলী রচনা কবে গিয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে পরম শাক্ত হয়েও বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসীক ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন ভারতচন্দ্র। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করবার পর ইনি নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। এখানেই তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লিখিত হয়। মহারাজার অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্তনের পূর্বাভাস হিসাবে তিনি কবিকে এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত করান।

পদলালিত্যে, শব্দযোজনায় ও সরলভাষার অবতারণায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর অদ্বিতীয়। বিদ্যাসুন্দর এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম রোমান্টিক কাব্য।

সুললিত ও রসাল শব্দচয়নে ভারতচন্দ্রের যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল; তার অন্যতম বিশেষ কারণ—তিনি অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—"রাজসভা কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মত,—যেমন তার উজ্জ্বলতা তেমনি তার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্রের অনেক উক্তি আজও প্রবচনের মত চলে আসছে; যেমন,—'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন', 'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন'—এইসব। ভারতচন্দ্রের প্রভাব পরবর্তীকালের অনেক কবিই এড়াতে পারেন নি।

ভারতচন্দ্রের আগে সব কবিতাই দেবদেবী-লীলা নিয়ে লিখিত হত। ভারতচন্দ্রই বর্ষা, বসন্ত, হাওয়া, বাসনা প্রভৃতি কবিতার বিষয়বস্তুতে গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেন। তিনি বাংলার বিবিধ ছন্দের প্রবর্তক। ভারতচন্দ্র প্রাক্ বৃটিশযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—'Raja Krishna chandra was exceedingly fortunate in one thing — he had Bharat chandra, the greatest poet of Bengal of his century as one of his entourage.'

সমসাময়িক ভক্তকবি রামপ্রসাদের সবিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি শাক্তভাবে অনুপ্রাণিত তান্ত্রিক উপাসক। রামপ্রসাদও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদের কাব্যের চরিত্রগুলি স্বাভাবিক। তাঁর কাব্যে একটা ঘরোয়া ভাবের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর গানগুলি খুব সরল ও মর্মস্পর্শী। 'মা আমায় দাও তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী' প্রভৃতি শ্যামাসঙ্গীতগুলি আজও বাঙালীর প্রাণে একটা ভাবাবেগ সৃষ্টি করে।

আজু গোঁসাইও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। ইনি রামপ্রসাদের অনেকগুলি বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতের উপর ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। সেগুলি তখনকার দিনে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়ার উলা-নিবাসী দুর্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'মুক্তালতাবলী' 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' প্রভৃতির লেখক। ভারতচন্দ্রের ঠিক পরেই 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' অনেকের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

ভাজনঘাটের বিজয়রাম সেনও একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। ভূকৈলাসের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের নির্দেশে তিনি তীর্থযাত্রাব বিবরণ—'তীর্থমঙ্গল কাব্য' রচনা কবেন:

> 'সাতাগুরি সনেতে আব ভাদ্রমাসে
> বিশারদে কহে পুঁথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে
> শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট নাম
> কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয় রাম।'

এই তীর্থমঙ্গল কাব্যে গঙ্গার দুই তীরের সুন্দর বর্ণনা আছে। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়—'ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত' এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্' লিখে স্মরণীয় হয়েছেন।

এরপর প্রাক্-আধুনিক বা প্রস্তুতি যুগ। এই যুগের জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার কয়েক শো' বছর আগের প্রাচীন ভাষায় লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত যুগোপযোগী করে সংস্কার করেন। মার্জিত করতে গিয়ে আসলের রূপ নষ্ট করবার অপরাধ স্বীকার করে নিলেও একথা সত্য যে, তিনি সহজ সরল করে ঐগুলির নতুন আকার দিয়েছিলেন বলে আজও বাঙলায় সকলের পক্ষে রামায়ণ মহাভারত পড়া সহজসাধ্য ও তার ভাব মনোজ্ঞ হয়েছে। জয়গোপাল তখনকার নদীয়া জেলার বজরাপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একখানি পারসী অভিধানও তৈরী করেন।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রাজা গিরীশচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। পাদপূরণে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। হাস্যরসের অব-তারণার জন্য ইনি বিখ্যাত ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'রসসাগর' উপাধি দেওয়া হয়।

ভাজনঘাট নিবাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামী স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, ভরতমিলন প্রভৃতি কয়েকখানি বৈষ্ণব-পালা কাব্য রচনা করেন। এগুলি করুণ রসাত্মক এবং কবিত্বপূর্ণ। সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বৃটিশপূর্ব যুগের প্রাচীন সাহিত্যের অবসান। এরপর আরম্ভ হয় ইংরাজী যুগ। এই যুগে যারা প্রতিভাবলে সাহিত্যে নতুন নতুন ভাব-ধারার সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশকের পর নদীয়ার কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বর গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় সেকালের বহু কবির জীবনী ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত পথপ্রদর্শক। তা'ছাড়া তখন-কার দেশ-বিদেশের অনেক সংবাদ ও তথ্য 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হত।

গুপ্ত কবিই কবিতায় সর্বপ্রথম বাঙালীকে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। 'মাতৃভাষা', 'স্বদেশ', 'ভারত সন্তানের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় তিনিই দেশকে, দেশের ভাষাকে মাতৃরূপে বন্দনা করতে শিক্ষা দেন।

'জান না কি জীব তুমি, জননী-জনম ভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে,
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে!'

গুপ্তকবি 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর'কেও বরণীয় বলে মনে করেছেন। বাঙালী মেয়েদের বিদেশী 'ফিরিঙ্গী শিক্ষার' তিনি বিরোধী ছিলেন:

'যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল ক'বেই ক'বে।'

তদানীন্তন সমাজের পটভূমিকায় তিনি যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মূলক কবিতা রচনা করেছিলেন তার জন্য তিনি বাংলাসাহিত্যে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পাঁঠা, আনারস, তপসী মাছ, বড়দিন প্রভৃতি কবিতায় একটা সহজ রসের প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে।

তার 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা, মর্কটেতে কি বুঝিবে কর্কটের' রস অথবা 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে' প্রভৃতি উক্তি আজও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত।

তিনি তাঁর প্রতিভায় কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠাই করেন নি, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যশিষ্যও গঠন করে গেছেন। এইসব শিষ্যের প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

একদিকে ঈশ্বর গুপ্ত যুগান্তের কবি, অন্যদিকে তিনি যুগ-প্রবর্তক।

বিল্বগ্রামের মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহজাত কবিত্বশক্তি ছিল প্রখর। তিনি সংস্কৃত 'বাসবদত্তা' কাব্যখানি সহজ সুন্দর বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর 'শিশুশিক্ষা' এককালে প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র বই ছিল।

এরপর আধুনিক যুগ। এ যুগে আমরা পাই চৌবেড়িয়ার দীনবন্ধু মিত্রকে। দীনবন্ধু প্রহসনের রঙ্গরসকে বাস্তব জীবনে এনে নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তখনকার নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের মর্মস্পর্শী সত্য ঘটনা নিয়ে তিনি ছদ্মনামে (কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম) বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ করেন। এই দেশে ইংরাজ-বিরোধী আন্দোলনের এখান থেকেই সূত্রপাত। দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলে কামিনী' নামে দুখানি রোমাণ্টিক নাটক লেখেন। তা'ছাড়া 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি প্রহসন ও নাটক একসঙ্গে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করে তোলে।

কুমারখালির (কাঙ্গাল) হরিনাথ মজুমদারও একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তিনি 'গ্রামবার্তা' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। হরিনাথ 'বিজয়বসন্ত', 'দক্ষযজ্ঞ', 'বিজয়া, অক্রূর সংবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর কতকগুলি বাউল সঙ্গীত ও 'ফিকির চাঁদের বাউল সঙ্গীত' এই ছদ্মনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মতিলাল রায় দোগাছিয়ার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর সহ-যোগিতায় একটি যাত্রাদল তৈরী করেন। পরে নবদ্বীপে তার নিজস্ব যাত্রাদল বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইনি রামবনবাস, রাবণ বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, নিমাই সন্যাস, কর্ণবধ প্রভৃতি অনেকগুলি পালা রচনা করেন। মতিরায়ের যাত্রা একদিন সমগ্র বাঙলা দেশে বিখ্যাত ছিল।

মেহেরপুরের জগদীশ্বর গুপ্ত 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'লীলাস্তবক' প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

গোঁসাই দুর্গাপুরের রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বহুভাষাবিৎ এবং বঙ্গদর্শনের লেখক। 'মিত্রবিলাপ' নামে একখানি কবিতা পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

বাগআঁচড়ার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একখানি উপ-ন্যাসের জন্য আজও অমর হয়ে আছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়: উনবিংশতি শতাব্দীতে বাঙলা দেশে উপন্যাস রচনায় যদি কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সমতুল্য যশ লাভ করে থাকেন, তবে তিনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'স্বর্ণলতা' তৎকালের একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস। এর নাট্যরূপ 'সরলা' একদিন বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। বেহালাবাদক 'রামকমল', শ্যালক 'গদাধরচন্দ্র'-চরিত তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

সিমলা গ্রামের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একজন খ্যাতিমান লেখক। তিনি রাণী ভবানী, সীতারাম, সিরাজদ্দৌলা, মীর-কাশিম প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির সমাদর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল শান্তিপুর। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পরিশিষ্ট নিয়ে 'মৃন্ময়ী' ও দুর্গেশ-নন্দিনীর পরিশিষ্ট 'নবাবনন্দিনী' নামে উপন্যাস রচনা করেন। তা ছাড়াও তাঁর বিমলা, দুইভগিনী প্রভৃতি উপন্যাস ছিল।

'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ছিলেন সুবর্ণপুর গ্রামনিবাসী। তিনি কীর্তিমন্দিব, চিন্তামন্দির প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। গ্যারিবলডি, ম্যাটসিনী প্রভৃতি দেশ-প্রেমিকদের আদর্শ জীবন-কথা শুনিয়ে তিনি পরাধীন বাঙালীর জীবনে নতুন আশার প্রেরণা দিয়েছিলেন। নবীন সেন রাণা-ঘাটে অবস্থানকালে তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা তৈরী করেন, সেজন্য তিনিও স্মরণীয়।

এরপর বাংলা সাহিত্যে অরুণোদয়। উনবিংশতি শতাব্দীর আট দশক থেকেই নবারুণ ক্রমে উজ্জ্বল রবীন্দ্রকিরণে দিগ্-মণ্ডল প্রভাবিত করে ফেলে। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। বিংশ শতাব্দীব প্রথম ভাগ থেকেই সাহিত্যের সর্বস্তরে দেখা গিয়েছিল তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। গানের ভিতর দিয়ে তিনি ধরতে চেয়েছেন অতীন্দ্রিয়কে, তিনি উম্ঘাটিত করেছেন ভারতের তপোমূর্তি। তাঁব সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতে যাওয়া নিরর্থক। নদীয়া তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে দাবী করতে পারে---শিলাইদহের বাসীন্দা ব'লে। শিলাইদহের আকাশ-বাতাস, শস্যক্ষেত্র, পদ্মার তীর, পল্লবঘন আম্রকানন, বাউল গান সকলই কবিকে একদিন প্রেরণা দিয়েছে। কবির অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা এই শিলাইদহের মুক্ত প্রকৃতির মধ্যেই লেখা।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে ইতিহাস ও স্বদেশপ্রেমের বাস্তব চরিত্র রূপায়িত করেছেন। নাটকগুলিতে তিনি পাশ্চাত্য আঙ্গিক অনুসরণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কতকগুলি গান ইউরোপীয় গীতরীতির মিশ্রণে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রচিত। প্রথম দিকে তিনি কল্কি অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম প্রভৃতি ব্যঙ্গ ও প্রহসনধর্মী নাটক লেখেন। 'হাসির গানে' তিনি বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমাব দেশ, আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ প্রভৃতি উদ্দীপনাময় স্বদেশী সঙ্গীতগুলি বাঙালীর প্রাণে দেশাত্মবোধের প্রেরণা এনে দিয়েছিল।

গানেব সুর যে হৃদয়কে এ ভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে বাঙালী তা' ভাবতেও পারে নি। তাঁব গানের মধ্যে বাঙলার স্বাভাবিক গীতি ও সুর-প্রতিভার মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্র-লাল গান বেঁধেছেন্ একের পর এক, আর সুরকার হিসাবে কবেছেন তাতে প্রাণ-সঞ্চার। 'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায় পথে পথে ঐ নদীয়ায়' দিলীপকুমারের কন্ঠে এই গানটির সুর শ্রোতাকে মুহূর্তে এক ভাব-জগতে নিয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীব কবি হিসাবেও বরেণ্য।

হাস্যরস রচনা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,--- 'শুচিশুভ্র অনাবিল হাস্যের ধ্রুবনক্ষত্রপুঞ্জ রচয়িতা'।

দ্বিজেন্দ্রলালেব---

'প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত!'
'বুড়ো বুড়ী দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।
বুড়ো ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ী ছিল ভারি শাক্ত।'

অথবা

'বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রূপার নয়।
তার আকাশেতে সূর্য ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।'

এবং

'আমি যদি পিঠে তোরই লাথি একটা মারি রাগে' প্রভৃতি ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে একাধারে হাস্যরস ও কশাঘাত আছে।

আবার কীর্তনের সুরে---

'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত
পানতুয়া শত শত'---শ্রোতাকে অনাবিল হাস্যরস

পরিবেশন করে। যেমন করে---

'স্ত্রীর চেয়ে কুমীব ভালো, বলে সর্বশাস্ত্রী
কারণ, কুমীর ধরলেও ছাড়ে কিন্তু ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।'

এর পর আমরা স্মরণ করতে পারি, কুমারখালির জলধর সেনকে। ইনি ছিলেন বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক। হিমালয় ভ্রমণ, নৈবেদ্য, প্রবাসচিত্র বিশুদাদা, অভাগী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। 'কল্লোল যুগেব' কথায় : জলধর জলধরেব মতই শ্যামস্নিগ্ধ। সর্বকালের, সর্ব বয়সের দাদা। প্রাণে অপরিমেয়। বাংলা সাহিত্যের সংসাবে একমাত্র জলধর সেনই অজাতশত্রু।

ঠিক একই সময়ে আমরা পাই---কৃষ্ণনগরের জগদানন্দ রায়কে। বিজ্ঞানের অনেক জটিল বিষয় ইনিই সর্বপ্রথম সহজ সরল ভাষায় তাঁর প্রকৃতি পরিচয়, জগদীশ বসুর আবিষ্কাব, চলবিদ্যুৎ, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন।

রাণাঘাটের গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের বেলা, পবিমল প্রভৃতি গীতিকাব্য ভাবধারায় একদিন বৈশিষ্ট্য লাভ কবেছিল।

জগদীশ গুপ্ত ছিলেন কুষ্টিয়াবাসী। তাঁর তাতল সৈকতে, রোমন্থন, লঘুগুরু প্রভৃতি নতুন যুগ প্রবর্তনের সূচনা করে। 'কল্লোল যুগ' বলেন : এই ভাঙনের রথে চড়ে এসেছিলেন আর একজন---জগদীশ গুপ্ত। সতেজ-সজীব লেখক, বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্দীপ্ত গল্প লিখেছেন তিনি।

বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির নিবাস ছিল নদীয়ার আঁইসমালি গ্রাম। সাজি, ছিন্নহস্ত প্রভৃতি বই লিখেছিলেন তিনি। সমালোচনায় স্পষ্টবাদিতা এবং তীব্র ব্যঙ্গ প্রয়োগের জন্য ইনি বিখ্যাত।

প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনাম গ্রহণ করলেও গা-ঢাকা দিতে পারেন নি। ইনি 'সবুজপত্রের' বিখ্যাত সম্পাদক। ভাষার চলিত-রীতিকেই তিনি প্রাধান্য দেন। ভাব ও চিন্তার জগতেও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সনেট পঞ্চাশৎ এবং পদচারণা নামে দু'খানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর বীরবলের হালখাতা নানা কথা, নানা চর্চা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নদীয়ার দাবি তাঁর উপর অনেকখানি। ছাত্রজীবন থেকে সুরু করে বহুকাল অবধিই তিনি কৃষ্ণনগরে বসবাস করেছিলেন। তাঁর নিজের জবানীতে জানা যায়: কৃষ্ণনগরের ভাল কথা। তার সেই ভাল কথাই আজ পর্যন্ত আমার মৌখিক ভাষা। আর ভাষার এই মূলধন কালক্রমে সুদে বেড়েছে। সুতরাং আমার ভাষার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। ···লিখিত ভাষার সঙ্গে আমি এই কৃষ্ণনগরেই প্রথম পরিচিত হই। ·· আমার লেখা পড়ে পাঠকের চোখে জল আসে না, কিন্তু ঠোঁটে হাসি ফোটে। এগুণও কৃষ্ণনগরের গুণ।

কবি করুণানিধান শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদুর্বা এবং শতনরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবির ভাষা ও ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়িত ভঙ্গিমা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করে। করুণানিধানের কবিতাবলী আবেগময় এবং অনায়াস-সরল।

যমশেরপুর নিবাসী যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অপরাজিতা'—নাগকেশর প্রভৃতি গ্রন্থ কাব্য-পিপাসু পাঠকসমাজে সুপরিচিত।

হরিপুরের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একাধারে ইঞ্জিনীয়ার ও কবি। তাঁর মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, ত্রিযামা, নিশান্তিকা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর প্রধান বক্তব্য এই যে,—কবিরা জীবন ও প্রেমের যতই জয়গান করুন না কেন, আসলে এ সব প্রকাণ্ড ফাঁকি।

'এ কথা বুঝিব কবে
ধানভানা ছাড়া কোন উঁচুমান থাকে না ঢেকির ববে?'

তাঁর দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব দান। 'মরীচিকায়' তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, রিক্ত জীবনকে তোমরা সমৃদ্ধ করতে পার কখনও?

'চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধরে দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?'

মানুষের জীবন আসলে ব্যর্থ। অথচ তাকে নিয়ে আমরা লীলায়িত ছন্দে কত না প্রেমের কথাই বলি!

'তুমি শালগ্রাম শিলা—
শোয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!'

কিন্তু জীবনের সব ব্যর্থতা যখন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না, তখন উপায় কি?—উপায়টাও কবি বাতলে দিয়েছেন:

'চারিদিক দেখে চারিদিক ঠেকে বুঝিয়াছি আমি ভাই,
নাকে শাক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই!'

বিদ্রোহী কবি নজরুলের—দুর্গম গিরি কান্তার মরু, শিকল পরা ছল প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা কবির কৃষ্ণনগর বাসকালে লিখিত হয়েছিল। তিনি কেবল রণতূর্যই বাজান নি, তাঁর একহাতে বাঁশরীও ছিল:

'আমি ইন্দ্রানিসুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মোর এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য।'

বিপ্লব তাঁকে ডাক দিয়েছিল:

'রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা
রুধির নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা।'

ভীরুর মৃত্যু তাঁর বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি বলেন:

'মরিব যেদিন,—মরিব বীরের মত
ধরা মার বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।'

রাণাঘাটের কুমুদ মল্লিক 'নদীয়া-কাহিনী' বইখানি অনেক পরিশ্রমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে রচনা করেন। এই বইখানি বিশেষ মূল্যবান। এর জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সুলেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাগআঁচড়া নিবাসী। তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' বইখানি পাঠকসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এইখানিই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের উপর প্রথম জীবনচরিত।

চুয়াডাঙ্গানিবাসী সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য একজন বিশেষ খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তাঁর 'মিলনমন্দির', 'ছিন্নমস্তা', 'ভবানী পাঠক' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করেছিল।

বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন চৌগাছা ও কৃষ্ণনগরনিবাসী। তাঁর 'নাগপাশ', 'বিপত্নীক' প্রভৃতি গ্রন্থ সুধীসমাজে একদিন বিশেষ পরিচিত ছিল।

রাণাঘাটনিবাসী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রসিদ্ধ 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর 'শশীনাথ', 'রাজপথ' প্রভৃতি উপন্যাস বিখ্যাত।

মেহেরপুরের দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নাম কে না জানেন? তিনি বহু ডিটেকটিভ উপন্যাসের তর্জমা করেছেন। কিন্তু সে বইগুলির ভাষা এতই প্রাঞ্জল যে অনুবাদ ব'লে তা মনেই হয় না। ভাষার উপর দীনেন্দ্রকুমারের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁর কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধে পল্লীচিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'পল্লীচিত্র' বইখানি তাঁরই লেখা এবং এই বইখানি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। পল্লীর নিরানন্দ জীবন-কথাও তাঁর কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বীরনগরের চন্দ্রশেখর বসু 'বেদান্ত প্রকাশ', 'প্রণয় তত্ত্ব' প্রভৃতি প্রকাশ করেন।

নিরুপমা দেবী একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা। তিনি ছিলেন ভালুকানিবাসী। তাঁর 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি উপন্যাস একদিন বিশেষ সমাদরে পঠিত হত।

শান্তিপুরনিবাসী নলিনীমোহন সান্যাল পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর 'সুভদ্রাঙ্গী' প্রভৃতি উপন্যাস খ্যাতি লাভ করেছিল।

'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসখানি বহুদিন পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর লেখক ছিলেন কুষ্টিয়ানিবাসী মীর মোসারফ হোসেন।

শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক তাঁর 'ফেরদৌসী-চরিত' বইখানি লিখে বিখ্যাত হয়েছেন।

রাজশেখর বসু বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যসাধক। ইনি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে 'কজ্জলী', 'গড্ডালিকা', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'কস্তুরীবাই' প্রভৃতি বই লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বীরনগর। পরশুরাম বাঙ্গালীর নানা সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিহাস ও কৌতুক রসের সিঞ্চনে পরম উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। তাঁর 'গড্ডালিকা' 'কজ্জলী' প্রভৃতি বই বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক সৃষ্টি। তাঁর 'চিকিৎসা বিভ্রাটে'র হয় টানতি পার না, লম্বকর্ণের কখন এলে? ইত্যাদি উক্তি অনবদ্য।

কাঁচকুলিনিবাসী অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তাঁর 'ফোয়ারা', 'পাগলা ঝোরা', 'প্রেমের কথা' 'কাব্য সুধা' প্রভৃতি গ্রন্থ মার্জিত হাস্যরস ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

লোকনাথপুরের কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর 'পল্লীকথা', 'মনোমুকুর' প্রভৃতি বই পাঠকমহলে বিশেষ আদৃত হয়েছিল।

তাঁর 'মনের ছায়ায়' আমরা দেখতে পাই :

> 'আজি আকাশের নীল নব ঘনে ঘনায় তোমারি মায়া
> খোলা বাতায়নে দেখিনু চকিতে পড়িল তোমার ছায়া,
> ছায়া দেখি কেন জাগে সংশয় চির বিরহীর মনে
> আমারি মনের ছায়াকে তবে কি দেখিলাম বাতায়নে?'

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল শান্তিপুর। তাঁর 'আবর্ত', 'শাশ্বত পিপাসা' প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। তিনি 'প্রবাসী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন।

কৃষ্ণনগরের দীননাথ সান্যাল ডাক্তার হয়েও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের উপর তিনি একখানি সমালোচনা-গ্রন্থ লেখেন।

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কৃষ্ণনগরবাসী এবং সাহিত্য-রসিক। তাঁর 'দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' প্রভৃতি বই বিশেষ সমাদর লাভ করে।

গোঁড়পাড়ার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান সাহিত্যিক। তাঁর 'ভারত পরিচয়', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি বিখ্যাত বই পাঠক-সমাজে সমাদৃত।

নীহাররঞ্জন সিংহ আজীবন কাব্য-সাধনা করেছেন। তাঁর 'সূর্যস্নান' প্রভৃতি বই খ্যাতি অর্জন করেছে।

কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর 'মনের পরশ', 'তীর্থঙ্কর', 'দুধারা' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে।

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য কবি হেম বাগচীর বাণী আজ নিস্তব্ধ। তাঁর 'দীপান্বিতা', 'তীর্থপথে' 'মানস বিরহ' প্রভৃতি কাব্য সুধীসমাজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। 'বৈশ্বানর' নামে একটি পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করতেন কৃষ্ণনগর থেকে। 'কল্লোল যুগ' তাঁর সম্বন্ধে বলেন: সবল-বিশাল চেহারা, চোখ দুটি দীর্ঘ ও শীতল—স্বপ্নময়। তীব্রতার চেয়ে প্রশান্তি, গাঢ়তার চেয়ে গভীরতার দিকে দৃষ্টি বেশি। কোন উদ্দামতায় হেম নেই, সে আছে উত্তপ্ত অনুভূতিতে। নিকষ কষিত সোনার মতই সে মহার্ঘ।

চারণ কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'মনের গভীরে' সকলের প্রবেশ সম্ভব না হলেও বইখানিতে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। তাঁর 'সবহারাদের গানের' মধ্যে একটা বিশেষ দৃপ্ত ভঙ্গী দেখা যায়।

তাঁর 'চরৈবেতি' কবিতায় 'জীবন পূজারী'দের ডাক দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন :

> 'জীবনপূজারী সৈনিকদল, আজিকে ঝড়ের রাতে
> চলার মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া বিজয়ধ্বজা হাতে,
> চলো সম্মুখে ভবিষ্যতের রচিতে বৃন্দাবন
> মৃত্যুর শিরে উড্ডীন যেথা প্রাণের জয়কেতন।
> আমরা গড়িব নূতন জগৎ—তোরণ দুয়ারে যার
> লেখা রহিয়াছে, 'মানুষের চেয়ে বড়ো নাহি কিছু আর'।

রাণাঘাটের নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তও সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন।

রাণাঘাটের কবি গোবিন্দ চক্রবর্তীও তাঁর কাব্য সাধনার জন্য খ্যাতিমান।

রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ও সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল তার 'বকুলতলা পি-এল-ক্যাম্প', 'দণ্ডক শর্বরী' 'অপরূপা অজন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে ইতিমধ্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

কার্টুন ছবি আঁকা যদি রসসাহিত্যের অঙ্গ হয় তা হলে আমরা চণ্ডী লাহিড়ীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করব।

বাংলার জমিদারী প্রথা উঠে গেছে এবং তার আগে উঠে গেছে চণ্ডীমণ্ডপ, ফরাস, তাকিয়া আর মজলিশ। সাহিত্য-অবদানের কথা বলতে গিয়ে মজলিশের কথা এল এই জন্যে যে, সাহিত্যিকরা যেমন সাহিত্য তৈরী করেন, মজলিশ তৈরী করে তেমনি সাহিত্যিককে। প্রমাণের অভাব নেই :

নবীন সেন বলেছেন, যশোরে তাঁদের একটা সঙ্ঘ ছিল। তাতে সাহিত্য, সঙ্গীত আর ইয়ারকি চলত। এখান থেকেই 'পলাশীর যুদ্ধে'র উৎপত্তি।

ঊনবিংশতি শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে একটা বৈঠক বসত। তার সভ্য ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী, লোকেন্দ্র পালিত প্রভৃতি। এঁরা সবাই ছিলেন সাহিত্য-রসপিপাসু।

সুকুমার রায়ের 'ননসেন্স ক্লাব' ও পরে তার বর্ধিতরূপ 'মনডে ক্লাবে' প্রত্যেক সভ্যের এক একটা উদ্ভট নাম ছিল।

এর সভ্য ছিলেন সুবিনয় ও সুকোমল রায়, প্রভাত গাঙ্গুলী, অমল হোম, কালিদাস নাগ, প্রশান্ত মহলানবিশ, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতি দিগগজ সাহিত্যরথীবৃন্দ।

পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোল' অফিসের আসরে যে লেখক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার কথা অজানা নেই কারও।

কৃষ্ণনগরে 'ভারতের নাট্যশাস্ত্র', স্মৃতির অতলে' প্রভৃতির লেখক, সঙ্গীত-বিশারদ অমিয় সান্যালের বাড়ীতে প্রত্যহ একটি সান্ধ্য মজলিশ বসত। এর নিয়মিত সদস্য ছিলেন: অমিয় সান্যাল, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, নির্মলকান্তি মজুমদার, বিনায়ক সান্যাল, অমিয় মজুমদার, চারু চক্রবর্তী (জরাসন্ধ,—নদীয়ার জেল সুপার থাকাকালীন 'লৌহ কপাট' এখানেই আরম্ভ হয়) বীরেন্দ্রমোহন আচার্য, ফজলুর রহমান, সমীরেন্দ্র সিংহরায় প্রভৃতি।

তা'ছাড়া সাময়িকভাবে এই মজলিশে এসে সপ্তাহ কেটে গেলেও যাওয়ার নাম করেন নি ডাঃ ননী লাহিড়ী এবং প্রখ্যাত সাহিত্যরসিক হারীতকৃষ্ণ দেব।

এই মজলিশে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ, পূর্ণ চক্রবর্তী, শরৎ পণ্ডিত প্রভৃতিরও সাময়িক আবির্ভাব ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যে এদের সকলেরই বিশেষ অবদান আছে। 'অপু' চরিত্রের স্রষ্টা, 'আদর্শ হিন্দু হোটেলের' লেখক প্রখ্যাত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মামজোয়ান-রাণাঘাট তথা নদীয়া আপন ব'লে দাবী করতে পারে।

অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস একজন কৃতী সাহিত্যিক। তাঁর 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়', 'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত।

নবদ্বীপের নিতাই ভটাচার্য 'সংগ্রাম ও শান্তি' প্রভৃতি নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ, কৃষ্ণনগরের হেমন্তকুমার সরকারও একজন সাহিত্যানুরাগী ও সুলেখক ছিলেন। তাঁর অগ্রজ ভূপেন্দ্রনাথ সরকারও সাহিত্য-সেবী। 'সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার' প্রভৃতি কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন দত্তফুলিয়ার অপূর্বমণি দত্ত। ননীগোপাল চক্রবর্তী শিশু-সাহিত্যে এবং সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিকবার ভারত সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর 'আকাশ গঙ্গা', 'বাদলা দিনের গল্প', 'পাল্কীবুড়ো', 'আমার বন্ধু ভাস্কর' প্রভৃতি বই কিশোর সাহিত্যে সমৃদ্ধি এনেছে। তিনি অনেকগুলি শিল্প-বিজ্ঞানের বইও লিখেছেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রাণাবন্দের হাতেম আলি মোল্লা, কৃষ্ণনগরের কালীপ্রসাদ বসু, শক্তিনগরের সুধীর ভৌমিক ও শচীন বিশ্বাস এবং রাণাঘাটের ভবেশ দত্ত। আনুলিয়ার মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ও সুলেখক। কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ ও সুলেখক। প্রমোদ সেনগুপ্ত খ্যাতিমান প্রবন্ধকার। অজিত দাস উপন্যাস লেখক। কৃষ্ণনগরের নির্মল দত্ত ও মোহিত রায় কেবল সাংবাদিকই নন, তাঁরা নব সাক্ষরদের জন্য বই লিখে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। অমর রায়ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বই লিখে একাধিকবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। রাজনৈতিক সাহিত্যে কাশীকান্ত মৈত্র চিন্তাশীল লেখক বলে সুপরিচিত।

কৃষ্ণনগরের মেয়ে সুপ্রীতি সান্যাল শুধু শিক্ষা নয়, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সঙ্গেও অনেকদিন যুক্ত আছেন।

কবিতা রচনায় এ জেলার ফণিভূষণ বিশ্বাস, নিজন দে চৌধুরী, নির্মাল্য ভট্টাচার্য (মজনু মোস্তাফা), দেবদাস আচার্য, রথীন ভৌমিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। চাপড়ার ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রবীন সুরসিক কবি।

সাহিত্যে নদীয়ার অবদানের কথা স্বল্প সময়ের মধ্যে যতখানি সম্ভব বলা হল। কিন্তু সাহিত্য কি বস্তু তা' এখনও বলা হয় নি।

সাহিত্য কি আমরা জানি না। সাহিত্য কাকে বলে তার চূড়ান্ত কথা আজও কেউ বলতে পেরেছেন বলেও আমাদের জানা নেই। অবশ্য তাতে সাহিত্যস্রষ্টার কিছুই এসে যায় না; কারণ সাহিত্য বস্তুটি কি, তা আগে থাকতে জেনে নিয়ে কেউ লিখতে বসেন না। সৃষ্টির পরে তার ধর্ম নিয়ে আর পাঁচজনে আলোচনা করেন। সাহিত্যস্রষ্টার অন্তরে যে উদ্দীপনা জাগে, তাকে তিনি প্রকাশ না করে স্বস্তি পান না। বাল্মীকির রামায়ণ-প্রণয়নের কাহিনীটি সাহিত্য-সৃষ্টির অপূর্ব উদাহরণ।

তবে সাহিত্য কি আমরা না জানলেও সাহিত্য কি করে আমরা জানতে পারি। সাহিত্য অনেক কিছু করতে পারে। সাহিত্য হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে, সংসারবিরাগী করতে পারে, এমন কি জীবনকে উৎসর্গ পর্যন্ত করাতে পারে অনায়াসে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটাতে, দুঃখে সান্ত্বনা দিতে, জগতে শান্তি স্থাপন করতে পারে সাহিত্য।

এত কাজ করতে হলে ত সাহিত্যকে দশভূজা হতে হয়। হাঁ, তা হয়। সেজন্য সাহিত্যের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে। কাব্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, সঙ্গীত সাহিত্য, উপন্যাস সাহিত্য এই সব।

কথার খেলায়, হাস্যরসের অবতারণায় যিনি আসর মাৎ করে রাখেন—ছাপার অক্ষরে প্রকাশ না হলেও, তিনিও সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই হিসাবে গোপাল ভাঁড়কে আমরা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে ধরে নিতে পারি। গোপালের নিজের লেখা কোন বই নেই, তাঁর পরিচয়ও কুয়াসাচ্ছন্ন অথচ লোকের মুখে মুখে আজও গোপাল সঞ্জীবিত। গোপালের রসসমৃদ্ধ কথাই তার সাহিত্যিক অবদান।

বাংলা সাহিত্য-সেবকদের অনেককেই আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই বলে তাঁদের অবদান কম নয়। তাঁরা আমাদের বরণীয়। সাহিত্যে অনেকের অবদান পরোক্ষ। এদেরও ভুলে গেলে চলবে না।

নদীয়ার দাদপুরনিবাসী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক। সাহিত্যিকদের দুর্দিনে পরমবন্ধু ছিলেন এই প্রকাশক। বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, দীনবন্ধুকে তিনি তাঁদের পুস্তকপ্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য

করেন। জলধর সেনকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনিই নিযুক্ত করেন। শরৎচন্দ্রকে ভরসা দিয়ে ব্রহ্মদেশ থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার মূলেও ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। তখনকার দিনে বহু সাহিত্যিক ছিলেন যাঁরা এই প্রকাশকের সহায়তা না পেলে সাহিত্যজগতে কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। সাহিত্যিক প্রকাশ করেন নিজেকে কিন্তু প্রকাশক প্রকাশ করেন অনেককে। নদীয়ার সাহিত্য-যজ্ঞে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের অবদান কম নয়।

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কত কীর্তন, কত বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, গম্ভীরা, আগমনী—আরও কত রকমের নাম না-জানা গান যে সুজলা সুফলা বাংলা দেশের মাটিকে রসসিঞ্চনে উর্বর করে রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। পদ, সুর ও ছন্দের বাহনে গান, সত্য ও সুন্দরের একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। নদীয়ার বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আরম্ভ করে রামপ্রসাদ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দ অধিকারী, লালন শা ফকির প্রভৃতি বহু কবি সঙ্গীতের মাধ্যমে সাহিত্য-সেবা করে এসেছেন।

নাটকরচয়িতা সাহিত্যিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই নাটকের রূপকার—অভিনেতার অবদানও সাহিত্যক্ষেত্রে কম নয়। অভিনয়ের শিল্পকলায় দর্শককে অভিভূত না করতে পারলে নাটকের সার্থকতা কোথায়? এদিক দিয়ে নদীয়ার নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী, বিকাশ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সগর্বে উচ্চারণ করা যেতে পারে।

বাঙালীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—সে কথা চায়, ভালো ভালো কথা। একটি পরজ গানে আছে, কালো কালো কম্বল কারি কারি কামেলিয়া। কিন্তু কালো কালো কম্বল চুরি গেলে বাঙালী তা নিয়ে গান বাঁধবে না,—পুলিশে খবর দেবে।'—বলেছেন আমাদের দিলীপকুমার রায়।

বাঙলা দেশের মধ্যে আবার ন'দে-শান্তিপুরের কথা আরও ভালো—অর্থাৎ এখানকার বাচনভঙ্গী মিষ্টি। একথা কেবল প্রমথ চৌধুরী কি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ই বলেন নি, এটা সর্ববাদীসম্মত। ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের বাহন। নদীয়ার সাহিত্য সে জন্য বাংলা সাহিত্যে একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থামতে হল এখানে। 'নদীয়ার সাহিত্য' বলে বিশেষ কিছু আছে কি? কৃষ্ণনগরের সরভাজা বিখ্যাত। সাহিত্যও কি ঐ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে?

পড়লে দোষ কি? সাহিত্য সর্বজনীন, মিষ্টান্নও ত সর্বজনীন। কিন্তু বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা বা কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ার ঐ সর্বজনীন মিষ্টান্ন-জগতে একটা বিশেষ আসন আছে, যেমন আছে কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য। ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের বাহন। ঢাকা-চাঁটগা-বরিশাল-খুলনা বা নদীয়ার ভাষায় যেমন পার্থক্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি আছে তার সাহিত্যেরও বৈশিষ্ট্য।

নদীয়ার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—প্রেম-ভক্তি ও অনাবিল হাস্য-রসের প্রাধান্য। যে হাস্যরস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: শুচিশুভ্র নক্ষত্রপুঞ্জ।

প্রেম-ভক্তির উৎস শ্রীচৈতন্যের দেশ এই নদীয়া। নদীয়ার মত সাহিত্যে হাস্যরস পরিবেশন করতে পেরেছে কে? কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, আজু গোঁসাই, বিজয়রাম সেন, রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, গোপাল ভাঁড় এবং পরবর্তী যুগে ঈশ্বর গুপ্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু—ব্যঙ্গোক্তি ও হাস্যরস পরিবেশনে বাংলা সাহিত্যে এঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বর্তমানে নদীয়ার অনেক উদীয়মান লেখক বিবিধ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে সাহিত্যসেবা করছেন। এই সব পত্রিকার কোন কোন লেখক সাহিত্যের গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে একটা নতুন পথ ধরতে আগ্রহশীল। অনেকে বিশিষ্ট কিশোর পত্রিকাগুলির নিয়মিত লেখক। অনেকে সাংবাদিকতার কাজে লিপ্ত থেকে সাহিত্যসাধনার প্রয়াসী।

কিন্তু কৈ সে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ? কৈ যুগস্রষ্টা ঈশ্বর গুপ্ত? —কৈ দ্বিজেন্দ্রলাল, বীরবল, পরশুরাম?

নদীয়ার সে সাহিত্য-প্রতিভা তো বিলুপ্ত হওয়ার কথা নয়! সেই 'রস-নিষিক্ত মৃদংগের' মৃত্তিকা তো বিশুষ্ক হবার নয়। তবে?

ভবিষ্যত এর উত্তর দেবে আমরা আশা রাখব।

বর্তমান সাহিত্য-রসপিপাসু যুবকদের মধ্যে উৎসাহের অভাব নেই। সম্ভবত গুপ্তকবি বা বীরবলের মত প্রতিভাবান পরিচালক খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। সুযোগ পেলে এঁরাই আবার নদীয়ার গৌরব ফিরিয়ে আনতে পাবেন,—সে সম্ভাবনা আছে এঁদের মধ্যে।

সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার এই পশ্চাৎ অপসরণের কারণ অবশ্য কেউ কেউ অনুমান করেন,—দেশবিভাগের পর নদীয়ার উপর বার বার যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যে ওলট-পালট কাণ্ড ঘটেছে নদীয়ায়, তাতে এখানে সাহিত্যসাধনার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে অনেকখানি।

কিন্তু তাই বলে এই অবস্থায় নদীয়ার শৈথিল্য দেখালে চলবে না,—বৈষ্ণব পদকর্তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাইকে ডাক দিয়ে বলতে হবে:

> 'হেদেরে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও
> বাহু পসারিয়া গোরা চাঁদেরে ফিরাও।'

নদীয়ার ভাব-চৈতন্যকে, তার রসধারাকে আজ গৃহত্যাগ করতে দেওয়া চলবে না। দুহাতে আলিঙ্গন করে নদীয়া-বিনোদকে, নদীয়ার সাহিত্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

সাংবাদিকতা ও পত্রপত্রিকা

নদীয়া শুধু ধর্মে বা সাহিত্যে নয়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার ক'রে আছে। বিদগ্ধমণ্ডলীর তীর্থভূমি এই নদীয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার মেলায় গুঞ্জরণ-মুখর। এই সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি জ্ঞানানুশীলনে নদীয়াকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের জন্ম দেড়শো বছর আগে—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতায় প্রকাশিত 'সমাচারদর্পণ'-এর আবির্ভাবের সময় থেকে। নদীয়ায় সংবাদপত্রের সুরু একশো বছর আগে থেকে বাংলা ১২৭২ সালে। ১২৭১ সালে শান্তিপুরে 'কাব্যপ্রকাশযন্ত্র' নামে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরলাল মৈত্র। শান্তিপুর থেকেই প্রথম মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় 'রঙ্গভূমি'। ১২৭২ সালে। 'রঙ্গভূমি'র সম্পাদক ছিলেন শান্তিপুর ব্রাহ্ম-সমাজের তৎকালীন সম্পাদক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পত্রিকাখানি মাত্র এক বছর চলে।

রাণাঘাটের তদানীন্তন সুধীসমাজের অন্যতম যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'সমাজ ও সাহিত্য' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানি অবশ্য বেশীদিন চলি নি। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ১৩১৬ সালে 'বার্তাবহ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। গিরিজানাথই ছিলেন 'বার্তাবহ'-এর সম্পাদক। তিনি ছিলেন একদিকে সাংবাদিক ও অন্যদিকে কবি। সে সময়ে রাণাঘাটের মহকুমা-শাসক ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। গিরিজানাথ প্রায়ই নবীনচন্দ্রের বাংলোয় গিয়ে কাব্য ও সাহিত্যালোচনায় অবকাশ যাপন করতেন। গিরিজানাথ বার্ধক্যপীড়িত হলে রাণাঘাটের কৃতী সন্তান, বর্তমানের প্রখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কিছুদিন 'বার্তাবহ'-এর পরিচালনে সহায়তা করেছিলেন। গিরিজানাথের মৃত্যুর পর 'বার্তাবহ'-এর সম্পাদনা ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন শ্রীরমণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বার্তাবহ' এখনও চলছে এবং ৬৩ বছর তার বয়ঃক্রম।

শান্তিপুর থেকে 'সরোজিনী' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালে। 'সরোজিনী'র সম্পাদক ছিলেন রামলাল চক্রবর্তী। পত্রিকাখানি অবশ্য এক বছরের বেশী চলে নি। ১২৮৯ সালে শান্তিপুরে 'হিতকারী যন্ত্র' নামে আর একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়। 'কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র' ছাপাখানাটি পাঁচ বছর পর অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। ১২৯০ সালে শান্তিপুরের এই 'হিতকারী যন্ত্র' ছাপাখানা থেকে 'ভারতভূমি' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং 'মুদ্গর' নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দু'খানি পত্রিকারই সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন শ্যামাচরণ সান্যাল। মাত্র মাস চারেক চলেছিল এই পত্রিকা দু'খানি। ছাপাখানাটিও তিন বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে ১৩৩৫ সালে 'সেবা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পরে 'সেবা' সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত বীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 'শান্তি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যার পর 'শান্তি'র আর কোন সংখ্যা বের হয় নি। ১৩০৫ সালেই শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্পাদকতায় 'যুবক' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। যোগানন্দ ব্রহ্মচারী সুদীর্ঘ ৬৩ বছর 'যুবক' পরিচালনার পর গত ১৩৬৮ সালে পরলোকগমন করলে তাঁর পুত্রদ্বয় কল্যাণকুমার ব্রহ্মচারী ও নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী যথাক্রমে 'যুবক'-এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ১৩০৫ থেকে ১৩৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৯ বছর 'যুবক' চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০৭ সালে শান্তিপুরের যশস্বী কবি ও সাহিত্যিক মৌলভী মোজাম্মেল হক 'লহরী' নামে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 'লহরী' এক বছর চলে। ১৩১০ সালে মন্মথনাথ দাস 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শান্তিপুর থেকে প্রকাশ করেন। চার সংখ্যা প্রকাশের পর এখানিও বন্ধ হয়ে যায়।

১৩০৬ সালে নবদ্বীপ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ধর্মমূলক 'নিত্যধর্ম পত্রিকা'। পত্রিকাটি ছিল নবদ্বীপ ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে ১৩১২ সালে শান্তিপুর ব্রাহ্ম-সমাজের হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রের সম্পাদকতায় 'বাঙ্গালা' নামে একখানি জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মাত্র তিন সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর 'বাঙ্গলা' পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর থেকে 'বঙ্গরত্ন' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গরত্ন'কেই কৃষ্ণনগরের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলা যেতে পারে। বর্তমানে এই পত্রিকা-খানির বয়ঃক্রম ৬৭ বছর হয়েছে। 'বঙ্গরত্ন'র প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল দাস মৃত্যুকাল পর্যন্ত পত্রিকাখানির পরিচালনা করে গিয়েছেন। পত্রিকাখানি এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাখানির সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল দাস, এবং সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন সিংহ, শ্রীনির্মল দত্ত, শ্রীমোহিত

রায়, শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী বর্তমানেও 'বঙ্গরত্ন'-এর সম্পাদক রয়েছেন।

১৩১৯ সালে নদীয়া জেলার দারিয়াপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী'র মুখপত্ররূপে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয় 'সাধক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা। 'সাধক'-এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন সতীশচন্দ্র বিশ্বাস। দু'বছর চলার পর সাধক বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণনগর থেকে স্বনামখ্যাত হেমন্তকুমার সরকারের সম্পাদকতায় 'জাগরণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত (সম্ভবতঃ ইং ১৯২৬।২৭ সালে) হয়। পরে 'জাগরণ' কুষ্ঠিয়া (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং এর সম্পাদকতার ভার নেন নিশিকান্ত পাত্র।

১৩২৯ সালের ২রা ভাদ্র তারিখে (ইং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট) পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সারঙ্গ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্নের সম্পাদকতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে' মুদ্রিত হয়ে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয়'কেই নদীয়া জেলার প্রথম ধর্মীয় পত্রিকা বলা যেতে পারে। ১৩১০ সালে কলকাতায় স্থাপিত 'ভাগবত যন্ত্র'কে ১৩২০ সালে শ্রীমায়াপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং তারপর ১৩২২ সালে 'ভাগবত যন্ত্র' কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত হয় ও তার নামকরণ হয় 'শ্রীভাগবত প্রেস'। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়াপুরে 'নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস' স্থাপিত হয়। ১৩৩৩ সালে কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবত প্রেস থেকে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী ও পণ্ডিত চণ্ডী-চরণ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন থেকে শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ 'গৌড়ীয়' এর সম্পাদক হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'গৌড়ীয়' মাসিকে পরিণত হয়। পত্রিকাখানি এখনও শ্রীমায়াপুর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩৩৪ সালের ১৫ই ফাল্গুন (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী) শ্রীমায়াপুরে নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে দৈনিক 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী ও শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নদীয়াপ্রকাশ' শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিরোধানের পর বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩২৯ সালে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' নামে ধর্ম-বিষয়ক একখানি পত্রিকা নবদ্বীপ থেকে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি শ্রীল হরিদাস গোস্বামীর সম্পাদকতায় দশ বছর চলেছিল। পত্রিকার লেখকদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, নরহরি সরকার ঠাকুর, কালিদাস রায়, হরিমোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' ও 'গৌরাঙ্গসেবক' নামে দু'খানি পত্রিকাও নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের নাম ও রচনাকাল জানা যায় না। তবে পত্রিকা দু'খানিই ছিল মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলা বিষয়ক।

১৩৩০ সালের বৈশাখে নরেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক 'বাঁশরী' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের আষাঢ় থেকে 'বাঁশরী' মাসিকে পরিণত হয়। প্রায় এই সময় থেকেই কবি নীহাররঞ্জন সিংহ বাঁশরীর ভার গ্রহণ করেন। কবি নীহাররঞ্জন সিংহের সম্পাদকতায় ১৩৩৪ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৫৮ সালের ৩রা আষাঢ় থেকে (১৯৫১ খ্রীষ্টা-ব্দের ১৮ই জুন) 'বাঁশরী' আবার নবপর্যায়ে কৃষ্ণনগর থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। তখন এর সম্পাদক হন কবি নীহাররঞ্জন সিংহ ও শ্রীনির্মল দত্ত। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত 'বাঁশরী' চলেছিল।

পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ১৩৩৫ সাল থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েক বছর নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত 'নবদ্বীপ' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তৃতীয় পর্যায়ে সম্পাদক ছিলেন শ্যাম'পদ ভট্টাচার্য। ১৩৩৬ সালে 'শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ'-এর উদ্যোগে 'শান্তিপুর' নামে একখানি সংবাদ-পরিবেশিত মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম বছর 'শান্তিপুর'–এর সম্পাদক ছিলেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অমরনাথ প্রামাণিক। দ্বিতীয় বছর সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সচ্চিদানন্দ সান্যাল। বছর দুই চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিপুর থেকে 'সাহিত্যবার্ষিকী' নামে আর একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালে। শ্রীপ্রভাস রায় ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। পরিষদের মাসিক 'পূর্ণিমা সম্মিলনে' পঠিত প্রবীণ ও নবীন লেখকদের রচনাসম্ভারে প্রতি বছর শারদীয়া পূজার আগে একশত পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। তিন বছর চলার পর এই পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মদা গ্রাম থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'দীপশিখা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীউপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাংশুকুমার বসু।

১৩৪২ সালে রাণাঘাটে আর একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রকা-শিত হয় 'নদীয়ার বাণী'। এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। এই পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীগুপ্ত কর্মসূত্রে কলকাতায় চলে গেলে তিন বছর প্রকাশের পর পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৪৪ সালে শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী শিশুদের জন্যে 'কচি-কথা' নামে একখানি মাসিকপত্র কৃষ্ণনগরে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। অধুনালুপ্ত 'কচিকথা'র ১৩৪৮ সাল থেকে সম্পাদক-রূপে কাজ করেন নীহাররঞ্জন সিংহ ও শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ শিশুদের পত্রিকারূপে নদীয়ায় 'কচিকথা'ই প্রথম পত্রিকা বলা যেতে পারে। ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণনগর থেকে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় 'প্রাতিকা' মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিন সংখ্যার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বৈশ্বানর' কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয়। 'বৈশ্বানর'-এর সম্পাদক ছিলেন কবি শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। এই পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা মাত্র

প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগর থেকে ১৩৫৬ সালে 'সংগ্রাম' নামে একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাব সম্পাদক ছিলেন শ্রীসুশান্ত হালদার। 'সংগ্রাম' তরুণ সাহিত্যিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিল। কিছুদিন চলার পব 'সংগ্রাম' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৪৯ সালে শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কালের ভেরী' নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত হয়। 'নদীয়া জেলাবোর্ড' নামে একখানি পত্রিকা এবং একটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল কৃষ্ণনগর থেকে ১৩৫১ সালে। সম্পাদক ছিলেন খান বাহাদুর এম্, শামসুজ্জোহা।

'নদীয়ার কথা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কৃষ্ণনগরে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'নদীয়ার কথা'র সম্পাদক ছিলেন তাবকদাস বন্দোপাধ্যায় ও তাবপরে প্রফুল্লকুমাব ভট্টাচার্য এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শৌরবীন সেনগুপ্ত এই পত্রিকাব সম্পাদক ছিলেন। ফণী বায়েব সম্পাদকতায় ১৩৫৫ সালে 'শান্তিপুর সংস্কৃতি সংঘ'-এব উদ্যোগে 'প্রাচী' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন পাঁচজন: অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাধাবমণ প্রামাণিক, মহীতোষ দাস, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সত্যব্রত মৈত্র। প্রথম সংখ্যার পর এর আর কোন সংখ্যা প্রকাশ হয় নি। ১৩৫৬ সালে শান্তিপুবস্থ বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদেব মুখপত্ররূপে 'সঙ্ঘবাণী' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন। পত্রিকাখানি ন'বছর চলে।

সীমান্তবাসীর মুখপত্ররূপে 'সীমান্ত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র রাণাঘাট থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সালে। 'সীমান্ত'-এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীসনৎ চৌধুরী ও শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়। ন'বছর চলার পরে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৫৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণনগরে 'হোমশিখা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। 'হোমশিখা'র সম্পাদক হন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। ১৩৬২ এব আষাঢ় থেকে শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী ও শ্রীকালীপ্রসাদ বসু যুগ্ম-সম্পাদক হন। পরে ১৩৬৩ সালের বৈশাখ থেকে 'হোমশিখা'র সম্পাদকতার ভার এককভাবে গ্রহণ করেন শ্রীকালীপ্রসাদ বসু। সাহিত্য পত্রিকারূপে 'হোমশিখা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়ে এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা ১৩৬০ সালে শ্রীপ্রফুল্ল সাহা সম্পাদিত 'প্রগতি', ১৩৬১ সালে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু ও শ্রীনির্মল চৌধুরী সম্পাদিত 'সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয় নবদ্বীপ থেকে। ১৩৬২ সালে শান্তিপর থেকে বাংলা ও ইংরাজী রচনা সম্বলিত 'জেনারেল' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়ে এক বছর চলেছিল। এর সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন দেবদত্ত ভট্টাচার্য ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। ১৩৬২ সালে অধ্যাপক ধীরানন্দ রায়ের সম্পাদকতায় 'দিশারী' নামে একখানি পত্রিকা এবং ১৩৬৩ সালে দেবু চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ রায় ও জলেশ সেন সম্পাদিত 'অরণি' (ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শান্তিপর শাখার উদ্যোগে) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দু'খানি কয়েক সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলা বোর্ডের মুখপত্ররূপে 'নদীয়া মুকুর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। জেলা বোর্ডের অবলুপ্তি ঘটলে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'নদীয়া মুকুর'-এর স্বত্ব ও সম্পাদকতার ভাব গ্রহণ করেন শ্রীসমীবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়। নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের জন্যে 'নদীয়া মুকুর' এ-জেলায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করে আছে।

শ্রীরামরঞ্জন মৈত্র সম্পাদিত পাক্ষিক সংবাদপত্র 'বিদ্যুৎ'ও (১৪ বর্ষ) নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণনগর থেকে ধর্মীয় মাসিক, পরে পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত 'নদীয়াসুন্দব' শ্রীনাবায়ণ দাস মোহান্তর সম্পাদনায় ১৭ বছর যাবত চলছে।

রাণাঘাট থেকে প্রকাশিত ও শ্রীজীবন ভট্টাচার্য এবং শ্রীকালিকা বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'ক্লাশ' (১৪শ বর্ষ), নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীগৌবাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'নবদ্বীপবার্তা' (১১শ বর্ষ), চাকদহ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত পাক্ষিক সংবাদপত্র 'সাগ্নিক' (১৩শ বর্ষ) এবং শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'জনতার মুখ' সংবাদপত্রগুলি এই জেলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে বিশেষ উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। শিশুদের জন্য জেলার একমাত্র মাসিক 'মনির খনি' নবদ্বীপ থেকে নিয়মিত বের হচ্ছে।

এখানে আরও কয়েকখানি পত্রপত্রিকার কথা উল্লেখ করছি। এই পত্রপত্রিকাগুলি প্রকাশের পব প্রত্যেকখানি কিছুদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়, কোনখানি বা দীর্ঘ কয়েক বছরও চলে।

নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত:

বোধন (১৩৬২ সাল): সম্পাদক—শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সমতা (১৩৬২ সাল): সম্পাদক—ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
সঙ্ঘম (১৩৬৩ সাল): সম্পাদক—শ্রীপূর্ণেন্দু সেন।
গৌরভাবিনী (সম্ভবতঃ ১৩৬৪ সাল): সম্পাদক—শ্রীরাধাবিনোদ ওরফে সাহাজী।
সাধনা (১৩৬৬ সাল): সম্পাদক—শ্রীনগেন তালুকদার ও শ্রীপ্রাণবল্লভ বসাক।
হ্যানিম্যানের কথা (১৩৬৭ সাল): সম্পাদক—ডাঃ প্রাণগোবিন্দ গোস্বামী।
অগ্রণী (১৩৬৮ সাল): সম্পাদক—শ্রীনিতাই পোদ্দার।
শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা (১৩৬৮ সাল): সম্পাদক—শ্রীল ভগবান দাস বাবাজী।
বঙ্গতীর্থ (১৩৬৮ সাল): সম্পাদক—শ্রীবিভূতি বিদ্যাভূষণ ও শ্রীদীনেশ রায়।
শঙ্খ (১৩৭১ সাল): সম্পাদক—শ্রীদিলীপ কর্মকার।
প্রপন্ন (১৩৭১ সাল): নবদ্বীপ প্রসন্ন আশ্রমের মুখপত্র।
আমার দশক (১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ): সম্পাদক—অরুণ বসু।
তিমিরারি (১৩৭৪ সাল): সম্পাদক—তপন ভট্টাচার্য।

তর্জনী (১৩৭৬ সাল): সম্পাদক—শ্রীজয়দেব পাণ্ডে।
বোয়াক্ (১৩৭৯ সাল। মিনি পত্রিকা):
সম্পাদক—শ্রীসুজয় দত্ত।

কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত :

মুখপত্র (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৩): নদীয়া জেলা কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ।
অভিযান (১৯৪৬-৪৭ খ্রীস্টাব্দ): সম্পাদক—ফণী রায় ও বিভু বিশ্বাস।
অভিযাত্রী (১৩৫৪-৫৬ সাল): সম্পাদক—প্রথমে দীপেন মখোপাধ্যায় ও পরে শ্রীমোহিত রায়।
সেবা (শ্রাবণ ১৩৫৬ সাল): সম্পাদক—শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী।
লোকরাজ (মাঘ ১৩৫৭ সাল): সম্পাদক—শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী।
অভ্যুদয় (১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল): সম্পাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল।
প্রহরী (১৩৫৮ সাল): সম্পাদক—শ্রীবিভাস মিত্র ও শ্রীসুনীল ভাদড়।
ঘোষণা (১৩৫৮ সাল): সম্পাদক—শ্রীকুবের গুহ ও পরে শ্রীশৈলেন সরকার।
মিতালী (১৯৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দ): সম্পাদক—শ্রীমোহিত রায়।
নদীয়াদর্পণ (চৈত্র ১৩৬৫ সাল): সম্পাদিকা—শ্রীঅপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।
চাষী-মজদুর (১৯৫৯): সম্পাদক—শ্রীশৈলেন ঘোষ।
নদীয়াসমাচার: সম্পাদক—এস, এম, বদরুদ্দিন।
জলঙ্গী: সম্পাদক—শ্রীমোহনকালী বিশ্বাস।
বাজপাখী: সম্পাদক—নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়।
নদীয়া প্রকাশ: সম্পাদক—শ্রীনাড়ুগোপাল ঘোষ।

শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত :

চিত্রভানু (১৩৬৩ সাল): সম্পাদক—শান্তিপুর ছাত্র পরিষদ।
জলসারেঙ: বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নি।
তরুণ (১৩৬৭ সাল): সম্পাদক—চন্দ্রশেখর রায়।
নবদিগন্ত (১৩৭৪ সাল): সম্পাদক—শ্রীকিশোরী শাস্ত্রী।
শ্রীলেখনী (১৩৭৭ সাল)· সম্পাদক—রবীন ভবানী।

রাণাঘাট থেকে প্রকাশিত :

শ্রমিক ও সমাজ (১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ): তন্তুজীবিদের মুখপত্র: সম্পাদক—শ্রীরাধারমণ দেবনাথ।

বাদকুল্লা থেকে প্রকাশিত :

গ্রামিক: সম্পাদক—প্রীতিরঞ্জন আচার্য।

নদীয়া জেলার পত্রপত্রিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ জেলায় যেমন প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক পত্রিকা, তেমনি হয়েছে ধর্মীয় ও শিশু পত্রিকা। ইদানীংকালে মিনি পত্রিকাও তা থেকে বাদ পড়ে নি। বর্তমানে যে পত্র-পত্রিকাগুলি চালু তার একটি তালিকা এই নিবন্ধের শেষের দিকে দেওয়া হল।

পত্রপত্রিকার অনেকগুলি হাতে লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'অগ্নিশিখা' (১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ) এবং '৪২ বিপ্লবকালে 'মুক্তির ডাক' (১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ) নামে দু'খানি হাতে লেখা ও সাইক্লোস্টাইল করা পত্রিকা তদানীন্তন ব্রিটিশ-শাসন কাঠামোর ওপর দারুণভাবে আঘাত হেনেছিল। তা ছাড়া সাহিত্য বিষয়ক হস্তলিখিত পত্রিকা 'বেদুইন' (কৃষ্ণনগর) তদানীন্তন যুব সাহিত্যিক সমাজের হাতেখড়ি করিয়েছিল। এঁদের অনেকেই এখন সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। 'বেদুইন' কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী প্রমুখের রচনাতেও সমৃদ্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণনগর সাধারণ পাঠাগারের শিশু বিভাগের মুখপত্র 'অঙ্কুর' (দেওয়াল পত্রিকা) এখনও তার স্বকীয়তা বহন করে চলেছে।

এ-জেলার পত্রপত্রিকার ইতিহাসে স্কুলকলেজের পত্রিকাগুলিরও স্থান কম উল্লেখ্য নয়। স্কুল-কলেজের বিভিন্ন পত্রিকা আজও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রেখে চলেছে। এই সব পত্রিকার মধ্যে 'কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা'ই প্রাচীনতম। সাতান্ন বছর আগে হেমন্তকুমার সরকারের সম্পাদকতায় 'কৃষ্ণনগর কলেজ ম্যাগাজিন' প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ-জেলার অনেকেই কৃতী সাংবাদিকরূপে সংবাদপত্র-জগতে বিশেষ খ্যাতির আসন লাভ করেছেন। ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষকে এ-জেলার প্রথম সাংবাদিক বলা যেতে পারে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা থেকে। এ-পত্রিকা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সংবাদকে চিরকালীন স্থায়ী সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন এই নদীয়ারই দরদী মানুষ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। কাজী নজরুল ইস্‌লাম কৃষ্ণনগরে বসেই তাঁর 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (বাংলা ১২৪৩ সাল)।

সাংবাদিকরূপে যাঁরা খ্যাতিমান্ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারের। হেমন্তকুমার সরকারও 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'র অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তা ছাড়া আরও যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন: সর্বশ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত (সাংবাদিকরূপে জীবন সুরু ও পরে নাট্যকার), কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, দেবকুমার ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ বসু, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তরুণতম সাংবাদিক শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায় প্রমুখ। তা ছাড়া 'তির্যক' খ্যাত কার্টুনিস্ট শ্রীচণ্ডী লাহিড়ীও আছেন। এঁরা সকলেই কৃতী সাংবাদিক। কলকাতার সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং এখনও অনেকে আছেন। আকাশবাণীর শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আজ সাংবাদিকরূপে শীর্ষ

আসনে অধিষ্ঠিত। সাংবাদিকরূপে তিনিই প্রথম সরকারী খেতাব 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত।

বৃহৎ দৈনিক পত্রিকাগুলি আজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত। এই জেলার অনেকেই কলকাতার দৈনিক পত্রিকা বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা। দৈনিক পত্রিকা ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় জেলার এই সকল সাংবাদিকরাও আজ ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় আসার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভেতর কৃষ্ণনগরেই সাংবাদিকরা সর্বপ্রথম 'নদীয়া জেলা সংবাদ-পত্রসেবী সংঘ' গঠন করেন (২৬শে জুন, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রীউপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শ্রীনির্মল দত্তের গৃহে এই সংঘ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংঘের প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মল দত্ত। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, শিবকালী লাহিড়ী, কালিকাপ্রসাদ ভাদুড়ী, শ্রীসনৎ চৌধুরী, শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ ধর, শশী খাঁ, শ্রীমৃণাল দত্ত, শ্রীমোহনকালি বিশ্বাস, শ্রীনবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, শ্রীতড়িৎ বিশ্বাস প্রমুখ এই সংঘের এক একটি স্তম্ভ ছিলেন। পলাশীতে এই সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানেই অসুস্থ হয়ে কিছুদিন পরে সংঘের বিশিষ্ট সদস্য ও সাংবাদিক জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ সান্যাল পরলোকগমন করে। শশী খাঁ, কালিকাপ্রসাদ ভাদুড়ীও এখন জীবিত নেই। পরবর্তীকালে সর্বশ্রী মোহিত রায়, জীবন ভট্টাচার্য, কালিকা বসু, সন্তোষ মিত্র প্রমুখ সংঘের কর্মকর্তারূপে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন।

এই জেলার সাংবাদিকদের ভূমিকা আজও গৌরবময়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে 'নদীয়া জেলা প্রেস ক্লাব' গঠিত হয়। প্রেস ক্লাবের প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ধর ও শ্রীউপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশ্রী কালী-প্রসাদ বসু, নির্মল দত্ত, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, তিনকড়ি বাগচী, গোপালকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায় প্রমুখ প্রেস ক্লাবকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যান। এই সালের ৭ই ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে প্রেস ক্লাবের আহ্বানে 'পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল সংবাদপত্রসেবী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরেই 'পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল সংবাদপত্রসেবী সংঘ' গঠিত হয়।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী 'নবদ্বীপ সাংবাদিক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে শ্রীতিনকড়ি বাগচী ও শ্রীনলেন কুণ্ডু।

জেলার সংবাদপত্রসেবীদের একদিকে সংবাদ সরবরাহের নিপুণতা ও অন্যদিকে সংগ্রামী ভূমিকা দীর্ঘদিন থেকেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যের অভিযান ও নির্যাতনের সময় এই জেলার সাংবাদিকরা যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন সংবাদ পরিবেশন করে গিয়েছেন, এ-জেলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা একটি ভাস্বর অধ্যায় হয়ে রইবে। এই সময় থেকে সাংবাদিকতাও একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং ধারাবাহিকতার পরিবর্তন ঘটে। সাংবাদিকতার চরম পর্যায়ে এই সকল সাংবাদিকদের অবদান বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের কাছেও স্মরণীয়। আকাশবাণী ও যুগান্তরের সংবাদদাতা নির্মল দত্ত পি, টি, আইএর কালীপ্রসাদ বসু ও ইউ, এন, আইএর গোপালকৃষ্ণ রায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নদীয়া জেলা থেকে বর্তমানে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের বিবরণ

	পত্রিকার নাম	ঠিকানা	সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকাল
১।	বঙ্গরত্ন	কৃষ্ণনগর	অনিলকুমার চক্রবর্তী	১৯০৫	সাপ্তাহিক
২।	নদীয়ামুকুর	কৃষ্ণনগর	সমীবেন্দ্রনাথ সিংহরায়	১৯৬১	সাপ্তাহিক
৩।	বিদ্যুৎ	কৃষ্ণনগর	রামরঞ্জন মৈত্র	১৯৫৯	পাক্ষিক
৪।	নদীয়াসুন্দর	কৃষ্ণনগর	নারায়ণদাস মোহান্ত	১৯৫৬	সাপ্তাহিক
৫।	ফ্ল্যাশ	রাণাঘাট	জীবন ভট্টাচার্য ও কালিকা বসু	১৯৫৯	সাপ্তাহিক
৬।	বার্তাবহ	রাণাঘাট	রমণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১০	সাপ্তাহিক
৭।	নবদ্বীপবার্তা	নবদ্বীপ	গৌরাঙ্গভূষণ কুণ্ডু	১৯৬২	সাপ্তাহিক
৮।	সাগ্নিক	চাকদহ	অনিলকুমার ভট্টাচার্য	১৯৬৮	পাক্ষিক
৯।	জনতার মুখ	শান্তিপুর	মিহির খাঁ, কামাখ্যা ভট্টাচার্য, জিতেন মৈত্র, মাণিক বিশ্বাস, শুভংকর চক্রবর্তী	১৯৭২	পাক্ষিক
১০।	মুক্তিযুগ	কৃষ্ণনগর	বিশ্বতোষ মুখোপাধ্যায়	১৯৭২	পাক্ষিক
১১।	হোমশিখা	কৃষ্ণনগর	কালীপ্রসাদ বসু	১৯৫২	মাসিক
১২।	রবিবাসরাৎ	কৃষ্ণনগর	কাঁলাচাদ রায় ও রথীন সরকার	১৯৬৭	মাসিক
১৩।	নূপুর	শক্তিনগর	সুধীর ভৌমিক	১৯৭১	ত্রৈমাসিক
১৪।	অনুক্ষণ	কৃষ্ণনগর	রথীন ভৌমিক	---	ত্রৈমাসিক
১৫।	লেখা ও রেখা	শান্তিপুর	ভাস্কর মুখোপাধ্যায়	১৯৫৭	ত্রৈমাসিক
১৬।	রূপসী	কৃষ্ণনগর	পরিমল দাস	১৯৬৮	মাসিক
১৮।	মণির খনি	নবদ্বীপ	বেনুগোপাল মোদক	১৯৭১	মাসিক
১৮।	স্মরণিকা	ফুলিয়া	সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৯৭২	ত্রৈমাসিক
১৯।	অস্ট্রিক	কৃষ্ণনগর	বাবলু বিশ্বাস	১৯৭২	মাসিক
২০।	গৌড়ীয়	শ্রীমায়াপুর	ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ	১৯২২	মাসিক
২১।	নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ	কৃষ্ণনগর	এস, এম, বদরুদ্দিন	১৯৬৮	পাক্ষিক

বিদ্যাসমাজ ও বিদ্যাচর্চা

নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

—চৈতন্যভাগবত

নদীয়ার বিদ্যাচর্চা প্রাচীনত্বে খ্যাত। নদীয়ার প্রাচীন বিদ্যাসমাজের গৌরবে নদীয়া ইতিহাসে উজ্জ্বল। প্রাচীন নদীয়া হল গাঙ্গেয় সমতট। মাতৃজঠর গঙ্গার মতোই নদীয়ার বিদ্যাচর্চার গতি দুর্বার, বিচিত্র এবং উর্বর।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ'-এর বর্ণানুযায়ী ২৫০০ বছর পূর্বে শিক্ষায় সমৃদ্ধ নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। তখন বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যে নবদ্বীপ ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

কেরী ও মারশম্যানের ইতিহাস অনুসারে আদিশূর হলেন নবদ্বীপের রাজা এবং নবদ্বীপ তখন ছিল রাজধানীনগর। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন শাস্ত্রবিদ। "...... Brahmins well versed in the Hindu shastras and observances ......". রাজপোষকতায় নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার উন্নতি হতে লাগল। রাজপ্রযত্নে কবি ভট্টনারায়ণ রচনা করলেন 'বেণীসংহার' নাট্যকাব্য।

ইতিহাসের তার পরের কয়েকটি পৃষ্ঠা হল অন্ধকার। দেখা দিল দারুণ দুর্যোগ। মাৎসন্যায়।

দীর্ঘদিন পরে নবদ্বীপের সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন পালনৃপতিরা। দেশে শান্তি ফিরল। চতুর্দিকে ধ্বনিত হল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। প্রতিষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে বৌদ্ধচর্চা ও আরাধনার মঠ সুবর্ণবিহার, কালের ইতিহাসের আজ নীরব সাক্ষী।

ইতিহাসের পাতা উলটে চলি।

সেনরাজারা অধিষ্ঠিত হলেন নবদ্বীপের ক্ষমতায়। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের সাহচর্যে নৃপতি বল্লাল সেন রচনা করলেন দু'খানি কালজয়ী গ্রন্থ: অদ্ভুতসাগর আর দানসাগর।

কালবৈশাখী। ঈশানকোণে ঘন মেঘ। কানে ভেসে এল 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃ'। মেঘ কেটে আলো ফুটল। দেখা গেল নবদ্বীপের সিংহাসনে উপবিষ্ট শালপ্রাংশুভুজসমন্বিত অনিন্দ্যকান্তি নৃপতি। তাঁকে ঘিরে নবদ্বীপে বসেছে বিদ্যাসমাজ এবং নবরত্নের সভা। জয়ধ্বনি উঠল: জয়তু রাজা লক্ষ্মণ সেন। নর্তকীর নূপুর কিংকিনী শিঞ্জিত হল—মহাকবি জয়দেব গাইলেন শ্রীগীতগোবিন্দম্। সাধুরবে মুখরিত হল দিগন্ত। উমাপতি ধর শ্লোক পাঠ করলেন, ধোয়ী গাইলেন পবন দূত, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব-স্মৃতিসর্বস্ব-মীমাংসাসর্বস্বের বিধান শুনে নৃপতির মুখ হয়ে উঠল প্রশান্ত গম্ভীর। গোবর্ধন এবং শরণ পাঠ করতে লাগলেন তাঁদের রচিত কাব্য। স্মার্ত পণ্ডিত শূলপাণি, ঈশান, পশুপতি, ধনঞ্জয়, উদয়ন এবং শ্রীধর দাস রচনা করে চললেন অমূল্য গ্রন্থরাজি। বিদ্যোৎসাহী নৃপতি লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজসভা মণ্ডপের দ্বারে স্থাপন করলেন নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে স্তুতি করে রচিত একটি শ্লোক উৎকীর্ণ প্রস্তরফলক।

শুধু রাজসভা নয়, সেনরাজত্বে সমগ্র নবদ্বীপই ছিল বিদ্বজ্জন-পরিপূর্ণ নগর। 'সরস্বতীপ্রসাদে সবাই মহাদক্ষ'—চৈতন্যভাগবত। কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষ ও বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনেক চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল নবদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায়। জ্যোতির্বিদগণ এই সময় থেকেই পঞ্জিকা গণনা করেন। এই সময় বঙ্গ ও বহির্বঙ্গ থেকে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে এসে বিদ্যাচর্চা করতেন।

নবদ্বীপে পণ্ডিত শ্রীধর ভট্ট এই সময় পদার্থপ্রবেশ বা পদার্থধর্মসংগ্রহ বৈশেষিকদর্শনের 'ন্যায়কন্দলী' নামে টীকা ৯১৩ শকে (৯৯১ খ্রী.) রচনা ক'রে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গ্রন্থ অনুসারে আবার টীকা রচনা করেন নৈয়ায়িক পণ্ডিত উদয়নাচার্য,—এই গ্রন্থের নাম 'গুণকিরণাবলী'।

স্মার্ত শূলপাণি রচনা করেন 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক', 'ব্রতমালাবিবেক', 'দুর্গোৎসববিবেক', 'দত্তকনির্ণয়' এবং 'দীপকলিকা'। ঈশান রচনা করেন 'আহ্নিকপদ্ধতি' এবং পশুপতি রচনা করেন শ্রাদ্ধাধিকৃত্য 'পশুপতিপদ্ধতি'। শ্রীধর দাস রচনা করেন 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। মূল পুঁথিটি এখন আছে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে।

তারপর নবদ্বীপ তথা গোটা বাংলার বুকে নেমে এল মধ্যাহ্নে অন্ধকার।

ও কার অশ্বক্ষুরধ্বনি! মুখে যাবনী ভাষা। বণিকের ছদ্মবেশে ওরা এগিয়ে গেল লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদে। হঠাৎ ক্রন্দনরোল উঠল ওখানে। ছড়িয়ে পড়ল সারা নবদ্বীপে। নবদ্বীপের পথঘাট হল রক্তাক্ত। ভীতসন্ত্রস্ত জনতা। সংঘশক্তিহীন দারুণ আঘাতে হতচকিত। অশীতিপর বৃদ্ধ নৃপতি পূর্ববঙ্গে নিলেন আশ্রয়। নবদ্বীপ তথা সারা নদীয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হল বিন বখতিয়ার। ইতিহাসের এর পরের কয়েকটি পাতা নির্যাতন, পীড়ন আর রক্তরেখায় লিপ্ত।

'আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ দেখিলে তার জাতিধর্ম লয়॥'

দেশে অরাজকতা আর অস্থিরতার জন্য বিদ্যাচর্চা সঙ্কুচিত হল, বিনষ্ট হল পণ্ডিতদের অমূল্য সৃষ্টি হাজার হাজার পুঁথি। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের সমগ্র জীবনের সাধনার ফল।

শতাব্দী ঘুরল। ইতিমধ্যে হাজার হাজার মানুষ জাতিচ্যুত অবস্থায় মন্দিরের দরজায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে মসজিদে। সনাতন জীবনের বুনিয়াদে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। মানুষের পরিচয় নেমে এল ধর্মে।

ওদিকে ফুলিয়ায় বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস জনগণকে সামনে রেখে গাইলেন সপ্তকাণ্ড বাংলা রামায়ণ। লোক-গায়কেরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে রামায়ণগান গাইতে লাগলেন। লোকশিক্ষার বাহন হল রামায়ণ।

এমন সময়ে নবদ্বীপের সিংহাসনে বসলেন পাঠান হুসেন শাহ। চোখে তাঁর কৌতূহল, হৃদয় উদার। দুজন সৌম্য হিন্দুমন্ত্রী রূপ আর সনাতন—কর্মকুশলতা আর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নিয়ে তাঁর পার্শ্বেই উপবিষ্ট। নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজ আবার রাজপোষকতায় সমৃদ্ধ হতে লাগল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত অনুযায়ী ১৬ শতকে নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পড়তেন।

বন্যা। রেনেসাঁ। শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। এই মহাপ্লাবনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেমবিগ্রহ গৌরকান্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বাহু-দুটি আচণ্ডালে প্রসারিত, নয়নে প্রেমাশ্রু। সমস্ত নদীয়া তথা বাংলার মানুষ সেদিন এই অলোকসুন্দর ব্যক্তিত্বের বাহুপাশে ধরা দিল। জাতি আবার ঘুম ভেঙে জেগে উঠল এই অলৌকিক ব্যক্তিত্বে, জীয়নকাঠির স্পর্শে। বিমুখেরা ভীড় করল মন্দিরে, হরিসভায়। দীক্ষা নিল : জীবে দয়া, নামে রুচি এবং তরোরিব সহিষ্ণুতাব। জ্ঞান নয়, ভক্তি। ঘৃণা নয়, প্রেম। এ নতুন ধর্মাদর্শের আকর্ষণ অনুভব করলেন বামনপুকুরের চাঁদকাজি, ফুলিয়ার যবন হরিদাস, শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য এবং এমন আরও শত শত পার্ষদ আর শিষ্যেরা। গড়ে উঠল সারা নদীয়ায় বৈষ্ণব-তীর্থ। এই ভাবপ্লাবনের অভিঘাতে মনন ও চর্যার নানা খাত চঞ্চল হয়ে উঠল। সূত্রপাত হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনী-সাহিত্যের। কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন। বন্যা গীতি-সাহিত্যের খাতে এল নতুন জোয়ার। তার কল্লোল আজও প্রতিধ্বনিত।

এ যুগই সংস্কৃত ও সংস্কৃতিচর্চার সুবর্ণ যুগ। নবদ্বীপ তখন বিদ্যা ও মননের কেন্দ্রভূমি। বাংলার অক্সফোর্ড। বেদবেদান্ত-জ্যোতিষ-তন্ত্র-ন্যায়-স্মৃতি চর্চায় বাগিশ্বরী সাধন-পীঠ। ন্যায়াচার্য শ্রুতিধর বাসুদেব সার্বভৌম, নব্যন্যায়ের প্রবক্তা রঘুনাথ, স্মার্ত রঘুনন্দন, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ —এ যুগেরই পথিক। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন : 'বঙ্গে নব্যন্যায়ের চর্চার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপ বিদ্যা-সমাজেরই ইতিহাস।'

বাসুদেব সার্বভৌম পনের শতকের মাঝামাঝি (১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত নরহরি (মতান্তরে মহেশ্বর) বিশারদ। তাঁর টোল সব সময় বিদ্যার্থী-পরিপূর্ণ থাকত। এই সময় এদেশে ভট্টাচার্যবিদায় প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী বিত্তবানেরা (রাজা-জমিদার প্রভৃতি) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ভট্টাচার্যদের বার্ষিক অর্থদান করতেন। ধর্মের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে এবং পূজাপালপার্বণে ব্রাহ্মণেরা সিধা পেতেন। অনেকে জমিও পেতেন। এই ভাবেই বিত্তবানদের পোষকতায় পণ্ডিতসমাজ বিদ্যাচর্চা এবং সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতেন।

বাসুদেব সার্বভৌম সম্পর্কে লোককাহিনী সুপ্রচলিত। শৈশবে তিনি লেখাপড়া করতেন না, ছিলেন অমনোযোগীও। একদিন পিতা ভর্ৎসনা করে ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : অমন ছেলের মুখে ছাই দিতে হয়। সেদিন মা ছেলেকে খাবার থালার পাশে একমুঠো ছাই রেখে খেতে দিলেন। বাসুদেব কারণ জানলেন। বিবেকের দংশনে দুঃখে ক্ষোভে বাসুদেব সেই মুহূর্তে গৃহত্যাগ করে ভাবতে লাগলেন : বিদ্যা বিনা জীবন বৃথা। তাই তিনি ভাগীরথীর অতলে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন। এমন সময় দৈববাণী হল : বিদ্যালাভের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। আমি এই দগ্ধবনে প্রস্তররূপে বিরাজ করছি, তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠা করে পূজার ব্যবস্থা কর।

বাসুদেব গ্রামের মধ্যে বটবৃক্ষমূলে প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘট-স্থাপন করে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করলেন। এই দেবীই হলেন নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'পোড়ামা'।

কালে বাসুদেব হলেন দেবী সরস্বতীর বরপুত্র এবং অসাধারণ মেধা ও শ্রুতিধর। আমাদের দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে যাঁদের অসাধারণ কীর্তি দেখা যায় তাঁদের দেবানুগৃহীত বলে নানা কথাকাহিনী লোকসমাজে প্রচলিত হয়। তাই সারা ভারতখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেবের উপর দেবানুগ্রহ সম্পর্কে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত আছে।

নবদ্বীপে ন্যায়চর্চার পূর্বে মিথিলা ছিল অন্যতম বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র। বাঙালী বিদ্যার্থীরা মিথিলা থেকে উপাধি পেয়ে দেশে ফিরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বিদ্যাচর্চা করতেন। তখন এদেশে দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রের অভাব ছিল। মিথিলায় কোনও পুঁথি অনুলিপি করা যেত না।

বাসুদেব মিথিলায় গিয়ে প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের কাছে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাসুদেব ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সার্ব-ভৌম উপাধিতে ভূষিত হলেন। ইতিমধ্যে বাসুদেব 'চিন্তামণি'-সহ যাবতীয় ন্যায়গ্রন্থ আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন। তারপর তিনি গেলেন কাশীতে, সেখানে তিনি বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারঙ্গম হলেন।

নবদ্বীপে ফিরে তিনি কণ্ঠস্থ পুঁথি লিপিবদ্ধ করলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন মিথিলার বাইরে সর্বপ্রথম ন্যায়দর্শনের টোল। বিদ্যার্থীরা যাতে পুঁথি লিপিবদ্ধ করতে পারে তারও ব্যবস্থা করলেন। খবর ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎবেগে সারা ভারতে। সারা ভারত থেকে বিদ্যার্থীরা আসতে লাগল নবদ্বীপে বাসু-দেবের টোলে। প্রতিষ্ঠিত হল নবদ্বীপে বিদ্যানগর। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থের মতে বিদ্যানগর ছিল বিশ্ববিদ্যালয় (University)। এখানে ছিল বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চার আবাসিক চতুষ্পাঠী। বাসুদেব রচনা করলেন অমূল্য ন্যায়শাস্ত্র— 'সার্বভৌমনিরুক্ত'।

বাসুদেবের বিখ্যাত ছাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি এবং রঘুনন্দন। বাসুদেবের সময়েই নবদ্বীপ বিদ্যা ও ধর্মচর্চায় সারাভারতে খ্যাত হয়।

বাসুদেবের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতিও শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক তেজস্বী দৃঢ়ব্রতী নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কেও কিম্বদন্তী সুপ্রচলিত। শৈশবে পিতৃহীন রঘুনাথ ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকানির্বাহ করতেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে কথা আজ আর কারও অজানা নয়।

রঘুনাথ বাসুদেব সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে কাব্য-ব্যাকরণ-অভিধান—ন্যায় ও স্মৃতি অধ্যয়ন শেষ করে মহাপণ্ডিত হলেন। তিনি পূর্বে লেখা শাস্ত্রপুঁথিগুলির অসারতা প্রমাণ করে নতুন পুঁথি লিখতে লাগলেন। তর্কে তাঁর সঙ্গে কেউই পেরে উঠত না। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে গিয়ে বিদ্যাচর্চা করতে লাগলেন। তিনি পক্ষধরের 'সামান্যলক্ষণা' পুঁথির দোষ ধরলেন। পক্ষধরকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে তিনি সারা ভারতে খ্যাত হন। পরে তিনি নবদ্বীপে এসে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁর রচিত পুঁথি: 'আত্মতত্ত্ববিবেক-দীধিতি', 'অনুমিতি', 'মলিম্লচবিবেক' প্রভৃতি। রঘুনাথের ছাত্রদের মধ্যে মথুরানাথ ও রামভদ্র প্রধান।

বাসুদেবের অপর ছাত্র হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি টীকা রচনা করেন। বিখ্যাত 'হরিদাসী টীকা' ও 'কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা' তাঁর রচিত।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ই. বি. কাউয়েল হরিদাসের টীকার ইংরেজি অনুবাদ করেন।

নবদ্বীপের জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি সেকালের আর একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। তিনি রঘুনাথের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পুঁথি হল: 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'। এই পুঁথি নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে আছে।

রঘুনাথের অপর ছাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ-রচিত টীকা নৈয়ায়িকসমাজে 'মাথুরী' নামে পরিচিত।

জানকীনাথের পুত্র রামভদ্র সার্বভৌম কুসুমাঞ্জলির কয়েকখানি টীকা রচনা করেন।

সেকালের অপর ন্যায়টীকাকার হলেন ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপে তাঁর ভিটার নাম 'সিদ্ধান্তভিটা'। তাঁর বিখ্যাত পুঁথি—'লটার্থবাদ', 'কারণতাবাদবিচার' ও 'শব্দার্থসারমঞ্জরি' প্রভৃতি। তাঁর পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি এবং পৌত্র রুদ্ররাম তর্কবাগীশ দু'জনেই ছিলেন নৈয়ায়িক টীকাকার এবং বৈশেষিক শাস্ত্র পুঁথি রচয়িতা।

এই সময় নবদ্বীপে আর একজন বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়ে পারদর্শিতা দেখান। তিনি দ্বিতীয় বাসুদেব নামে পরিচিত। তাঁর পুত্র দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশও বিখ্যাত টীকা ও ব্যাকরণকার ছিলেন।

ন্যায়ের অপর ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত হলেন হরিরাম তর্কবাগীশ। তিনি বহু পুঁথি রচনা করেন এবং তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রও প্রচুর ছিল।

বাসুদেব সার্বভৌম বংশের অপর কৃতী নৈয়ায়িক কাশীশ্বর বিদ্যানিবাস এবং তাঁর পুত্রদ্বয় রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ রচনা করেন।

নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের খ্যাতি ছিল সারা ভারতজোড়া। তাঁর চতুষ্পাঠী শুধু নবদ্বীপেই ছিল না, নদীয়া তথা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছিল। তাঁর রচিত পুঁথির সংখ্যা অনেক। নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে তাঁর পুঁথি আছে।

তাঁর দুই পুত্র রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বরও পণ্ডিত ছিলেন এবং কয়েকখানি পুঁথি রচনা করেন।

নৈয়ায়িক রামরাম ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র পণ্ডিত রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 'সুবোধিনী' টীকা রচনা করেন।

গদাধর ভট্টাচার্য রাজশাহী থেকে নবদ্বীপে বিদ্যার্থী হিসাবে এসে পরে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হন এবং ন্যায় পুঁথি রচনা করে বিখ্যাত হন। তাঁর পুঁথি নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে আছে। নদীয়ারাজ রাঘব গদাধরের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মালিপোতা গ্রামে ৩৬০ বিঘা ভূমিদান করেন ২০শে আষাঢ় ১০৬৮ সন (১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে)।

গদাধরের পরে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক হন গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ। এই সময় নদীয়ারাজ রাঘব কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তিনি গোবিন্দকে আরবান্দী গ্রামে ৭০০ বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি দান করেন ১১ ফাল্গুন ১০৬৭ (১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে)। রাজা রাঘবের সময় থেকেই নদীয়ারাজের পোষকতা নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজ পেতে থাকেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে অর্থ ও ভূমি পেতে থাকেন।

এই সময়ের অপর নৈয়ায়িক রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার। তাঁর রচিত পুঁথি নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত আছে। তাঁর সমসাময়িক হলেন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার।

পরবর্তী বিখ্যাত নৈয়ায়িক হলেন জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন। নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণ এই সময় নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূমি দান করেন।

এই সময় নদীয়ারাজকে নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজ 'নবদ্বীপাধিপতি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

('নবদ্বীপাধিপতিং রামকৃষ্ণ রায়মপি স্ববশমানেতুং বহন্ সেনাপতীন্ প্রেষয়ামাস।'—ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্ পৃ: ৩৫ এবং দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায় লিখিত ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত পৃ: ৬৮ ও ৯১)।

জয়রাম তর্কালঙ্কার পাবনা থেকে নবদ্বীপে এসে বাস করেন। তিনি পুঁটিয়া রাজবংশের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ষড়দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি অনেকগুলি টীকা রচনা করেন।

নবদ্বীপে স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রচর্চার ইতিহাসে প্রাচীনতম উল্লেখ্য উজ্জ্বল নাম শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি। তিনি পনের শতকে

নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত পুঁথি—তত্ত্বার্ণব (দায়, কৃত্য ও উদ্‌বাহ)। তাঁর পুঁথি নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে আছে।

১৬ শতকে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন স্মার্ত রঘুনন্দন। তাঁর সময়ে নবদ্বীপবিদ্যাসমাজে স্মৃতির প্রাধান্য ছিল। তাঁর রচিত পুঁথি অসংখ্য। তার মধ্যে 'অষ্টবিংশতি', 'রাসযাত্রাপদ্ধতি', 'সংকল্পচন্দ্রিকা', 'ত্রিপুষ্করাশান্তিতত্ত্ব', 'দ্বাদশযাত্রা প্রমাণতত্ত্ব' ও হরিস্মৃতিসুধাকর' প্রভৃতি স্মৃতিপুঁথি বিখ্যাত।

রঘুনন্দনের সমসাময়িক স্মার্ত হলেন রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। তিনি অনেকগুলি স্মৃতিটীকা রচনা করেন।

শান্তিপুরের চৈতলবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম নবদ্বীপে এসে স্মৃতি ও কাব্যে পণ্ডিত হন। তাঁর রচিত কাব্য: 'কৃষ্ণপদামৃত' এবং 'পদাঙ্কদূত'।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ছিলেন এই সময়ে নবদ্বীপের অন্যতম স্মৃতিশাস্ত্রকার। তাঁর রচিত পুঁথি: 'স্মৃতিপ্রদীপ', 'স্মৃতিসার-সংগ্রহ', 'সংকল্পদুর্গভঞ্জন' এবং 'ধর্মবিবেক'।

আমাদের দেশে বৌদ্ধদের অবসানের পর তন্ত্রের মত প্রচারিত হতে দেখা যায়। বৌদ্ধপ্রভাবে বৈদিক ধর্ম দূরে চলে গেল। তান্ত্রিকেরা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের আশ্রয় দিলেন। ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ড এবং বৌদ্ধদের জ্ঞানকাণ্ড মিলিত হয়ে তন্ত্রের মধ্যে নতুন রূপ ধারণ করল। (নবদ্বীপমহিমা, ২য় সং, পৃঃ ২০৩)। এইভাবে তন্ত্র সমধিক প্রচলিত হল এবং বাঙালী তান্ত্রিক শাস্ত্রকারদের অনেকে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসাধনে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস বিখ্যাত তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর রচিত পুঁথি: 'ষটচক্রভেদ', 'বামকেশ্বরতন্ত্র', 'শ্যামারহস্যতন্ত্র', 'শাক্তক্রমতন্ত্র', 'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী' এবং 'তত্ত্বচিন্তামণি'। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে তাঁর রচিত পুঁথি আছে।

লোকসমাজে খ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। চৈতন্যভাগবত অনুযায়ী তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিম্বদন্তী শোনা যায়। তিনি 'তন্ত্রসার' নামে সুবৃহৎ বিখ্যাত তন্ত্রপুঁথি রচনা করেন। এই পুঁথিতে তিনি বৈষ্ণব ও শাক্তদের দেবদেবী উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি এবং স্মার্তিক পূজাপদ্ধতি আলোচনা করেন। তিনিই এদেশে কার্তিকী অমাবস্যায় শ্যামাপূজাপদ্ধতি ও শ্যামামূর্তি প্রচলন করেন। তাঁর সময়ে নবদ্বীপ তথা নদীয়ায় শক্তিসাধনাও প্রবল ছিল। তিনি 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রপুঁথি রচনা করেন। তাঁর ভ্রাতা মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ গোপালের উপাসক এবং পণ্ডিত ছিলেন।

নদীয়ারাজ রাঘবের সময়ে উল্লায় (বীরনগরে) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বসবাস করতেন। রাজা তাঁদের প্রচুর ভূমি দান করে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহিত করেন। উলার বিখ্যাত স্মার্ত-পণ্ডিত রঘুনাথ সার্বভৌম দায়াধিকার সম্বন্ধে 'স্বত্বব্যবস্থার্ণব-সেতুবন্ধ', 'সিদ্ধান্তার্ণব' ও 'স্মার্তব্যবস্থার্ণব' প্রভৃতি পুঁথি রচনা করেন।

রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্র (১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ারাজ হন এবং 'কৃষ্ণনগর'-এর প্রতিষ্ঠাতা) বিবিধ পুরাণ থেকে সার সংকলন করে 'পুরাণাসার' নামে সুবৃহৎ পুঁথি রচনা করেন। নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে এই পুঁথি আছে। তিনি পণ্ডিতদের প্রচুর ভূমি দান করেছেন (নদীয়া কালেক্টারীর তায়দাদ নং ২৯৩৯২)। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে রাজা রুদ্রের সময়ে নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতগণ ঘটিভরা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পেতেন এবং তাঁর সময়ে (১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে) নবদ্বীপে ৪০০০ ছাত্র ও ৬০০ অধ্যাপক ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে বসেন ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন বিদ্যাসমাজের অন্যতমশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও ছিলেন বিদ্বানপণ্ডিত। তাঁকে ঘিরে ছিল এক বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীমণ্ডলী। তাঁরা হলেন নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, স্মার্তগোপাল ন্যায়পঞ্চানন, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়-পঞ্চানন, দার্শনিক শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্র তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং পুরাণবিদ গদাধর তর্কালঙ্কার। এছাড়া, তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতত্রয় শান্তিপুরের রাধামোহন বিদ্যা-বাচস্পতি, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে নানাভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পোষকতা করেছেন। মহারাজ কৃতবিদ্য পণ্ডিতদের রাজসভায় সংবর্ধিত করেছেন এবং প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। অনুরূপ একটি প্রশংসা-পত্র নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রামানন্দ বাচস্পতি 'আহ্নিকাচারবাজ', কৃষ্ণকান্ত বিদ্যা-বাগীশ 'জয়সিংহকল্পদ্রুম' এবং রামরুদ্র বিদ্যানিধি 'সারসংগ্রহ' পুঁথি রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশকে ১৯২ বিঘা ভূমি দান করেন (নদীয়া কালেকটারীর তায়দাদ নং ২৪১০)।

মহারাজ নবাব সরকারে প্রতি বৎসর একখানি করে পঞ্জিকা দিতেন এবং পরে ইংরেজরাজও মহারাজের পঞ্জিকা গ্রহণ করেন। এই পঞ্জিকা প্রণয়ন করতেন রামরুদ্র বিদ্যানিধি। পরবর্তীকালে নদীয়ার কালেক্টার নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের গণিত পঞ্জিকা গ্রহণ করতেন এবং তদনুযায়ী সারা বাংলার পর্বদিন উপলক্ষে সরকারী ছুটির তালিকা তৈরি হত। বিদ্যা-নিধির বংশধরেরাই পুরুষানুক্রমে নবদ্বীপপঞ্জিকার গণক ছিলেন। পরবর্তীকালে এই বংশের শেষ পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন।

নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাচীন কয়েকটি অখণ্ড পুঁথি আছে। শুভঙ্কর রচিত 'সঙ্গীতদামোদর' (তাল-পাতায়)-এর সম্পূর্ণ তিনখণ্ড এবং কবিরত্ন পুরুষোত্তমের 'সঙ্গীত নারায়ণ' পুঁথি উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন সপ্তমপুরুষ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি শান্তিপুর বিদ্যাসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নব্য-ন্যায় পুঁথি বহির্বঙ্গেও প্রচারিত ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ৮১ বিঘা ভূমি দান করেন (নদীয়া কালেক্টারীর তায়দাদ নং ৬২৭৭)। তাঁর পুঁথি: 'ভাগবত-তত্ত্বসার', 'তত্ত্বসংগ্রহ', 'ভক্তিরহস্য', 'কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব' 'তত্ত্বদীপিকা', 'কৃষ্ণতত্ত্বামৃত', 'কৃষ্ণভক্তিরসোদয়' ও 'তত্ত্ব সন্দর্ভটিপ্পনী' প্রভৃতি।

শান্তিপুরের সর্বানন্দী, বল্লভী, নপাড়ী, চৈতল, শোভাকর ও কাশ্যপ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বংশে বহু পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা হলেন: রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র তর্কবাগীশ, শিবচরণ বিদ্যাবাচস্পতি, রাধাচরণ ন্যায়পঞ্চানন, রামসুন্দর ন্যায়-বাচস্পতি এবং আরও অনেকে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে উলা (বীরনগরে) কৃষ্ণরাম ন্যায়-পঞ্চানন নামে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। ১২৬৩ সনের মড়কে বিদ্যাসমাজ বিলুপ্ত হয়।

চাকদহের অদূরে ভট্টাচার্য-কামালপুরে দুটি পণ্ডিত বংশ ছিলেন। একদা এই গ্রামে নাকি পাদুকাসহ প্রবেশ নিষেধ ছিল। তাতেই বোঝা যায় যে তখন এখানে সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতেরা বাস করতেন এবং তাঁদের সকলেই সম্মান করে চলত। এখানকার গাঙ্গুলীবংশের পণ্ডিতেরা হলেন বানগুপ্ত চতুর্ভুজ, রামভদ্র চক্রবর্তী, গোপীবল্লভ ন্যায়বাগীশ, মধুসূদন পঞ্চানন, মুকুন্দ ন্যায়ালঙ্কার, সিদ্ধেশ্বর সার্বভৌম ও রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। মধুসূদন নদীয়ারাজ রাঘবের দানভাজন ছিলেন (নদীয়া কালেক্টারীর তায়দাদ নং ৪৪৪৩)। তাঁর দুই পুত্র—বাসুদেব বিদ্যালঙ্কার এবং রঘুদেব বাচস্পতি। রঘুদেবের চতুষ্পাঠীর ছাত্র হলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৫২ সনে রঘুদেবকে চাকদহের বাগডোব (ভূমির পরিমাণ ৮১০ বিঘা) গ্রামটিই দান করেন।

অপর চট্টবংশের পণ্ডিত হলেন মহাদেব তর্কবাগীশ, বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি ও রূপনারায়ণ সার্বভৌম।

নদীয়ার বিল্বপুষ্করিণীর (বেলপুকুর) ঠাকুরবংশ পাণ্ডিত্যে খ্যাত। গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, পার্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি। বেলপুকুরে চতুষ্পাঠী ছিল।

নদীয়ার বিল্বগ্রামেও ছিল পণ্ডিতসমাজ। 'শিশুশিক্ষা', 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের (১৮১৭-১৮৫৮) এই গ্রামেরই এক পণ্ডিত বংশে জন্ম হয়।

নদীয়ার কাঁচকুলিতে ছিল পণ্ডিতসমাজ। এখানকার এক পণ্ডিতবংশে 'পদ্মাবলী', 'কাদম্বরী', 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা তারাশঙ্কর তর্করত্নের জন্ম হয়।

'বাংলাভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার' রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫) ছিলেন স্মার্তপণ্ডিত। সামাজিক বহু ব্যাপারে বিধান দিতেন। তাঁর জন্ম নদীয়ার পালপাড়ায়। তাঁর পিতা হলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলেন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরিহরানন্দ নাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত) ছিলেন রামমোহন রায়ের তান্ত্রিক গুরু এবং বন্ধু। অপর ভ্রাতা হলেন পণ্ডিত রামধন বিদ্যা-লঙ্কার। এছাড়া আরও অনেক পণ্ডিত বংশ পালপাড়ায় ছিল।

মহারাজ রুদ্র শান্তিপুরের অদূরে ১০৮ ঘর নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সংসারযাত্রা নির্বাহের উপযোগী ভূসম্পত্তি দান করে একটি আদর্শ ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামের নাম ব্রহ্মশাসন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরে তাঁর প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্র ছিলেন বিদ্যাসমাজের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ে ব্রহ্মশাসনের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন তর্কচূড়ামণি দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি প্রচার করেন এবং তন্ত্র থেকে পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন।

এই সময়ে নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রধান ছিলেন নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ।

গিরীশচন্দ্রের পরে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় নবদ্বীপ বিদ্যা-সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত-দের প্রধান ছিলেন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রামলোচন ন্যায়ভূষণ ও রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। রামনাথ ১৮ শতকের শেষভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বুনো রামনাথ' নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর সম্পর্কেও অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতেই পরে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়।

রামনাথের ছাত্র ধর্মদহ-বহিরগাছি নিবাসী কৃষ্ণানন্দ বিদ্যা-বাচস্পতি। অন্তর্ব্যাকরণ নাট্যপরিশিষ্ট' রচনা করেন।

এই সময়ের কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ছিলেন ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী। তিনি রচনা করেন: 'পদার্থ-তত্ত্বটীকা', 'দায়ভাগটীকা', 'গৌতমসূত্রটীক', 'চিন্তামণিটীকা' 'তন্ত্ররত্নাবলী', 'চৈতন্যচিন্তামৃত', 'ন্যায়রত্নাবলী' এবং আরও অনেক গ্রন্থ।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগর কলেজ এবং কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়।

ইংরেজ শাসনকালে নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চা হ্রাস পেতে থাকে। প্রথমদিকে সরকারী কাজে চাকরিতে ফারশী শিখতে হত। ফলে ফারশীচর্চাও তখন নদীয়ায় হয়। পরে আসে ইংরেজি। ইংরেজদের মধ্যে নবদ্বীপে এসে মিশনারী কেরী সাহেব স্যার উইলিয়াম জোনস এবং এইচ. এইচ. উইলসন সংস্কৃতচর্চা করেছেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত ইংরেজ সরকার নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজকে অর্থবৃত্তি দিতেন। সরকার খ্যাতনামা পণ্ডিতদের 'মহামহোপাধ্যায়' সম্মানসূচক উপাধি দিতেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্যটক ভোলানাথ চন্দ্র নবদ্বীপে নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণিকে প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং তাঁর চতুষ্পাঠীতে বহির্বঙ্গের ছাত্রও দেখেন।

এই সময় যশোহর থেকে নবদ্বীপে এসে প্রখ্যাত নৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি 'কাব্য-মালাখ্যটীকা' ও 'সুবোধাটীকা' প্রভৃতি রচনা করেন।

পণ্ডিত গোলকনাথ ন্যায়রত্ন ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজন্যের সম্মানলাভ করেন। তাঁর পুঁথি নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে আছে।

হরমোহন চূড়ামণি 'সামান্য লক্ষণা ব্যাখ্যা' পুঁথি রচনা করেন। প্রসন্ন তর্করত্নের চতুষ্পাঠীতে বহির্বঙ্গ থেকে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসতেন বিদ্যার্থীরা। তাঁর টোল আজও নবদ্বীপে 'পাকাটোল' নামে পরিচিত।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ন্যায়ের প্রধান পদ লাভ করেন। তাঁর পরে নৈয়ায়িক প্রধান হন মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন।

মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্বভৌম বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। তাঁর পরে নৈয়ায়িক প্রধান হন মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। তাঁর চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করেন (৩০-৮-১৯১৫) বাংলার প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল।

মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ প্রথমে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর টোলে অধ্যাপনা করতেন, পরে নবদ্বীপে পাকাটোলের প্রধান হন। তিনি ন্যায়দর্শনের কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেন।

মহামহোপাধ্যায় সীতারাম ন্যায়াচার্য শিরোমণি বর্ধমান থেকে নবদ্বীপে আসেন। তিনি বহুভাষাবিদ্‌ও ছিলেন। তিনি বনের মধ্যে নিভৃতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বিদ্যাচর্চা করতেন বলে তাঁর চতুষ্পাঠীর নাম ছিল 'আরণ্যচতুষ্পাঠী'। সারা-ভারত থেকে ছাত্র এসে তাঁর টোলে পড়তেন। তিনি রবীন্দ্র-নাথের গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদ করেন।

মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ নৈয়ায়িক-প্রধান হয়েছিলেন।

ইংরেজ শাসনকালের স্মার্ত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হন।

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন রচনা করেন 'নির্ণয়', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সম্বন্ধ', 'শুদ্ধি', 'উদ্বাহ', 'আচার', 'বিচার', 'অধিকার' ও 'দুর্গোৎসব' প্রভৃতি গ্রন্থ।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন ইংরেজ সরকারের আদেশে 'হিন্দু আইন' সঙ্কলন করেন।

স্মার্ত রামানন্দ বাচস্পতি রচনা করেন 'কৃত্যরাজ', 'সমাহিত-রাজ', ও 'আহ্নিকাচাররাজ'। তাঁর পুঁথি নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে আছে।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ 'রথপদ্ধতি' রচনা করেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর পরে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি স্মৃতির প্রধান পদ পান।

মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, কাশীনাথ শাস্ত্রী, শিবগোবিন্দ ভারতী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সময়ে স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর। তাঁর রচিত শ্লোকাবলী লোকমুখে-মুখে প্রচারিত। সেগুলি আজও সংকলিত হয়নি। নবদ্বীপে তাঁর টোলের নাম ছিল 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'। তাঁর রচিত গ্রন্থ: 'চৈতন্য-শতক', 'অমরার্থচন্দ্রিকা', 'বকদূত' প্রভৃতি। 'বিশ্বদূত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করতেন। কৃষ্ণ-নগরে তাঁর পৌত্র শ্রীদ্বীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে তাঁর কাছে তাঁর পিতামহের সংগৃহীত শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের হস্তাক্ষর সম্বলিত পুঁথি এবং মৈথিলী ভাষায় লিখিত মহাভারত পুঁথি আছে।

ইংরেজশাসনে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠীর চিত্র: 'In 1829 Professor Wilson found between 500 and 600 pupils standing at the tols'.

তখন টোল ছিল:

বৎসর	টোল	ছাত্র
১৮৬৪	১২	১৫০
১৮৮১	২০	১০০
১৯০১	৪০	২৭৪
১৯০৮	৩০	২৫০

নবদ্বীপে শিক্ষার প্রচলিত ধারা সম্পর্কে পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ লিখিছেন: 'ছাত্রগণ কোন-না-কোন অধ্যাপকেরই অন্তেবাসী হয়ে থাকত এবং অধ্যাপকগৃহেই অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালিত হত। ছাত্রগণ এতে শুধু যে পাঠ্য বিষয়েই ব্যুৎ-পত্তিলাভ করত তা নয়, নিত্যনিয়ত অধ্যাপকের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের ঋষিবৎ পবিত্র জীবনের আদর্শে নিজেদেরই আদর্শ জীবন গঠন করবার সৌভাগ্যলাভ করত। ছাত্রগণ শুধু গ্রন্থপাঠই করত না, সন্ধ্যাবন্দনা-পূজা-হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা সংযম ও শিষ্টাচার শিক্ষার আদর্শস্থানীয় হতে পারত। কোন ছাত্রের চারিত্রিক দুর্বলতা আদৌ উপেক্ষিত হত না—সকল ছাত্র সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়ে তাকে সংশোধন করে দিত। ছাত্র যত বুদ্ধিমানই হোক, ধর্মপরায়ণ না হলে তার সমাদর হত না। অধ্যাপকগণ দূর-দূরান্তরে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্ডিতসভায় গমনকালে ছাত্রগণকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার হত, ছাত্রগণ তা অনুধাবন করত, তর্কপদ্ধতি আয়ত্ত করতে অনেক সময় তারাও বিচারে অংশ-গ্রহণ করত। ফলে অধীতব্য বিষয়ে তারা যেভাবে ব্যুৎপন্ন হবার সুযোগ পেত, বর্তমানকালের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-পদ্ধতিতেই ছাত্রেরা সে সুযোগ পায় না। পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়েও নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে শিক্ষাসমাপ্তির কোন নির্দিষ্ট কাল ছিল না। যে ছাত্র যতদিন ইচ্ছা গুরুগৃহে অবস্থানপূর্বক শিক্ষালাভ করতে পারত। গৃহাশ্রমে ফিরে যখন নিজস্ব চতুষ্পাঠী স্থাপনে তার আগ্রহ জন্মাত, তখনি নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিদগ্ধজননীর পুণ্যপাদপীঠে অধ্যাপক সমবেত হলে ছাত্রকে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হত। পরীক্ষার প্রশ্ন পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকত না। সমবেত অধ্যাপকগণ

সমক্ষে শলাকাবেধ প্রণালীতে যে কোন প্রশ্ন যে কোন পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করতেন। ছাত্রের ব্যুৎপত্তি দর্শনে প্রীত হয়ে অধ্যাপক-মণ্ডলী তাকে শাস্ত্রজ্ঞানানুরূপ উপাধিদান করতেন। পরীক্ষার্থীর সমক্ষে পরীক্ষিতব্য বিষয়ের পুঁথিটি একটি শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা হলে শলাকার অগ্রভাগ যে পৃষ্ঠাকে স্পর্শ করত সে পৃষ্ঠা থেকেই প্রশ্ন করা হত, এইভাবে বারবারই বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হত। সময় কোন নির্দিষ্ট থাকত না, পরীক্ষকেরা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পরীক্ষা দিতে হত।'

নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গবিবুধ জননীসভা নাম যুক্ত। ১২৯২ সনে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'সংস্কৃত বিদ্যাবিবর্ধিনী বিদগ্ধ জননীসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার উন্নতি এবং বিদ্যার্থীদের উৎসাহদানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা থেকে বিবিধশাস্ত্রে পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং উপযুক্তদের রত্ন সম্বলিত উপাধি ও পদকাদি দেওয়া হয়। প্রথম সভাপতি হন পাইকপাড়াধিপতি রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতি হন নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। এই সময়ে সভার নাম পরিবর্তিত হয়— 'বঙ্গবিবুধ জননীসভা'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সালে এই সভার সভাপতি ছিলেন। এই সভা বহু জ্ঞানীগুনী বিদ্বানকে উপাধিদান করে সম্মানিত করে থাকে। এই সভা ১৯৩৫ সালে পুরাতন পাকাটোলের গৃহাদি ক্রয় করে সেইস্থানে 'সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ' স্থাপন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এই সভার প্রাক্তন সভাপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় নবদ্বীপে সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এই সভা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১৯৭১ সালে ভারত সরকার এই সভার সভাপতি পণ্ডিত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থকে সম্মানিত করেন।

রাজা-জমিদার এবং বিত্তবানেরা নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজকে পোষকতা করতেন কিন্তু সাধারণ মানুষেরও এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা ছিল। মানুষের মূল্যবোধে তখন ফাটল ধরেনি। মানুষ আন্তরিকভাবেই তখন পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, মান্য করে চলত এবং স্মরণে রাখত কৃতজ্ঞচিত্তে। পণ্ডিতের পঠনপাঠনে যাতে কোন রকম বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য সাধারণ মানুষেরা ছিল সচেতন। পণ্ডিতেরা তাই একমনে বিদ্যাচর্চা করতে পারতেন।

নদীয়ায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক খ্রীষ্টিয় ধর্মপ্রচারক ডিয়ার সাহেব।

'In 1832, a Mr. deerr, who was then staitioned at Kalna, in Burdwan District, went to Krishnagar for a change of air, and, while there, opened two schools in the town of Nabadwip and at Krishnagar itself'.

নবদ্বীপে মিশনারি সাহেবদের কাছে সর্বপ্রথম প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য। পরে তিনি নবদ্বীপে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছোটদের ইংরেজিশিক্ষা দিতেন।

তখনকার বাংলার মিশনারিদের প্রধান রেভারেণ্ট হ্যাসেলের প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর। তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চাপড়ায় ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সময় নবদ্বীপেও ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। হ্যাসেলের পরে রেভারেন্ট মেলিন এবং রেভারেন্ট শোর এই ইংরেজি বিদ্যালয়-গুলি পরিচালনা করেন।

কৃষ্ণনগরে ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্তক হলেন রামতনু লাহিড়ীর অনুজ ডেভিড হেয়ারের ছাত্র শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগরে নিজগৃহে একটি ইংরেজিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজেই ইংরেজিশিক্ষা দিতেন। পরে তাঁর বিদ্যালয়টি কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে পরিণত হয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত।

১ জানুয়ারি ১৮৪৬ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ক্যাপটেন ডি. এল. রিচারডসন। নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রামতনু লাহিড়ী এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন অধ্যাপক। এনট্রান্স পাশ করে তখন কলেজে ভর্তি হতে হত। মাসিক বেতন ছিল ৫-০০ টাকা। একশো বিঘা জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত। মূল কলেজ দালান তিন বিঘা জমিতে। ১৮৫৬ সালে ৬৬,৮৭৬.০০ টাকা ব্যয়ে দালান নির্মিত হয়। এর মধ্যে বেসরকারী দানের পরিমাণ ১৭,০০০.০০ টাকা। ১৯০৯ সালে কলেজের ছাত্র ছিল ১২৪ জন এবং ১ জন প্রিন্সিপ্যাল, ৫ জন প্রফেসর ও ৪ জন লেকচারার ছিলেন।

স্যার রোপার লেথব্রীজ লিখেছেন: 'In those days Krishnagar was the chief city in Bengal, and the principal seat of learning and civilisation.........'

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর চারচ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে সেন্ট জনস স্কুল স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩ সালে কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল স্থাপন করেন।

নদীয়া বিদ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত হলেও সাক্ষরতার হার কম ছিল। ১৮৭২ সালের প্রথম জনগণনায় দেখা যায় যে শতকরা ২.৪ জন লেখাপড়া জানেন। ১৮৫৬-৫৭ সালে জেলায় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত মাত্র ১৯টি বিদ্যালয় ছিল। ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৮৬৫ জন। ১৮৭১ সালে সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৫২টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯,১২০ জন। ঐ বছরে বেসরকারী বিদ্যালয় ছিল ২৫৫ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,৪০৬ জন। সাক্ষরতার হার: ১৮৮১ সালে শতকরা ৫.৫ (পুরুষ), ১৮৯১ সালে শতকরা ৭.১ (পুরুষ) এবং ১৯০১ সালে শতকরা ১০.৪ (পুরুষ) জন।

১৯০৮-০৯ সালে মোট বিদ্যালয় ছিল ১১৭৫ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪১,৫০৫ জন। এর মধ্যে ৪৬টি পৌরসভা, ৭৩৮টি জেলাবোর্ড

এবং চারচ মিশনারি সোসাইটি ১টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (ছাত্র-২১৬), ৪টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় (ছাত্র-৫১৭) এবং ৪১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্র ২,০৫২) পরিচালনা করতেন।

১৮৭১-৭২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২২৯টি এবং বালিকা বিদ্যালয় ছিল ২১টি।

১৮৯১ সালেব জনগণনা অনুযায়ী নদীয়ার শিক্ষাচিত্র :

	সংখ্যা			শতাংশ		
	ছাত্র	সাক্ষর	নিরক্ষর	ছাত্র	সাক্ষর	নিরক্ষর
পুরুষ	১৯,৬৯৯	৫৬,৮৪৩	৭২৫,৬০৫	২.২০	৭.০৮	৯০.৭২
মহিলা	৯৮৬	৩,৬৫৮	৮৩৭,৩১৭	.০১	.৫০	৯৯.৪৯

আর একটি শিক্ষাচিত্র দেওয়া হল :

		১৯১১-১২	১৯২০-২১
মোট	বিদ্যালয়	১,২৭৩	১,৩৩৭
	ছাত্র	৪১,১৮৮	৪৪,২৭১
উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়	বিদ্যায়	২৬	৩৫
	ছাত্র	৫,৮৬১	৭,২০৩
মধ্য ইংবেজি বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	৫২	৫৮
	ছাত্র	৪,৪৬৪	৪,৮৭৭
মধ্য মাতৃভাষা বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	১৪	৪
	ছাত্র	১,০৭৯	২৬৮
উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	১৪৪	১২৪
	ছাত্র	৭,১৪৬	৫,৫১২
নিম্নতর প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	৯৪৪	১,০৬১
	ছাত্র	২৮,৫৯১	২৫,৪৬৯
শিক্ষণ বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	১২	১০
	ছাত্র	১৮৭	১৭০
অন্যান্য বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	৬৬	৩৮
	ছাত্র	১,৩৪১	৫১৯
কোরাণ বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	৩	--
	ছাত্র	৩৭	--
বিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে বালকদের আনুপাতিক শতকরা হার	বালক	৩৫.৩	৩০.৪
বিদ্যালয়গামী ছাত্রীদের মধ্যে বালিকাদের আনুপাতিক শতকরা হার	বালিকা	৫.০৫	৫-৯০

১৯২১ সালের নদীয়া জেলার সাক্ষরতা চিত্র :

	মোট সাক্ষর	পুরুষ	মহিলা
হিন্দু	৭৩,১১৫	৬০,৭৯৫	১২,৩২০
মুসলমান	২১,৭৭৬	১৯,৮৩৬	১,৯৪০

সাক্ষরতার হার (শতাংশে) :

হিন্দু	১২.৫	২৫.৪	৪.৩
মুসলমান	২.৪	৪.৩	.৪

ইংরেজি সাক্ষর :

হিন্দু	২০,২৩৫	১৯,৫৩১	৬৫৪
মুসলমান	২,৭৬২	২,৫৮২	১৮০

নদীয়ার সাক্ষরতার কালানুক্রমিক চিত্র :

সাক্ষরতার হার :

বৎসর	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯০১	১২.০৮	২২.৪৩	১.৮৭
১৯১১	১১.৭২	২০,৫৫	২.৮৫
১৯২১	১৩.৫৪	২২.৩৫	৪.৩১
১৯৩১	১২.৪৯	১৯ ৮৫	৪.৭৪
১৯৪১	২০.৩২	৩০.২৪	৯.৮৩
১৯৫১	১৫.৩১	১৮.১৬	১২.২৩
১৯৬১	২৭.২৫	৩৫.৭৮	১৮.২৪
১৯৭১	৩১.৩১	৩৯ ২৮	২২ ৯২

		মোট	পুরুষ	মহিলা
	মোট	৬,৯৮,৩৪১	৪,৪২,১১৭	২,৫৬,২২৪
১৯৭১	গ্রাম	৪,৫৪,৪৩১	২,৯৯,২৩৪	১,৫৫,১১৭
	শহর	২,৪৩,৯১০	১,৪২,৮৮৪	১,০১,০২৭

১৯৬১ সালের জনগণনায় সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গ্রামে নদীয়ার স্থান ৬ষ্ঠ এবং শহরে ৩য়।

প্রাথমিক শিক্ষা

স্বাধীনতার পর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে নদীয়ায় ৮০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭৩,১৭৪ জন ছাত্র ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে নদীয়ায় ১৩৯৩ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৫৩০৭৭ জন ছাত্র ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে ৮১টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও তার ছাত্রসংখ্যা ৮,৯৪৮ জন ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা — ২৪,৩০৫ জন) সরকার সরাসরি পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন পৌরসভা ও নদীয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ ১১২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১১০৬১০

ছাত্র সংখ্যা) পরিচালনা করেন। এই জেলায় সরকারী সাহায্য অপ্রাপ্ত অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা যায় যে জেলার ৫-১৪ বছর বয়স্কদের মোট সংখ্যার বালক ৩৫-৫৮ শতাংশ এবং বালিকা ২৯.১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে পড়ে।

নদীয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ (District School Board, Nadia) গঠিত হয় Bengal Rural Primary Education Act, 1930 অনুযায়ী এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ সুরু হয় ১ মার্চ ১৯৩৫ থেকে। তখন জেলাশাসক সভাপতি থাকতেন এবং সম্পাদক থাকতেন জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক। জেলার সমগ্র গ্রামাঞ্চলের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা পর্ষৎ করে থাকে। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম বেসরকারী ব্যক্তি পর্ষৎ-এর সভাপতি হন স্বর্গত জননেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে গ্রাম-নদীয়ায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। এখন পর্ষৎ-এর সদস্য নেই, একমাত্র কার্য-নির্বাহক হলেন জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (প্রাথমিক)। তবে পর্ষৎ-এর উপদেষ্টা সমিতি আছে—জেলাশাসক সভাপতি এবং জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (প্রাথমিক) সম্পাদক। উপদেষ্টা সমিতির সদস্যসংখ্যা—২১ জন, এঁরা সরকার কর্তৃক মনোনীত। নদীয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ-এর আয়ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র .

আর্থিক বছর	আয়	ব্যয়
১৯৬৫-৬৬	৬৩,৬৯,০১৮.১৩ টাকা	৮৮,১২,৩৪০.০৫ টাকা
১৯৬৯-৭০	১,১৪,১৯,২৬৩.৯৪ টাকা	১,১৭,৭৫,৮৮৩.২৭ টাকা
১৯৭০-৭১	১,৪২,৬৭,০১০.৮৭ টাকা	১,২৪,৪৩,২৪২.৯৯ টাকা
১৯৭১-৭২	১,৬৩,৯৩,৩৭৩.১৯ টাকা	১,২৯,০৪,৫৮৭.৩৯ টাকা

নদীয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকশিক্ষিকাদের বুনিয়াদী শিক্ষণের জন্য বড় আন্দুলিয়া, ধর্মদা এবং বড়জাগুলীতে 'জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' আছে, মোট আসন সংখ্যা ৪৫০টি। কৃষ্ণনগরে আছে শিক্ষিকাদের জন্য 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহিলা শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়'। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষণের জন্য জেলায় ৪টি পি. টি. স্কুল আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা :

স্বাধীনতার পর নদীয়া জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে। ১৯৫১-৫২ সালে জেলায় মাত্র ৬০টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ছাত্রসংখ্যা ১৯,৭২১ জন ছিল। ১৯৬১ সালে জেলায় উচ্চ বিদ্যালয় (উচ্চতর মাধ্যমিক সহ) ছিল ৯৮ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪১,১৭২ জন। এর মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় ৬২ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক ৩৬। ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ২৫,২৪৭ এবং ১৫,৯২৫ জন। এর মধ্যে কৃষ্ণনগরের সম্পূর্ণ সরকার পরিচালিত দুটি উচ্চতর বিদ্যালয় (কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল এবং কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়) ধরা হয়েছে। জেলায় বালিকা বিদ্যালয়ের (উচ্চ ও উচ্চতর) সংখ্যা ৩১। ১৯৬১ সালে জেলায় ১১৭টি নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় ছিল, এই সংখ্যা ১৯৫১-৫২তে ছিল মাত্র ৪৫টি। ছাত্রসংখ্যা হল — ১৯৬১তে ১১,৭৬৪ জন এবং ১৯৫১-৫২তে ৪,৬২৯ জন। এখন নদীয়া জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য আছেন নদীয়া জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, মাধ্যমিক শিক্ষা।

নদীয়া জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য কল্যাণী ও শিমুরালীতে একটি করে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে।

নদীয়া জেলার নিম্নলিখিত উচ্চ (ও উচ্চতর মাধ্যমিক) বিদ্যালয় শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে :

	বিদ্যালয়	প্রতিষ্ঠাকাল
১।	কৃষ্ণনগর সি, এম, এস, স্কুল	১৮৩৪
২।	হাটচাপড়া কে, ই, হাইস্কুল	১৮৪১
৩।	কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুল	১৮৪৯
৪।	রাণাঘাট পালচৌধুরী স্কুল	১৮৫৩
৫।	শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল	১৮৫৬
৬।	মুড়াগাছা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮৬০
৭।	সূত্রাগড় মহারাজ নদীয়া হাইস্কুল	১৮৬৯
৮।	নবদ্বীপ তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়	১৮৭০
৯।	কৃষ্ণনগর দেবনাথ স্কুল	১৮৭৩
১০।	নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল	১৮৭৩

কলেজ শিক্ষা :

জেলায় ১০টি মহাবিদ্যালয় আছে। কৃষ্ণনগর কলেজ শতবর্ষের প্রাচীনতায় এবং ঐতিহ্যে খ্যাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নবদ্বীপে বিদ্যাসাগর কলেজের শাখা স্থাপিত হয়। অন্যান্য কলেজগুলির মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনতার পরে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে জেলায় মাত্র ৪টি কলেজ ছিল এবং তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০৮৩ জন। ১৯৬০-৬১তে ছাত্রসংখ্যা ৩৫৩৭ জন। নদীয়ার সব কলেজই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা :

নদীয়ার কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কল্যাণীর সমগ্র 'সি' ব্লক ও আরও এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। মোট জমির পরিমাণ ৮৩২ একর। এখানে সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ভবন ও ছাত্রাবাস ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্বে আবাসিক ছিল। এখানে কৃষি, কলা ও বিজ্ঞান পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সংযুক্ত কৃষিখামারও আছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম :

কৃষি বিভাগ :

১। বি, এস, সি (কৃষি) অনারস।

২। এম, এস্‌সি (কৃষি)—
- (ক) এ্যাগ্রনমি
- (খ) এগ্রিকালচারাল্ ইক্‌নমিকস্
- (গ) এগ্রিকালচারাল্ ইনজিনিয়ারিং
- (ঘ) এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন
- (ঙ) এনিম্যাল হাসবানড্রি
- (চ) এনটমোলজি
- (ছ) জেনেটিক্স এবং প্লান্ট ব্রিডিং
- (জ) হরটিকালচার
- (ঝ) প্লান্ট প্যাথলজি
- (ঞ) সয়েল সায়েন্স এবং এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি

কলা বিভাগ :

১। বি, এ, (অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং ইংরেজি) অনারস্
২। বি, টি, বি, এড (ফিজিক্যাল এডুকেশন)
৩। এম, এ, (অর্থনীতি, ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষা)

বিজ্ঞান বিভাগ :

১। বি, এসসি (রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, অঙ্ক শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা ও জীববিজ্ঞান) অনারস।
২। এম, এসসি (রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, অঙ্ক শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা ও জীববিজ্ঞান)।

এছাড়া এখানে কৃষি, কলা ও বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণায় Ph.D. দেওয়া হয়। কৃষিবিভাগে অনেকগুলি কৃষিখামার আছে, এখানে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকদহ ও কাঁচড়াপাড়ার ডিগ্রী কলেজ এবং শিমুরালীর বি, টি, কলেজ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন (affiliated)।

হিন্দী শিক্ষা :

দেশ স্বাধীন হবার পর নদীয়ায় হিন্দীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে কৃষ্ণনগরে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়, পরে পূর্ণ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এখন জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৬টি হিন্দীভাষা শিক্ষাকেন্দ্র আছে। প্রতি বছর এই জেলা থেকে শতাধিক ব্যক্তি প্রাথমিক, প্রারম্ভিক, প্রবেশ, পরিচয়, কোবিদ ও রত্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। ১৯৬৭ সালে কৃষ্ণনগরে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচারক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজ-শিক্ষা :

দেশ স্বাধীন হবার পর জেলায় সমাজ শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ ঘটেছে। সারা জেলায় ছড়িয়ে আছে নৈশবিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার। এছাড়া, কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে সরকার ও জনসাধারণের অর্থে নির্মিত হয়েছে সুরম্য মঞ্চগৃহ। কবি, তরজা ও কীর্তন গায়কেরা এবং নাটকাভিনয় সংস্থাকে সরকার আর্থিক সাহায্য করে থাকেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে নৃত্যসংগীতাঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। জেলার ১৪টি ব্লকে একটি করে শিশু উদ্যান আছে। বয়স্কদের মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্য জেলায় দুটি বিদ্যালয় আছে। ফুলিয়ায় ৩৮০০০-০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে কবি কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কম্যুনিটি হল। জেলায় একজন জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক আছেন।

সমাজ-কল্যাণ :

১৫ই আগস্ট ১৯৫৮ নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানায় পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষৎ-এর অধীনে নাকাশিপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতি গঠিত হয়। এই থানার দশটি কেন্দ্রে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ সুরু হয়।

এখন বিভিন্ন উন্নয়ণ ব্লকে মুখ্য সেবিকাদের তত্ত্বাবধানে সমাজকল্যাণমূলক কাজ হয়ে থাকে।

কারিগরী-শিক্ষা :

কৃষ্ণনগরে কারিগরী শিক্ষণের জন্য বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজি আছে, এখান থেকে সিভিল-মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকালে ডিপলোমা দেওয়া হয়। এ-ছাড়াও আছে নিম্নতর কারিগরী বিদ্যালয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের তাঁত, সূচী, এমব্রডারী প্রভৃতি শেখাবার জন্য কারিগরী বিদ্যালয় তথা উৎপাদনকেন্দ্র আছে।

পরিশিষ্ট ক
জেলার বিশিষ্ট গ্রন্থাগার পরিচিতি
কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী :

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী গ্রন্থাগার-গুলির মধ্যে প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া জেলার শিক্ষা-সংস্কৃতির মননকেন্দ্র। উনিশ শতকের নবজাগরণের কালে ১৮৫৬ সালে তৎকালীন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হজসন প্র্যাট আই- সি- এস, কৃষ্ণ-নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজহলে জেলাবাসীর এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন নদীয়া জেলার মুখ্য আমীন রামলোচন ঘোষ। নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় উলার জমিদার-বাবুরা, রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুরা, নাটুদহের প্রাণকৃষ্ণ পাল, শিবনিবাসের বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতেই এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা, রামলোচন ঘোষ, তৎপুত্র মনমোহন ঘোষ ও জেলা শাসক যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন। সভায় দশ হাজার টাকা ওঠে। মহারাজা গ্রন্থাগারের জন্য জমি দান করেন। ১৮৫৯ সালে বর্তমান গৃহ নির্মিত হয়। প্রথম গ্রন্থাগারিক দীননাথ পাল। ১৮৬৬ সালে সম্পাদক হন যদুনাথ

রায়। তাঁর সময়ে এখানে দাতব্য বিদ্যালয় (গোবিন্দ সড়ক বিদ্যালয়) বসে। পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই গৃহ পরিত্যাগ করতে চান না। ফলে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সাময়িক-ভাবে বন্ধ থাকে। ১০ আগস্ট, ১৮৯২ কৃষ্ণনগর কলেজহলে আবার নদীয়াবাসীব সাধারণ সভা হয়। মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র, মনমোহন ঘোষ, জেলাশাসক, জেলা জজ ও ডবলিউ বিলীং (কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ), প্রসন্নকুমার বসু, রামগোপাল চেৎলাঙ্গিয়া ও আরও অনেকের সহৃদয় প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি ১৮৯৬ সালে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং গ্রন্থাগার আবার নবরূপে চলতে থাকে। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাঁদের আগ্রহে ও সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রন্থাগারটি উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হয়ে ওঠে। শুধু গ্রন্থ পাঠই নয়, খেলাধূলা-শরীরচর্চারও আয়োজন হয়।

দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আসে গ্রন্থাগারেও। গ্রন্থাগার বিপন্ন হয়। গ্রন্থাগারের তৎকালীন পরিচালক ও কর্মীদের অনেকে হন কারারুদ্ধ। গ্রন্থাগাবেব উপর পতিত হয় রাজরোষ। ফলে বহু মূল্যবান গ্রন্থের হয় বহ্নি উৎসব। শোনা যায় যে, কয়েকজন অসামাজিক মানুষ এ সময় গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকগুলির নাকি বিলুপ্তি ঘটায়। দেশ স্বাধীন হবার পর কিশোর বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে বর্তমান সমাজের চাহিদার যোগ্য প্রয়োজনেব উপযুক্ত কবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারের উল্লেখ্য পবিচালনায় ছিলেন চুনীলাল বায়, সত্যপ্রসন্ন মজুমদার, মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ সান্যাল, ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী, সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তকুমার মিত্র, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন বসু, শিবরাম গুপ্ত ও আরও অনেকে।

বর্তমান সভ্য-সভ্যাসংখ্যা

সাধারণ বিভাগ--সভ্য-৪৫০+সভ্যা-১৩৮ = মোট ৫৮৮ জন।
কিশোর বিভাগ--সভ্য-২৪৪+সভ্যা-৫৭ = মোট ৩০১ জন।

বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা

কিশোর বিভাগ--২২৩৭
সাধারণ বিভাগ--

বাংলা

উপন্যাস--৪১৮৬ সাহিত্য--৮১৮, ইতিহাস--১৭৩, ভ্রমণ --২৬৭, কাব্য--৩৫২, নাটক--৩৩৭, ধর্ম ও দর্শন--২৯২, জীবনী--৩৯০, বিবিধ--৮৮৪, অভিধান--৪০, চারুকলা--৭০, সংস্কৃত গ্রন্থ--২৫, মোট--৭৮২৯ (পত্র-পত্রিকা বাদে)।

ইংরেজি

উপন্যাস--২১৪৫, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি--১৫১, ধর্ম--৬৯, ভ্রমণ--৩৮, দর্শন--২৯, জীবনী--১৭৭, সাহিত্য--৪০২, বিবিধ--৪৪০, ইতিহাস--৩৫৫, মোট--৩৮০৬ (পত্র-পত্রিকা বাদে)।

--বার্ষিক বিবরণী ১৯৭২।

নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার:

নবদ্বীপ তথা নদীয়ার গৌরব নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে নাম হয় 'সপ্তম এডোয়ারড এ্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী'। পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের টোল বাড়িতে লাইব্রেরীগৃহ পরে নির্মিত হয়। নদীয়া রাজবাড়ি থেকে এখানে শতসহস্র দুর্লভ পুঁথি আনা হয়েছিল ম. ম. অজিতনাথ ন্যায়রত্নের প্রচেষ্টায়। ভারতের অন্য গ্রন্থাগারে এত পুঁথি নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর গ্রন্থা-গারটি 'টাউন লাইব্রেরী' হয়েছে এবং নতুন নাম হয়েছে নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার। এই পাঠাগারের উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে নবদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কয়েকখানি পুঁথির চিত্রিত কাষ্ঠাবরণ (পাটা) আছে। এছাড়া, অনেক প্রাচীন পুঁথির সুন্দর হস্তাক্ষরও দেখবার মতো। সমগ্র পুঁথিশালা আমাদেব প্রাচীন বিদ্যা-সমাজের প্রামাণ্য দলিল।

রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী:

রাণাঘাট শহরে ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত স্টুডেন্টস লাইব্রেরী পরবর্তীকালে নাম হয় রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী। ১৯০২ সালে পঞ্জীভুক্ত হয়। গ্রন্থাগার গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন জমিদার বরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ১৯০২ সালে। এখানে বই আছে ১২৫০০ (পত্রপত্রিকা সমেত)। আলাদা শিশু ও মহিলা বিভাগ আছে।

বাদকুল্লা রাণীভবাণী পাঠাগার:

বাদকুল্লায় ১৯৪৮ সালে নাটোর থেকে আনীত এই পাঠাগারটি স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সান্যালের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। বর্তমান পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১৫০০, সভ্য সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। পাঠা-গারটি স্থানীয় উদ্বাস্তুদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল।

উলা সাধারণ পাঠাগার:

বীরনগরের উলা সাধারণ পাঠাগার একটি বিশিষ্ট পাঠাগার। বর্তমানে এরিয়া লাইব্রেরী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব সাহায্যপুষ্ট। সহস্রাধিক পুস্তক আছে। সম্পাদক শ্রীতড়িৎ-কুমার বিশ্বাস।

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার:

নবদ্বীপের আদর্শ পাঠাগার একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৩৫৮ সালে স্থাপিত। এখানে পাঠ্যপুস্তক সর-বরাহ করেও ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা হয়। বর্তমান

সম্পাদক শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সাহা। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর সহযোগিতায় পাঠাগারটির উন্নতি হয়েছে।

শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ :

১ চৈত্র ১৩২১ সালে শান্তিপুরের আশানন্দ পল্লীতে প্রভাস রায়ের উদ্যোগে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হয়। প্রথমে নাম ছিল হরিহর লাইব্রেরী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ও উৎকর্ষবিধান এবং লোকশিক্ষা প্রচারে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ কাজ সুরু করে। নয় হাজার মূল্যে পরিষদের নিজস্ব ভবন কেনা হয়। পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জলধর সেন, সরলা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায় ও কালিদাস রায় প্রভৃতি। 'সাহিত্য বার্ষিকী' ও 'শান্তিপুর' দুটি সাহিত্যপত্রও প্রকাশিত হয় পরিষদের উদ্যোগে। পরিষদের সংগ্রহশালায় তিনশো প্রাচীন পুঁথি, নানা ঐতিহাসিক উপাদান, পুরাকীর্তি পড়ে আছে গবেষণার অপেক্ষায়। বহু পুরানো দিনের পঞ্জিকা, স্থানীয় প্রাচীন লেখকদের চিত্র ও পাণ্ডুলিপিও আছে। পরিষদের উদ্যোগেই দীর্ঘদিন ধরে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ :

শান্তিপুরে ১৩১৬ সালে "বালক সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। বালক মনের উৎকর্ষ বিধানই ছিল বালক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য। জ্ঞানানুসন্ধান ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে "ধর্মপুস্তকাগার" নামে এক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল। পুরাণ বিষয়ে তিনটি পরীক্ষা মাতৃভাষায় গ্রহণের ব্যবস্থা হল।

শান্তিপুরের সেদিনের যাঁরা জ্ঞানীগুণী বিদ্বান মানুষ তাঁরা এগিয়ে এলেন সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। তাঁরা হলেন হরিশচন্দ্র গোস্বামী, রজনীকান্ত মৈত্র, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, বিশ্বেশ্বর দাস, ভূষণচন্দ্র দাস, সচ্চিদানন্দ সান্যাল, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি এবং আরোও অনেকে। মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল ১৩২৩ সালে বালক সমাজের পক্ষ থেকে, আর তখন থেকেই বালক সমাজ নাম পরিবর্তন করে জ্ঞানশিক্ষার কেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হল "বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ"। শিক্ষাপ্রচার, চতুষ্পাঠী পরিচালনা, পুঁথি সংগ্রহ ও গবেষণার ব্যবস্থা, সৎগ্রন্থের সংগ্রহ ও পস্তকাগার পরিচালনা, ব্যায়ামাগার ও সেবাসদন প্রতিষ্ঠা— এই পাঁচটি মানব সেবার উপযোগী কার্যক্রম নিয়ে নবোদ্যমে কাজ শুরু হল বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ। পরে বেজপাড়ায় পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হল।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী :

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী শান্তিপুরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর বন্ধুসভার ঘরে প্রথমে কাজ শুরু হয় পাবলিক লাইব্রেরীর। প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী (ছোটু), প্যারীমোহন সান্যাল এবং আরও অনেক বিদ্যানুরাগী এই লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্যামবাজার নিবাসী শশধর গোস্বামী ছিলেন তখন পুলিশের ক্রিমিন্যাল বিভাগের সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর। শার্লকহোমসের ডিটেকটিভ বই, ডিকেন্সের বই এবং আরও কিছু বই প্রথমে লাইব্রেরীকে দান করেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও বই দান করলেন। রজনীকান্ত মৈত্র অর্থ-সাহায্য করে পরিপুষ্ট করে তুললেন।

নদীয়া জেলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে তখন প্রয়াস শুরু করেছেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান। শান্তিপুরের প্রতাপশালী ভূস্বামী উমেশচন্দ্র রায় (মতি রায়) যুক্ত ছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে। তাঁর সাহায্য পাওয়া গেল। শান্তিপুরের বিখ্যাত নট নির্মলেন্দু লাহিড়ী নাট্যানুষ্ঠানের সাহায্যে পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য অর্থসংগ্রহ করেছেন।

হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কসের লোহালক্কব প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, কালাচাঁদ চটোপাধ্যায়, নারাণ গোস্বামী প্রভৃতির চেষ্টায় সংগৃহীত হয় বরদা পাইন মারফৎ। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে পাবলিক লাইব্রেরী বিল্ডিং হল নবরূপে রূপায়িত হল। নদীয়া জেলায় এমন হল (Hall) নেই বললেই চলে।

স্বর্গত পি. এম. বাগচী, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, এন. সি. লাহিড়ী প্রভৃতি জ্ঞানানুরাগী দাতৃগণ গ্রন্থাদি দানে সমৃদ্ধ করে তুললেন পাবলিক লাইব্রেরীর সংগ্রহ-শালা। একটি স্মরণীয় সংগ্রহ গৌরীপুর রাজার মধ্যম পুত্র প্রমথেশ বড়ুয়ার। চিত্রজগতের প্রতিভাবান পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া আসাম এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর চেষ্টায় প্রমথেশ বড়ুয়ার মূল্যবান গ্রন্থরাজি নেলসন্স এনসাইক্লোপিডিয়া ও আরও দুশো গ্রন্থ পাবলিক লাইব্রেরীর সংগ্রহ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। স্যার আজিজুল হক, ভগবতীচরণ দাস প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের দানে ভরে ওঠে পাবলিক লাইব্রেরী। শান্তিপুরের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল এই পাবলিক লাইব্রেরী। সেদিন রাজনীতি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনীতি বিষয়ে Cyclostyled ইস্তাহার বিলি করা হত লাইব্রেরী থেকে। জেলে রাজবন্দীদের পুস্তক গ্রন্থাদি সরবরাহ পাবলিক লাইব্রেরীর এক স্মরণীয় কীর্তি।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংযোজন করলেন এক নবতর অধ্যায়। বিপুল উদ্দীপনা ও অসাধারণ উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেল গ্রন্থাগারজীবনে। সে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব চন্দ, বি. এস. কেশবন্। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত শশী খাঁ। তারপর Area Library রূপে পাবলিক লাইব্রেরীর স্বীকৃতিলাভ আর এক স্মরণীয় ঘটনা। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যমও সফল হয়েছে।

আকর :

W. Ward — Account of Writings, Religion and Manners of the Hindoos.

Radhakumud Mookherjea — History of Ancient Indian Education.

Lord Ronaldsay — Heart of Aryabarta.

Tavernier's Travels.

Bholanath Chandra — Travels of a Hindoo.

Sir William Jones — Reports.

Bengal District Gazetteers : NADIA — J. H E. Garrett.

Riazu — S — Sulatin : translated by Maulvi Abdus Salam.

Professor E. B. Cowell — Reports of 1867.

Sir William Hunter : A Statistical Account of Bengal, 1876, Vol. II.

E. A. Gait — Census of India, 1901.

A. N. Basu (ed) — William Adam's Report on the State of Education in Bengal, 1835-1838.

C. A. Martin — Review of Education in Bengal 1892-93 to 1896-97.

A Pedler — Review of Education in Bengal 1897-98 to 1901-02.

District Census Report, 1891 — Nadia, Census — 1951 — NADIA.

Census 1961: NADIA

NADIA Statistics 1911-1921 (B volume)

Calendar of Persian Correspondence Vol. I (1759-1767).

Imperial Gazetteer of India Bengal – Vol 1.

Evaluation Report on Pry. Schools in West Bengal.

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—নবদ্বীপমহিমা

কুমুদনাথ মল্লিক—নদীয়াকাহিনী

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—শান্তিপুর পরিচয়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়—ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত

বৃন্দাবন দাস—শ্রীচৈতন্যভাগবত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

জয়ানন্দ—শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ

বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড)

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ—নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস

কৃষ্ণনগর পৌরসভা শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ

পরিশিষ্ট খ : মহাবিদ্যালয়-পঞ্জী

	মহাবিদ্যালয়	প্রতিষ্ঠাকাল	সহশিক্ষামূলক	ছাত্রছাত্রী	কোন বিষয়ে অনার্স আছে
১।	কৃষ্ণনগর কলেজ	১৮৪৬	হ্যাঁ	৭৩৬	ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা।
২।	মহিলা মহাবিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর	১৯৫৮	না, কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্য	৬০০	বাংলা, দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতি।
৩।	কৃষ্ণনগর কলেজ অব কমার্স	১৯৬৮	না, কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য	৮৪১	নাই
৪।	বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি	১৯৫৬	ঐ	১৭০	নাই
৫।	পান্নাদেবী কলেজ, করিমপুর	১৯৬৮	হ্যাঁ	৮১৯	নাই
৬।	সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, মাজদিয়া	১-৯-৬৬	হ্যাঁ	৫৮০	বাংলা
৭।	শান্তিপুর কলেজ	১৯৪৮	হ্যাঁ	১১৪০	বাংলা, ইতিহাস ও গণিত।
৮।	চাকদহ কলেজ	১৯৭২	হ্যাঁ	৮৩	নাই
৯।	শ্রীকৃষ্ণ কলেজ	১৯৫২	হ্যাঁ	১৪২৯	বাংলা ও হিসাবতত্ত্ব
১০।	রাণাঘাট কলেজ	১৯৫০	হ্যাঁ	২৭০০* (প্রাতঃ, দিবা ও সান্ধ্য)	বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রসায়ন।
১১।	বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ	১৯৪২	হ্যাঁ	২৩৪৭ (দিবা ও রাত্রি)	অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস ও সংস্কৃত।

* সান্ধ্য বিভাগে কেবলমাত্র বাণিজ্য বিষয় পড়ানো হয়।

পরিশিষ্ট খ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়পঞ্জী

সদব মহকুমা

কৃষ্ণনগব সদর থানা : কৃষ্ণনগর পৌবসভা

বিদ্যালয়	প্রতিষ্ঠাকাল
*১। সি, এম, এস.	১৮৩৪
*২। দেবনাথ	১৮৭৩
*৩। লেডি কারমাইকেল বালিকা	১৯২৩
*৪। মৃণালিনী বালিকা	১৮৯৭
*৫। এ, ভি.	১৮৪৯
*৬। ডনবসকো	--
*৭। হোলি ফ্যামিলি বালিকা	১৯৩৯
*৮। রাষ্ট্রীয় বালিকা	--
*৯। কৃষ্ণনগব	১৯৩৯
*১০। শক্তিনগর	১৯৪৯
*১১। শক্তিনগর বালিকা	১৯৪৯
১২। ঘূর্ণী	১৯৫৭
*১৩। কলিজিয়েট	--
*১৪। স্বর্ণময়ী বালিকা	১৯৫৪
১৫। রামবকস চেৎলাডিয়া	---
১৬। মহাবাণী জ্যোতির্ময়ী বালিকা	-
১৭। অক্ষয় বালিকা	--
১৮। হিন্দুকল্যাণ বালিকা	--

*১। ধুবুলিয়া শ্যামাপ্রসাদ	১৯৫৩
*২। ধুবুলিয়া দেশবন্ধু	১৯৫৪
৩। ধুবুলিয়া সুভাষচন্দ্র বালিকা	১৯৫৫
৪। ধুবুলিয়া নিবেদিতা বালিকা	১৯৫৬
৫। বেলপুকুর	১৮৯৫
৬। ভালুকা	--
৮। পাটপুকুর	--
৮। দিগনগর	--
৯। স্বামীজী বিদ্যাপীঠ, ভীমপুর	--
১০। আমঘাটা শ্যামপুর	--
১১। আসাননগর	--
১২। ভাতজাংলা কালিপুর	--

নবদ্বীপ থানা : নবদ্বীপ পৌবসভা

১। হিন্দু	১৮৭৩
*২। জাতীয় বিদ্যালয়	১৯৪৮
*৩। বঙ্গবাণী বালিকা	১৯২৯
৪। সারস্বত বালিকা	১৯৫৬
৫। সারস্বত মন্দিব	১৯৩৫
*৬। শিক্ষামন্দিব	১৯৪৯
৭। শ্রীগৌরাঙ্গ	১৯৬২
*৮। বকুলতলা	১৯২৩
*৯। বকুলতলা বালিকা	--
*১০। তারাসুন্দরী বালিকা	১৮৭০
*১১। ঈশানীস্মৃতি বালিকা	১৯২৮

১। ভাগীরথী বিদ্যাপীঠ, স্বরূপগঞ্জ	--
*২। শ্রীমায়াপুর ঠাকুব ভক্তিবিনোদ	১৯৬১
৩। বাবলাবী শ্যামসুন্দব	

চাপড়া থানা

১। হাটচাপড়া কে. ই.	১৮৪১
*২। বড় আন্দুলিয়া	১৯৪৮
*৩। সাবদামণি ইন্দ্রাকন্যা বালিকা, বড় আন্দুলিয়া	--
*৪। শিমুলিয়া	--
৫। দৈয়েরবাজার	--
৬। বহিবগাছি বাঘমাবা	--

কৃষ্ণগঞ্জ থানা

১। খালবোয়ালিয়া	১৯৪৬
২। চন্দননগব আর, ডি, পি,	১৯২১
৩। মাজদিয়া বেলবাজাব	১৮৯০
৪। মাটিয়াবী বানপুব	১৯৪৯
৫। শিবমোহিনীকন্যা বালিকা, মাজদিয়া	---
৬। কৃষ্ণগঞ্জ অনিলস্মৃতি	--
৭। স্বর্ণখালি পাইকপাড়া	--

নাকাশিপাড়া থানা

১। বেথুয়াডহরী জে, সি, এম	১৯৪২
২। বেথুয়াডহরী বালিকা	১৯৫৬
৩। সুধাকরপুর	১৮৮৬
৪। পাটিকাবাড়ী	১৯৫০
৫। শিবপুর জে, কে, এস	১৯৪৭
৬। মুড়াগাছা	১৮৬০
৭। সুবদনী বালিকা, মুড়াগাছা	১৯৫১
৮। ললিতা শ্রীকৃষ্ণবালিকা, বীরপুর	--
৯। তৈবিচারা অক্ষয়	--
১০। ধর্মদা কে- কে-	--
১১। সাপজোলা দেশবন্ধু	--

কালীগঞ্জ থানা

*১। পলাশী	১৮৯৭
*২। মীরা	১৯৪৭
*৩। লাখুরিয়া	১৯৪৯
*৪। পানিঘাটা উমাদাসস্মৃতি	১৯৩৮
*৫। দেবগ্রাম এস. এ.	১৯৪৯
*৬। মাটিয়াবী আর. পি. সেন স্মৃতি	১৯৩০
৭। জুড়ানপুর ডি- এস.	১৯৪৬
৮। নাগাদি ওবেদিয়া	—
৯। কামারী	—
১০। সাদিপুব	সাদিপুর
১১। ডি. কে. কে. বালিকা দেবগ্রাম	—
১২। পলশুণ্ডা	—
১৩। পুকুরিয়া	—
১৪। চব চুয়াডাঙা	—

তেহট্ট থানা

*১। পলাশিপাড়া মহাত্মাগান্ধীস্মৃতি	১৯৪৮
*২। সিদ্ধেশ্ববী শ্যামনগব	১৯২১
*৩। নিমতলা	১৯৪৮
*৪। তেহট	১৯৫১
৫। শ্রীদামচন্দ্র বালিকা, তেহট্ট	—
৬। মোবাবকপুব কলোনী	—
৭। কুঠিপাডা	—
৮। বড়চাঁদঘব	—
৯। নেতাই	—
১০। হাঁসপুকুবিয়া	—
১১। বাণিয়া	—
১২। নন্দনপুব	—
১৩। সাহেবনগর	—
১৪। সাহেবনগর	—

করিমপুর থানা

*১। শিকারপুর	১৯০০
*২। করিমপুর জগন্নাথ	১৯৫৮
*৩। যমশেরপুর বি. এন.	১৮৯৯
৪। ধোড়াদহ নজনীকান্ত	১৯৬৪
৫। চেঁচানিয়া কৃষিশিল্প	১৯৪৮
৬। হোগলবেড়িয়া আদর্শশিক্ষানিকেতন	১৯৫৯
৭। করিমপুর বালিকা	—
৮। বালিয়াডাঙা	—
৯। নতিডাঙা অনিলস্মৃতি	—
১০। নারায়ণপুর	—
১১। মহিষবাথান	—

রাণাঘাট মহকুমা

রাণাঘাটথানা : বীরনগর পৌবসভা

*১। বীবনগর বালক	১৯৪৯
২। বীবনগব শিবকালী বালিকা	১৯৫৬

রাণাঘাট পৌবসভা

*১। লালগোপাল	১৯২৬
*২। পালচৌধুবী	১৮৫৩
৩। লালগোপাল বালিকা	১৮৫৫
৪। পালচৌধুবী বালিকা	—
৫। নাসরা	১৯৫৪
৬। নাসবা বালিকা	১৯৫৫
৭। ইউসুফ	১৯৫০
৮। হেমনলিনী বালিকা	—
৯। ব্রজবালা বালিকা	—
১০। ভারতী	—

১। তাহেরপুব নেতাজী	১৯৫৪
২। গাংনাপুর	১৯৪৯
৩। আড়ংঘাটা ইউ. এম.	১৯৪৯
৪। আড়ংঘাটা বালিকা	১৯৫৮
*৫। তাহেরপুর বালিকা	১৯৫৫
৬। আনুলিয়া	—
*৭। নপাড়া	—
*৮। দত্তপুলিয়া ইউ. কে.	—
*৯। হিজুলী শিক্ষানিকেতন	—
১০। সবিষাডাঙ্গা	—
১১। বরণবেড়িয়া	—
১২। কৃষ্ণনগব	—
১৩। বিধানচন্দ্র, বাণাঘাট	১৯৫৫
১৪। ভূদেবস্মৃতি, প্রীতিনগব	১৯৫০
১৫। পাঁচবেড়িয়া	—
১৬। হাজরাপুর	—
১৭। দলুয়াবাড়ি এ. এস.	—
১৮। হাবিবপুব	—

চাকদহ থানা : চাকদহ পৌরসভা

*১। রামলাল একাদেমী	১৯০৭
*২। বাপুজী বিদ্যামন্দির	১৯৫৩
৩। বাপুজী বিদ্যামন্দির বালিকা	১৯৪৮
*৪। পূর্বাচল	১৯৫২
৫। পূর্বাচল বালিকা	১৯৫৪
*৬। বসন্তকুমারী বালিকা	১৯৪৮

*১। দেশপ্রিয়, চাঁদমারী	১৯৫৫
২। নগেন্দ্রবালা বালিকা, কাটাগঞ্জ	১৯৫৫
৩। কাটাগঞ্জ আদর্শশিক্ষায়তন	১৯৬৫
*৪। গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দির	১৯৪৮
*৫। শিমুরালী উপেন্দ্র বিদ্যাভবন	১৯৪৬
*৬। মদনপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ	১৯৫০
৭। মদনপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ বালিকা	১৯৫০
*৮। রাজারমাঠ আর. কে. এ.	১৯৫৬
৯। নেতাজী বিদ্যামন্দির বালিকা	১৯৫৩
*১০। পান্নালাল, কল্যাণী	১৯৫৬
১১। শিমুরালী উপেন্দ্র বালিকা	১৯৫৯
১২। বিষ্ণুপুর বালিকা	—
১৩। কল্যাণী বিধানচন্দ্র বালিকা	—
১৪। দুর্গানগর বিপিনবিহারী	—
১৫। বালিয়া	—
১৬। সান্যালচর অটলবিহারী	—
১৭। রাউতারী	—
১৮। চরসরাটি	—
১৯। মুকুন্দনগর	—
২০। বিষ্ণুপুর	—
২১। কামালপুর আদর্শ	—
২২। গৌরীশাল গরীবপুর	—
২৩। হিংনাড়া অঞ্চল	—
২৪। আলাইপুর মনোরমা	—

হরিণঘাটা থানা

*১। বড়জাগুলী গোপাল একাদেমী	১৯২১
২। নগরউখড়া	১৯৬২
*৩। রাজলক্ষ্মীকন্যা	—
৪। কাণ্টডাঙা তারকদাস	—
*৫। চৌগাছা প্রাণগোপাল	—
*৬। নিমতলা বিদ্যানিকেতন	—
৭। বিরহী নেতাজী	—
৮। ফতেপুর	—
৯। রসুল্লাপুর	—
১০। পানপুর	—

হাঁসখালী থানা

*১। বাদকুল্লা ইউনাইটেড একাদেমী	১৯৪৭
২। ভুবনমোহিনী বালিকা, বাদকুল্লা	—
*৩। বগুলা	১৯৪৭
৪। হারানচন্দ্র শরৎচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বালিকা, বগুলা	—
৫। বহিরগাছি	—
৬। গ্যাঁড়াপোতা	—
৭। বগুলাপূর্বপাড়া	—
৮। তারকনগর যমুনাসুন্দরী	—
৯। ভৈরবচন্দ্রপুর	—
১০। দক্ষিণপাড়া আর. এস. পি. সি.	—
১১। হাঁসখালী	—
১২। বাপজীনগর	—

শান্তিপুর থানা : শান্তিপুর পৌরসভা

*১। ওরিয়েনটাল একাদেমী	১৮৯৫
২। শান্তিপুর বালিকা	১৯৩৪
*৩। মিউনিসিপ্যাল	১৮৫৬
*৪। সূত্রাগড় নেতাজী	১৮৬৯
৫। মুসলিম	১৯৩৬
৬। শরৎকুমারী বালিকা	—

*১। ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন	১৯৫২
*২। ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতি	১৯৪৮
*৩। ফুলিয়া বালিকা	—
*৪। ফুলিয়া বাধারাণী নারীশিক্ষা মন্দির	—

*উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পরিশিষ্ট গ

নদীয়া জেলা। প্রাথমিক শিক্ষা। ১৯৭১-৭২

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শহর ২৮৬
গ্রাম ১৫২২
মোট ১৮০৮

(২) ছাত্রসংখ্যা
শহর বালক ৩৬,৫৮০
,, বালিকা ১৪,৮৫৪
গ্রাম বালক ১,০৭,২১৩
,, বালিকা ৭০,৯৮৩

(৩) শিক্ষকসংখ্যা শহব পুরুষ ১,০৫৭
,, মহিলা ৩৫৪
গ্রাম পুরুষ ৪,৪০১
,, মহিলা ৬৫৫

(৪) ব্যয় শহর টাকা ২৪,১৭,০০৬'১০
,, গ্রাম টাকা ১,২০,৮৮,৮৯০'৬৫

(৫) নিম্নবুনিয়াদী (প্রাথমিক) বিদ্যালয়
শহব ৪
গ্রাম ১১৮

(৬) ছাত্রসংখ্যা শহর বালক ৫৪০
,, বালিকা ৪০৫
গ্রাম বালক ৬,৮৯১
,, বালিকা ৪,৭৭৪

(৭) শিক্ষকসংখ্যা শহর পুরুষ ১৯
,, মহিলা ৪
গ্রাম পুরুষ ৫২৭
,, মহিলা ২৪

(৮) ব্যয় শহর টাকা ১৫,০০০'০০
,, গ্রাম টাকা ৮,১৫,৬৯৬'৬৪

(৯) প্রাক্‌বুনিয়াদী ও নারসারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা
শহর ৪
গ্রাম ৫

(১০) ছাত্রসংখ্যা শহর বালক ১৬৫
,, বালিকা ১০০
গ্রাম বালক ২৩৫
,, বালিকা ২১৫

(১১) শিক্ষকসংখ্যা শহর পুরুষ ^
মহিলা ৮
গ্রাম পুরুষ ×
মহিলা ৯

(১২) ব্যয় শহর টাকা ১২,০০০'০০
গ্রাম টাকা ১৯,২০০'০০

(১৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়
(ক) প্রাথমিক শিক্ষক বিদ্যালয় শহর ১
গ্রাম ৩

শিক্ষার্থীসংখ্যা শহর পুরুষ ২৪
মহিলা ১৬
গ্রাম পুরুষ ৪৮
, মহিলা ×

শিক্ষকসংখ্যা শহর পুরুষ ২
মহিলা ×
গ্রাম পুরুষ ৩
মহিলা ×

(খ) নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়
শহর ×
গ্রাম ৩

শিক্ষার্থীসংখ্যা শহর পুরুষ ×
মহিলা ×
গ্রাম পুরুষ ২৪৩
মহিলা ১৩৭

শিক্ষকসংখ্যা শহর পুরুষ ×
মহিলা ×
গ্রাম পুরুষ ৮
মহিলা ৩

(১৪) চতুষ্পাঠী (টোল) ৩৯
ছাত্রসংখ্যা ৫৩০
শিক্ষক ৬৬

সরকারী ব্যয় টাকা ৭০,১০০'০০

(বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, নদীয়া, প্রাথমিক শিক্ষা'র সৌজন্যে)।

নদীয়া। মাধ্যমিক শিক্ষা। ১৯৭১-৭২

	শহর			গ্রাম		
	বালক	বালিকা	সহশিক্ষা	বালক	বালিকা	সহশিক্ষা
(১) নিম্নতর উচ্চবিদ্যালয়	৮	৪	--	১০৭	২৫	১০৩
(২) ছাত্রসংখ্যা	১৪২০	৮০৪	--	৮৬০৮	৫৩৪৬	--
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
(৩) শিক্ষকসংখ্যা		৩৪	১২	৪৯১	২১	
(৪) মোট সরকারী ব্যয়	টাকা ৮,৫০,০০০-০০					

	শহর			গ্রাম		
	বালক	বালিকা	সহশিক্ষা	বালক	বালিকা	সহশিক্ষা
(৫) দশম-শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়	৭	১১	--	৭৩	১৮	৬০
(৬) ছাত্রসংখ্যা	২৬২০	২৬৭৮	--	২৫-৬৬৫	১১০৪৭	--
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
(৭) শিক্ষকসংখ্যা		৯৩	১৩১	৭১৮	১৮৩	
(৮) মোট সরকারী ব্যয়	টাকা ১৬,৭৩,০০০-০০					

	শহর			গ্রাম		
	বালক	বালিকা	সহশিক্ষা	বালক	বালিকা	সহশিক্ষা
(৯) একাদশশ্রেণীর বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩	১৫	--	৪২	৯	৩৯
(১০) ছাত্রসংখ্যা	১৫,৭২৫	৭.৯৩৮	--	২৬,৬৭৫	৪,০৭০	--
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
(১১) শিক্ষক সংখ্যা		৬০৫	২৮০	৭০০	৬৩	
(১২) মোট সরকারী ব্যয় টাকা	৪৩,০৬,১২০-০০					

কারিগরী বিদ্যালয়

(১) বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১
(২) ছাত্রসংখ্যা	৫৪
(৩) শিক্ষক সংখ্যা	১৩
(৪) মোট সরকারী ব্যয় টাকা	৪৮,০০০-০০

শিল্প বিদ্যালয়

(১) বিদ্যালয়ের সংখ্যা	পুরুষ	৩	
	মহিলা	১১	সব কটিই শহরে অবস্থিত
(২) শিক্ষার্থী সংখ্যা	পুরুষ	১১৯৮	
	মহিলা	৪১	
(৩) শিক্ষক সংখ্যা	পুরুষ	৮৪	
	মহিলা	৪৪	
(৪) মোট সরকারী ব্যয়	টাকা ৩,৮১,০০০-০০		

[জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, মাধ্যমিক শিক্ষা, নদীয়ার সৌজন্যে)

নদীয়া জেলার গ্রন্থাগারসমূহের বিবরণী

জেলা-গ্রন্থাগার

নাম	অবস্থান	সদস্য সংখ্যা	পুস্তক সংখ্যা
১। জেলা গ্রন্থাগার	কৃষ্ণনগর	৫৪১	২০,৪৪৯

শহর-গ্রন্থাগার

নাম	অবস্থান	সদস্য সংখ্যা	পুস্তক সংখ্যা
১। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার	নবদ্বীপ	১২৫	১৪৭৫৮ +পুঁথি ৯৫০

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার

নাম	অবস্থান
১। বঙ্গবাণী	নবদ্বীপ

গ্রামীন পাঠাগার (সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত)

নাম	অবস্থান	সদস্য সংখ্যা	পুস্তক
১। প্রদ্যোৎ স্মৃতি পাঠাগার	পলাশীপাড়া	৮০	১৬৫৫
২। কিশোরিমোহন সাধারণ পাঠাগার	শিকারপুর	১১৯	২১২৭
৩। বড়জাগুলিয়া প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার	বড়জাগুলিয়া	৩৫৩	২৩১৩
৪। ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার	কাঁচড়াপাড়া	৯২	২৯৯২
৫। ধর্মদা এস, এস, পাঠাগার	ধর্মদা	৮৬	১,৯৭২
৬। শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার	বড়আন্দুলিয়া	১৭৬	২৮০২
৭। শান্তিপুর সাধারণ পাঠাগার	শান্তিপুর	৪৮৭	১৬,৬৬৬
৮। সুশীলাসুন্দরী এন, এস, পাঠাগার	মাজদিয়া	১০৬	৩১৪৩
৯। অঙ্কুরিকা গ্রন্থাগার	পলাশী	৬০	১৫৮০
১০। আনুলিয়া কেদারনাথ স্মৃতি পাঠাগার	আনুলিয়া	১৪৮	২৩২৭
১১। দিগম্বরপুর শহীদ এস, পাঠাগার	দিগম্বরপুর	৫৫	১৪৪১
১২। নতিডাঙ্গা তরুণ এস, পাঠাগার	নতিডাঙ্গা	৫৪	১০৯৪
১৩। মদনপুর সাধারণ পাঠাগার	মদনপুর	১৮০	৩৩৯৫
১৪। তরুণ পাঠাগার	আসাননগর	৭০	২৬৩৯
১৫। ফুলিয়া সাধারণ পাঠাগার	ফুলিয়া কলোনি	১১৮	১৪৭৭
১৬। উলা সাধারণ পাঠাগার	বীরনগর	৬৫	১৭৭৫
১৭। মৃণালিনী সাধারণ পাঠাগার	পাগলাচণ্ডী	১৯০	১০৬৯
১৮। বগুলা নেতাজী সংঘ পাঠাগার	বগুলা	১৪০	১২২৯
১৯। চাপড়া সাধারণ পাঠাগার	বাঙ্গালঝি	১৫১	১৪৬৯
২০। দক্ষিণপাড়া বিবেকানন্দ পাঠাগার	দক্ষিণপাড়া	১৬৮	১৬৬৪
২১। মাঝের গ্রাম পাঠাগার	গঙ্গাসারা	৫৫	৬২৮
২২। বামনপুকুর সাধারণ পাঠাগার	শ্রীমায়াপুর	১৭৭	১৬৫৫
২৩। করিমপুর সাধারণ পাঠাগার	করিমপুর	৯৩	১০৮২
২৪। দেবগ্রাম সাধারণ পাঠাগার	দেবগ্রাম	৮২	১০৩৭
২৫। তেহট্ট নবারুণ পাঠাগার	তেহট্ট	৩০	৩০৯০
২৬। জগরাণী পাঠাগার	বিরহী	৮৮	৪৩৮
২৭। বেলপুকুর সাধারণ পাঠাগার	বেলপুকুর	১৪১	৮১০
২৮। কাশিডাঙ্গা তরুণ সমিতি পাঠাগার	কাশিডাঙ্গা	৫৮	১৬৯১
২৯। সংস্কৃতি সংঘ পাঠাগার	শিমুরালী	৭৬	১৫১৬
৩০। শুকসাগর সমাজসংঘ পাঠাগার	শুকসাগর	৪৫	৬২৫
৩১। রবীন্দ্রস্মৃতি পাঠাগার	ভাতজাঙলা	৮৩	৬৩৫
৩২। নাজমোনেসা মেমোরিয়াল আদর্শ পাঠাগার	বাসরখোলা	৯৬	৯০৭

সাধারণ গ্রন্থাগার

	নাম	অবস্থান		নাম	অবস্থান
১।	কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী	কৃষ্ণনগর	২৪।	কবি করুণানিধন গ্রন্থাগার	শান্তিপুর
২।	সাধনা লাইব্রেরী	ঐ	২৫।	অনিল স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার	কৃষ্ণগঞ্জ
৩।	সুহৃদসংঘ পাঠাগার	কৃষ্ণনগর	২৬।	বাণপুর ফুলবেড়িয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার	বাণপুর
৪।	আজিদ লাইব্রেরী	শালিগ্রাম	২৭।	আচার্য-বীরেশ্বর স্মৃতি পাঠাগার	কৃষ্ণনগর
৫।	গোটপাড়া সাধারণ পাঠাগার	গোটপাড়া	২৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার	কৃষ্ণনগর
৬।	বিবেকানন্দ পাঠাগার	কাঁদোয়া	২৯।	রবীন্দ্র গ্রন্থাগার	নবদ্বীপ
৭।	দেশবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার	বেথুয়াডহরী	৩০।	অঞ্জনগড় তরুণ সংঘ পাঠাগার	বাদকুল্লা
৮।	বিবেকানন্দ পাঠাগার	চাকদহ	৩১।	যোগাযোগ সংঘ পাঠাগার	গয়েশপুর
৯।	হরিণঘাটা কিশোরসংঘ পাঠাগার	সুবর্ণপুর	৩২।	কালীগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার	কালীগঞ্জ
১০।	ফতেপুর সাধারণ পাঠাগার	ভাজনঘাট	৩৩।	নারায়ণ ক্লাব ও লাইব্রেরী	অমিয়নারায়ণপুর
১১।	আদর্শ পাঠাগার	নবদ্বীপ	৩৪।	সংঘ-ভারতী	তেহট্ট
১২।	ফরওয়ার্ড লাইব্রেরী	নবদ্বীপ	৩৫।	কানাইনগর মিলনী পাঠাগার	কানাইনগর
১৩।	শিল্পগোষ্ঠী পাঠাগার	নবদ্বীপ	৩৬।	নবারুণ সংঘ পাঠাগার	জয়পুর
১৪।	রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী	রাণাঘাট	৩৭।	উদয়ন পাঠাগার	নবদ্বীপ
১৫।	বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ	হিজলী	৩৮।	সরোজিনী পাঠাগার	নবদ্বীপ
১৬।	রবীন্দ্রসাধারণ পাঠাগার	গাংনাপুর	৩৯।	ভারতী সংসদ গ্রন্থাগার	কৃষ্ণনগর
১৭।	দত্তফলিয়া সাধারণ পাঠাগার	দত্তফুলিয়া	৪০।	গোখেল স্মৃতি পাঠাগার	কৃষ্ণনগর
১৮।	রামমোহন গ্রন্থাগার	ভাগীরথী শিল্পাশ্রম	৪১।	শিমুলতলা যুবসংঘ পাঠাগার	কৃষ্ণনগর
১৯।	চোগাছা মিলনসংঘ পাঠাগার	চৌগাছা	৪২।	সুতরাগড় আনন্দসম্মিলনী পাঠাগার	শান্তিপুর
২০।	বসন্তস্মৃতি পাঠাগার	চাকদহ	৪৩।	মহাপ্রভুপাড়া সাধারণ পাঠাগার	রাণাঘাট
২১।	মাটিয়ারী পাঠাগার	মাটিয়ারী	৪৪।	সত্যসংঘ পাঠাগার	রাণাঘাট
২২।	মেঘনাদ-স্মৃতি পাঠাগার	দহপোতা	৪৫।	সুভাষ পাঠাগার	শান্তিপুর
২৩।	অক্ষয় গ্রন্থাগার	শান্তিপুর	৪৬।	সুতরাগড় দেশবন্ধু গ্রন্থাগার	শান্তিপুর

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

নদীয়ার স্বাস্থ্য একসময় ভালই ছিল। Wilson's Early Annals of the English পুস্তকে উল্লেখ আছে যে ১৭১৩ সালে তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর চিকিৎসকদের পরামর্শে কলিকাতা থেকে নবদ্বীপে এসে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ইংরেজরাজত্বের প্রথমদিকেও নদীয়া জেলা স্বাস্থ্যকর ছিল। তখনও দেশে নানারোগ দেখা দেয় নি। সাধারণ লোক মোটামুটি সু-স্বাস্থ্যেরই অধিকারী ছিল। চাকদহের নিকটবর্তী ভাগীরথীতীরে সুখসাগরে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের পল্লী-আবাস ছিল। অনেক ইংরেজ রাজপুরুষও সে সময় সুখসাগরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসতেন। বর্তমানে সেই সুখসাগর ভাগীরথী গর্ভে নিশ্চিহ্ন। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে যে নদীয়া জেলা একসময় স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তবে ১৯১০ সালে প্রকাশিত তাঁর গেজেটিয়ারে গ্যারেট সাহেব বলেছেন যে নদীয়ার স্বাস্থ্য কোনকালেই ভাল ছিল না। তাঁর মতে এখানে যে অন্য জায়গা থেকে লোকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসত তার কারণ অন্য জায়গাগুলি ছিল আরও অস্বাস্থ্যকর। ইংরাজ রাজত্বের পরবর্তী আমলে নদীয়ার স্বাস্থ্যের অবনতির কথা বিবেচনা করেই সম্ভবতঃ গ্যারেট সাহেব এই মন্তব্য করেছিলেন।

নদীবিধৌত নদীয়ার নদীগুলি যখন স্রোতস্বিনী ছিল, তখন এ জেলার জলবায়ু ও পরিবেশ ছিল অনেক স্বাস্থ্যকর। এই নদীগুলির মাধ্যমেই জেলার স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থা বজায় থাকত। কিন্তু নদীবক্ষ থেকে পলি ঠিকমত নিঃসরিত না হওয়াতে নদীর খাত ক্রমেই উঁচু হয়ে নদীগুলি অগভীর ও ক্ষীণধারা হয়ে পড়েছে। অঞ্জনা, যমুনা প্রভৃতি শাখানদীগুলি মজে গিয়ে কচুরীপানা ও আগাছা পরিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর খালে পরিণত হয়েছে। আগে নদীগুলির স্বাভাবিক বানের জল প্রতি বর্ষায় মাঠে প্রবেশ করে গ্রামগুলিকে ধুয়ে দিত। এতে চাষের জমি যেমন পলি পড়ে উর্বরা হত, তেমনি গ্রামের নানা রোগজীবাণু ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে চলে যেত। কিন্তু নদীগুলি সঙ্কীর্ণ ও অগভীর হওয়ায় বন্যার আশঙ্কাই শুধু বেড়েছে আর জল নিকাশের ব্যবস্থা হয়েছে ব্যাহত। ১৮৬৫ সালে বঙ্গীয় সরকারের স্যানিটারী কমিশনার কৃষ্ণনগরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক রিপোর্টে যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য। "In former times when Jellenghee river communicated with the Unjana, Krishnagar was not unhealthy; gradually by silting and other gradual influence the communication ceased and the place became unhealthy."

বাংলার অন্যান্য জেলার মত এ জেলাতেও রেলপথ স্থাপনের সঙ্গে নদীগুলির অবনতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে বঙ্গদেশে রেললাইন স্থাপিত হয়, আর তখন থেকেই রেললাইনের বাঁধে আর সাঁকোয় নদীর গতি রুদ্ধ হতে থাকে এবং স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়ে। নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূমিতে ম্যালেরিয়া মহামারীর সুরুও তখন থেকেই। বড় বড় রাস্তা তৈরীর প্রয়োজনেও অনেক বাঁধ দিতে হয়েছে এবং তার ফলেও জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে এবং রেললাইন ও রাস্তার দুধারে অসংখ্য খানাখন্দ তৈরী হয়ে মশার বংশবিস্তারে সহায়তা করেছে। রেলপথ ও রাস্তা তৈরীর ফলে বাংলার জনস্বাস্থ্যের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় সরকারের তৎকালীন জনস্বাস্থ্য অধিকর্তা সি. এ. বেন্টলী সাহেব এক তথ্য-বহুল রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। অবশ্য রেলপথ ও রাস্তা দুইই আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, তবে বেন্টলী সাহেবের মতে সুপরিকল্পিতভাবে জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলি তৈরী করলে অনেকখানি কুফল এড়ানো যেত। আগে কচুরীপানা এদেশে ছিল না। কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথম থেকে কচুরীপানার আমদানী হয়ে সারাদেশের নদীনালা খালবিল পুকুর সব ভর্তি হয়ে যায়। এর ফলে জলও দূষিত হয়ে পড়ে এবং মশার বিস্তারের সুবিধা হয়। গ্রামগুলিও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রামের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

ম্যালেরিয়া মহামারী :

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই নদীয়ার জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবনতি আরম্ভ হয়। ১৮৫২ সালে যশোর জেলায় প্রথম ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দেয়। ১৮৫৪ সালে এই মহামারী পার্শ্ববর্তী জেলা নদীয়াকে আক্রমণ করে। এই মহামারীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে এই জেলার দেবগ্রাম, মাঝেরখালি, মুড়াগাছা প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি প্রথমে এই সর্বনাশা মহামারীর কবলে পড়ে। এর ফলে এই গ্রামগুলির লোকসংখ্যা বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয় বীরনগর গ্রামের। বীরনগর আক্রান্ত হয় ১৮৫৬ সালে। বীরনগর বা উলা সে সময় নদীয়া জেলার মধ্যে খুবই সমৃদ্ধিশালী ও জনাকীর্ণ গ্রাম ছিল। জানা যায়, এই মহামারীর ফলে তৎকালীন বীরনগরের ১৮ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশী অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাকী লোকের অধিকাংশই অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। আজকের বীরনগরের ভগ্নদশার মূল কারণ ছিল এই মহামারী। পরবর্তী কয়েকবছরের মধ্যে এই মহামারী

নদীয়া জেলায় চিকিৎসাকেন্দ্র
হাসপাতাল
প্রাইমারি হেলথ সেন্টার
সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার
টি. বি. হাসপাতাল
অন্যান্য হাসপাতাল
পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র
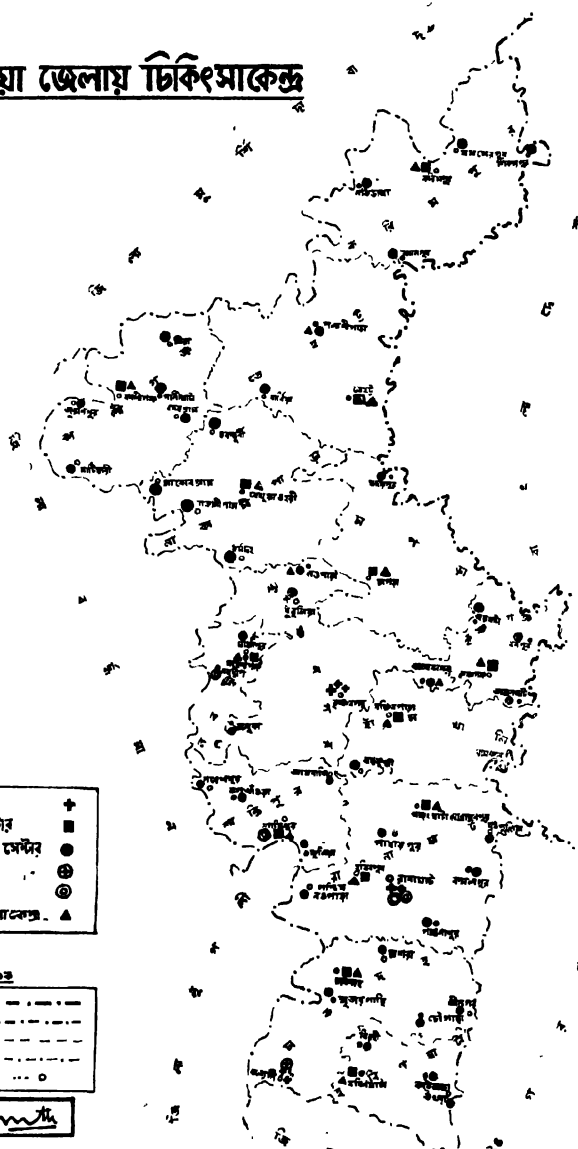
বীরনগরের উত্তর দিকে অবস্থিত বারাসাত, বাদকুল্লা, খামার-শিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৯-৬০ সালে এই রোগ পশ্চিম দিকে ফুলিয়া, নবলা, মালিপোতা, শান্তিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে কবলিত করে। ১৮৬০ সালে উত্তরদিকে গোবিন্দপুর, দিগনগর এবং কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে এবং দক্ষিণদিকে রাণাঘাটের মধ্যদিয়ে আনুলিয়া, কায়েতপাড়া, যুগপুর প্রভৃতি গ্রাম ছাড়িয়ে চাকদহ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই ম্যালেরিয়া মহামারী শেষপর্যন্ত নদীয়া জেলা থেকে হুগলী, ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলায় অনতিকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই মহামারী বর্ধমানজ্বর নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই ম্যালেরিয়া মহামারীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে শ্রীকুমুদনাথ মল্লিকের ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'নদীয়া কাহিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা' উল্লেখযোগ্য।

"- - - নদীয়া এই সময় মহামারীর দারুণ কবলে এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। যেদিকে তাকাইবে সেই দিকেই কেবল বিষাদপূর্ণ শোকের দৃশ্য। রাস্তাঘাট জনহীন--কৃচিৎ ২।১ জন বৈদ্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছে অথবা শিবাদল ও সারমেয় সম্প্রদায় শ্মশান হইতে বা গৃহ হইতে শবদেহ সংগ্রহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে শবাদি শ্মশানে লইয়া দাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শবসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্মশানে আব স্থান না পাইয়া যেখানে সেখানে দাহ করিতে বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিতে থাকে। ক্রমে যখন সকলেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল তখন আর কে শ্মশানে লইয়া যায়, কাজেই লোক গৃহাভ্যন্তরে মরিয়া পচিতে আরম্ভ করিল। গ্রামস্থ ২।১ জন যাহারা কোনরূপে নিস্তার পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়নপর হইল। এইরূপে কত সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল--কত বর্ধিষ্ণু পল্লী জনহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল এবং কত শত শত গ্রাম, শিবাকুল ও শকুনী গৃধিনীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইল।"

১৮৫৪ সালে নদীয়া জেলায় যে সর্বনাশা ম্যালেরিয়া মহামারী সুরু হয় তার কবল থেকে এই জেলা পরবর্তীকালে আর কখনও উদ্ধারলাভ করতে পারে নি। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কমবেশী হয়েছে মাত্র। ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এই মহামারীর একটানা অগ্রগতি চলে। তারপরে কিছু কমলেও আবার নতুন করে সুরু হয় ১৮৬৩-৬৪ সালে। তারপর কিছুদিন এর প্রকোপ কম থেকে আবার সুরু হয় ১৮৭০-৭১ সালে। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এই মহামারী ভয়াবহ আকার ধারণ করে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নদীয়া জেলাকেই গ্রাস করে ফেলে এবং এই জেলাকে করে তোলে স্থায়ীভাবে অস্বাস্থ্যকর। এই সময় থেকে নদীয়ার জনসংখ্যাও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৯১, ১৯১১ এবং ১৯২১ সালের আদম-সুমারীতে নদীয়ার জনসংখ্যা হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শুধু যে ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর ফলেই এই জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তাই নয়, সেন্সাস রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় যে, বহু লোক এ জেলা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, ম্যালেরিয়ার ভয়েই এ জেলা থেকে লোক বাইরে পালিয়ে গিয়েছিল।

এই শতাব্দীর সুরু থেকেই নদীয়া জেলায় আবার স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি দেখা দেয়। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে নদীয়া জেলায় প্রতিবছর গড়ে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুহার ছিল হাজার করা ৩৪.১২ জন। এই সময় সমগ্র বাংলায় ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যুর দিক দিয়ে নদীয়ার স্থানই ছিল সর্বোচ্চে। ১৯২১ সালেও নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার ছিল সমগ্র প্রদেশে শুধু রাজসাহী জেলার নিচে--হাজারে ৩৩.৫ জন। অবশ্য ১৯২২ সাল থেকে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা হাজারকরা ২০ থেকে ১৩র মধ্যে ওঠানামা করে। বহুদিন ধরে রোগে ভুগে লোকের সহনক্ষমতা বৃদ্ধি, কুইনিনের ব্যাপক ব্যবহার ও পানীয় জলের কিছু উন্নতি এই হ্রাসের কারণ বলে মনে করা হয়।

নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়া যে কি ক্ষতি করেছে তা' স্বল্প-পরিসরে বর্ণনা করা অসম্ভব। কত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম যে শ্মশানে পরিণত হয়েছে তার হিসেব নেই। নদীয়ার অর্থনীতি, বিশেষতঃ চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য এবং নদীয়ার গৌরব ধর্ম ও বিদ্যাচর্চাও এই কালরোগের প্রকোপে পড়ে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই জেলায় ম্যালেরিয়া প্রসারের কারণ ও প্রতিকারের পন্থা নির্ণয়ের জন্য ইংরেজ সরকারের আমলেও বিশেষজ্ঞদের অনেক কমিটি ও কমিশন বসেছে--এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: Epidemic Commission, 1864, Nadia Fever Commission—1881 Drainage Commtitee-1906-7.

এই কমিটি ও কমিশনগুলি যে সকল কারণকে নদীয়ায় ম্যালেরিয়া প্রসারের জন্য দায়ী করেছেন তা মোটামুটি একই রকম। সেগুলি হল: (১) গ্রামে জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাব (২) গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব (৩) গ্রামে বনজঙ্গল পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ (৪) আগাছা ও পানায় পরিপূর্ণ পুকুর ও ডোবা। এর সঙ্গে জনসাধারণের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি-কেও দায়ী করা হয়েছে। তবে এক কুইনিন বিতরণ ছাড়া ম্যালেরিয়ার প্রতিকারকল্পে সরকারী উদ্যোগে সে সময় খুব ব্যাপক ব্যবস্থা কিছুই নেওয়া হয় নি। চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল খুব অপ্রতুল। কাজেই সাধারণ লোকের ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মরাই ছিল একমাত্র স্বাভাবিক পরিণতি।

কলেরা:

ম্যালেরিয়ার পরে যে রোগ নদীয়ায় সবচেয়ে মারাত্মক ছিল তা' হল কলেরা। W. H. Carry সাহেবের Good old days of Hon'ble John Company ও Calcutta Review, Vol. VI এ উল্লেখ পাওয়া যায় কলেরা ১৮১৭ সালে নদীয়াতেই প্রথম সুরু হয় তারপর ক্রমে ক্রমে

বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মহামারী হিসাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব নদীয়ায় অনেকবারই হয়েছে। ১৮৯৫-৯৬ সালে নদীয়ায় ভয়াবহ কলেরা দেখা দিয়েছিল এবং দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল গড়ে ৩০০। ১৯০৭ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে কলেরা থেকে মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ৩.৮৩ এবং এই হারে নদীয়া জেলার স্থান ছিল সারা বাংলায় চতুর্থ। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। আগে গ্রামে পুকুর ও নদীর জল পানের জন্য ব্যবহার হত। স্রোত কমে যাওয়ায় অতি সহজেই নদীর জল দূষিত হত। গ্রামের পুকুরগুলিও স্বাস্থ্যসম্মত-ভাবে রাখা হত না। একই জলাশয়ে মানুষের স্নান, গবাদি পশুর স্নান, কাপড়কাচা বাসনমাজা সবই চলত এবং সেই জলাশয়েরই জল পানীয় জল হিসেবেও ব্যবহার হত। কোন কোন গ্রামে পুকুরের অভাবে ডোবার জল খেতেও লোকে দ্বিধা বোধ করত না। গ্রামে বা শহরে অনেকের বাড়ীতে কূয়া ছিল। কিন্তু কাঁচা কূয়োর প্রচলন বেশী থাকায় তা প্রায়ই দূষিত হত। ঘনঘন মহামারীর ফলে সরকার ১৮৭০ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু পাকা কূয়ো খনন করিয়ে দেন। কলেরা ছাড়াও আমাশা, উদরাময়, কৃমি প্রভৃতি রোগের প্রকোপও নদীয়ায় যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই এই রোগগুলির বিস্তৃতির কারণ। আগে গ্রামে নলকূপ খুব কম ছিল। ১৯৩০ সাল থেকে জেলা বোর্ড গ্রামে গ্রামে কিছু নলকূপ স্থাপন করে পানীয়জল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল সামান্য। পৌর শহরগুলিতেও একমাত্র কৃষ্ণনগর ছাড়া অন্য কোথাও তখন পাইপ দ্বারা জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না।

স্বাধীনতার পর থেকেই নদীয়াজেলার জনস্বাস্থ্যের উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সরকারী প্রচেষ্টার ফলেই এই উন্নতি প্রধানতঃ সম্ভব হয়েছে। ১৯৫১ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে নদীয়ার জনস্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়াকে বিতাড়িত করা। ১৯৫৩ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী নেওয়া হয়। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ীতে ডি, ডি, টি, ছড়িয়ে ম্যালেরিয়া বীজাণুর প্রধান বাহক মশার বংশকে ধ্বংস করা আরম্ভ হয়। এতে যে ফল পাওয়া যায় তা' অভাবনীয়। নদীয়া জেলায় ১৯৫৩ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩২৮৫, আর ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে এই মৃত্যুসংখ্যা মাত্র একবছরে ৭৩৫ জন কমে ১৯৫৪ সালে দাঁড়ায় ২৫৫০। ইতিমধ্যে পূর্বপাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু এসে নদীয়ার বনজঙ্গল জলাজমি সব পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে। নদীয়া জেলাতেই সরকারী উদ্যোগে প্রায় ৪০টি কলোনী স্থাপিত হয়। জনসংখ্যার চাপে এবং পতিত জমিতে চাষবাস সুরু হওয়ায় গ্রামের পরিবেশ অনেক স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের তরফ থেকে উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে অনেক নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেক স্যানিটারী পায়খানা তৈরী করে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই নদীয়ায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কমতে কমতে এখন একেবারে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ১৯৬৫ সালে এ জেলায় ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ১৭ জনের। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে এই সংখ্যা আরও কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮ জন ও ৫ জন। আর এখন ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর খবর দূরের কথা, ম্যালে-রিয়া রোগে আক্রমণের খবরই প্রায় শোনা যায় না। যাতে নতুন করে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ না ঘটে তার জন্য ম্যালেরিয়া দূরীকরণ শাখা ব্যাপক পর্যবেক্ষণের কাজে রত আছে।

কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। কোন কোন বছর এখনও কলেরা দেখা দেয়, তবে তা' প্রতি-রোধের জন্য ব্যাপক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পানীয় জল সরবরাহের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৯৫১ সালে জনস্বাস্থ্য বিভাগের গ্রামীন জলসরবরাহ শাখার তত্ত্বাবধানে এ জেলায় মোট ৫৬৫১টি চালু নলকূপ ছিল এবং ১৯৭২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭৪১টি। এ ছাড়া গ্রামে নিজের ব্যয়ে বাড়ীতে নলকূপ বসানোর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। এখন গ্রামে নলকূপের জল খাওয়া প্রায় অভ্যাসেই পরিণত হয়েছে। শহরগুলিতেও জলসরবরাহ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। স্বাধীনতার আগে একমাত্র কৃষ্ণনগর শহরেই পাইপ দ্বারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। এখন নবদ্বীপ, রাণাঘাট ও শান্তিপুর শহরেও পাইপ দ্বারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণের জন্য পৌরসভাগুলিকে অর্থমঞ্জুর করছেন। কল্যাণীর জলসরবরাহ ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সবচেয়ে উন্নত ও আধুনিক। নদীয়ার সমস্ত পৌর শহরগুলিতেই খোলা পয়ঃপ্রণালী, শুধু কল্যাণীই ব্যতিক্রম। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপের মত শহরগুলিতে এখনও খাটা পায়খানার প্রচলন আছে।

আগের চেয়ে পৌরশহরগুলিতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল হলেও এই সব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ না হলে জনস্বাস্থ্যের পুরো উন্নতি হবে না।

গ্রামাঞ্চলে এখনও পায়খানা তৈরী করার অভ্যাস ব্যাপক ভাবে সুরু হয় নি। সামান্য কিছু উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের বাড়ীতেই পায়খানা দেখা যায়। গ্রামে এখনও বহুব্যক্তি মাঠে, ঝোপঝাড়ে, রাস্তার ধারে, পুকুর পারে নিয়মিত মলত্যাগ করে। এই কু-অভ্যাসের ফলে কৃমি, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ করা দুরূহ।

কলেরা বসন্তের টিকা এখন জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের দ্বারা গ্রামে ব্যাপকভাবে দেওয়া হয়।
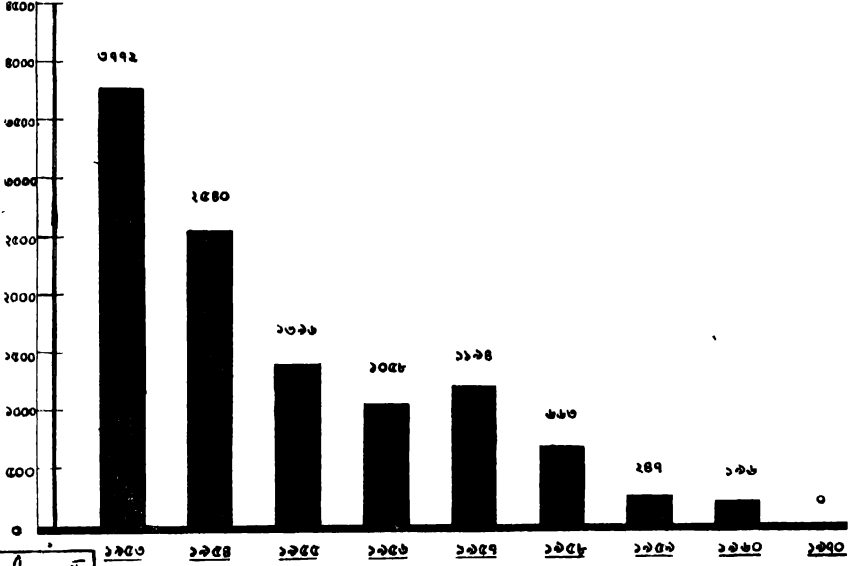
নিচে গত তিন বছরেব টিকা ও ইনজেকসন দেওয়ার হিসেব দেওয়া হল :

	কলেরা	বসন্ত	টি,এ,বি,সি, ইনজেক্‌সন
১৯৬৯	১,৯৯,৭৬৯	৩,৬৬,৭৭৩	১৭০৩
১৯৭০	৬৭,০২২	৩,১১,৪২৯	১১০৭
১৯৭১	৬,৩৮,২৩৫	৭,৯৫,১১০	৮৮,৩২৭

১৯৭১ সালের হিসেবের মধ্যে বাংলাদেশ শরণার্থীর জন্য দেওয়ার হিসেব ধরা আছে। ১৯৬৯ সালে বসন্তরোগে মারা গিয়েছে মাত্র ১১ জন। ঐ বছর কলেরায় কেউ মারা যায় নি। ১৯৭০ সালে বসন্ত বা কলেরায় একজনও মারা যায় নি। অবশ্য গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস রোগে মারা গিয়েছে ১৯৬৯ সালে ৮ জন এবং ১৯৭০ সালে ৩৩ জন। ১৯৭১ সালে শেষোক্ত রোগে স্থানীয় কোন ব্যক্তি মারা না গেলেও ১৬৭ জন বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী মারা গিয়েছিল।

চিকিৎসা ব্যবস্থা :

স্বাধীনতার আগে অন্যান্য জেলার মত নদীয়া জেলাতেও চিকিৎসাব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল ছিল। প্রথম পরিকল্পনা সুরু হবার আগে সরকারী পরিচালনাধীনে সারা জেলায় কৃষ্ণনগরে ৭৯টি শয্যাসহ একটি সদর হাসপাতাল ও রাণাঘাটে ৬টি শয্যাসহ একটি এ, জি, হাসপাতাল এবং কল্যাণীতে ৬০০ শয্যাসহ একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল ছিল। অবশ্য পুলিশ ও জেলের বিভাগীয় আলাদা হাসপাতাল ছিল। এছাড়া শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত ৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তিপুর দাতব্য চিকিৎসালয় ও নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত ২৮ শয্যাবিশিষ্ট গ্যারেট হাসপাতাল ছিল। কিন্তু আজ সারা নদীয়া জেলায় মোট ১১টি সরকারী হাসপাতাল ও ৬টি বেসরকারী হাসপাতাল চলছে। এদের মিলিত শয্যাসংখ্যা ৩৩৫৫টি। এ ছাড়াও এ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম পরিকল্পনা থেকে মোট ২৫০টি শয্যা নিয়ে ১৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৫৪টি শয্যা নিয়ে

৪০টি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ৭টি সরকারী ও ১০টি বেসরকারী ক্লিনিক এবং ২৫টি বেসরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় এ জেলায় এখন চলছে।

হাসপাতাল ও চিকিৎসা ব্যবস্থার দিক দিয়ে নদীয়া জেলাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলা যায়। কলিকাতা বাদ দিলে সারা পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালের সুযোগের দিক দিয়ে নদীয়া জেলার স্থান শুধু দার্জিলিং জেলার নীচে। নদীয়া জেলায় প্রতিহাজার জনসংখ্যায় শয্যাসংখ্যা ১.৬০। সারা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক উর্ধ্বে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি এক হাজার জনের পিছু আছে .৮৮টি শয্যা।

এ জেলার কল্যাণী ও ধুবুলিয়ায় রাজ্যের দুটি প্রধান যক্ষ্মা হাসপাতাল অবস্থিত। এ জেলার কল্যাণীতেই সবচেয়ে বেশী হাসপাতাল আছে। কল্যাণীতে কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল ছাড়াও জওহরলাল নেহরু হাসপাতাল, গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও ই. এস. আই (শ্রমবিভাগ) হাসপাতাল অবস্থিত।

কৃষ্ণনগর জেলা-হাসপাতালটি সম্প্রসারিত হয়ে ১৯৬৩ সালে সদর হাসপাতাল থেকে শক্তিনগরের (কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে) নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা। শহরের মধ্যস্থলে সদর হাসপাতালে বহির্বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ, ডি, ডি, ক্লিনিক, টি, বি, ক্লিনিক ও কুষ্ঠ ক্লিনিক এখনও রয়েছে। শক্তিনগরে সাধারণ বিভাগ, সার্জারী, ই, এন, টি, প্যাথলজি, চক্ষু চিকিৎসা, দন্তচিকিৎসা, রেডিওলজি, ইমারজেন্সি, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি বিভাগগুলি আছে। প্রত্যেক বিভাগেই আছেন উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ। এই হাসপাতালে একটি ব্লাডব্যাঙ্কও আছে। শয্যাসংখ্যা এখন ৩৫০।

নদীয়া জেলায় কুষ্ঠরোগের প্রকোপ ভয়াবহ না হলেও কিছু আছে। কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালের কুষ্ঠক্লিনিকে ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে কুষ্ঠরোগী চিকিৎসিত হয়েছে যথাক্রমে ৩২৬ জন, ৩৯১ জন ও ৩০৫ জন। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কুষ্ঠ-রোগের সমীক্ষা, চিকিৎসা এবং এই রোগ সম্বন্ধে সঠিক প্রচারের উদ্দেশ্যে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কালীগঞ্জ ও চাকদহ থানাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তিপুরে সবচেয়ে বেশী কুষ্ঠরোগী আছে—প্রায় ৭০০। চাকদহে এই সংখ্যা ৬০০। নবদ্বীপ ও কালীগঞ্জে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫০ ও ৩৫০। এই থানাগুলিতে ক্লিনিক স্থাপন করে চিকিৎসা চলছে।

কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে একটি যক্ষ্মা ক্লিনিক আছে। এই ক্লিনিকে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা গড়ে বৎসরে ৩ হাজা-রেরও বেশী। ক্লিনিকের হিসাবে দেখা যায় রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। গ্রামাঞ্চলের ও সহরাঞ্চলের রোগীর সংখ্যা প্রায় সমান। ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে ধুবুলিয়া ও কাঁচরাপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যা নিম্নরূপ :

সাল	ভর্তিসংখ্যা	মৃত্যুসংখ্যা
১৯৬৯	২৫৩০	১৯২
১৯৭০	২৫৪৫	১৮০

তবে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে নদীয়া জেলা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে না। কারণ ঐ হাসপাতাল দুটিতে সারা রাজ্যের রোগীই ভর্তি হয়।

কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে একটি যৌনব্যাধির ক্লিনিক আছে। ঐ ক্লিনিকে গড়ে বাৎসরিক ৫০০ রোগী চিকিৎসিত হয়। দেখা যায় এই ক্লিনিকে শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিতের এবং নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী। ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে রোগীর সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। অবশ্য তা থেকে যৌনরোগ কমছে কিনা বলা শক্ত, কারণ বাইরে চিকিৎসিত রোগীর হিসেব পাওয়া যায় না। কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৫০০। এটি একটি অতি উন্নত ধরনের আধুনিক হাসপাতাল। এখানেও সাধারণ চিকিৎসা, সার্জারী, স্ত্রীরোগ, প্যাথলজি, রেডিওলজি, অ্যানাস্থেসিয়া, দন্তচিকিৎসা প্রভৃতি প্রায় সকল বিভাগেরই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। এখানে সপ্তাহে একদিন পলিও টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে।

কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালটিও একটি আধুনিক ব্যবস্থাসমন্বিত হাসপাতাল। এখানেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। শয্যাসংখ্যা ১০০।

কৃষ্ণনগর থানার দুটি ব্লক বাদ দিয়ে জেলার ১৬টি ব্লকের মধ্যে ১৪টি ব্লকেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। এর মধ্যে বেথুয়াডহরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যাসংখ্যা সব চেয়ে বেশী—৫০টি। বাকী ১৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৭টিতে শয্যাসংখ্যা ২০টি হিসেবে এবং ৬টিতে আছে ১০টি হিসেবে। আর ৪০টি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ১৫টিতে আছে ১০টি হিসেবে শয্যা আর ১টিতে আছে ৪টি শয্যা।

গ্রামাঞ্চলে এখনও সুশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব। সেক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকেই নদীয়ার গ্রামবাসী চিকিৎসার একমাত্র সুযোগ লাভ করে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গুলিতে মহিলাদের জন্য আলাদা শয্যা নির্দিষ্ট আছে। স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা ছাড়াও জন্মমৃত্যুর সংখ্যা রেকর্ড করা, বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, কলেরা বসন্তের টিকা দেওয়া ও পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কাজ হয়ে থাকে।

পরিবার পরিকল্পনা :

নদীয়া জেলায় পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কাজ ২০টি প্রধান কেন্দ্র ও ৭৯টি সহায়ক কেন্দ্রের মারফত পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পরিবার কল্যাণ পরি-কল্পনার প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। বিনামূল্যে সকল কেন্দ্র

থেকেই জন্মনিরোধের উপকরণ বিতরণ এবং যথাযথ উপদেশ নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রধান কেন্দ্রগুলিতে পুরুষদের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে। ১৯৭৩ সালের ২রা জানুয়ারী থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য ২৩ হাজার পুরুষের ভেসেকটমির লক্ষ্য নিয়ে এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান কয়েক-বৎসরে নিরোধের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে লুপের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। গত তিন বৎসরের পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কাজের হিসেবে দেখা যায় ১৯৬৯-৭০ সালে কাজ অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে। পরবর্তী ২ বছরে শান্তিশৃংখলার অভাবজনিত পরিস্থিতিতে কাজ ব্যাহত হয়েছে।

	অস্ত্রোপচার				উপকরণ ব্যবহার-
	পুং	স্ত্রী	মোট	লুপ	কারীর সংখ্যা
১৯৬৯-৭০	৩৭০২	৩৪৭	৩৭৪৯	৫০৩	১৬৫৭
১৯৭০-৭১	১৩৮৫	৩২৩	১৭০৮	৩৮২	২৪৯৯
১৯৭১-৭২	৯৪৮	২৬৫	১২১৩	২৮১	২৩৩২

সরকারী প্রতিষ্ঠান :

স্বাধীনতার পর থেকে এ জেলায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার যাবতীয় উন্নয়ন প্রধানতঃ সরকারী উদ্যোগে হলেও বেসরকারী প্রচেষ্টাও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুতঃপক্ষে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকারী ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।

নদীয়া জেলায় বর্তমানে বেসরকারী হাসপাতাল ৬টি, দাতব্য চিকিৎসালয় ২৫টি ও ক্লিনিক ১০টি আছে। তবে এগুলি সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। জেলা পরিষদ ৯টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচালনা করেন।

বেসরকারী হাসপাতালের মধ্যে নবদ্বীপের গ্যারেট হাসপাতাল খুব পুরানো। এই হাসপাতালে বর্তমানে ২৮টি শয্যা আছে। এখানে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসার জন্য খুব ভীড় হয়। তার কারণ নবদ্বীপের মত জনবহুল শহরে আর কোন হাসপাতাল নেই। নবদ্বীপে ৬৮ শয্যাযুক্ত বড় সরকারী হাসপাতাল শীঘ্রই খোলা হচ্ছে। গ্যারেট হাসপাতাল নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

রাণাঘাট মহকুমা টি, বি, এসোসিয়েশন পরিচালিত বহির্বিভাগীয় যক্ষ্মা ক্লিনিক ও অন্তর্বিভাগীয় কে, সি, গুহ মেমোরিয়াল যক্ষ্মা হাসপাতাল জেলার বেসরকারী চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত রাণাঘাট টি, বি, ক্লিনিকে ২টি এক্সরে মেসিন ও আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত ল্যাবরেটারী ও সুযোগ্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা আছে। বৎসরে প্রায় ৩ হাজার রোগীকে এখানে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়। ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের এককালীন ১,২১,০০০ টাকা দানে বক্ষ-পরীক্ষাগারকে উন্নীত করা হয়েছে। অন্তর্বিভাগীয় কে, সি, গুহ হাসপাতালে ১০০টি শয্যা আছে। এর মধ্যে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ কর্তৃক ৪৮ শয্যা এবং ই, এস, আই (শ্রমবিভাগ) কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য ৪০টি শয্যা সংরক্ষিত।

রাণাঘাট প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গল সমিতি পরিচালিত রাধারাণী সেবাসদন ৩০টি শয্যাবিশিষ্ট প্রসূতি হাসপাতাল। এখানে অস্ত্রোপচারের সুবন্দোবস্ত আছে। এই প্রতিষ্ঠানে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ আছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের সুবিধাসহ একটি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে। পূর্বে রাণাঘাট মিশন হাসপাতাল খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে সাধারণ বিভাগ এবং প্রসূতি বিভাগ ছিল। ১৯৪৭ সালে প্রসূতি বিভাগ ব্যতীত অন্য সব বিভাগ এবং ১৯৬৭ সালে প্রসূতি বিভাগটি মিশন কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। বর্তমানে এই ভবনে সরকারী মহকুমা হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৭২ সালে ডাঃ বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী হোমিও কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নবদ্বীপের নিকটে স্বরূপগঞ্জে শিবানন্দ আরোগ্যভবনে বক্ষ-পরীক্ষাগার, যক্ষ্মা ক্লিনিক প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। একটি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছে।

আজ সরকারী ও বেসরকারী মিলিত প্রচেষ্টায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার যে উন্নতি এ জেলায় হয়েছে তার প্রতিফলন ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত মৃত্যুসংখ্যাতেই দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের জন্মমৃত্যু-হারের বিবরণ (জেলা-স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত) অন্যত্র দেওয়া হল।

শিক্ষার প্রসার ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের ওপরে স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্ট নির্ভরশীল। এই দুটি বিষয়ের উন্নতি ক্রমে ক্রমেই হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষেরও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আগের চেয়ে বাড়ছে। তবে সেই সঙ্গে জীবনধারণের জটিলতা ও খাদ্যে ভেজালজনিত নতুন নতুন রোগও বাড়ছে। তবুও আশা করা যায়, নদীয়ার জনস্বাস্থ্য বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

C.A. Bentley-র Malaria and Agriculture in Bengal, *A.C. Chatterjee*-র Problem of Malaria in Bengal, Nadia District Gazetteer—Garrett, নদীয়াকাহিনী, Census Hand Book, Nadia, 1951 and 1961, State of Health in west Bengal, 1954, State of Health in West Bengal, 1966, Health on March, 1970 এবং নদীয়ার জনস্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট।

পরিশিষ্ট ক

নদীয়া জেলায় হাজারকরা জন্মমৃত্যু হার

বছর	জন্মসংখ্যা	জন্মহার	মৃত্যুহার	মৃত্যুহার	শিশুমৃত্যুসংখ্যা	শিশুমৃত্যুহার
১৯৬৫	৩৭,৪৩৫	১৯.৫	১২,৫৬৮	৬.৬	১৬৩৭	৪৩.৭
১৯৬৬	৩৭,৮৭৫	১৯.২	১১,৬৬৪	৫.৯	১৭৭৭	৪৬.৯
১৯৬৭	৩৮,৪৬৪	১৯.৩	১০,৪২২	৫.২	১৪৬৭	৩৮.১

পরিশিষ্ট খ

নদীয়া জেলায় বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা

ব্লকের নাম		হাসপাতালের নাম	পরিচালন কর্তৃপক্ষ	শয্যাসংখ্যা
কৃষ্ণনগর ১	১।	নদীয়া জেলা হাসপাতাল,	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ	৩৫০
	২।	কৃষ্ণনগর পুলিশ হাসপাতাল	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বিভাগ	৪৬
	৩।	কৃষ্ণনগর জেল হাসপাতাল	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা বিভাগ	৩৩
কৃষ্ণনগর ২	৪।	ধুবুলিয়া রিলিফ ক্যাম্প হাসপাতাল	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ	৫০
	৫।	ধুবুলিয়া যক্ষ্মা হাসপাতাল	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ	৭৯০
রাণাঘাট ১	৬।	রাণাঘাট মহকুমা হাসপাতাল	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ	১৩১
	৭।	রাণাঘাট রিলিফ ক্যাম্প হাসপাতাল	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ	৩০
	৮।	রাণাঘাট কে, সি, গুহ যক্ষ্মা হাসপাতাল	বেসরকারী	১০০
	৯।	রাণাঘাট প্রসূতিসদন	বেসরকারী	৩০
	১০।	উলা দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রসূতিসদন	বীরনগর পৌরসভা	১২
চাকদহ	১১।	জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, কল্যাণী	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ	৫০০
	১২।	গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, কল্যাণী	ঐ	১০০
	১৩।	কাঁচরাপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল, কল্যাণী	ঐ	১০০০
	১৪।	ই, এস, আই হাসপাতাল, কল্যাণী	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমবিভাগ	১২৫
	১৫।	মশবা প্রসূতিসদন	বেসরকারী	১০
শান্তিপুর	১৬।	রামেশ্বর প্রসূতি সদন	বেসরকারী	২০
নবদ্বীপ	১৭।	নবদ্বীপ গ্যারেট হাসপাতাল	নবদ্বীপ পৌরসভা	২৮

পরিশিষ্ট গ

নদীয়া জেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র

	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	স্থাপিত	শয্যাসংখ্যা	ব্লক
১।	আসাননগর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১৫-৯-৫৮	—	কৃষ্ণনগর ১
২।	ভালুকা ,, ,,	১২-১-৬৮	—	,,
৩।	নওপাড়া ,, ,,	১৯৫৬	—	কৃষ্ণনগর ২
৪।	চাপড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৫-৫-৫৪	২০	চাপড়া
৫।	হাদয়পুর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৮-১০-৫০	১০	,,
৬।	কৃষ্ণগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৮-৯-৫৭	২০	কৃষ্ণগঞ্জ
৭।	বানপুর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৪-১০-৫৮	—	,,
৮।	ভাজনঘাট ,, ,,	১০-৯-৫৮	—	,,
৯।	জয়ঘাটা ,, ,,	২৬-৭-৬১	—	,,
১০।	মহেশগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৪-৬-৬৬	১০	নবদ্বীপ

১১।	শ্রীমায়াপুর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২-১-৬৫	--	নবদ্বীপ
১২।	বেথুয়াডহরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১১-৮-৫২	৫০	নাকাশীপাড়া
১৩।	নাকাশীপাড়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৫-৪-৫৫	১০	,,
১৪।	ধর্মদা ,, ,,	২৪-৮-৫২	১০	,,
১৫।	চকঘুড়ি ,, ,,	১২-৭-৬৩	--	,,
১৬।	মাঝের গ্রাম ,, ,,	৩১-৮-৬৪	--	,,
১৭।	কালিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৭-১২-৬০	২০	কালিগঞ্জ
১৮।	জুড়নপুর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৪-৮-৫৩	১০	,,
১৯।	পানিঘাটা ,, ,,	২৪-৫-৫৫	১০	,,
২০।	মীরা ,, ,,	৩-৯-৫০	১০	,,
২১।	দেবগ্রাম ,, ,,	১-১১-৫৮	১০	,,
২২।	মেটিয়ারী ,, ,,	১-৭-৬৫	--	,,
২৩।	তেহট্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৩-৫-৬৭	১০	তেহট্ট-১
২৪।	প্রীতিময়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২২-৪-৬৩	১০	তেহট্ট-২
২৫।	বাণিয়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২০-১১-৫৫	--	,,
২৬।	করিমপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৪-৫-৫৭	২০	করিমপুব
২৭।	বাগছি-জমশেরপুর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৬-১০-৫২	১০	,,
২৮।	নতিডাঙ্গা , ,,	২৪-২-৫৩	১০	,,
২৯।	নন্দনপুর ,, ,,	৬-৮-৫৬	--	,,
৩০।	শিকারপুব ,, ,,	৭-১-৬৩	--	,,
৩১।	দক্ষিণপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১০-৭-৫২	১০	হাঁসখালি
৩২।	বাদকুল্লা সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১-১১-৫২	১০	,,
৩৩।	বামনগর ,, ,,	১৭-১১-৫৮	--	,,
৩৪।	শান্তিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৫-১-৫৫	২০	শান্তিপুব
৩৫।	বাগআঁচড়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১৭-১১-৫২	১০	,,
৩৬।	গয়েশপুব	১৭-১০-৫৩	১০	,,
৩৭।	ফুলিয়া ,, ,,	১-৮-৫৩	১০	,,
৩৮।	আরবান্দী ,, ,,	২৬-১২-৫৩	১০	,,
৩৯।	যাদবদত্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৬-১-৬৮	১০	বাণাঘাট ১
৪০।	পাহাড়পুর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২-৬-৫৭	--	,,
৪১।	নওপাড়া ,, ,,	২৫-৯-৫৮	--	,,
৪২।	আড়ংঘাটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৬-১০-৬২	১০	রাণাঘাট ২
৪৩।	দত্তফুলিয়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৯-৫-৫৬	১০	,,
৪৪।	গাঙ্গনাপুর ,, ,,	১৩-৯-৫৮	--	,,
৪৫।	কামালপুর ,, ,,	২০-৫-৬৫	--	,,
৪৬।	চাকদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২০-৯-৫৪	২০	চাকদহ
৪৭।	মশরা সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩০-৯-৫৮	--	,,
৪৮।	সুত্রাগাছি ,, ,,	১৬-১২-৫৮	--	,,
৪৯।	চৌগাছা ,, ,,	১-৬-৬১	--	,,
৫০।	শ্রীনগর ,, ,,	১৫-২-৬৪	--	,,
৫১।	হরিণঘাটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১৭-১২-৫৩	২০	হরিণঘাটা
৫২।	কাষ্ঠডাঙ্গা সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩-১-৫১	৪	,,
৫৩।	নগরউখড়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২৫-৯-৫৬		,,
৫৪।	বিরোহী ,, ,,	৪-৭-৫৫	--	,,

কৃষি ও সেচ

নদীয়া জেলার অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো মূলতঃ কৃষি-ভিত্তিক---কৃষিই জেলার মোট উৎপাদন ও আয়ের সর্বপ্রধান উৎস এবং মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই এই কৃষির সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। ১৯৭১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে জানা যায় এই জেলার মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যা হল ৫৫২৫৫৮-এর মধ্যে কৃষি শ্রমিক ১৫২২৮৫ জন এবং কৃষক ২০৮৫৩৫ জন অর্থাৎ মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া আরও বহুব্যক্তি নানাভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

দেশবিভাগের পর এই জেলাকে একটা বৃহৎ অংশ হারাতে হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার চেয়ে এই জেলাকেই বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির চাপ বেশী সহ্য করতে হয়। এতে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া জনবৃদ্ধিজনিত জমির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ তো রয়েছেই। এর ফলে এই জেলার বেশীর ভাগ জমিই চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয় এমন জমিতেও চাষ হচ্ছে। ভারতবর্ষে মোট আয়তনের শতকরা ৪৪.৬ ভাগ হল কৃষিজমি, পশ্চিমবঙ্গে মোট আয়তনের শতকরা ৬২ ভাগ জমিতে আবাদ হয় এবং নদীয়া জেলায় শতকরা ৭৭.২৬ ভাগ জমি (চলতি কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমি নিয়ে) কৃষিজমি। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় অধিক ফলনের জন্য জমির আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব বেশী আর নেই। বর্তমানে তাই সেচ ও সার প্রয়োগদ্বারা অধিক ফলনশীল শস্যচাষ ও আধুনিক উন্নত প্রথায় কৃষিকার্যের মাধ্যমে একর পিছু উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এক-ফসলী জমিকে বহু-ফসলী জমিতে পরিণত করে অধিক ফলনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চলেছে।

পূর্বে নদীয়ায় ভূমি-মালিকানা ব্যবস্থা ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ---অধিকাংশ জমিই উঠবন্দী ব্যবস্থার আওতায় ছিল। এই উঠবন্দী যে কেবল নদীয়াতেই প্রচলিত ছিল তা নয়, তবে নদীয়ায় এই নিয়ম সর্বত্রই দেখা যেত ("The particular tenure which is known by the name 'Utbandhi' apparently had its origin in the Nadia district, from which it had spread to neighbouring districts, though in no district is it as common as in Nadia where about five-eighths of the cultivated lands are held under it"—J. H. E. Garrett, Bengal District Gazetteers---Nadia, 1910 p. 112)। এই উঠবন্দী ব্যবস্থায় এক বছরের জন্য জমি চাষ করতে দেওয়া হত এবং কৃষক কেবলমাত্র সেই জমির খাজনা দিত যে জমি সে এক বছরের জন্য চাষ করার অনুমতি পেত। পর পর বার বছর ধরে কোন কৃষক একই জমি চাষ করার সুযোগ পেলে সে সেই জমির অধিকার অর্থাৎ স্থায়ীভাবে চাষ করার সুযোগ পেত; কিন্তু প্রায়শঃই এটা ঘটতো না। ফলে জমির ওপর কৃষকের কোন স্থায়িত্বই ছিল না। উঠবন্দী জমির খাজনার হারও ছিল খুব বেশী। ১৯১০ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যেখানে উঠবন্দী জমির খাজনা বিঘাপ্রতি ৪ থেকে ৮ টাকা ছিল সেখানে অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী লীজের অধীন জমির খাজনার হার ছিল মাত্র ৫ আনা থেকে ১৪ আনা। জমির মালিকানা অস্থায়ী হওয়ায় জমির উন্নতিতে কৃষকের কোন উৎসাহ ছিল না। স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার বিলোপের মাধ্যমে জমির মালিকানা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী জানা যায় এই জেলার ১৪৫৪৬০ জন গ্রামীণ কৃষক পরিবারের ৬২.৭ শতাংশ যে জমি চাষ করেন সেই জমি হয় তাদের নিজেদের অথবা সরকারের এবং ৫.৯ শতাংশ চাষ করেন অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জমি। এ ছাড়া বাকী ৩১.৪ শতাংশের আছে আংশিক মালিকানা। নদীয়া জেলার কৃষিজীবী পরিবারের অধিকাংশেরই (প্রায় ৬৫ শতাংশ) রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতি জমি---পাঁচ একরের কম। নীচের সারণী থেকে কত পরিমাণ জমি কত শতাংশ কৃষিজীবী পরিবারের আয়ত্তাধীন তা দেখানো হয়েছে---

(১৯৬১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুসারে)

২.৪ একর এবং তার কম	৩৩ ৪
২.৫ একর থেকে ৪.৯ একর	৩২ ০
৫ একর থেকে ৯.৯ একর	২৪.৮
১০ একর ও তার বেশী	৯.৫
সঠিক নির্ণীত নয় এরূপ	০.৩

নদীয়ায় মাটির অনুর্বরতা কৃষির একটা প্রধান সমস্যা। বস্তুতঃ এই অনুর্বর মাটির জন্য কৃষি জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম। এই জেলার মাটির গঠনে প্রধান ভূমিকা রয়েছে ভাগীরথীর। এ ছাড়া জলঙ্গী, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি বহুসংখ্যক শাখানদীরও রয়েছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এই সব নদীবেষ্টিত নদীয়ার ভূত্বক তাই প্রধানতঃ গাঙ্গেয় পলিদ্বারা গঠিত ("The soils generally come under the category of New Alluvium. the eastern and southern past being composed of clay loam whereas the western part is formed of sandy loam"—B. Banerjee & N. M. Bowers—The Changing Cultural Landscape of Nadia, 1965, p 14)। শীর্ণ ভাগীরথী ও তার বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা মৌসুমী বৃষ্টির ভার সহ্য করতে পারে না, তাই দেখা দেয় বন্যা ও প্লাবন।

এই বন্যায় নদী ও তার পার্শ্ববর্তী মাঠ জলে একাকার হয়ে যায়—নদীর পাড় যায় ভেঙে আর নদীবক্ষ ভরাট হয় পলি ও ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকায়। এই জেলার মাটির গঠনে দুটি প্রধান বিষয় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে নদীর সঞ্চিত পলিমাটি এবং বৃষ্টিপাত ইত্যাদির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে জোয়ারভাঁটার প্রভাবে গঠিত মাটির উপরিস্তর।* এই সব নদী ছাড়া রয়েছে বহুসংখ্যক বৃহদাকার বিল, জলা জায়গা ও নীচু জমি এবং বর্ষার জলে গজিয়ে ওঠা ডোবা ও পুকুর। জেলার পশ্চিমে কালান্তর এলাকাও এইরূপ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলজোড়া নীচু জমি। সামগ্রিক-ভাবে কালান্তর এলাকা ছাড়া গোটা জেলার মাটির প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরনের। কালান্তর এলাকা মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে জলঙ্গী এবং ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে কালীগঞ্জ এবং তেহট্ট থানা অবধি নেমে গেছে। এই এলাকার জমি নীচু এবং মাটি কালো এঁটেল জাতীয়। কালান্তর এলাকায় একমাত্র আমন ধানের চাষ হয় এবং বৃষ্টিপাতের অভাব হলে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। অতিবৃষ্টিতে ভাগীরথীর জল ঢুকে এই অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়। কালান্তর অঞ্চলটি প্রায় ১৫ মাইল লম্বা ও ৮ মাইল চওড়া। খরা ও বন্যার প্রকোপ খুব বেশী না হলে এই অঞ্চলের জমি থেকে আমনের ভাল ফলন পাওয়া যায়। বছরের বেশীর ভাগ সময় জলে ডুবে থাকে বলে এখানে আউস বা রবি ফসল চাষ সম্ভব হয় না। আবার প্রতি বছর বন্যার পলি পড়ায় এখানকার মাটি খুবই উর্বর। সাধারণভাবে এই কালান্তর অঞ্চলটি ছাড়া এই জেলার বাকী জমি উঁচু জমির শ্রেণীতে পড়ে। এজন্য এই জেলা আউস ধান ও রবিশস্যের চাষের পক্ষে অনুকূল।

নদীয়া জেলার বিভিন্ন থানায় প্রধানতঃ কি ধরণের মাটি পাওয়া যায় তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

(১)	কৃষ্ণনগর	দোঁয়াশ
(২)	নবদ্বীপ	বেলে দোঁয়াশ
(৩)	নাকাশীপাড়া	বেলে দোঁয়াশ
(৪)	কালীগঞ্জ	দোঁয়াশ
(৫)	তেহট্ট	প্রধানতঃ দোঁয়াশ, কিছু অংশে পলি দোঁয়াশও পাওয়া যায়।
(৬)	করিমপুর	প্রধানতঃ বেলে দোঁয়াশ, কোন কোন জায়গায় এঁটেল দোঁয়াশও পাওয়া যায়।
(৭)	চাপড়া	প্রধানতঃ পলি এঁটেল দোঁয়াশ, কোন কোন জায়গায় দোঁয়াশ জাতের মাটিও পাওয়া যায়।
(৮)	কৃষ্ণগঞ্জ	দোঁয়াশ
(৯)	শান্তিপুর	প্রধানতঃ দোঁয়াশ তবে পলি দোঁয়াশ মাটিও কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়।
(১০)	হাঁসখালি	প্রধানতঃ এঁটেল জাতীয়, কোন কোন জায়গায় বেলে দোঁয়াশ মাটিও পাওয়া যায়।
(১১)	রাণাঘাট	প্রধানতঃ দোঁয়াশ, কোন কোন জায়গায় মাটি পলি এঁটেল জাতীয়।
(১২)	চাকদা	প্রধানতঃ এঁটেল জাতীয়, তবে দোঁয়াশ, পলি এঁটেল এবং পলি ধরনের মাটিও দেখা যায়।
(১৩)	হরিণঘাটা	প্রধানতঃ দোঁয়াশ তবে এঁটেল এবং বেলে জাতীয় মাটিও পাওয়া যায়।

(সূত্র: 'সার সমাচার' নবম বর্ষ ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)

নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশ—এই তিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ জমিতে সার রূপে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এর সাথে পরিমাণমত জৈবসার ব্যবহার করতে হয়। স্বাধীনতার আগে এই রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হত না—এমনকি কয়েক বছর আগেও এই রাসায়নিক সার ব্যবহারের তত প্রচলন ছিল না। তবে জৈবসার অবশ্য ব্যবহৃত হত। পূর্বে নদীয়াতে যখন ব্যাপকভাবে নীলচাষ হত তখন নীলের অবশিষ্টাংশ জমির সার রূপে ব্যবহৃত হত। এছাড়া এখানে তৈলবীজের অব-শিষ্টাংশ 'খৈল' জমিতে দেওয়ার প্রচলন আছে। গোবর, শহর অঞ্চলের মল ইত্যাদিও সার রূপে ব্যবহৃত হয়। সবুজ সার রূপে ধইঞ্চার চাষ জৈবসারের ঘাটতি পূরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ডালজাতীয় শস্যচাষও জমির সার সৃজনে সহায়তা করে।

ইউরিয়া ও এমোনিয়াম সালফেট থেকে পাওয়া যায় শুধুমাত্র নাইট্রোজেনঘটিত সার। সুপার ফসফেট থেকে পাওয়া যায় ফস্ফেটঘটিত সার ও মিউরিয়েট অব পটাশ থেকে পাওয়া যায় পটাশঘটিত সার। পরপৃষ্ঠার সারণী থেকে এ জেলায় গত কয়েক বছরের সারব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ সার-ব্যবহার খুবই সীমিত। খুব সাম্প্রতিক কালে বন্যা ইত্যাদির জন্য এবং সার পাওয়ার ব্যাপারে নানা অসুবিধার জন্য সার ব্যবহারের পরিমাণ কমে গেছে। সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারলে এই জেলায় সার ব্যবহারের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর সম্ভাব্যতাও বৃদ্ধি পাবে।

জেলার অনুর্বর মাটির সমস্যা সার প্রয়োগের দ্বারা কিছু পরিমাণে লাঘব করা সম্ভব হলেও সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার দ্বারা খরা ও বন্যার সমস্যা সমাধানে এখনও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। এই জেলার অধিকাংশ কৃষককে আজও আকাশের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হয়।

এই জেলার জলবায়ু প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবাধীন এবং দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত চরম

*A Report on the soil work in W. Bengal Vol. II Dist. Nadia—(Directorate of Agriculture, Govt. of West Bengal, 1960.)

নদীয়া জেলায় সেচবিভাগের জলনিকাশী প্রকল্পসমূহ
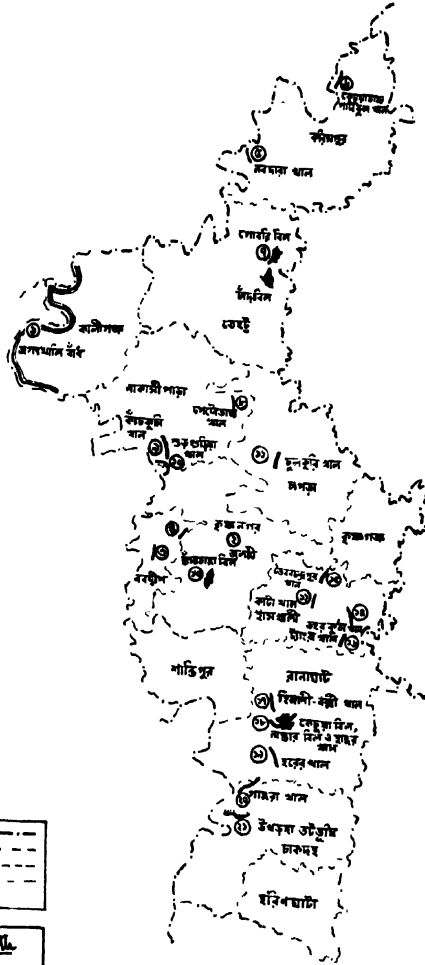
বিবরণ

১ জগৎখালি বাঁধের পুনর্গঠন
২ ঘূর্ণীতে জলঙ্গীর ক্ষয়প্রাপ্ত বামপার্শ্বস্থিত পাড়ের সংরক্ষণ কার্য
৩ নবদ্বীপে ভাগীরথীর ক্ষয়প্রাপ্ত দক্ষিণ পাড়ের সংরক্ষণ কার্য
৪ স্বরূপগঞ্জে জলঙ্গীর ক্ষয়প্রাপ্ত বামপার্শ্বস্থিত সংরক্ষণ কার্য
৫ নবদারা খালের পুনঃখনন
৬ কেচুয়াডাঙ্গা পাটাবুকা খাল প্রকল্প
৭ গোবরি ও চাঁদবিলের জলনিষ্কাশন
৮ শেটেডাঙ্গা খাল প্রকল্প
৯ কাঁচকুলি খালের পুনঃখনন
১০ গুড়গুড়িয়া খালের পুনঃখনন
১১ চুলকুরি খালের পুনঃখনন
১২ কাটাখালের উন্নয়ন
১৩ হাঁসাডাঙ্গা বিল জলনিষ্কাশন প্রকল্প
১৪ ডহরকুণ্ডর খালের পুনঃখনন
১৫ ভৈরবচন্দ্রপুর খালের উন্নয়ন
১৬ ট্যাংরা খালের পুনঃখনন
১৭ হিজলী-বক্সী খালের পুনঃখনন
১৮ কেচুয়া বিল, নাস্তার বিল ও যাঙ্গর খালের সংস্কার
১৯ হরের খালের পুনঃখনন
২০ গাঙ্গরা খালের পুনঃখনন
২১ উখড়া তটভূমি জলনিষ্কাশন প্রকল্প

(মেট্রিক টনে প্রকাশিত)

		১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১০৭০-৭১
১।	এ্যামোনিয়াম সালফেট	২৩৬৯	২৫৬৯	২৭২৮	১৯০৮	৯৯০
২।	ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	২০	৬৯	৯৫	৪	২
৩।	ইউরিয়া	১৮৪৯	১৮৪৯	২০৬৮	১৯২১	২৫২১
৪।	এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট	২০	২৯	৩৬	৪	১
৫।	ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট	৪০	১২৬	১৩৮	১৯২	৩০
৬।	এ্যামোনিয়াম ফসফেট	--	--	৭৮	৪০	৫৭
৭।	সুপার ফসফেট	১৪৫৮	১৪৯২	১৫৩০	৯২৫	৬৯৪
৮।	এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	--	--	৬০	৭	২৮
৯।	মিউরিয়েট অব পটাশ	১৯	১৪৬	২৫১	৪১৫	৪৮৭
১০।	মিশ্র সার	১০৮৮	১৬৭৬	১৮৯৪	১৫৫	৮
১১।	এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট (১৫ : ১৫ : ১৫)	--	--	--	--	৩৫২
১২।	এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট (২০ : ২০ : ২০)	--	--	--	--	৬৪১
		৬৮৬৩	৭৯৫৬	৮৮৭৮	৫৫৭১	৫৮১১

(সূত্র : 'সার সমাচার' নবম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)

ভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ বর্ষা ও প্রথম শরতে হয়। জেলার পশ্চিম অংশে এই সময় কৃষিকার্য ভাল হয়। পূর্বাংশে অবশ্য মাঝে মাঝে বন্যা ও প্লাবন দেখা দেয়। পূর্বাংশে বরং গ্রীষ্মকালের প্রাক্‌মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও কাল-বৈশাখীর ঝোড়ো আবহাওয়া কৃষির পক্ষে বেশী উপযোগী। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১০ ইঞ্চি এবং পাট ও আমন ধান চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। শীতকালেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়—প্রায় ৭ ইঞ্চি। এই শীতকালীন বৃষ্টিতে রবিশস্য ও নানাবিধ শীতকালীন সবজির ফলন ভাল হয়।

গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ায় নদীর মূল ধারা হারিয়ে যায় এবং সেখানে তৈরী হয় ছোট ছোট বদ্ধ জলা এবং চর। নদীর জলের মাত্রাও খুব নেমে যায়। এর ফলে গভীর নদীবক্ষ থেকে জল উত্তোলন করে মাঠে দেওয়া খুবই শক্ত। তেমনি বর্ষাকালে এইসব নদী অতিরিক্ত জলের চাপ সহ্য করতে পারে না এবং মাঠের জল নিষ্কাশনও সম্ভব হয় না। ফলে নদীতীরবর্তী মাঠ ও কৃষিক্ষেত্র সম্পূর্ণ জলমগ্ন হওয়ায় শস্যের প্রভূত ক্ষতি হয়।

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পূর্বে এই জেলায় কোন সেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।* এই জেলায় কূপের সাহায্যে সেচের প্রচলন ছিল না আবার যে বহুসংখ্যক বিল ও বৃহৎ জলাশয় আছে সেগুলিকেও সেচের কাজে ব্যবহার করা হয় নি। এই সব বিল ও জলাশয়ের যথোপযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে সেচ ও জল নিষ্কাশন এই উভয়ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যেতে পারে। স্বাধীনতার পর একদিকে যেমন কৃষি বিভাগের উদ্যোগে গভীর নলকূপ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাভাবিক জলের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলেছে তেমনি অপরদিকে সেচ ও জলপথ বিভাগের প্রচেষ্টায় বহুসংখ্যক খাল-বিল ইত্যাদির সংস্কারের মাধ্যমে সেচ, জলনিষ্কাশন, বন্যানিয়ন্ত্রণ, নগররক্ষা ইত্যাদি বিবিধ উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই জেলায় সেচের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ভূপৃষ্ঠ সমতল এবং খরস্রোতা নদীর একান্ত অভাব—ফলে নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে ও খাল কেটে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন সম্ভাবনা নেই। সেচের ব্যাপারে তাই গভীর নলকূপ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে।

পরিশিষ্ট ক ও খ-এ এই জেলার সেচের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

নদীয়া জেলায় সেচের প্রধান প্রধান উৎস হল গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং নদী জলোত্তোলন প্রকল্প। এগুলো সবই কৃষিবিভাগ পরিচালনা করেন। একটি গভীর নলকূপ বসাতে মোট খরচ প্রায় ১ লক্ষ টাকা। এই খরচে ২০০ একর জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা যায়। তা হলে একর প্রতি সেচের খরচ দাঁড়ায় ৫০০ টাকা। ৪ পাম্পযুক্ত ১টি নদী-সেচ প্রকল্পে মোট খরচ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং এর সেচ এলাকা ৩০০ একর। এক্ষেত্রে

*J.M. Pringle & A.H. Kemm—Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Nadia, 1918-26, Calcutta, 1928, p.16.

একর প্রতি সেচের খরচ প্রায় ৪০০ টাকা। একটি অগভীর নলকূপের মোট খরচ ৫ হাজার টাকা এবং সেচ এলাকা ১০ একর। এতে একর প্রতি সেচের খরচ পড়ে ৫০০ টাকা।

গড়পড়তা হিসাবে একটি গভীর নলকূপের আয়ু প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর, একটি নদী সেচ প্রকল্পের আয়ু প্রায় ৮ থেকে ১০ বছর এবং অগভীর নলকূপের আয়ু আরও কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঁধ ও খালের সাহায্যে সেচব্যবস্থায় খরচও যেমন কম তেমনি স্থায়িত্বও বেশী। এই জেলায় তাই সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে বেশী। সর্বশেষ তথ্যে জানা যায় এই জেলায় ৪৬৯টি গভীব নলকূপ, ৬৪টি নদী জলোত্তোলন প্রকল্প আছে। এছাড়া সরকারী পরিচালনায় ৪৯৪১টি এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ২৫৩০টি অগভীর নলকূপ আছে। এই অগভীর নলকূপের সংখ্যা অবশ্য খুবই বাড়ছে এবং এর মাধ্যমে সেচের সুবিধা সম্প্রসাবিত হচ্ছে। গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে—এই জাতীয় বহু নলকূপই অকেজো হয়ে পড়ে থাকছে। এর ফলে সেচ এলাকাতেও একপ্রকার অনিশ্চয়তার উদ্ভব হচ্ছে।

১৯৭১-৭২ সালে ট্রান্সফর্মার চুরি ইত্যাদি কারণে প্রায় ৪৫টি গভীর নলকূপ অচল হয়ে রয়েছে। নীচে ব্লক অনুযায়ী গভীর নলকূপ, নদী জলোত্তোলন প্রকল্প ও কৃষি বিভাগ পরিচালিত অগভীর নলকূপের সংখ্যা দেওয়া হল—

	গভীর নলকূপ	নদীজলোত্তোলন প্রকল্প	অগভীর নলকূপ
কৃষ্ণনগর-১	৪৮	৬	২৫৮
কৃষ্ণনগর-২	৯	২	২৩৫
নবদ্বীপ	৯	২	১৫৫
নাকাশীপাড়া	২০	৩	৬৯৪
কালীগঞ্জ	৩৩	৫	৫৬৮
তেহট্ট-১	১৮	৫	১৮৫
তেহট্ট-২	৮	৫	১৩২
করিমপুর	৩৯	১	৪০৭
চাপড়া	২১	৪	২৭৩
কৃষ্ণগঞ্জ	১২	৭	১৫৪
শান্তিপুর	৫০	১	২৮১
হাঁসখালি	৪৮	১২	২৯২
রাণাঘাট-১	৩৬	৫	১৪৮
রাণাঘাট-২	৩৭	২	২৫৯
চাকদা	৫২	২	৩০৬
হরিণঘাটা	২৯	২	৫১৪
	৪৬৯	৬৪	৪৯৪১

স্বাধীনতার পর সেচ ও জলপথ-বিভাগ এই জেলায় কতকগুলি খাল-বিল ইত্যাদি সংস্কার ও পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ ও জল নিষ্কাশনের সুবিধা বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছেন। নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির রূপায়ণ সমাপ্ত হয়েছে (এর মধ্যে ১৬ নং, ১৭ নং এবং ১৮ নং প্রকল্প তিনটির কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি)। এর মাধ্যমে যে পরিমাণ এলাকায় সেচের সুবিধা বিস্তার সম্ভব হয়েছে তা দেখানো হল:

		সেচ এলাকা (একরে)	থানা
১।	কেচুয়াডাঙ্গা পাটাবুকাখাল প্রকল্প	১০০	করিমপুর
২।	গুড়গুড়িয়া খালের পুনঃখনন	১৫০০	নাকাশীপাড়া
৩।	হারের খালের পুনঃখনন	৬৪০	রাণাঘাট
৪।	পেটোডাঙ্গা খাল প্রকল্প	১৬০	নাকাশীপাড়া
৫।	কাটা খালের উন্নয়ন	১৬০	হাঁসখালি
৬।	হিজলী-বক্সী খালের পুনঃখনন	৩২০	রাণাঘাট
৭।	হাঁসাডাঙ্গা বিল জলনিষ্কাশন প্রকল্প	১৬০	কৃষ্ণনগর
৮।	ডহরকুঠার খালের পুনঃখনন	১২৪০	হাঁসখালি
৯।	ভৈরবচন্দ্রপুর খালের উন্নয়ন	৩৭৫০	হাঁসখালি
১০।	কাঁচকুলি খালের পুনঃখনন	২৬৪০	নাকাশীপাড়া
১১।	গাঙ্গরা খালের পুনঃখনন	৮০০	চাকদা
১২।	জগৎখালি বাঁধের পুনর্গঠন	—	কালীগঞ্জ
১৩।	গোবরি ও চাঁদ বিলের জলনিষ্কাশন	২০০০	তেহট্ট
১৪।	উখড়দা তটভূমি জলনিষ্কাশন প্রকল্প	—	চাকদা
১৫।	চুলকুরি খালের পুনঃখনন	—	চাপড়া
১৬।	নবদারা খালের পুনঃখনন	২৮০০	করিমপুর
১৭।	ট্যাংরা খালের পুনঃখনন	১৩৩০০	হাঁসখালি
১৮।	কেচুয়া বিল, নাস্তার বিলের জলনিষ্কাজন ও হাঙ্গর খালের সংস্কার	১৫০০	রাণাঘাট

উপরোক্ত ১৮টি প্রকল্প ছাড়া ঘূর্ণী, স্বরূপগঞ্জ ও নবদ্বীপে নগররক্ষার জন্য আরও তিনটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

এই জেলায় পুষ্করিণীর মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা খুবই অসুবিধাজনক কেননা জমি প্রধানতঃ বালুকাময় হওয়ায় জমির জলধারণ করার ক্ষমতা কম। ১৯৬১-৬২ সালে নদীয়া জেলাকে পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনের আওতায় আনা হয় এবং ১৯৬২-৬৩ সালে সেচ ও মৎস্যচাষ এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে জেলা শাসকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে পুষ্করিণী উন্নয়নের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়।

বেসরকারী মালিকানাধীন এবং পরিত্যক্ত পুষ্করিণীকে সর্বোচ্চ ২৫ বছরের জন্য সরকার অধিগ্রহণ করে উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ সংগৃহীত হয় সেচের কার্যে ব্যবহৃত জলের উপর ধার্য কর এবং মৎস্যচাষের

জন্য ঋীজসূত্রে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে। নীচে এই বিভাগের কার্যাবলীর সর্বশেষ বিবরণ দেওয়া হল:

সাল	যে সব পুষ্করিণীর উন্নয়ন হয়েছে	মোট ব্যয়
১৯৬২-৬৩—১৯৬৫-৬৬	৪৮	২০২৩২৯·৪০
১৯৬৬-৬৭—১৯৭০-৭১	৫৪	২৯৬৩০১·৬১
এপ্রিল ১৯৭১—নভেম্বর ১৯৭২	৫	২৯৯৯৮·৮১
	১০৭	৫২৮৬২৯·৮২

এই ১০৭টি পুষ্করিণীর উন্নয়নের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫৮৭·২৪ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য সেচের কাজে এই প্রয়াস খুবই নগণ্য; অধিকন্তু, একই সাথে সেচ ও মৎস্যচাষ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সেচের কাজে বেশী জল ব্যবহৃত হলে মৎস্যচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে নানা-প্রকার অসুবিধ দেখা দেয়। এর ফলে পুষ্করিণী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইনের সামান্য পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

মাটি ও বৃষ্টিপাতের অবস্থা এইপ্রকার থাকায় বিভিন্ন শস্যোৎপাদনের উন্নতির একটা বড় শর্ত হল নদীয়ার মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী বীজ ব্যবহারের ব্যাপক প্রসার। এ বিষয়ে জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী বীজ খামারগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে কৃষি বিভাগের অধীনে এই জেলায় ৯টি বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে—এর মধ্যে তিনটি হল জেলাভিত্তিক এবং বাকী ৬টি ব্লকভিত্তিক (১৯৭২ সালের ১লা জুলাই কল্যাণীতে অবস্থিত একটি জেলা বীজ খামার এবং চাকদায় অবস্থিত একটি ব্লক বীজ খামার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়েছে)। নীচে এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:

জেলা বীজ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ:

	স্থাপিত	আয়তন (একরে)	আবাদী জমির পরিমাণ (একরে)
১। ফুলিয়া	১৯৫৩-৫৪	১০৫·০০	৬৫·০০
২। ভাজনঘাট	১৯৫৬-৫৭	২৬৫·০০	১৯৫·০০
৩। কৃষ্ণনগর	১৯৫১	২১৮·০০	১৫৭·০০

ব্লক বীজ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ:

	স্থাপিত	আয়তন (একরে)	আবাদী জমির পরিমাণ (একরে)
৪। তেহট্ট	১৩-৯-৫৭	২৪·১৪	২০·২০
৫। করিমপুর	১৮-৯-৫৭	২৫·৪৬	২০·৯৬
৬। কালীগঞ্জ	২২-৯-৫৭	২৭·৩৩	২৩·৩২
৭। হাঁসখালি	২৬-৯-৫৭	২৬·২৬	২৩·৩৯
৮। নাকাশীপাড়া	১৫-১-৫৮	২২·৬১	১৮·০৬
৯। কৃষ্ণগঞ্জ	৩০-৩-৬১ / ১২-৪-৬১	২৫·৫১	২২·২০

এই ব্লকভিত্তিক বীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির নাম ব্লক বীজ খামার (Block Seed Farm)। ফুলিয়ার জেলাভিত্তিক খামারটির নাম জেলা বীজ খামার (District Seed Farm) এবং ভাজনঘাট ও কৃষ্ণনগরে অবস্থিত জেলাভিত্তিক খামার দুটির নাম পাট বীজ উৎপাদন খামার (Jute Seed Multiplication Farm)।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় স্বাধীনতার পরে সার ব্যবহারের জনপ্রিয়তা, সেচের সুযোগের সম্প্রসারণ ও বীজখামারের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ জেলার কৃষিতে এক সামগ্রিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। প্রাক্‌স্বাধীনতাযুগের নদীয়ার কৃষির সামগ্রিক অবস্থা, শস্যচাষ ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায় ১৯১০ সালে প্রকাশিত গ্যারেটের বিবরণীতে (J.H.E. Garrett. Bengal District Gazetteers—Nadia, 1910 pp. 67-73) কিন্তু এর তথ্য অবিভক্ত নদীয়ার এবং অনেক আগের। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের তথ্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এতে অসুবিধা হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালের ঈশাকের সমীক্ষায় (H.S.M. Ishaque—Agricultural Statistics by Plot to Plot Enumeration in Bengal, 1944-45, Part I, 1946, pp. 63-67) বিভিন্ন মহকুমার তথ্য আলাদা আলাদা দেওয়া আছে—এথেকে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট মহকুমার তথ্য একত্র করে মোটামুটিভাবে বর্তমান নদীয়ার পরিচয় জানা যায়। পরিশিষ্ট—গ'তে ঈশাক সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য, পরিশিষ্ট ঘ ও পরিশিষ্ট ঙ'তে ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিশিষ্ট চ'তে ১৯৫১-৫২ ও ১৯৬০-৬১তে মোট জমির শতকরা কতভাগ কোন ফসলের আওতায় ছিল তার তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল। পরিশিষ্ট-ছ'তে ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরে নদীয়া জেলার প্রধান প্রধান শস্যের চাষ এলাকা, মোট উৎপাদনের পরিমাণ এবং একর পিছু উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে এ জেলার জমির ব্যবহারের যে হিসাব পাওয়া যায় তা নীচে দেওয়া হল:

	(একরে প্রকাশিত)
জেলার মোট আয়তন	৯৬৫০০০
বনভূমি	৩০০০
চাষের অনুপযুক্ত জমি	১৬৯০০০
মোট আবাদী জমি	৭২১০০০
অনাবাদী জমি (চলতি কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী বাদে)	৪৪০০০
চলতি কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমি	২৮০০০
দ্বিফসলী জমি	৪৫৮০০০
আউস ধান	৩০৫০০০
আমন ধান	২২০০০০
বোরো	৭০০০
পাট	১২০০০০
মেস্তা	৪০০০০

ডাল জাতীয় রবিশস্য	২৭৪০০০
অড়হর	৩০০০০
কলাই	২৬০০০
তৈলবীজ	৭০০০০
আখ	১৬০০০
গম	৬৩০০০

(সূত্র: সার সমাচার, নবম বর্ষ ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৮)

ঈশাকের বিবরণী, ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালের আদমসুমারী এবং সর্বশেষ তথ্যের এই তুলনামূলক সংখ্যা চিত্রে দেখা যায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থার এক সামগ্রিক পরিবর্তন হয়েছে। অধিকাংশ শস্যচাষের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সুস্পষ্ট। এছাড়া অনাবাদী জমির পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

এইসব সংখ্যা চিত্রে দেখা যায় আউস ধান নদীয়া জেলার প্রধান ফসল যদিও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় আমন ধানই প্রধান। ভাদ্র মাসে এই ধান কাটা হয় বলে একে ভাদুই ধানও বলা হয়। সাধারণভাবে নদীয়ার জমি উঁচু জমির পর্যায়ে পড়ে--এজন্য আউসের পক্ষে নদীয়ার মাটি উপযুক্ত। বছরের প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আউস ধানের জমি তৈরীর কাজ সুরু হয়ে যায় এবং পুরো বৈশাখ মাস ধরে বীজ বোনার কাজ চলে। চারা ৬ ইঞ্চি বড় হলেই আগাছা নিবারণ এবং চারা পাতলা করার জন্য জমিতে বিদে চালান হয়। আউসের মাঠে আগাছার উপদ্রব একটা বড় সমস্যা। ভাদ্র আশ্বিন মাসে আউস ধান কাটা হয়। আউস ধানের চাল মোটা জাতীয় এবং সহজপাচ্য নয়। এই জেলায় আউস ধানের অনেকগুলি স্থানীয় জাতি বহুদিন থেকেই প্রচলিত যথা, সতিকা, শ্বেত জামরা, কেলে মোটা, আউস লোনা, হনুমান জোটা, লক্ষ্মীজোটা, খানজানমুনি, বেগুনবিচি, বেনামুড়ি, চাঁদমুনি, মদো, পাথরকুচি, ধাঙ্গা, পাটজল, ধরিয়াল, কটকতারা, ভুতমারি, কেলেসোনা ইত্যাদি। এই জেলায় আউসের গড় উৎপাদন একর প্রতি ১২ মণ। আউস কাটার পর রবি চাষেরজন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

আউসের পর নদীয়া জেলায় আমন ধানের চাষ প্রধান। আমন ধানের বহুসংখ্যক স্থানীয় জাতি আছে এবং এর মধ্যে কতকগুলি খুবই উৎকৃষ্ট মানের—যেমন, বদরাজ, কাতিকসাল, ঝিঙেসাল, ভাসামানিক, ক্ষীরসাল, বদকলমা, ডাহরনাগরা, দুধকলমা, কেলে, বাঁকু, গোবিন্দভোগ, বাদসাভোগ, দেবমুনি, মুক্তাহার, বয়ড়া, শালকেলে, মহাসাল ইত্যাদি। এপ্রিল মে মাসে আমনের বীজ বীজতলায় ফেলা হয়। ফসল কাটার সময় নভেম্বর ডিসেম্বর। গড় ফলন একর-পিছু ১৮ মণ। আমন ধানের বীজ এক জায়গায় তৈরী করে নিয়ে তারপর ঐ বীজতলা থেকে আমনের ক্ষেতে চারা রোওয়া হয়। আলের সাহায্যে মাঠের জল ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় এবং মাঝে দু একবার আগাছা অপসারণের ব্যবস্থা করতে হয়।

এছাড়া কিছু পরিমাণে বোরো ধানের চাষও হয়। এই ধান গ্রীষ্মকালে কাটা হয়। এর প্রধান তিনটে স্থানীয় জাতি হল কালি বোরো, সাদা বোরো এবং লালতুলোমুখী।

নীচে বিভিন্ন প্রকার ধান চাষের এলাকা এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হল :

(হাজার একরে প্রকাশিত)

	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
আমন	২২৪.৯	২৪৩.৪	২১৯.০	২২৪.০	২২০.৫	--
	(৪৬.৫)	(৪৭.২)	(৪৩.৩)	(৪৩.৭)	(৩৮.২)	--
আউস	২৫৬.৯	২৬৭.৩	২৮১.২	২৮৫.৯	৩৫৩.৩	২৯৭.৫
	(৫৩.১)	(৫১.৮)	(৫৫.৬)	(৫৫.৫)	(৬১.৩)	--
বোরো	২.২	৫.০	৬.০	৪.০	২.৭	৭.৫
	(০.৫)	(১.০)	(১.২)	(০.৮)	(০.৫)	--

(বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা উক্ত বছরে মোট ধানচাষ এলাকার শতাংশ)

ধানের পরেই অর্থকরী ফসল পাটের স্থান। আউস ধানের জমি পাট চাষের পক্ষে উপযোগী। আউস ধানের সঙ্গে পাটের জমি তৈরীর কাজও চলতে থাকে এবং মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা আসা মাত্র এপ্রিল-মে মাসে পাটের বীজ বুনে দেওয়া হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাটের ফসল তৈরী হয়ে যায়। পাট কাটার পর আঁটি বেঁধে নিকটবর্তী ডোবা বা পুকুরে ১৫-২০ দিন ডুবিয়ে রাখা হয়। পাট পচে গেলে আঁশ ছাড়িয়ে বাঁশের খুঁটিতে বাঁশ বেঁধে তার ওপর শুকানোর জন্য টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। পাটের স্থানীয় জাতির মধ্যে প্রধান প্রধান হল--বেলুন পাট, তোষা পাট, কাকিয়া বোম্বাই (ডি ১৫৪), ফন্দুক, তিতা পাট ইত্যাদি। নীচে পাট চাষের আয়তন, মোট উৎপাদন এবং একর প্রতি ফলনের চিত্র দেওয়া হল :

	আয়তন ('০০০ একরে)	উৎপাদন ('০০০ টনে)	একর প্রতি ফলন (মণে)
১৯৬৬-৬৭	১৪৭.৩	৩৯৬.২	২.৬৯
১৯৬৭-৬৮	১৮২.৪	৬৫১.২	৩.৫৭
১৯৬৮-৬৯	৮৬.২	১০০.৮	১.১৭
১৯৬৯-৭০	১৬৪.৩	৫৭৫.০	৩.৫০

পাটের পর নদীয়া জেলার অপর অর্থকরী ফসল হল আখ। আখের চাষ হয় প্রায় ১৬ হাজার একরে। নদীয়াতে একটি চিনিকল থাকায় আখের বাজার ভাল। আখ কিছু বসান হয় কার্তিক মাসে আর কিছু বসান হয় চৈত্র মাসে। আখের যে সব জাতি প্রচলিত সেগুলি হল কাজলি, খাগবাই, চিনেচম্পা, জাভা, সি,ও, ২১৩, সি, ও, ৪২১, সি, ও, ৫২৭, সি, ও, ৩১৩ ইত্যাদি। নীচের সারণীতে আখচাষ বিষয়ে কতকগুলি তথ্য দেওয়া হল। এ থেকে আখচাষের অবস্থা সম্যকভাবে অবগত হওয়া যাবে।

	আয়তন ('০০০ একরে)	উৎপাদন ('০০০ টনে)	একর প্রতি ফলন (মণে)
১৯৬৪-৬৫	১৬.৩	২৮২.৬	৪৭১ ৮৭
১৯৬৫-৬৬	২০.৪	৩৫১.৬	৪৬৯.১৯
১৯৬৬-৬৭	১৫.৫	২৯০ ৬	৫১০.৩১
১৯৬৭-৬৮	১০ ৬	১৩৬.০	৩৪৯.৩১

এই তিনটি প্রধান ফসলের চাষ উন্নত করার জন্য রাণাঘাটে ধান চাষ বিষয়ক (All India Coordinated Rice Improvement Project), কৃষ্ণনগরে পাট চাষ বিষয়ক (Indian Jute Industries Research Association) এবং বেথুয়াডহরিতে আখ চাষ বিষয়ক (Sugarcane Research Station) গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রাণাঘাটের ধান চাষ বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্রে উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত নানাপ্রকার অবস্থা, নানাবিধ রোগ ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ধান রক্ষার উপায় এবং ধানের উন্নত জাতের ক্ষেত্রে সার, সেচ ও চারা বসানোর প্রয়োজনীয় শর্তাদি নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরিবর্ত দ্রব্যের আবির্ভাবে পাটজাতীয় দ্রব্যের খুব তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব কমে যাওয়ায় এই দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। এই শিল্পকে বাঁচানোর অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তের মধ্যে রয়েছে কাঁচাপাটের উৎপাদনমূল্য কমানোর প্রচেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত পাট চাষ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বেথুয়াডহরির আখ চাষ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে উৎকৃষ্ট এবং স্থানীয় আবহাওয়া ও মৃত্তিকার উপযোগী আখের চাষ এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা। পলাশীতে একটা চিনির কল থাকায় এই অঞ্চলে আখ চাষ বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই তিনটি প্রধান প্রধান ফসলের চাষ ছাড়া এ জেলায় ডাল জাতীয় রবিশস্যের চাষ ব্যাপকভাবে হয়। রবিশস্যের চাষ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সুরু হয় এবং মার্চ মাসে কাটা হয়। রবিফসলের মধ্যে ছোলা, মশুর, মটর, অড়হর প্রভৃতি প্রধান। পূর্বে এ জেলায় সোনামুগ নামে একপ্রকার স্থানীয় মুগ চাষ হত। বর্তমানে এর চাষ খুবই হ্রাস পেয়েছে। এই সোনামুগ রঙ ও গন্ধের জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। জেলার ডালজাতীয় রবিশস্যের গড়পড়তা একর প্রতি ফলন এই রকম—ছোলা সাড়ে তিন থেকে চার কুইন্টাল, মুশুর তিন থেকে সাড়ে তিন কুইন্টাল, কলাই দুই থেকে আড়াই কুইন্টাল, মুগ দেড় থেকে দুই কুইন্টাল, আর অড়হর সাড়ে তিন থেকে চার কুইন্টাল।

রবিফসল হিসাবে গমের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তেহট্ট এবং করিমপুর থানা এলাকায় তৈলবীজ শস্যের চাষ হয়। ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলায় রবি মরশুমে ডাল শস্যের চাষ ছিল ২ লক্ষ ৭৪ হাজার একরে। এছাড়া খরিফ মরশুমে প্রায় ৩০ হাজার একরে অড়হরের চাষ ও প্রায় ২৬ হাজার একরে কলাইয়ের চাষ হত। মোট ৩ লক্ষ ৩০ হাজার একরে ডাল জাতীয় শস্যের চাষ হত। ১৯৭০-৭১ সালে ডাল শস্যের চাষ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৯১ হাজার একরে। ঘাটতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৯ হাজার একর। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই জেলা ডাল-জাতীয় শস্যে উদ্বৃত্ত ছিল, ১৯৭০ থেকেই ডালশস্যে ঘাটতি সুরু হয়েছে। গভীর নলকূপ, নদী জলোত্তোলন প্রকল্প ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের পর এই জেলার বেশ কিছু পরিমাণ জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। সেচ এলাকা বেড়ে যাওয়ার পর থেকেই উচ্চফলনশীল গমচাষের এলাকা বাড়তে সুরু করেছে—আর সেই পরিমাণে ডালশস্যের চাষ কমতে সুরু করেছে। গম চাষের অগ্রগতিই এই ঘাটতির প্রধান কারণ। এই জেলায় সাধারণভাবে ডাল শস্যের একক এবং মিশ্রচাষ উভয়ই হয়। প্রধান প্রধান মিশ্রচাষ হল ছোলার সাথে গম, ছোলার সাথে সর্ষে বা রাই বা তিসি, ছোলার সাথে যব, মশুরের সাথে রাই, দেশীয় মটরের সাথে রাই—আবার কোন কোন জায়গায় মশুর, যব ও সর্ষে এই তিনটি মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হয়ে থাকে। অড়হর চাষ নদীয়ায় ব্যাপকভাবে হয়। কোন বছর বৃষ্টিপাত কম হলে আউসের ফলন ভাল না হলেও অড়হরের স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

এই সব প্রধান প্রধান ফসল ছাড়া এ জেলায় খুব উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন হয়—যেমন আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কলা, লিচু ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ জেলায় বহু খেজুর গাছ থাকায় শীতকালে প্রচুর পরিমাণে খেজুর গুড় তৈরী হয়। ১৯৬৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায় (B. Banerjee & N. M. Bowers—The Changing Cultural Landscape of Nadia, p. 17) এ জেলায় ৪২০০০ খেজুর গাছ আছে এবং তা থেকে বছরে প্রায় ৩০০ টন গুড় তৈরী হয়। ফলচাষ উন্নয়নের জন্য কৃষ্ণনগরস্থিত ফলগাছ গবেষণা কেন্দ্র (Horticultural Research Station) এবং বাঙ্গুরিয়াস্থিত লেবু জাতীয় ফলের উন্নয়ন কেন্দ্র (Citrus Station) দুটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণনগরস্থিত ফলগাছ গবেষণা কেন্দ্রটি বহু পুরাতন। এটি স্থাপিত হয় ১৯৩২ সালে। সুরুতে সরকারী প্রদর্শন খামারের পার্শ্ববর্তী ১৬ একর খাসমহলের জমি এই উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়। পরে

১৯৪৬ সালে প্রদর্শন খামারের ৪০ একর জমিকেও এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কেন্দ্রে উন্নত জাতের ফল, তরি-তরকারি ও সবজি উৎপাদন করা, বিভিন্ন ফলোৎপাদনের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা-পদ্ধতি নির্ধারণ করা, ভাল জাতের চারা ও কলম তৈরী করা ইত্যাদি হয়ে থাকে।

স্বাধীনতার পর হরিণঘাটাকে কেন্দ্র করে দুগ্ধজাত শিল্পের প্রসার হচ্ছে এবং এর ফলে পশুখাদ্য চাষেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নদীয়ার আবহাওয়া মোটামুটি শুকনো এবং কাছে কলকাতার বাজার থাকায় এই জেলা পশুপালন বিশেষতঃ মুরগী পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ জেলায় মুরগী পালন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুরগীর খাদ্যের জন্য ভুট্টার গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গঙ্গা-১০১, গঙ্গা-৩, কিষাণ, এ-ডি কিউবা প্রভৃতি জাতের ভুট্টা এ জেলায় ভাল হয়।

এছাড়া বর্তমানে সয়াবীন চিনেবাদাম ইত্যাদি চাষেরও প্রচলন হয়েছে। সয়াবীনে প্রায় ৪৪ শতাংশ প্রোটীন খাদ্যপ্রাণ থাকে। সয়াবীন চাষের অন্তর্গত জমির পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খুব সাম্প্রতিক কালে এই জেলায় উচ্চফলনশীল ধান ও গম চাষের অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে উচ্চফলনশীল জাতের গম চাষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত উচ্চফলনশীল জাতের খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে বিস্তৃতি হয়েছে তা জেলার মোট উৎপাদনের দিক থেকে তত প্রাধান্যলাভ করেনি। ১৯৬৯-৭০ সালের হিসাবে দেখা যায়;

উচ্চফলনশীল	আউস ধান চাষ হত	২২'৫ হাজার একরে
উচ্চফলনশীল	আমন ধান চাষ হত	১০'৪ হাজার একরে
উচ্চফলনশীল	বোরো ধান চাষ হত	৪'৪ হাজার একরে
উচ্চফলনশীল	গম চাষ হত	৫৮'০ হাজার একরে
		৯৫'৩

ওপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে জেলায় উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্য চাষের অন্তর্গত জমির পরিমাণ মোট ৯৫'৩ হাজার একর। মোট আবাদী জমির পরিমাণের দিক থেকে এই অংশ খুবই কম। অবশ্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট উচ্চফলনশীল ধান চাষের আওতায় যে জমি আছে তার শতকরা ৬'৪ ভাগ হল নদীয়ায়, গমের ক্ষেত্রে এই হার শতকরা ১৩'৪।

দেখা গেছে এই জেলায় উচ্চফলনক্ষম জাতের ধান চাষ করে খরিফখন্দে একর প্রতি ৯৪ মণ এবং রবিখন্দে একর প্রতি ১০৫ মণ এবং উচ্চফলনক্ষম গম চাষ করে একর প্রতি ৬০ মণ অবধি ফলন পাওয়া যায়। উচ্চফলনক্ষম জাতের ফসল চাষের কর্মসূচী সুরু হওয়ার পর কয়েক বছরে কি রকম অগ্রগতি হয়েছে নীচের তালিকায় তা দেখানো হয়েছে।

আয়তন '০০০ একরে, উৎপাদন '০০০ মেট্রিক টনে

	ধান		গম	
	আয়তন	উৎপাদন	আয়তন	উৎপাদন
১৯৬৬-৬৭	৩'০	২'৩	০'৫	'০৩৪
১৯৬৭-৬৮	১৫'৯	১৪'৩০	৮'৫	৬'৩৪
১৯৬৮-৬৯	৩৫'৯	৩৬'৪	৩৭'৩	৩৫'০
১৯৬৯-৭০	৩৭'২	৪২'০	৬৩'৭	৬৪'৫
১৯৭০-৭১	৪৪'৬৭	৫০'৫	১৪০'০	১৪২'০
১৯৭১-৭২	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত		১৮৫'০	—

ওপরের এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে নদীয়ায় উচ্চফলনশীল জাতের খাদ্যশস্য চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই উচ্চফলনশীল জাতের শস্যোৎপাদনের কর্মসূচীর সুরুতে তাইচুং-৬৫, তাইনান-৩, কলিম্পং-১ ও ২ প্রভৃতি ফরমোজান জাতীয় উচ্চফলনশীল ধানের ব্যবহার সুরু হয়; কিন্তু পরে এগুলির চেয়ে অনেক উন্নত আই-আর-৮ ধান উচ্চফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দেয়। পরবর্তীকালে জয়া, পদ্মা, বালা, রত্না, বিজয়া প্রভৃতি জাতের ধান এখানকার কৃষকদের মধ্যে চালু করা হয় এবং এগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গমের বেলায়ও প্রথম দিকে উচ্চফলনশীল জাত হিসেবে সোনোরা-৬৪ লারমারো প্রভৃতি জাতের গম চাষ সুরু হলেও পরবর্তীকালে সোনালিকা, কল্যাণ সোনা, সরবতী সোনোরা, ছোটি লারমা প্রভৃতি উন্নততর উচ্চফলনশীল জাতের গম এই জেলায় প্রধান হয়ে উঠেছে।

উচ্চফলনশীল ধান ও গম চাষের কর্মসূচী ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রথম এই জেলায় সুরু হয়। প্রথম বছর এই কর্মসূচীতে ধান চাষের এলাকা ৩৯০০ একর ছিল, ১৯৭০-৭১ সালে এই এলাকা বেড়ে ৩৭৩০০ একরে দাঁড়িয়েছে। আরও বেশী এলাকা এই কর্মসূচীর আওতায় আনার পথে প্রধান বাধা হল—মাটি প্রধানতঃ হাল্কা ধরনের হওয়ায় বারবার বেশী পরিমাণে সেচের প্রয়োজন হয়। অথচ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে সাধারণভাবে এই জেলায় সেচের সুবিধা খুব কম এলাকাতে আছে। আজকাল গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ইত্যাদির মাধ্যমে যেখানে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেও অকেজো হয়ে পড়ে থাকা, ট্রান্সফর্মার চুরি ইত্যাদির জন্য সেচের জল সরবরাহের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭ সালের আগে নদীয়া জেলায় গম চাষ খুব অল্প পরিমাণ জমিতে হত কিন্তু মেক্সিকান জাতের গম আসার পর গমের এলাকা দ্রুত বাড়তে থাকে। মেক্সিকান গম চাষের এলাকা বাড়ার প্রধান কারণ হল এগুলি স্বল্পকালীন ফসল, দেরীতে বুনলেও ফলনে বিশেষ তারতম্য হয় না।

পাটের ফলন এবং আঁশের মান দুই-ই উন্নত করার জন্য যে এলাকায় পাট পচানোর স্বাভাবিক সুব্যবস্থা আছে, সেখানে উন্নত প্রথায় পাট চাষ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার মূল কথা হল উন্নত জাতের পাট বীজ সরবরাহ, উন্নত চাষ ব্যবস্থা অবলম্বন,

ঠিক সময়ে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, সঠিক পদ্ধতিতে পাট পচানো ও আঁশ ছাড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ এবং পাটের সুষ্ঠু বিপনন ব্যবস্থা সংগঠন যাতে অধিক পরিমাণে, উন্নত মানের পাটের সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৮-৬৯ সালে ২০০০ একর পরিমাণ জমিতে পাট চাষের প্যাকেজ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে ৬০০০ একরে এই পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৭০-৭১ সালে ১৩০০০ একর জমি এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয় এবং ১৯৭১-৭২ সালে ২৬০০০ একরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এই কর্মসূচী গ্রহণের আগে একর প্রতি পাটের উৎপাদন ২·৫ থেকে ৩·২ গাঁট ছিল। প্যাকেজ প্রোগ্রামের জমি থেকে ফসল কাটার পর দেখা গেছে একর প্রতি প্রায় ৩·৫ থেকে ৪·০ গাঁট পাট পাওয়া যেতে পারে।

এই জেলায় একটা চিনির কল থাকায় আখ চাষের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জেলার আখ চাষের ৪৫ শতাংশ সেচবিহীন এলাকায় অবস্থিত। এই জেলায় গত তিন বছরে আখ চাষের অন্তর্গত জমির পরিমাণ গড়ে ১৬০০০ একর—এই আখ চাষ এলাকার প্রায় অর্ধেক পলাশীস্থিত চিনিকলের সন্নিকটবর্তী। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিনিকল এলাকায় আখের নিবিড় চাষের ব্যবস্থা করা হয়। এই নিবিড় চাষের প্রকল্পে ১০০০০ একর নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে জোরদার করা হয়। এই উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে 'ইক্ষুউৎসব' পালন করা হয়। ১৯৭০ সালে চিনিকল এলাকায় আখ উন্নয়ন পর্ষদ (Sugarcane Development Council) গঠিত হয়েছে। পলাশীস্থিত চিনিকলে ১৫০ দিন ধরে প্রতিদিন ১২৫০ মেট্রিক টন করে আখ মাড়াই করলে মোট আখের প্রয়োজন দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ কুইন্টাল। এই কারখানার উন্নতির জন্য প্রয়োজন আখ চাষের বিস্তৃতি। আখ উন্নয়ন পর্ষদের সামনে রয়েছে এই বিরাট দায়িত্ব।

একদিকে যেমন ধান ও গমের উচ্চফলনশীল জাতের বীজ প্রবর্তন, পাটের প্যাকেজ প্রোগ্রাম, আখের নিবিড় চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে নদীয়া জেলার প্রধান প্রধান ফসল চাষের উন্নতির চেষ্টা চলেছে তেমনি সাম্প্রতিককালে কৃষির উন্নতির জন্য এক সর্বাত্মক কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রধানতঃ প্রদর্শনমূলক হলেও এর দ্বারা কৃষকদের উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করা সম্ভব হবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কালীগঞ্জ থানার ৩৩টি মৌজায় ২৩০০০ একর পরিমাণ জমিতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। একে আয়াকাট উন্নয়ন প্রকল্প বলা হয়। আবাদযোগ্য এলাকাকে তামিল ভাষায় আয়াকাট বলে। দেবগ্রামে এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে অল্প কয়েকজন কর্মী নিয়ে কাজ সুরু হয়। ১৯৭০-৭১ সালে অধিকাংশ পদেই কর্মীদের নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও অবধি যা অগ্রগতি হয়েছে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

(১) চাষীর জমি বিষয়ে তথ্যাদি, জমি থেকে আয়ব্যয়ের হিসাব, কৃষি-ঋণ ও কৃষিজাত দ্রব্য বিপনন ব্যবস্থা সম্পর্কে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন হয়েছে।

(২) মাঠে সেচের জল সরবরাহের জন্য কাঁচা নালা থাকায় চুইয়ে প্রচুর জলের অপচয় হয়। গভীর নলকূপ ও নদী সেচ এলাকায় ৩২০০ ফুট লম্বা উন্নত ধরনের নালা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ৪০০ ফুট লম্বা উন্নত ধরনের নালা (ড্রপপিট, চেক গেট সহ) অগভীর নলকূপ এলাকাতেও তৈরী করা হয়েছে। এই উন্নত ধরনের নালা নির্মাণের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ প্রদর্শনমূলক যাতে চাষী এগুলির উপযোগিতা বুঝে নিজেরাই এ ধরনের নালা নির্মাণে উৎসাহী হন। এ সম্বন্ধে সকল রকম কারিগরী সাহায্য 'ষ্টেট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট পাইলট প্রজেক্ট' থেকে দেওয়া হবে।

(৩) এই এলাকায় ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি গভীরতা অবধি ৬৬০ ফুট অন্তর মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এগুলির পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল মৌজার মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট করে মানচিত্র বিতরণের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

(৪) সেচের জল সুষ্ঠু বিতরণের জন্য ১৫০ একর জমি সমতল করা হয়েছে।

(৫) প্যাকেজ পদ্ধতি ও উন্নত চাষ প্রথা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য (প্রতিটি প্রদর্শন ক্ষেত্রের আয়তন এক একর) ২৫টি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে।

এ সবের মাধ্যমে একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এক-ফসলী বা দো-ফসলী জমিকে বহুফসলী জমিতে পরিণত করার এক বৃহৎ আয়োজন চলেছে। কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় কৃষককে অবহিত করে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত ও বিজ্ঞান-সম্মত কৃষির বাস্তব রূপায়ন সম্ভব করে তোলাই হল আমাদের সামনে প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছরের মধ্যে বিবিধ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে এই জেলার কৃষিক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে সুরু করেছে—আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই জেলার কৃষি সর্ববিষয়ে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে এবং লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হবে।

পরিশিষ্ট ক

নদীয়া জেলায় ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী সেচের অধীন এলাকা

(একরে প্রকাশিত)

	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১০৭০-৭১	১৯৭১-৭২
১। গভীর নলকূপ	১২৬৭৫.০০	২১১৬৪.০০	২১৮০৪.০০	৪৫৭০০.০০	৪৬৯০০.০০
২। অগভীর নলকূপ	৩৮৫০.০০	৪৯০০.০০	১১১৩৫.০০	৩৫০০০.০০	৪৯০০০.০০
৩। নদী জলোত্তোলন প্রকল্প	৪৪৭.০০	১৪৭২.০০	১৯০০.০০	৩৪০০ ০০	৬৪০০.০০
৪। সরকারী খাল	—	—	—	—	—
৫। বেসরকারী খাল	৯৫০ ০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৯৫০.০০
৬। পুকুর	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০
৭। কূপ	—	—	—	—	—
৮। অন্যান্য সূত্র	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৯২০.০০	২৯২০.০০

পরিশিষ্ট খ

নদীয়া জেলায় বিভিন্ন শস্যচাষের ক্ষেত্রে ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত মোট সেচ-এলাকার পরিমাণ

(একরে প্রকাশিত)

	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২
আউস	৪৭৯০.০০	১১২৮০.০০	১৭৫০০.০০	১০৭০০.০০	১৫০০০.০০
আমন	৩৮৭৪.০০	১১৬০৮.০০	১০২৭৪.০০	১১৫০০.০০	১৯০০০.০০
পাট	১৮২০.০০	৫৩৪৪.০০	২৮৯২.০০	৪৯৬১ ০০	৮০০০.০০
গম	১০৩০০.০০	২৪২৫০.০০	৪৮২০০.০০	৫৫০০০.০০	৭৭০০০.০০
ডালজাতীয় শস্য	৫৯৫.০০	৫৮০.০০	—	—	—
সর্ষে	—	১৬৫০.০০	৫২৪২.০০	৫০০.০০	৪০০.০০
তরিতরকারি	১৭১৬.০০	১৯০৪.০০	২৫০০.০০	৪৫৯.০০	৪৫০.০০
বোবো ধান	৪০০০.০০	৫৫০০.০০	৭৪০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০০.০০
আখ	৩২০০.০০	১৮৫০.০০	২৬৪২.০০	২৭০০.০০	২৭০০.০০

পরিশিষ্ট গ

ঈশাক-সমীক্ষায় (১৯৪৪-৪৫ সাল) প্রাপ্ত তথ্য (একরে প্রকাশিত)

(কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট মহকুমাদ্বয় একত্রে)

ধান মোট	৪৯৬৫৭৬.০১	যব	২৩১৩.২৯
আমন	২১৪৯৯৬.২০	মুশুরি	৩৪৬৩৮.৪৫
আউস	২৮১১৭৫.৯৮	মুগ	৩৭৭.০৫
বোরো	৪০৩.৮৩	মাসকলাই	১৬৯৭.৯৪
ডালজাতীয় শস্য মোট	১৬৪৬০৫.৫৯	খেসাড়ি	৪৭৫৯.১৬
ছোলা	১০০০৫৩.৪৬	অড়হর	১২৩৭৬.৬৪
গম	৭৭৮৯.৫০	ভুট্টা	৬০০.১০

অন্যান্য খাদ্যশস্য	
আখ	৬৩৮৪'৭৬
চিনেবাদাম	'৯২
সর্ষে	১১৬৯৭'৯২
তিল	৭২১'১৪
লঙ্কা	৯৫৭'৪১
আলু	৮৬৫'৯০
পেঁয়াজ ও রসুন	৪৮০'৮০
অন্যান্য তরকারি	১৩১৬০৯'৬১
তন্তুজাতীয় ফসল	
পাট	২১৫৮২'৬৮
মেস্তা	২২'২১
ফল ও অন্যান্য	
নারিকেল	৩২৫'৬৫
গুপুরি	৪'০০
আম	১১৯৫৪'৪৯
খেজুর	৭৩৪'৬৪
অন্যান্য ফল	৮২১৬'১৭
পানের বরজ	১৯২'৭৮
বাঁশবন	১২৪৪৪'৭১
অন্যান্য	১৪১৯'৪৮
তামাক	৯৩২'৭৫
চাষের অনুপযুক্ত জমি মোট	১০৮৯৬২'৮৪
এর মধ্যে, পুকুর	৮৪২৯'০৪
খাল, বিল, নদী প্রভৃতি	৬৯৯৯৫'৫৫
রাস্তাঘাট বাঁধ রেলপথ প্রভৃতি	১৯৬৬৮'৮৫
দোকানপাট বাড়ীঘর মন্দির মসজিদ প্রভৃতি	৩৩১৬৫'০১
অন্যান্য	৭৭০৪'৩৯
চাষের উপযুক্ত কিন্তু অনাবাদী মোট	১৬১২৩৯'১৯
এর মধ্যে, আবাদযোগ্য পতিত	১২৫৮৬৮'৫০
ভিটে	১৬০০৯'৬৭
পশুচারণক্ষেত্র	৫৫৫'৩১
জঙ্গল	১৫০২১'১৫
খেলার মাঠ ইত্যাদি	১৮৪০'৯১
অন্যান্য	১৯৪৩'৬৫
মোট আয়তন	৯৩৮৭৭১'৫৪

পরিশিষ্ট ঘ

১৯৫১ সালের আদমসুমারীর বিবরণে নদীয়ার কৃষি বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য (একরে প্রকাশিত) :

মোট চাষ বহির্ভূত জমি (হাল আমলের পতিত, চাষের উপযুক্ত অথচ পতিত এবং চাষের অনুপযুক্ত জমি একত্রে)	৩৩৮২০৭
এর মধ্যে, চাষের অনুপযুক্ত জমি	১০৫৯৬২
চাষের উপযুক্ত অথচ পতিত ও হাল আমলের পতিত জমি একত্রে	২৩২২৪৫
মোট কৃষিজমি	৮৬০২১৬
এর মধ্যে দোফসলী	২৭৬৬৫২
ভাদুই শস্যের অন্তর্গত	৬৪০৮১৬
আমন শস্যের অন্তর্গত	২১০৭৬৫
রবি অথবা খরিফ শস্যের অন্তর্গত	২৬৫৩৪৬
অন্যান্য (আম, পান, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি)	৪৩২৮৯

পরিশিষ্ট ঙ

১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী কত জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হত তার তুলনামূলক হিসাব :

(একরে প্রকাশিত)

	১৯৫১	১৯৬১
আউস ধান	১৯৩৯৭৬	২৮১২০৬
আমন ধান	২১০৭৬৫	২৬১২০৬
বোরো ধান	৮৫১	১৯৭৭
গম	২৪৮০০	১০১৩১
যব	৬১০০	১০১৩১
ছোলা	৮৬৫০০	১২৪৭৮৮
ডাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য	১০২৫৯৪	২৫০০৭০
তিসি বা মসনে	১৫০০০	৩৭৩১৩
তিল	৬০৫	৭৪১
সর্ষে	৮০০০	২২৭৩৪
আখ	৫৭৩৩	১৭৭৯২
পাট	—	৭৩৮৮৪
অন্যান্য তন্তুজাতীয়	—	৪৫৯৬২

পরিশিষ্ট চ

১৯৫১-৫২ এবং ১৯৬০-৬১-তে মোট এলাকার শতকরা কত ভাগ বিভিন্ন ফসল চাষের আওতায় ছিল তা নীচে দেখানো হয়েছে—

	১৯৫১-৫২	১৯৬০-৬১
ধান মোট	৫১.১৭	৪৭.১৯
আউস	২৫.৯৫	২৪.৩৯
আমন	২৫.০৭	২২.৬৪
বোরো	০.১৫	০.৭১
গম	২.৪২	০.৮৮
ভুট্টা	০.১১	০.২
ছোলা	২.০৯	১০.৮২
অন্যান্য খাদ্যশস্য	—	২১.৬৮
আখ	০.৭০	১.৫৪
তিসি বা মসনে	২.২৪	৩.২৩
ফল ও সব্জি	—	০.৭৭
পাট	১৯.২৭	৬.৪১

পরিশিষ্ট ছ

১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরে নদীয়া জেলার প্রধান প্রধান শস্যের চাষ এলাকা, মোট উৎপাদন ও একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ

	শস্যের নাম	আয়তন (হাজার একরে প্রকাশিত)					মোট উৎপাদন (হাজার টনে প্রকাশিত)					একর প্রতি উৎপাদন (মণে প্রকাশিত)				
		১৯৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭	৬৭-৬৮	৬৮-৬৯	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭	৬৭-৬৮	৬৮-৬৯	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭	৬৭-৬৮	৬৮-৬৯
১।	আউস	২৫৬.৯	২৬৭.৩	২৮১.২	২৮৫.৯	৩৫৩.৩	১১৩.০	৮০.৯	৭৪'৭	১০১'৯	১১৮'৬	১১'৯৭	৮'২৪	৭'২৩	৯'৭০	৯'১৩
২।	আমন	২২৪.৯	২৪৩.৪	২১৯.০	২২৪.৯	২২০.৫	১০৪.৮	৯১.৯	৫৩'২	৮৩'৬	৯২'০	১২'৬৯	১০'২৮	৬'৬১	১০'১২	১১'৩৬
৩।	বোরো	২.২	৫.০	৬.০	৪.০	২.৭	১.১	২.৫	৩'৩	৩'৫	৩'৫	১৩'০০	১৩'৫০	১৫'০০	২৪'০০	৩৫'২০
৪।	গম	১১.৪	১০.১	১০.১	১৩ ৭	--	২.৬	৩.০	৩'৬	৩'৬	--	৬'১২	৮'০১	৯'৭১	৬'৫৭	—
৫।	ভুট্টা	০.৪	০.৫	০.৪	০.২	০.২	০.১	০.১	০'১	ক	ক	৫'০০	৫'৫০	৫'০০	৬'০০	৫'০০
৬।	ডালজাতীয়	৩২.৮	৩৭.৮	৩৭.১	২৫.৬	৩৪.৩	১১.৪	১১.৭	১০'৮	৭'৩	৭'৩	৯'৪৫	৮'৩৯	৭'৯৬	৭'৭২	৫'৭৯
৭।	ছোলা	১২৫.৬	১২৮.২	১৩৭.১	২০০.৭	১৫৫.৭	৩৪.৪	২৬.০	৪০'৬	৫৯'১	৩২'০	৭'৪৬	৫'৫১	৮'০৬	৮'০১	৫'৬০
৮।	ডাল জাতীয় খরিফ শস্য (ছোলা ও ৬ নং বাদে)	--	৪২.০	২৫.৬	২৭.৩	৩০.২	--	১২.৯	৭'৭	৭'৫	৮'৭	--	৮'৩৮	৭'৮৬	৭'৪৭	৭'৮৫
৯।	তিল	১.৩	৩.০	২.৬	১.৮	--	০.৩	০.৬	০'৫	০'৪	--	৫'১৯	৫'২৬	৪'৮২	৫'৪৪	—
১০।	তিসি বা মসিনে	১৩৮.৯	৪০'২	৩৮.৯	২৮.৮	২৩.৫	৩.৬	৩.০	৩'৪	৩'৮	২'৩	২'৬০	২'০৩	২'৩৬	৩'৬১	২'৬২
১১।	সর্ষে	২৫.১	৪৪.২	৩৫.৭	৩৭.৮	২২.০	২.৯	৭.০	৫'৭	৫'৮	২'৬	৩'১৫	৪'৩০	৪'৩৮	৪'১৫	৩'২৫
১২।	মেস্তা*	৫৩.৫	৩১.৭	২৪.২	২৫.৯	১৫.১	১৪৭.১	৬৯.৭	৪১'৯	৮০'৮	২৫'৭	২'৭৫	২'২০	১'৭৩	৩'১২	১'৭০
১৩।	তামাক**	৪০০	৪০০	৪০০	৫০০	—	৬০	৭০	৬৫	৮০	—	৪'১৮	৪'৫৫	৪'৬১	৪'৩০	—
১৪।	আদা জাতীয়	৫০০	৫২০	৫৩০	৩০	২৫	৪০৫	৪৩০	৪৯০	২০	১৫	২২'০০	২৩'০০	২৫'০০	১৫'০০	১৬'০০
১৫।	পাট*	--	--	১৪৭.৩	১৮২.৪	৮৬.২	--	--	৩৯৬'২	৬৫১'২	১০০'৮	—	-	২'৬৯	৩'৫৭	১'১৭
১৬।	আখ	১৬.৩	২০.৪	১৫.৫	১০.৬	—	২৮২.৬	৩৫১.৬	২৯০'৬	১৩৬'০	--	৪৭১'৮৭	৪৬৯'১৯	৫১০'৩১	'৩৪৯'৩১	--

*উৎপাদন '০০০ গাঁট, হিসাবে—একর পিছু উৎপাদনও গাঁটে প্রকাশিত। **আয়তন একরে — উৎপাদন টনে।

'ক' চিহ্নের দ্বারা ৫০ টনের কম বোঝান হয়েছে।

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা

প্রাক্ স্বাধীনতাকালে অবিভক্ত বাংলার পশুপালন বিভাগের কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকায়। তখন গো-উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নীতি বা পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ হয়নি এবং যেটুকু কাজ হয়েছে তার মধ্যে ছিল ধারাবাহিকতার বিশেষ অভাব। ১৯৪২ সালে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি উন্নত জাতের ষাঁড় বিতরণ করে গো-প্রজননের কাজ চলত। একই সঙ্গে খাদ্য ও প্রতিপালনের দিকে তেমন লক্ষ্য দেওয়া হত না। তাই গো-উন্নয়নে এই সময় বিশেষ কোন কাজ হয়নি বললেই চলে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গো-উন্নয়নের কাজ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। ১৯৪৭ সালে হরিণঘাটা ও কল্যাণী পশুপালন খামার স্থাপিত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম গো-প্রজনন কেন্দ্র হরিণঘাটায় সুরু হয়। বর্তমানে নদীয়া জেলায় মোট ১২টি গো-প্রজনন কেন্দ্র ও ১১৩টি উপকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলি যথাক্রমে হরিণঘাটা, মদনপুর, চাকদহ, রাণাঘাট, ফুলিয়া, হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, বেথুয়াডহরী, দেবগ্রাম, পলাশী ও চাপড়ায় অবস্থিত। প্রতিটি উপকেন্দ্রে একজন করে কেন্দ্রসহায়ক রয়েছেন। এঁদের প্রধান কাজ গো-প্রজনন, নিকৃষ্ট ষাঁড়ের বলদীকরণ, গো-খাদ্য বিক্রয় এবং স্বল্পমূল্যে পশুখাদ্যের বীজ বিতরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিবিড় গো-উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছেন ১৯৬৫ সালে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সমগ্র নিবিড় গো-উন্নয়ন অঞ্চলকে ২টি ব্লকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। ১নং ব্লকের সদরকেন্দ্র কৃষ্ণনগরে। ২নং ব্লকের সদর কেন্দ্র বারাসতে। নদীয়া জেলার পরিকল্পনাভুক্ত থানাগুলির নাম কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, তেহট্ট (আংশিক), নবদ্বীপ (আংশিক), শান্তিপুর, হাঁসখালি, রাণাঘাট, চাকদহ এবং হরিণঘাটা।

হরিণঘাটা খামারে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে হলষ্টীন জার্সি জাতীয় ষাঁড় ও দেশী গরুর সংমিশ্রণে উদ্ভূত শংকর গরু হরিয়ানা জাতের গরু অপেক্ষা ৪।৫ গুণ বেশী দুধ দেয়। তাই ১৯৬৮ সালে এই জাতীয় শংকর প্রজননের দিকে দৃষ্টি রেখে নদীয়া জেলায় বেথুয়াডহরী ও হরিণঘাটায় দুটি গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই দুটি কেন্দ্র থেকে দৈনিক প্রায় ১৫০০ মিলিমিটার গো-বীজ বিভিন্ন কেন্দ্রে ও উপকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। এখানে হলষ্টীন ও জার্সি জাতের মোট ৪১টি ষাঁড় আছে। গো-প্রজনন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ১৯৬৫ সাল থেকে এই জেলায় যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল:

(১)	গো-প্রজননের সংখ্যা		২৪৪,৬৫৮
(২)	বাছুরের সংখ্যা	পুং	৪৫,৩২৫
		স্ত্রী	৪০,৫৪৬
		মোট	৮৫,৮৭১
(৩)	বলদীকরণের সংখ্যা—		৩৫,৭৩৬

(৪) সুষম গো-খাদ্য বিক্রয় —১৫২৯ মেট্রিক টন।
(৫) বে-সরকারী গো-খামারের সংখ্যা—১৪৫
(৬) সমবায় দুগ্ধ উন্নয়ন ও বিক্রয় সমিতি—২৭
(৭) গো-খাদ্যের বীজ বিক্রয়—৫৫০০ কু:
(৮) গো-খাদ্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র—১৪৪২
(৯) খড় কাটার যন্ত্র বিতরণ—৩৮১

হরিণঘাটা ও কল্যাণী পশুপালন খামার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৭ সালে খোলা হয়:

(১) গরু, মুরগী, হাঁস, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর সুষ্ঠুভাবে পালন।
(২) পশুপালন সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ জ্ঞান গ্রামবাসীদের মধ্যে সম্প্রসারণ।
(৩) পশুপালন সম্বন্ধে গ্রামের লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে নূতন জাতের পশুপক্ষীর সৃজন সম্ভব হয়।

এই খামারের গো-খাদ্য উৎপাদন শাখার অধীনে মোট ৪৩৩৫ একর জমি আছে। এর মধ্যে চাষোপযোগী জমির পরিমাণ ২৪৮১-০৮ একর। এখানে নেপিয়ার, হাইব্রিড, প্যারা, জোয়ার, ভুট্টা, বারসীম, লুসার্ণ ও ওট্ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। যাঁরা দুধেল গরু পালন করেন তাঁরা গরুর খাদ্য হিসোবে কাঁচা ঘাসের উপযোগিতা বিলক্ষণ জানেন। একটি দুধেল গরুর দৈনিক কমপক্ষে ১৫ কেজি হারে কাঁচা ঘাসের প্রয়োজন। দুধের উৎপাদন ও গরুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির পক্ষে শুধুমাত্র কাঁচা ঘাসই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে সুষম গো-খাদ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। একথা স্মরণ রেখে এই জেলার পশুপালন দপ্তর কেবলমাত্র এ বছর জেলাশাসকের সহায়তায় প্রায় ৬০ টন নেপিয়ার ও প্যারা ঘাসের কাটিং বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। হরিণঘাটা ও ফুলিয়াতে ২টি গো-খাদ্য খামার এই সব চাহিদা মেটাবার জন্য খোলা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে প্রতিটি ব্লকে যাতে কমপক্ষে একটি করে গো-খাদ্য খামার ও ডেয়ারী ফার্ম করা যায় তার পরিকল্পনাও রয়েছে। কল্যাণী গো-পালন খামারটি ১৯৬৫ সালে শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে কী ধরণের শংকর জাতীয় গরু ভাল হতে পারে তার সম্বন্ধে গবেষণা করাই এই খামারটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

হরিণঘাটা গো-পালন খামারে ভারতের বিভিন্ন জাতের গরু যেমন, হরিয়ানা, সিন্ধি, সাইওয়াল, আরপারকার, গীর এবং মুরা জাতীয় মহিষ নিয়ে গবেষণা চলছে।

এখানকার ষাঁড় ও বকন বাছুর উৎপাদন শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন জাতের ষাঁড় ও বকন বাছুর তৈরী করে গ্রামবাসীদের কাছে বিক্রয় করা।

এই খামারের শূকর পালন কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন হাজার শূকর পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এখান থেকে খাদ্য উপযোগী তৈরী মাংস বিক্রয় করার জন্য একটি কারখানাও রয়েছে। এই কারখানা থেকে উৎপন্ন মাংস কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে বিক্রী করার ব্যবস্থা আছে।

এখানকার হাঁস ও মুরগীর খামারে এখন বিভিন্ন জাতের মুরগীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ এবং হাঁসের সংখ্যা প্রায় ১০০০। এছাড়া সাহাবাদী মান্ডি ও নেলোর জাতীয় প্রায় ৪০০ ভেড়া নিয়ে এবং ১৫০টি দেশী ছাগল নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার কাজ এখানে চলেছে।

গরুর খাবারের রাসায়ণিক পরীক্ষার জন্য রসায়ণ বিভাগ, বিভিন্ন জাতীয় ঘাসের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র, দুই বছরে ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী ডিপ্লোমা পড়াবার জন্য শিক্ষায়তন, সুষম গো ও শূকর খাদ্য তৈরীর কারখানা, পশু চিকিৎসা বিভাগ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের তদারকিতে শংকর জাতীয় গরু উৎপাদনের খামার রয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসারে ও বেকার সমস্যা সমাধানে গো-পালনের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা আছে। গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জমির অপ্রতুলতা এবং জটিল বেকার সমস্যার পটভূমিকায় সামান্য জমিতে পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার সম্ভাবনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক হলণ্টীন ও জার্সি জাতের গরু রেখেই খামার খুলতে চান এমন ৬৫ জনকে ১০/২০ দিনের জন্য হরিণঘাটা পশুখামার বা গো-প্রজননের কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অনেকে নিজেদের ফার্ম গড়বার কাজ আরম্ভ করেছেন, অনেকে আবার গো-প্রজননের কাজে লেগে গেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে হরিণঘাটা—কল্যাণী ফার্ম পৃথিবীর অতি বৃহৎ পশুখামারগুলির অন্যতম এবং এখানে হলষ্টিন ও জার্সি জাতের যে সংখ্যায় বিদেশী জাতের গরু তৈরী হয়েছে ভারতের অন্য কোথাও অত বেশী ভাল জাতের গরু তৈরী হয়নি।

দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প :

দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করার সরকারী প্রচেষ্টা দেখা যায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকে। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাতে শহর অঞ্চল নিয়মিত দুধের যোগান দেওয়া যায় এবং পল্লী অঞ্চলে কৃষকের আর্থনীতিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলার হরিণঘাটা, ফুলিয়া, চিত্রশালি, বাহাদুরপুর, বেথুয়াডহরী, পলাশী, তেহট্ট ও চাকদহ মোট ৮টি দুগ্ধ সংগ্রহ এবং শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষ্ণনগরের নিকটে শিমুলতলা ও কালীনগরে দুটি "আদর্শ দুগ্ধ উৎপাদন গ্রাম" তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ষ্টেট ব্যাংক ও ইউনাইটেড ব্যাংক এই ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করবে বলে জানা গিয়েছে। দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে "ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া" বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এই ব্যাংক এই জেলার ডেয়ারী ফার্মের জন্য ২-৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছেন।

"ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ"—এর মতে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাথাপিছু ২৫০ গ্রাম করে দুধের প্রয়োজন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গড়ে মাথাপিছু ৭০ গ্রামের বেশী দুধ পাওয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে হরিণঘাটা দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে।

হরিণঘাটায় জার্সি ও হলণ্টীন জাতের শংকর গরু প্রতি বিয়ানে ১৮০০ থেকে ২০০০ কেজি দুধ দেয়। দেশী গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি দুধ দেয়। দেশী গরু গড়ে ৬ থেকে ১০ মাস দুধ বন্ধ রাখে কিন্তু শংকর গরু-গুলিকে অনেক সময় জোর করেই দুধ বন্ধ করে দিতে হয় যেহেতু কমপক্ষে দু-মাস দুধ বন্ধ থাকা উচিত। হরিণঘাটার গো-প্রজনন খামারে দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য গবেষণার কাজ চলে।

হরিণঘাটা খামারের হরিয়ানা, রেডসিন্ধি, আরপারকার প্রভৃতি গরু ও শংকর গরুর দুধ উৎপাদনের একটি চিত্র নীচের সারণীতে দেওয়া হল :

(১)	হরিয়ানা জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ দেয়—	১০১৮.৩১ কেজি
(২)	রেডসিন্ধি জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ দেয়—	৮১০.৪০ কেজি
(৩)	সাহিওয়াল জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ দেয়—	১৪৬৬.৮৫ কেজি
(৪)	আরপারকার জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ দেয়—	১৫৬০.৯৩ কেজি
(৫)	গীর জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ দেয়—	১৪৬০.৮৫ কেজি
(৬)	জার্সি জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ য়ে—	১৮১০.১০ কেজি
(৭)	হলণ্টীন জাতের গরু প্রতি বিয়ানে গড়ে দুধ দেয়—	৩২১৩.৮৫ কেজি

এই জেলার বিভিন্ন দুগ্ধ সংগ্রহশালা থেকে দুধ হরিণঘাটার দুগ্ধ কেন্দ্রে আনা হয় এবং সেই দুধ ঠাণ্ডা করে কলিকাতা ও ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহরে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়া দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্গত দুগ্ধ কলোনীতে প্রায় ৮০০০টি মহিষ আছে। এই মহিষগুলির দুধও হরিণঘাটার ফার্মের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এই দুধ বিবিধ উপায়ে ষ্টাণ্ডার্ড (১-১৬ পয়সা প্রতি লিটার), ডবল টোন (-৯৬ পয়সা

প্রতি লিটার) ও খাঁটি গরুর দুধ (১-৭২ পয়সা প্রতি লিটার) হিসেবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্রীর জন্য পাঠান হয় এছাড়া দুধের সরবরাহের উপর নির্ভর করে হরিণঘাটা কেন্দ্রে ঘি এবং মাখন তৈরী করা হয়।

হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়া কারখানা মিলে প্রায় ১,৫৫,০০০ লিটার দুধ দৈনিক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, হাসপাতালে ও বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করা হয়। এই দুধের পরিমাণ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে (১) স্ট্যাণ্ডার্ড দুধ ১,২০,০০০ লিটার, (২) গরুর দুধ ২০,০০০ লিটার এবং (৩) ডবল টোনড্ দুধ ১৫,০০০ লিটার হিসাবে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী প্রায় ৬০০টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রী হয়। বর্তমানে রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর ফলে কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

হাঁস-মুরগী খামার :

বহুদিন পূর্বে হাঁস-মুরগীর খামার একটি অবহেলিত কুটির-শিল্প ছিল। অনেকে তখন ভাবতেই পারেননি এই ধরনের খামার বেকার লোকদের জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করে দেবে। সম্প্রতি 'ডিপলিটার' নামে এক নূতন পদ্ধতিতে উন্নত-মানের মুরগী চাষ করা সম্ভব হয়েছে এবং অনেকেই অর্থ-উপার্জনের জন্য এখন এই ধরণের খামার তৈরীর কাজে নিজে-দের ব্যস্ত রাখছেন। ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিম বাংলার সর্বপ্রথম মুরগী-পালন প্রকল্প আয় বৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে চালু হয়। তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্ব-সাধারণের কাছে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের প্রচার করতে এবং ভাল জাতের মুরগীর বাচ্চার সরবরাহ করতে এবং এই জাতীয় মুরগীর সুষ্ঠু বিপনন করতে সচেষ্ট।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা, রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে মোট ৩টি মুরগী-খামার রাজ্য সরকারের অধীনে আছে। ১৯৪১ সালে রাণাঘাটে রাজ্য সরকারের মুরগী-খামার প্রকল্প চালু করা হয় এবং এই খামারের প্রধান কাজ হল মুরগীর অধিক উৎপাদন করা এবং ভাল জাতের মুরগী বাচ্চার খামার তৈরী করতে উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রী করা। বর্তমান খাদ্য সংকটের পটভূমিকায় মুরগী পালনের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।

রাণাঘাটে অবস্থিত সরকারী মুরগী-খামার বছরে ৯,১২,৫০০ করে ডিম উৎপাদন করে। এই খামার থেকে আবার প্রতি বছর মুরগীর মাংসও তৈরী করা হয় প্রায় ১০।১৫ হাজার কে,জি। রাণাঘাটের এই খামার থেকে কাঁচড়াপাড়া ও রাণা-ঘাটে অবস্থিত যক্ষ্মা হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রতি বছর ২,০৮,০০০টি ডিম সরবরাহ করা হয়।

নদীয়া জেলার সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নত করতে যে কয়টি প্রকল্প চালু আছে তার মধ্যে 'এ্যাপ্লায়েড নিউট্রিসন্' পরিকল্পনা অন্যতম। গ্রামা-ঞ্চলে মুরগী চাষের সম্প্রসারণের জন্য এই প্রকল্পের দ্বারা আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে করিমপুর ব্লকে, কৃষ্ণনগরের দুটি ব্লকে এবং শান্তিপুর ও হরিণঘাটা ব্লকে ১০৬টি মুরগী-খামার তৈরী হয়েছে বলে জানা যায়। প্রতিটি মুরগী-খামারকে ১০০টি লেয়ার তৈরী করার কাজে সাহায্য করার জন্য ২৫০টি উন্নত জাতের মুরগীর বাচ্চা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মুরগীর পালন ও উৎপাদনের জন্য জায়গার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই সরকার এ কাজে উৎসাহী প্রতিটি মুরগী চাষীকে ৮০০ টাকা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ছোট মুরগীর বাচ্চাগুলিকে দু মাস ধরে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

১৯৬৫ সাল থেকে রাণাঘাটের সরকারী মুরগী-খামার থেকে বেসরকারী মুরগী খামারীদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই সাহায্যের পরিমাণ ১,১৪,০০০ টাকা।

রাণাঘাট ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৯০ জনের বেশী বেসরকারী মুরগী উৎপাদনকারী নিজেদের খামারগুলিকে রাণাঘাটের সরকারী মুরগী-খামারের সঙ্গে রেজেস্ট্রী করে রেখেছেন।

ডিম ও মুরগীর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লাভজনক বিপনন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে বেসরকারী মুরগী উৎপাদকগণ সারা বছর লাভজনক মূল্য পেতে পারেন। খোলা বাজারে দরের তারতম্য হওয়ায় সরকার মুরগী চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি ডিম ক্রয় করে ক্রেতাদের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করছেন, গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ লোকেরা ডিম কম ক্রয় করে, তাই এই সময় উদ্বৃত্ত ডিমগুলি ক্রয় করে সরকার হিমঘরে রেখে প্রয়োজনের সময় সাধারণের কাছে বিক্রী করেন।

১৯৭২ সাল থেকে পশুপালন দপ্তর বেকার যুবকদের মাধ্যমে হিমঘরে সংরক্ষিত ডিমগুলি বাজারে বিক্রী করার একটি পরিকল্পনা করেছেন। এর ফলে প্রতি একশত ডিম বিক্রী করলে এই যুবকরা চার টাকা লাভ করতে পারবেন, এই ব্যবস্থার ফলে ২০০ জন বেকার যুবক ২০ লক্ষ ডিম বিক্রী করে তিন মাস পর্যন্ত চাকুরী পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

রাণাঘাট ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা তাই ন্যায্য মূল্যে ডিম ক্রয় করার সুযোগ পেয়েছেন।

শুধু তাই নয়, যে সমস্ত বেসরকারী মুরগী চাষী তাদের খামারগুলি রেজেস্ট্রী করে রেখেছেন তাদের মুরগীর সুষম খাদ্য বিক্রী করা হয় বাজার থেকে কম দামে। রাণাঘাটে অবস্থিত রাজ্য মুরগী-খামার থেকে প্রায় ২৫০ টন সুষম মুরগী খাদ্য চাষীদের কাছে বিক্রী করা হয়।

মুরগীর সুষম খাদ্য বন্টনের জন্য ও উৎপন্ন ডিম ও মাংস ন্যায্য মূল্যে ক্রয় ও বিক্রীর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুপালন দপ্তর নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে একটি বিপনন কেন্দ্র চালু করেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে বেকার যুবকগণ স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থানের একটি পথ বেছে নিতে পেরেছেন। অনেক গৃহিনী আবার 'কিচেন পোলট্রি' তৈরী করেছেন। উদা-হরণ-স্বরূপ শ্রীমতী সন্ধ্যা মিত্র, ডাক্‌বাংলো রোড, কৃষ্ণনগর,

শ্রীমতী শান্তি চৌধুরী, খোড়াপাড়া, কৃষ্ণনগর, শ্রীমতী সরযূবালা বিশ্বাস, আসাননগর, শ্রীমতী হাসিরাণী রায়, বেথুয়াডহরী এবং শ্রীমতী পারমিতা বসু, চাপড়া নামগুলি উল্লেখযোগ্য। যুবকদের মধ্যে সর্বশ্রী প্রদীপ ধর, রণজিৎ রায়, দিলীপ তরফ-দারের নাম উল্লেখযোগ্য। নিচের সারণীতে রেজিস্ট্রীকৃত মুরগীর খামারের সংখ্যা এবং বিপনন কেন্দ্রে সংগৃহীত ডিমের সংখ্যা দেওয়া হল :

বছর	রেজিস্ট্রীকৃত মুরগী খামারের সংখ্যা	বিপনন কেন্দ্রে সংগৃহীত ডিম
১৯৬৭-৬৮	১০২	১২,৬৮৭
১৯৬৮-৬৯	২১৮	৪০,৪০১
১৯৬৯-৭০	২৩৯	৬৮,৯২৩
১৯৭০-৭১	২৩৯	১,১৮,৩১৯
১৯৭১-৭২	১৬২	২,৬১,২০৯

শুধু বেকার যুবক বা গৃহস্থ বধূরাই নন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি চাকুরী অথবা অন্য ব্যবসায় ছেড়ে ব্যবসা-ভিত্তিক মুরগীর খামার তৈরী করেছেন। উদাহরণস্বরূপ স্বরূপগঞ্জের 'মিতালী পোলট্রি', বেথুয়াডহরির গ্যা গ্যা পোলট্রি ফার্ম', কৃষ্ণনগরের 'লিটল ফ্লাওয়ার পোলট্রি ফার্ম', এবং ঘূর্ণীর 'কৃষ্ণনগর পোলট্রি ফার্মের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া কৃষ্ণনগর মহকুমার অন্তর্গত যে কয়টি ব্লককে 'এ্যাপ্লায়েড নিউট্রিসন' প্রকল্পের আওতায় আনা হয় সেই ব্লক-গুলির বিভিন্ন স্থানে ৪৩টি নতুন মুরগীর খামার চালু করা যায়। বেকার কর্মহীন বা কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় এই বেসরকারী খামারগুলি। সরকার এই খামারগুলির জন্য বিনামূল্যে মুরগীর সুষম খাদ্য বন্টন ব্যতীত আর্থিক সাহায্যও করেন। এই সব কেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী হাস-পাতাল, প্রসূতিসদন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত চার বছরে ৬৭,৭৪১টি ডিম বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত জাতের মুরগী পালন করে ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পশুপালন দপ্তর কৃষ্ণনগর শহরের প্রান্তে একটি সরকারী মুরগী-পালন ক্ষেত্র স্থাপন করেছেন।

পশুচিকিৎসা :

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে ২টি পশু চিকিৎসা হাসপাতাল ছিল। এছাড়া কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরী, তেহট্ট ও শান্তিপুরে ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। তখন-কার হাসপাতালগুলিতে স্থানাভাব ও কর্মচারীর স্বল্পতা ছাড়া ছিল যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রের অপ্রতুলতা।

স্বাধীনতা লাভের পর নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন।

(১) পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের সুব্যবস্থা।
(২) পশুচিকিসা বীক্ষণাগার।
(৩) শহর ও শহরতলি অঞ্চলে পশুচিকিসালয় স্থাপন।
(৪) গ্রামীণ পশুচিকিৎসা কার্যক্রমসহ পশুমহামারী নিরোধ ও নিবারণ পরিকল্পনা।

এই জেলার পশুচিকিৎসা বিভাগের কাজকর্মের বিশেষতঃ সংক্রামক রোগ নিবারণমূলক কাজের পরিদর্শনের জন্য একজন পশু চিকিৎসা আধিকারিকের অফিস এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা নিয়ে গঠিত পশুচিকিৎসা বিভাগের একটি আঞ্চলিক অধ্যক্ষ মহাশয় জেলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্বে আছেন।

নদীয়া জেলায় গৃহপালিত পশু, হাঁস ও মুরগীর সংক্রামক রোগ নির্ণয় ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরে ১৯৬৬-৬৭ সালে 'নদীয়া জেলা বীক্ষণাগার' স্থাপিত হয়। এই বীক্ষণা-গার স্থাপনের পূর্বে সংক্রামক রোগ নির্ণয় করার ব্যাপারে 'বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজের' উপর নির্ভর করতে হত। সংক্রামক রোগ প্রতিকারের জন্য এই বীক্ষণাগারে যাবতীয় টীকা মজুত থাকে। গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য গণটীকা এই জেলায় চালু আছে। এই বীক্ষণাগারে পশুপক্ষীর মলমূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১টি 'ক' শ্রেণীর এবং রাণাঘাট, শান্তিপুর ও নবদ্বীপে মোট ৩টি 'খ' শ্রেণীর পশুচিকিৎসা হাসপাতাল খোলা হয়েছে।

সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাযুক্ত এসব পশুচিকিৎসার হাসপাতালে বহির্বিভাগ, আরোগ্যশালা, অস্ত্রোপচারের ঘর, কমপাউণ্ডিং ঘর, গুদামঘর, ও তত্ত্বাবধান ঘরের ব্যবস্থা আছে। রোগের নিদান ও যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটার, অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং ঔষধপত্রাদির দ্বারা প্রতিটি হাসপাতাল সুসজ্জিত। রুগ্ন পশুপক্ষীর মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য জেলা হাসপাতালে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন। এছাড়া এখানে সিরাম ও টীকা প্রভৃতির মজুত ভাণ্ডার রাখা হয়েছে। এছাড়া 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর হাসপাতালেই গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে একটি করে পশুচিকিৎসা ঔষধালয় বা ডিসপেন্সারী খোলা হয়েছে। এখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, রেফ্রিজারেটর ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র রাখা হয়েছে। ফলে গ্রামবাসীরা রুগ্ন ও অসুস্থ পশুপক্ষীর চিকিৎসা করাবার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন। এখানে সিরাম ও টীকা সরবরাহ করা হয় স্থানীয় প্রয়োজন উপলব্ধি করে। এই জেলায় ১৩টি থানায় মোট ১৬টি ব্লক পর্যায় পশুচিকিৎসালয় আছে। যেমন : কৃষ্ণনগর-১, কৃষ্ণনগর-২, (ধুবুলিয়া), নাকাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, তেহট্ট-১, তেহট্ট-২, করিমপুর, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, রাণাঘাট-১, রাণাঘাট-২, চাকদহ, হরিণঘাটা, শান্তিপুর (ফুলিয়া) ও নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগরে একটি ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। এর দ্বারা শক্তিনগর, কালীনগর, চিত্রশালী, দৈয়ের বাজার, ধুবুলিয়া, গাছা ও বাদকুল্লায় পশু চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

উন্নয়ন ব্লকের ঔষধালয় থেকে ৫ মাইলের বেশী দূরত্বে এক বা একাধিক প্রাথমিক পশুচিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্র রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি নদীয়া জেলার দিগনগর, ভীমপুর, নওয়াপাড়া, মুড়াগাছা, বড়ইটনা, শ্যামনগর, ছোট নলদা, করিমপুর, বড়-আঁদুলিয়া, বানপুর, বগুলা, দক্ষিণপাড়া, আড়ংঘাটা, পায়রাডাঙ্গা, সিলিন্দা, বিরহী, গোবিন্দপুর ও বামন-পুকুরে অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলি ঔষধালয়ের অগ্রবর্তী শাখা হিসাবে কাজ করে। ব্লকের পশুচিকিৎসক প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে এই কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে পশুপক্ষীর চিকিৎসা করেন। কৃষকদের ঘরে ঘরে চিকিৎসার সহায়তা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ঔষধালয়ের অধীন এক বা একাধিক মৌল পশু-চিকিৎসা উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে ও পরবর্তীকালের তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল।

১৯৪৭ সালের পূর্বে জেলার চিত্র

(ক) পশু হাসপাতাল—২টি (কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট)

(খ) গ্রামীন ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র—৪টি (কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরী, তেহট্ট ও শান্তিপুর)।

স্বাধীনতা লাভের পরে জেলার চিত্র—

(ক) রাজ্য পশুচিকিৎসা হাসপাতাল 'ক' শ্রেণীর ১টি (কৃষ্ণনগর)।

(খ) রাজ্য পশুচিকিৎসা হাসপাতাল 'খ' শ্রেণীর ৫টি যথাক্রমে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ ও বেথুয়াডহরীতে অবস্থিত।

(গ) ব্লক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র—১৬টি।

(ঘ) প্রাথমিক পশুচিকিৎসা সাহায্যকেন্দ্র—১৮টি।

(ঙ) ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসালয়—১টি।

(চ) হাসপাতাল সংলগ্ন কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র—৪টি।

(ছ) জেলা পশুরোগ বীক্ষণাগার—১টি।

পরিশিষ্ট ক

নদীয়া জেলায় গত ১০ বৎসরের তুলনামূলক পশুচিকিৎসার কার্যাবলী

	রোগী চিকিৎসা			প্রাক্ চিকিৎসা সাহায্য	
বৎসর	হাসপাতাল	ব্লক ডিস্পেন্সারি	ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়	প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র
১৯৬২-৬৩	৮,৭০৪	১৩,৩২০	২,৩৮৬		৬,৭৮৩
১৯৬৩-৬৪	৫,৬৭৭	২৮,০৮৯	১০,২১২	৪,১২৬	১০,০৭৮
১৯৬৪-৬৫	৭,৩৮৯	৪১,৬০৪	২,৬৩৭	৪,৬৩৭	৯,৮৬৩
১৯৬৫-৬৬	১১,৫৫৪	২৩,৯৪৫	৪,১৭৭	৭,৬৪৭	১০,৫১৬
১৯৬৬-৬৭	১২,১৮৮	৩৭,১৬৩	৮৬৯	৭,৬৬৬	১১,৫৮৬
১৯৬৭-৬৮	১৩,৩১৯	২৬,৫৯২		৯,০৩৯	১২,৯৮৯
১৯৬৮-৬৯	২৭,৮২৪	২৯,৪৭৭		১৫,২৭৪	২৮,৭৬২
১৯৬৯-৭০	২৮,৯৭৪	২৩,৬৪৩		১০,৭৭৭	২৬,২৩৯
১৯৭০-৭১	৩২,৯৭৪	৩৫,৭১৪		৫,৪৮৯	৩৩,৭৩৪
১৯৭১-৭২	৩৪,৯৭৮	৬২,৮৩৬		৮,১৭৪	৩৬,৬২৩

পরিশিষ্ট খ

(খ) পশুপক্ষীর রোগ সংক্রমণের পূর্বে ইংজেকশান (Mass vaccination):

বৎসর	রিণ্ডারপেষ্ট (R. P.)	বাদলা (B. Q.)	গলাফোলা (H. S.)	ডাকপ্লেগ (A. P.)	রাণীক্ষেত (R. D.)	কলেরা (F. C.)	বসন্ত (F. Pox.)
১৯৬২-৬৩	৭৭,৯৯৩				৯,১৩৬		২,৮৯৫
১৯৬৩-৬৪	৯৫,১৯২				৮৯,৯৪৭		৯৯৮
১৯৬৪-৬৫	১০,০০১				৮৪,৩৮৪		৮৪৪
১৯৬৫-৬৬	১,০৮,২৮৪	৮৬			১,৬০,৯৬৭		৫,৯৯৫
১৯৬৬-৬৭	৯১,৪৯১		৪৯	১,২২৫	১,৯২,৪০৩		
১৯৬৭-৬৮	১,২৭,৭৮৫			২,৮৮০	১,১৬,১৮৫	৯১৮	৫,০৯৪
১৯৬৮-৬৯	১,১৫,৫৪৯	১০,৫১৯		১৪,২০৫	২,০৯,৭২২	১,৪৬১	১৮,৬০৭
১৯৬৯-৭০	৩৬,১৬১			১৬,১৬৪	১,২৭,১০৬	৪,০৪৯	৯,১৪৫
১৯৭০-৭১	৮৫,৬৭২			১৬,৯৬২	২,১২,৪৩২	১,৯৫৮	১৬,৭৮২
১৯৭১-৭২	২,১৩,৫০৬	৩,৭১২	৪,৭০৫	২৬,৪৮৭	১,৯৪,০৪৬	১,৫২৯	১৫,০৫২

পরিশিষ্ট গ

অসুখ ও মহামারী লাগার পর ইন্‌জেকশান (Vaccination in the face of outbreak):

বৎসর	রিণ্ডারপেষ্ট	গলাফোলা	বাদলা	অ্যানথ্রাক্স	রাণীক্ষেত	বসন্ত	কলেরা	ডাকপ্লেগ
১৯৬২-৬৩		৩,১০১	১,৬০৩	১২৫৫	১৮৭	২,০৯৫	২০০	
১৯৬৩-৬৪		৩,২২২	৪০৫	২৬০	১১,১৩০	৩,১১১	৪২০	
১৯৬৪-৬৫		২,৪৯৬	১,১৯৯		১৬,৫৬৭	৩,১৯৬	৭২৫	
১৯৬৫-৬৬		১,৮৪২	১৫৮	৮৫	২৪,৬৮৫	২,১৩৮	৫৮৯	৬,৫১৫
১৯৬৬-৬৭		৪৮	১,০৬৮	৪৭৮	৭,৯৩৭	১,৭৭০	৫২৩	২,৯০৪
১৯৬৭-৬৮	৫,৬৫২		৮৭৪	১৫০	৭৭,৬৩০	৮,৬২৪	৯২৮	১,৫০৭
১৯৬৮-৬৯	৫৪৮	২,৯৪২	৮১১	৫১	৮,৩৮৯	৫,৭৮৮	৬২৩	২,২৪১
১৯৬৯-৭০	৪৮০		৬০৩	৬০৩	৩,৪৫৯	১,২১৫	৭৪০	৬৪০
১৯৭০-৭১		১৯৪	৪৬০		২,৬০৭	৭৭৫	২০৫	
১৯৭১-৭২	৪৮৫				৩,৭৫৮	২,৭১০		২,৬১৮

মৎস্য

প্রোটিনের মুখ্য উৎস বলে মাছ বাঙ্গালীর কাছে অপরিহার্য। আবার জমির সার ও মুরগীর খাদ্য তৈরী হয় মাছ থেকে। তাই মাছের চাহিদা এত বেশী। নদীয়া জেলায় মাছের সমস্যা জটিল হওয়ার একমাত্র কারণ চাহিদার তুলনায় যোগান অত্যন্ত কম। প্রাক-স্বাধীনতাকালে কিন্তু এমন ছিল না। তখন মাছ আসত এখনকার বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে। এই সময় একজন জেলা মীনাধিকারিক ও একজন সহকারী মীনাধিকারিক নিয়ে নদীয়া জেলায় মৎস্য দপ্তরের কাজ চলত। কোন মৎস্য-খামার খোলা হয়নি এই সময়। মাছ, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং এই জেলার জেলেরা প্রাচীন পদ্ধতিতে মাছ চাষের কাজে অভিজ্ঞ ছিল। তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ চালু ছিল না। সুতরাং মৎস্যদপ্তর এই সময় কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর মৎস্যদপ্তরের কাজ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে চাষের মাধ্যমে। বর্তমানে জেলা মীনাধিকারিক ও সহকারী মীনাধিকারিক ছাড়া প্রতিটি ব্লকে একজন করে মীন সম্প্রসারণ আধিকারিক আছেন। মৎস্যচাষীরা যাতে তাদের সমস্যাগুলি নিকটবর্তী আধিকারিকের কাছে উপস্থাপিত করে সেগুলির সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই জেলায় ১৬টি ব্লক-ভিত্তিক মৎস্যদপ্তর খোলা হয়েছে।

নদীয়া জেলায় খাল বিল ও নদীর পরিমাণ ১৬১৮৫·৬৪ হেক্টর ও পুষ্করিণী বা জলাশয়ের পরিমাণ ৬৪০৯·৩০ হেক্টর। স্বাধীনতা লাভের পর মৎস্য উন্নয়নের ব্যাপারে যে সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল:

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ইউনিয়ন-ওয়ারী পুষ্করিণীগুলিতে মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নদীয়া জেলায় ব্যয় করা হয়েছে ১,৪৭,০২৫ টাকা আর 'ড্রাই-ডিস্ট্রিক্ট' প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ১,৩২,০৭৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আশু ফলদায়ক প্রকল্পের জন্য এই জেলায় ব্যয় করা হয়েছে ৭,০০০ টাকা এবং মধ্যবর্তীকালীন ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ৩,৯৬,২৯৫ টাকা। এছাড়া দুঃস্থ মৎস্যচাষী ও তাদের সমবায় সমিতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ২৪,০০০ টাকা সাহায্য করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আশুফলদায়ক প্রকল্পের জন্য এই জেলায় ৭,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সুরু হয়েছে কৃষকদের মাধ্যমে পুষ্করিণীর মৎস্য উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদীয়া জেলার জন্য ১,৫১,৪৪০ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। এ প্রকল্পগুলি ছাড়া আর যে সমস্ত প্রকল্প এই জেলার মৎস্য উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল উন্নয়নমূলক ব্লকে মাছের বীজ ও সার ৫০% কমদামে সরবরাহ করা। এ ছাড়া আছে অনাবাদী পুকুরগুলি অঞ্চল পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সংস্কার করে মাছ চাষ করার প্রকল্প, কৃষকদের মাছের চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং প্রসূতি ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাছের যোগান দেওয়া। মাছ ধরার নৌকাগুলি মৎস্য চাষীদের মধ্যে অল্প মূল্যে দেওয়ার প্রকল্পও মাঝে মাঝে কার্যকরী হয়েছে এই জেলায়। তবে এই ব্যাপারে নৌকাগুলির সম্পূর্ণ মূল্যের ৫% ধীবরদের অগ্রিম দিতে হবে। মৎস্য-চাষীদের মধ্যে 'ধানী পোনা' ও 'চারা পোনা' ৫০% কম দামে বিতরণের প্রকল্প চালু হয়েছে মাঝে মাঝে। এ ছাড়া ধীবরদের কাজের সুবিধার জন্য ৪ জন করে মৎস্য-চাষী নিয়ে একটি দল রাখা হয়েছিল এই জেলায়। মিঠা জলে মাছের ডিম ছেড়ে দিয়ে মাছ চাষ করার ব্যবস্থা হয়েছিল মাঝে মাঝে। এই জেলায় মাছের বীজ ও মাছের চাষের জন্য যে কয়টি খামার আছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল:

এই বিলগুলিতে মাছের চাষ হয়—

(১)	কল্যাণীর ধোকাবদহ মৎস্যখামার	২৩·৪৭ হেক্টর
(২)	হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত মথুরাবিল	২৬৭ হেক্টর
(৩)	শান্তিপুরে অবস্থিত মৎস্যখামার	১·৮ হেক্টর
(৪)	অঞ্জনার মৎস্য-বীজ খামার	৫৭·৩৪ হেক্টর
(৫)	আমদা বিলের মৎস্য খামার	৮৪·৬৪ হেক্টর
(৬)	ফুলিয়ার বিল	১৫·৮০ হেক্টর

এই বিলগুলিতে মাছ ধরা হয়—

(৭)	পলদা-কনিঙ্গ বিল	১৭২·৭৮৮ হেক্টর
(৮)	ফতাইপুর বিল	২২·৩০ হেক্টর
(৯)	ডলসালি বিল	৩৬·২৬ হেক্টর

এ ছাড়া ভালুকা ও ফতাইপুর বিলের ৪৮·২২ হেক্টর ও ২২·৩০ হেক্টর জমি মাছ চাষের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত মৎস্য-গবেষণাগারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা হয়:

(১) মাছের ডিম ও মাছের পোনা এক স্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াতের সময় নষ্ট হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা করা।

(২) রুই, কাৎলা, মৃগেল, ইত্যাদি মাছগুলির ডিম নিঃসরণ কোন্ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো।

(৩) নর্দমার ময়লা জল-পুষ্ট মাছের চাষ সম্বন্ধে যত্ন নেওয়া।

(৪) সমতলভূমিতে পাহাড়ী নদীর মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা করা।

(৫) অবাঞ্ছিত জলীয় আগাছাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা।
(৬) মালয় থেকে ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে যে 'ঘেসো রুই' ভারতে এসেছিল সেগুলির আমদানি করা।
(৭) চীনদেশীয় 'ঘেসো রুই' মাছগুলির কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।
(৮) মাছের ওপর পাট পচানোর ক্ষতিকারক পরিণাম ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা করা।
(৯) চালান দেবার সময় 'ধানী পোনা' মাছগুলির ওপর নিদ্রাকারক ঔষধের ফল সম্বন্ধে গবেষণা করা।
(১০) নিকৃষ্ট জাতের মাছগুলি যাতে রুই, কাৎলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছগুলির সঙ্গে মিশে না থাকে সেই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

১৯৬৩ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী মৎস্য গবেষণাগারে ৫টি শাখা ছিল। এদের কাজ ছিল প্রধানতঃ মাছের খাদ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা এবং মিঠা জল দূষিত হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করা। মাছের রোগ, মৎস্য সংরক্ষণ, জল ও মাটির পরীক্ষা, মাছ চাষের উপযোগী সার সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো, অবাঞ্ছিত আগাছার উৎপাটন বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে কল্যাণীতে মৎস্যখামার কেন্দ্রে মাছের প্রতিপালন ও পরীক্ষার জন্য জলাশয় বা পুকুরগুলির মোট আয়তন ১৫ একর। শক্তিনগরের অঞ্জনা মৎস্যখামার এবং ধোকরদহ মৎস্যখামার কল্যাণী মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল এই দুইটি খামারে প্রয়োগ করা হয়। এই দুটি ফার্মের উদ্দেশ্য হল :

(১) মৎস্য চাষীদের মাছচাষ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ও প্রয়োজনবোধে সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান করা।
(২) ভাল মাছের বীজ স্থানীয় কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিতরণ করা।
(৩) স্থানীয় জলাশয়ে স্থানীয় ও বহিরাগত মাছের চাষ জনপ্রিয় করা।
(৪) স্থানীয় মৎস্যচাষীদের মাছের চাষ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া
(৫) সরকারের পরিচালনায় একটি 'বাফার স্টক' তৈরী করে সরবরাহের সময় মাছের যোগান দেওয়া এবং মৎস্য সমস্যার সমাধান করা।

রুই, কাৎলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছগুলি গ্রীষ্মকালে জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রবাহিত জলে স্বাভাবিক প্রজননের দ্বারা মাছ উৎপাদন করে কিন্তু সম্প্রতি এক পরীক্ষায় জানা গেছে যে এই মাছগুলিকে বদ্ধ জলের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে 'হরমোন ইনজেকসনের' সাহায্যে প্রজনন করা সম্ভব। তবে মাছের ডিম ছাড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন :

(১) বয়ঃপ্রাপ্ত মাছগুলিকে 'হরমোন ইনজেকসন' দিয়ে একটি বদ্ধ জলাশয়ে রাখতে হবে।
(২) 'পিটুটারি গ্লাণ্ড'গুলি বয়ঃপ্রাপ্ত মাছগুলি থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
(৩) ডিম ছাড়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে।

'পিটুটারি গ্লাণ্ড' সংগ্রহ করার পর একটি রঙিন বোতলে ঔষধের সাহায্যে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার চেয়ে কম উত্তাপে এই বোতল রাখতে হবে।

হরমোন ইনজেকসন দেওয়ার ৬ ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা পরে মাছগুলি ডিমছাড়ার পক্ষে উপযোগী হয় এবং তৃতীয় দিনে ধানীপোনা উৎপন্ন হয়। পুষ্করিণী বা জলাশয়গুলি বহু মালিকের হওয়াতে মাছ চাষের কাজ এই জেলায় ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া পাট পচানোর জন্য সাময়িকভাবে জল দূষিত হয়ে মাছের ক্ষতি হচ্ছে। বিলের মধ্যে পাট পচানোর ফলে 'সালফিউবেটেড হাইড্রোজেন' সৃষ্টি হওয়ায় মাছের মড়ক লাগছে। রাস্তায় পাশের নালাগুলির পাড় উঁচু করে পাট পচানোর ব্যবস্থা করা হলে পাটপচা জল পাশের জলায় গড়িয়ে পড়বে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইভাবে কোন কাজই হচ্ছে না। এছাড়া কৃষিজমিতে ফলিডল, এনড্রিন, ডি-ডি-টি, ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে বর্ষাকালে এই কীটনাশক দ্রব্য জলের সঙ্গে মিশে সংলগ্ন জলায় এসে মাছের মড়ক লাগায় ও জল দূষিত করে।

সেচ ব্যবস্থার সুব্যবস্থা এবং মৎস্য চাষের উন্নতিকল্পে নদীয়া জেলাকে ১৯৬১-৬২ সালে বেঙ্গল ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্টের আওতায় আনা হয়। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জলাশয়গুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে ২৫ বৎসরের জন্য সরকারী পরিচালনায় আনা এবং সরকারী খরচে সেগুলির উন্নতিবিধান করা। গভীর নলকূপ বিভিন্ন জায়গায় সরকারী প্রচেষ্টা ও ব্যয়ে হওয়ায় কৃষিকাজে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। ফলে পুকুর, ডোবা, দীঘি ইত্যাদি জলাশয়ের মাধ্যমে সেচের কাজের গুরুত্ব এই জেলায় কিছু কমে গেলেও মৎস্যপালন ও মৎস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এগুলির সার্থকতা সকলেই উপলব্ধি করেছেন। তাই নদীয়ার জেলা-শাসক অনাবাদী মৎস্য চাষের জলাশয়গুলি পুষ্করিণী উন্নয়ন-মূলক প্রকল্পগুলির আওতায় আনার জন্য একটি প্রস্তাব রেখেছেন সরকারের কাছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য চাষের ও মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে একটি 'মাস্টার প্ল্যান' কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে মৎস্য চাষের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। এই কমিটির পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হলে অচিরেই মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবসায়ক্ষেত্র উজ্জ্বল হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষ্ণনগরে জেলা মৎস্য আধিকারিকের অফিস এবং মৎস্য খামারসমূহের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর অফিস আছে।

বন

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে নদীয়া জেলার বনভূমির আয়তন কত ছিল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সময়ে নদীয়া জেলা পরিদর্শন করতে এসে পরিব্রাজকবা যে রোজনামচা তৈরী করে গেছেন তা থেকে এই জেলার বনভূমি সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। স্ট্যাভরনিয়ার ১৭৮৫ সালে নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামটির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন এই গ্রামটির দক্ষিণাঞ্চল ছিল অরণ্যসংকুল। বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এইস্থান। নবদ্বীপের নিকটবর্তী স্থান থেকে হিংস্র জন্তু শিকার করবার উদ্দেশ্যে ১৮০২ সালে এক অভিযাত্রীদল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে আসেন। জন্তু শিকারের দ্বাবা উপলব্ধি করা যায় এই জেলাব বনভূমি কত বিস্তৃত ছিল। এই জেলার বিলুপ্তপ্রায় নদীগুলির ধারে ছিল বহুদূরবিস্তৃত গহন অরণ্যানী। কৃষ্ণনগরের রাজা ও তাঁর সভাসদগণ এই স্থানে অবসর সময়ে শিকার কবতে আসতেন। নদীর ধারে ছিল বাড়ীঘর ও আসবাবপত্র তৈরী করার উপযোগী নরম কাঠের বনভূমি। জলেব চাপে নদীর তীরভূমি ক্ষয় হওয়ার জন্য মূল্যবান গাছগুলি নদীগর্ভে পতিত হওয়ায় একসময় শুধু যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছিল তা নয়, অনেক নৌকাও গাছের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৮২০ সালে ক্যাপ্টেন লাণ্ডের এক বিবরণী থেকে এই কথা জানা যায়। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পাশে চূর্ণী নদীর তীরে অতি মনোরম বনভূমির কথা আমরা জানতে পাবি ১৮২৪ সালে ধর্মযাজক হিবারের বিবরণী থেকে। তিনি লিখেছিলেন এখানকার গভীর অরণ্যের বৃক্ষাদি ভেদ করে মন্দিরের চূড়া বহুদূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে কৃষ্ণগঞ্জে তিনি মন্দির দর্শনের অভিপ্রায়ে অবতরণ করেছিলেন। এ স্থানেও ক্রীড়ানুরাগী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিকারের উদ্দেশ্যে বহুবার এসেছিলেন। কিন্তু সেই হিংস্রজন্তুসংকুল অরণ্যানীর কিছু আব আজ অবশিষ্ট নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে বহুস্থান বনশূন্য করে চাষের উপযোগী করা হয়েছে। তাই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মনোবম বনভূমিব বিলুপ্তি ঘটেছে নদীয়া জেলায়।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে এই জেলায় বনভূমিব বিলুপ্তি ঘটেছে বলা চলে এবং এখানে তাল, বাবলা ছাড়া অন্যকোন কাঠের বনভূমি বড় একটা চোখে পড়ত না। উৎকৃষ্ট জমি ফসল লাগাবাব কাজে ব্যবহার করে নিকৃষ্ট জমিতে গাছ বসিয়ে বন তৈরী কবার কাজ আবম্ভ হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকে। যে সমস্ত জমিতে কাশ, কুশ এবং উলুখড় আছে বা যে সমস্ত জমিতে বালির ভাগ বেশী সে সমস্ত জমি বন তৈরীর কাজে পাওয়া যায়। এই জমিগুলির মাটি অত্যন্ত শক্ত এবং কাশ ও কুশগাছের শিকড়গুলি জমি থেকে প্রায় ৯০ সেন্টিমিটার ভিতরে প্রবেশ করার ফলে বনভূমি তৈরীর কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছে।

১৯৪৬ সালে এই জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত যুগপুর এবং চক হাতিশালা গ্রামে মোট ৬ হেক্টর জমিতে কৃত্রিম বন তৈরী করার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায়। কৃত্রিম বন তৈরী করার প্রচেষ্টা ১৯৪৮ সাল থেকে বাড়তে থাকে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ৮৯৪.৫০ হেক্টার জমিতে বন তৈরীর কাজ চলে। ১৯৪৬ সালে মনে হয়েছিল নাকাশীপাড়া, চাপড়া, তেহট্ট, রাণাঘাট, হাঁসখালি এবং শান্তিপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহুজমি কৃত্রিম বন তৈরীর কাজে পাওয়া যাবে কিন্তু বাংলা বিভক্ত হবার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ফলে নতুন জমি এই কাজে বিশেষ পাওয়া যায় না। সরকারের আয়ত্তে যে সমস্ত বনভূমি ১৯৪৭ সালের পর থেকে আছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

নদীয়া জেলায় সরকারের আয়ত্তাধীন বনভূমিব বিস্তৃতি ও পবিমাণ:

১৯৪৭	১১.৫৬ হেক্টর
১৯৫০	২৭২.৬০ ,,
১৯৬০	১১৭৬.৪৭ ,,
১৯৭১	১২৪৫.৮১ ,,

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে নদীয়া জেলায় কৃত্রিম বনভূমি তৈরী করার কাজের অগ্রগতির একটা বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আবাদ করা জমিব পরিমাণ ৮৯৪.৫০ হেক্টর

২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আবাদ করা জমির পরিমাণ ১০০.১১ হেক্টর

৩য় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাকালে আবাদ করা জমির পরিমাণ ১২৮.৫৬ হেক্টর

৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আবাদ করা জমির পরিমাণ ৮৯.৪৮ হেক্টর

স্থানীয় লোকের প্রয়োজনানুযায়ী এই জেলায় প্রথমদিকে বাড়ী, ঘর ও আসবাব তৈরী কবার গাছের এবং পবের পর্যায়ে জ্বালানী কাঠের চাষ করা হয়েছিল।

জ্বালানী কাঠের মধ্যে প্রধানতঃ অর্জুন, বাবলা, এবং মিনজিবি জাতীয় গাছের আবাদ করা হয়েছিল। এই গাছগুলি প্রত্যেকটি ৩.৬৫ মিটার অন্তর লাগানো হয়েছিল। এই কাজে সফলতা আনার জন্য কয়েকটি স্থানে ৪০ সে: মিটার পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে নতুন করে জমি তৈরী করে ঐ সমস্ত গাছ লাগানো হয়েছিল। নাকাশীপাড়া থানার বেথুয়াডহরি, যুগপুর, চক-হাতিশালা ও বানগড়িয়া মৌজায়, চাপড়া থানার মহৎপুব

মৌজায় এবং শান্তিপুর থানার বাহাদুরপুর-পলাশগাছি মৌজায় এবং দেবগ্রামে, রাণাঘাট থানার হিজুলি মৌজায় অপ্রয়োজনীয় গাছ কেটে সেখানে সেগুন গাছের চাষ আরম্ভ করার একটি প্রস্তাব আছে, এছাড়া কোতোয়ালী থানার বাহাদুরপুর মায়াকোল মৌজায়, হাঁসখালি থানার মুচিফুলবেড়িয়ায়, রাণাঘাট থানার শংকরপুর, খাসিয়া ও কেসাইপুর মৌজায় শিশু, শিমুল, মিনজিরি, আকাশমনি প্রভৃতি গাছের বন সৃজন করার একটি প্রস্তাব আছে। এই জেলায় উন্নততর শ্রেণীর বন সৃজন করার জন্য এখানকার বনবিভাগ সচেষ্ট আছেন।

বনবিভাগের আয়ত্তাধীন জায়গাগুলিতে যাতে অবৈধভাবে কেউ কাঠ কাটতে বা গোচারণ করাতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বন-ভূমি অঞ্চলে একই জমি বিভিন্ন কাজে লাগাবার জন্য একটি প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে ১৯৬৩ সালে এই জেলায় দুই সারি গাছের মাঝে হলুদের চাষ করা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে। অন্য কোন ফসল এই স্থানে চাষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু গাছের ছায়া এবং উষ্ণ ও সিক্ত জলবায়ু হলুদ চাষের পক্ষে অনুকূল। হলুদ চাষের ফলে বনভূমিরও উন্নতি হয় কারণ হলুদ চাষের জন্য দুই সারি নরম কাঠের মাঝে কোন অবাঞ্ছিত আগাছা জন্মাতে পারে না।

বনভূমির উন্নয়নের জন্য ১৯৬৭ সালে এই জেলায় পথের পাশের জমিতে ভাল গাছ লাগাবার জন্য একটা খামার খোলা হয়েছে কিন্তু এতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, কারণ কৃষকরা রাস্তার ধারের জমিগুলি পর্যন্ত কৃষিকাজে ব্যবহার করছেন। তাই খামারের কাজে কিছু বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৫০ সাল থেকে নদীয়া জেলায় 'বনমহোৎসব' চালু হবার পর থেকে প্রতিবছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কিছু জ্বালানী ও আসবাবপত্র তৈরী করার উপযোগী গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই জেলার বনবিভাগ এবং ব্লক অফিসগুলির সাহায্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে বন-ভূমির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা এবং ব্যক্তিগতভাবে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করা।

নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরি মৌজার বনভূমি অঞ্চল চিত্ত-বিনোদনের একটি সুন্দর জায়গা হয়ে উঠেছে। এই উদ্দেশ্যে এখানে তৈরী হয়েছে ৫৪·০০ হেক্টর জমির ওপর একটি মনোরম 'হরিণ উদ্যান' (ডিয়ার পার্ক)। এখানে সুন্দর হরিণগুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করে দর্শকদের অপরিসীম আনন্দ দান করে। এই উদ্যানের ভিতরে আছে মিনজিরি, শিশু, সেগুন, অর্জুন প্রভৃতি মূল্যবান নরম কাঠের গাছ। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে এখানে 'সম্বর', 'বাকিং' এবং 'চিতল' জাতের হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। চিতল শ্রেণীর হরিণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই 'হরিণ উদ্যানে' এক বছর থেকে দু'বছর পর্যন্ত হরিণ-শিশুদের সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর হরিণের তুলনায় অনেক বেশী। এই স্থানের উন্নতির কথা নদীয়া জেলার পরিকল্পনা কমিটি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। এই উন্নয়নের কাজে পরিকল্পনাগুলি এই রকম:

(১) ডিয়ার পার্ক বা হরিণ উদ্যানের পরিধি বাড়াতে হবে।
(২) বেথুয়াডহরির সরকারী বনভূমিতে দুটি কটেজ নির্মাণ করে সেখানে থাকার সুব্যবস্থা করতে হবে।
(৩) জলাশয়ের উন্নতি করে নৌকাবিহার ও মাছধরার উপযোগী করে তুলতে হবে।
(৪) রঙিন পাখীদের রাখার জন্য একটি সুন্দর পক্ষীশালা স্থাপন করতে হবে।

ভারতের 'ন্যাশনাল ফরেস্ট-পলিসি' অনুযায়ী সমতল ভূমি অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ জমি বনভূমি তৈরী করার কাজের জন্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এই হিসাবে পশ্চিমবাংলার মোট আয়তনের মাত্র ১৩ শতাংশ জমি বনভূমি এবং নদীয়া জেলার ৩,৯০০ বর্গ কিলোমিটার জমির মধ্যে মাত্র ১২·৫ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল।

নদীয়া জেলা প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। তাই বেশী পরিমাপ জমি বনভূমি তৈরী করার কাজে পাওয়া যাবে এটা আশা করা শক্ত। কিন্তু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে এই বনভূমির সম্প্রসারণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 'যদি যন্ত্র, সেচ, সার এবং বিবিধ কীটনাশক ঔষধের সাহায্যে এই জেলায় কৃষিকাজে আশাতীত উন্নতি লক্ষ্য করা যায় এবং বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে যদি জনসংখ্যার মোটামুটি স্থিতি অবস্থা থাকে, তবেই সম্ভব হবে অল্পজমিতে বেশী ফসল উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত জমিগুলি কৃত্রিম বন তৈরীর কাজে ব্যবহার করা। এই সঙ্গে দরকার কৃষকদের অনুপ্রেরণা দেওয়া যাতে তারা মূল্যবান কাঠের চাষে নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। বিগত ২৫ বছরে কৃত্রিম বন তৈরীর কাজে নদীয়া জেলায় কিছু উন্নতি হয়েছে কিন্তু তাতে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বনসম্পদের উন্নয়নের কাজে নিজেদের সর্বদা ব্যস্ত রাখতে হবে। তবেই মূল্যবান কাঠগুলি এই জেলার স্থানীয় লোকদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ ও পূর্বডুয়ার্স অঞ্চলের ৪৫০০ হেক্টর জমিতে একটি কৃত্রিম বনভূমি তৈরী করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই উপলক্ষে একটি 'ফরেস্ট কর্পোরেশন' গঠিত হয়েছে। 'এগ্রিকালচারাল রি-ফিনান্স কর্পোরেশন' এই প্রকল্পের অর্থনৈতিক তাৎপর্য পরীক্ষা করে দেখছেন বলে জানা গেছে। নদীয়া জেলায় বনভূমির সর্বাঙ্গীণ ও সুপরিকল্পিত উন্নতির জন্য এই ফরেস্ট কর্পোরেশন যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে এই জেলা বনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক লাভ ছাড়াও মানুষের তৈরী এই বনভূমি চাকরী ও কিছু নতুন শিল্প (কাঠ-চেরাই শিল্প) গড়ে তুলে অর্থকরী কাজের সুযোগ এনে দেবে। সেইসঙ্গে বেকার সমস্যার কিছু সুরাহা হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষ্ণনগরে বনবিভাগের ডিভিশনাল অফিস এবং কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে রেঞ্জ অফিস আছে।

সমবায়

নদীয়া জেলায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি ১৯১৩ সালে নদীয়া জেলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং রাণাঘাট কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রী হবার পর থেকে সুরু হয়। এই ব্যাঙ্ক দুটি রেজিস্ট্রী হবার পর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম্য ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রাম্য সঞ্চয় সংগ্রহ করে এবং সভ্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে তা সভ্যদের মধ্যে প্রয়োজনের সময়ে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ হিসাবে বন্টন করাই এই সব সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। অল্পসুদে ঋণদান করে মহাজনদের কবল থেকে কৃষিজীবিদের রক্ষার জন্যই এই সমবায় সমিতিগুলির সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার পূর্বপর্যন্ত সমবায় আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার পর এই জেলায় বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় এইসব উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও জীবিকা অর্জনে সাহায্যের নিমিত্ত অনেকগুলি সমবায় গৃহনির্মাণ ও শিল্পসমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে বহুসংখ্যক তন্তুবায় সমিতি রেজিস্ট্রীকৃত হয়। এই জেলার শান্তিপুরে বহুদিন থেকে অনেক কুশলী তন্তুবায়ের বসবাস। সূক্ষ্ম ও বিভিন্ন ডিজাইনের তাঁতের ধুতি ও শাড়ীর জন্য শান্তিপুরের সুনাম ভারতব্যাপী। স্বাধীনতার পূর্বেই এই অঞ্চলে কয়েকটি তন্তুবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ তন্তুবায় সমিতিই স্বাধীনতার পরে গঠিত হয়। অনেক উদ্বাস্তু এসে জীবিকার জন্য তাঁতশিল্পে নিয়োজিত হন, যার ফলে তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পিতল ও কাঁসা, খাদি, পাদুকাপ্রস্তুত, ছোটখাট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও উদ্বাস্তুদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি শিল্প-সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

স্বাধীনতার পরে ২টি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ৫৮৬টি গ্রাম্য ঋণদান সমিতি, ৫৪টি অ-কৃষি ঋণদান সমিতি এই জেলায় বর্তমান ছিল। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন ছিল ৯,৫৭,০৩৫ টাকা। কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮,৩৯,৩২৭ টাকা। কৃষি সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা ছিল ১৫,২৭০ জন। ঐ সময়ে অ-কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬,৪২,১৬৯ টাকা। প্রায় সমস্ত কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি ছিল অসীম দায়বিশিষ্ট। অ-কৃষি সমিতিগুলির মধ্যে (১) কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (২) রাণাঘাট পিপলস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ (৩) নদীয়া পোস্টাল ডিভিসন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এবং (৪) প্যাক কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ এর নাম উল্লেখযোগ্য।

দেশবিভাগের জন্য এই জেলার সমবায় আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বহু বিনিয়োগ পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন কৃষকদের চাষবাসে স্বল্পমেয়াদী অর্থ ঋণ দেবার ক্ষমতাও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ছিল না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার তাই সমবায় আন্দোলনকে পুনর্গঠিত ও সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'গ্রাম্য ঋণদান সমীক্ষা কমিটির' সুপারিশ অনুসারে সরকার বৃহদাকার ঋণদান সমিতি এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির একত্রীকরণ দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেন। সমিতির শেয়ারে অংশ গ্রহণ, মালপত্র ক্রয়বিক্রয়ের গুদামঘর নির্মাণের জন্য ঋণ ও দান দেওয়া, পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের ব্যয় বহনের জন্য সমিতিকে অনুদান দেওয়া সমবায় কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে 'সাবভেনশন' প্রদান দ্বারা ঋণদান সমিতিগুলিকে সুসংহত করার চেষ্টা করা হয়। বৃহদাকার কৃষি বিপনন সমিতি প্রতিষ্ঠা, দুগ্ধ সমিতি, কৃষি সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্যও সরকারী ঋণ ও সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তন্তুবায় ও শিল্পসমিতিতে কার্যকরী মূলধন সরঞ্জাম তৈরী বাবদও ঋণ ও গুদামঘর তৈরী বাবদ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনাকালে করা হয়।

বর্তমানে নদীয়া জেলায় ১২টি কৃষি বিপনন সমিতি ১২টি থানায় কৃষিজাত দ্রব্য, সার, কীটনাশক দ্রব্য, বীজ, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত আছে। এর মধ্যে ১১টি বিপনন সমিতিকে মোট ২,২০,৬৮৮ টাকা গুদাম তৈরী করার জন্য ঋণ ও দান হিসাবে সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমিতিগুলির কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লাভের পরিমাণও বেড়েছে।

এখন ৩১টি বৃহদাকার কৃষি ঋণদান সমিতি, ৫০৪টি সমবায় সেবা সমিতি, ৩৯টি অসীম দায়বিশিষ্ট ঋণদান সমিতি, ২৯টি বহুমুখী উদ্দেশ্য সমিতি কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে। ২৬টি সমিতি অ-কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

১৯৭১-৭২ সালে কৃষিঋণদান সমিতিগুলি চাষীদের উৎপাদন মূলক কাজের জন্য ৬,৬৮,০০০ টাকা ঋণদান করেছে। ১৯৫২ সালে যেখানে এ জেলার গ্রামীন জনসাধারণের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ কৃষি ঋণদান সমিতির আওতায় ছিল, আজ তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। জেলার গ্রামের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই আজ এই সমবায় সমিতিগুলির সাহায্য পাচ্ছে।

সমবায়ের ক্ষেত্রে এ জেলায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৯৫৯-৬০ সালে রাণাঘাট সেন্ট্রাল কো-অপারিটিভ ব্যাঙ্ক ও নদীয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সংযুক্ত হয়ে নদীয়া জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পত্তন হয়েছে। নবগঠিত এই সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য

সরকার ১,৪৯,৭০০ টাকা শেয়ার বাবদ এবং ৩,০০০০০ টাকা অনুদান বাবদ দিয়েছেন। এই ব্যাঙ্ক কৃষিকার্যের জন্য প্রাথমিক সমিতিগুলির মাধ্যমে চাষীদের স্বল্প ও মধ্যম-মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। গত কয়েক বছরে এই ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছে এবং আদায় করেছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

বৎসর	ঋণ দানের পরিমাণ	ঋণ আদায়ের পরিমাণ
১৯৬৮-৬৯	৩১,৫৫,৭৫৭ টাকা	৩৩,৭৩,৯৩৮ টাকা
১৯৬৯-৭০	৮১,৯১,১৪১ ,,	৬৮,৩০,৯৮০ ,,
১৯৭০-৭১	৯০,৬৭,২৫৯ ,,	৬৪,৬৪,৫০৪ ,,
১৯৭১-৭২	২৮,৯৭,১৭২ ,,	২৩,৪৫,৬০২ ,,

নদীয়া জেলা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক) এই জেলার কৃষিজীবিদের জমির উন্নতিসাধন, জলসেচ ব্যবস্থা, পুরাতন ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির নিমিত্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এ জেলায় সেচের সুবিধার প্রসারার্থে যে জরুরী প্রকল্প গ্রহণ করেছে তার মাধ্যমে অগভীর নলকূপ ও পাম্পসেট ক্রয়, জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বাবদ এ পর্যন্ত ৩৬,৯৭,০০০ টাকা চাষীদের ঋণদান করেছে। ক্রেতা সমবায় সমিতি ও বিপনন সমিতিগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১৯৭০-৭১ সালে ৮,৭০,১১৮ টাকা ঋণ দিয়েছে। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে, কৃষিঋণের সব অর্থ নগদে না দিয়ে কিছু অংশ সার, কীটঘ্ন ঔষধ, বীজের মাধ্যমে দেওয়ার।

এ জেলায় ৫৪টি তন্তবায় সমবায় সমিতি আছে। এগুলি ১৯৭০-৭১ সালে ৩৮,০১,০১৬ টাকার জিনিষ বিক্রি করে ৪৩,৯২৭ টাকা এবং ১৯৭১-৭২ সালে ৪৬,০৪,২২৫ টাকার জিনিষ বিক্রি করে ৫২,৯০৩ টাকা লাভ করিছে।

জেলায় পাওয়ারলুম সমবায় সমিতির সংখ্যা ১২। এর সবগুলিই পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের দ্বারা গঠিত। এ সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ৫২৯, কার্যকরী মূলধন ১০,৪৫,৮২৮ টাকা এবং ১৯৭০-৭১ সালে লাভের পরিমাণ ছিল ৪৮,৬১২ টাকা।

উদ্বাস্তুদের গৃহনির্মাণের জন্য এ জেলায় ১০টি গৃহনির্মাণ সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতিগুলি জমিসংগ্রহ করে সভ্যদের মধ্যে বিলি করেছে এবং বাড়ী তৈরী করতে সহায়তা করেছে।

শিল্প সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে নবদ্বীপের প্যাক কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও ন্যাশনাল ক্লক ম্যানুফ্যাকচারিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজ বেশ সন্তোষজনক। প্যাক সমিতি গিল্টি সোনার অলংকার, কালি, তাঁতের কাপড় তৈরী এবং ন্যাশনাল ক্লক ঘড়ি তৈরী করে বেশ সুনাম অর্জন করেছে এবং অনেক কর্মীর জীবিকা অর্জনে সাহায্য করেছে। প্যাকে কর্মীর সংখ্যা এখন ২১২ জন। এই সমিতি ১৯৭১-৭২ সালে ৯,১৫,০০০ টাকার কারবার করেছে। খাদি বোর্ডের পরিচালনাধীনে ইট ও টালি প্রস্তুতের সমবায় সমিতিও ভাল কাজ করছে। নদীয়াতে এখন ৬৪টি শিল্পসমবায় সমিতি চালু আছে।

নদীয়ার সমবায় আন্দোলনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ক্রেতা সমবায়। ভারত-চীন যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করবার জন্য ৯২টি প্রাথমিক ভাণ্ডারসহ ২টি পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। সরকার শেয়ার, কার্যকরী মূলধন, ঋণ ও তদারকীর জন্য পরিচালন ব্যয় বাবদ অনুদান এই সব সমিতিগুলিকে দিয়েছেন।

এই জেলায় ১টি মৎস্যজীবি সমিতির ফেডারেশন ও ৬০টি মৎস্যজীবি সমিতি রয়েছে। সরকার ঐ কেন্দ্রীয় সমিতিতে ২,৬০,০০০ টাকা ঋণ ও অনুদান এবং প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ২,৬৭,৭৬০ টাকা ঋণ ও অনুদান হিসেবে দিয়েছেন।

নদীয়া জেলায় বেকার ইঞ্জিনিয়াররা হতাশায় ভেঙ্গে না পড়ে সমবায়ের মাধ্যমে নতুন শিল্পস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। ১৯৭১-৭২ সালে এই ধরনের সমবায়ের সংখ্যা ছিল ১৫ আর সভ্যসংখ্যা ছিল ১৮০ জন। এই সমবায় সমিতিসমূহের মোট শেয়ার মূলধন ৫২,০০০ টাকা আর কার্যকরী মূলধন ৮৬,০০০ টাকা। এদের মধ্যে ১০টি সমিতি কাজ আরম্ভ করেছে এবং ১৯৭১-৭২ সালে ৩,১৩,৩৬৬ টাকার কাজ করেছে।

বর্তমানে ৩২টি কৃষি সমিতি, ২৬টি শহরাঞ্চলীয় ও কর্ম-সংস্থান সমিতি, ১৬টি দুগ্ধবিতরণ সমিতি এবং উপজাতি অধিবাসিদের মধ্যে ১৬টি সমবায় শস্যগোলা চালু রয়েছে।

পরিবহন সমবায় সমিতিগুলির কাজ এ জেলায় বেশ সন্তোষ-জনক। এদের মধ্যে শক্তিনগর ট্রান্সপোর্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটি, কল্যাণী ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি, শান্তিপুর পরিবহন সমিতি, নদীয়া জেলা মোটরকর্মী ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ এবং কৃষ্ণনগর মোটর এমপ্লয়মেন্ট কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ সমিতিগুলির ভালই লাভ হচ্ছে।

মহিলাদের মধ্যেও সমবায়ের আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে। জেলায় মহিলাদের বেশ কয়েকটি শিল্প সমবায় সমিতি আছে। এদের মধ্যে কল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি, কৃষ্ণনগর মহিলা বিদ্যা-লয়, মণিপুর নারী শিল্প সমিতি প্রভৃতি অগ্রগণ্য।

যদিও এ জেলায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির এখনও অনেক অবকাশ ও সুযোগ আছে, তবু বলা যায় স্বাধীনতার পর সমবায় জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন কর্মধারায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সমবায় আন্দোলনের সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য জেলা পর্যায়ে সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক (Assistant Registrar of Co-operative Societies) এবং প্রতি ব্লকে একজন সমবায় পরিদর্শক (Co-operative Inspector) আছেন।

পরিশিষ্ট

নদীয়া জেলায় সমবায়ের অগ্রগতি

সমিতি	সংখ্যা	সভ্যসংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (টাকা)	কার্যকরী মূলধন (টাকা)	নীটলাভ (টাকা)
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে					
১। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	২	৬৯০	১,৮৬,৮৭৫	১৪,৮২,৭৯০	১৫,৮৬৫
২। কৃষি ঋণদান সমিতি	৬৭৮	৩৮,২২৩	১,২৮,৫৭০	২১,৫৫,৮৯০	৫৩,৮২০
৩। অন্যান্য সমিতি	১৩০	৩৬,৮৫২	২,৭৫,৮৪০	১৩,৮৬,৯৭০	৯৯,৭৩০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনার শেষে					
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	১	৭২৪	৪,৫৯,৪৯০	৩৯,৯৬,৮৭০	১৫,৮৬৫
২। কৃষি ঋণদান সমিতি	৬৩৫	৪২,৩৯০	৬,৯৮,১৭০	২৯,৮৬,৯৩০	৬৮,৯৩০
৩। অন্যান্য সমিতি	১৪০	৩৯,৩৬২	৩৪,২০,৪৩	১৮,৯৬,৭৫০	১২,৬৫,৩৬
৪। জমি বন্ধকী ব্যাংক	১	২৮৭	১২৬৪০	১৮,৯৮,৬৫	৪,৭৩০
৫। কৃষি বিপনন সমিতি	৮	২৩৭২	১১,৪৭,৮৫	৪,২৮,৯৭৫	৮,৯,৭০
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব শেষে					
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	১	৯৫২	১৫,৮২,১৭০	১,২৮,৬৬,৮১৮	৫০,৩১২
২। জমি বন্ধকী ব্যাংক	১	৯৬৮	৫,২০,২৫	৭৭,৬৯,৮০	৯,৭৩৪
৩। পাইকাবী ক্রেতা সমবায়	২	৫৯	২,৭০,৩০২	৯,১২,১৬৮	১২,০৫৩
৪। প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়	৯২	১১,৪৪৩	৩,১০,৭৯০	৪৪৪৭৫৮	১৫ ৮৯৬
৫। কৃষি ঋণদান সমিতি	৫৮২	৩৬,২৩৩	২,৩৬,৭২৩৭	১,২৫,৬৫,৭০৬	১,২৩,৮৯৬
৬। কৃষি বিপনন সমিতি	১২	২৫৭৬	২৩৯০৩৫	৭,১১,৯১৭	১২,৭৩৫
৭। অন্যান্য সমিতি	৩২৪	৩৬,২৩৩	১৬,৩২,৫৬১	৯১,৩৩,০৩৮	১,৩৬,৮৯০
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা কালে					
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	১	১০৬৭	১৯,৯৬,০৫৬	১,৬৮,৯৫,৪২১	৭৩,১৮৯
২। জমিবন্ধকী ব্যাংক	১	২৭১০	৩,৪৯,৭২৫	৫৪,৬৬,২১৪	৭১,২০৫
৩। কৃষি ঋণদান সমিতি	৫৫৪	৬৫৮৯৬	২৪,৮৬,৭৯০	১,৫৭,৯৬,৮৭০	২,৪৯,৭৬৮
৪। কৃষি বিপনন সমিতি	১২	২৬৮৬	২,৭৯,৪২৪	৮,৩৯,৭৩৮	১১,৩৯৬
৫। পাইকারী ক্রেতা সমিতি	২	১১৬	৪,২১,১৭০	১,২১,৪১১৫	--
৬। প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি	৯২	২১,১১৪	৩,১৮,৭৯২	৫,৯৪,০৩১	৩২,১০০
৭। ইঞ্জিনিয়ারিং সমিতি	১৫	১২৮	৫২,০০০	৮৫,০০০	৩৫৮৬০
৮। অন্যান্য সমিতি	২৮৬	৩৪,৮৬৫	১৬,৪৮,৯৯০	৯৮,৪৫,৮৬০	১,২৮,৩৬০

শিল্প

নদীয়া জেলা মূলতঃ কৃষিভিত্তিক বলে এই জেলায় শিল্প বিকাশে বিগত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি। গ্রাম বাংলার অন্যান্য জেলার মতই এই জেলায়ও কিছু গ্রামীন শিল্প, কুটির শিল্প এবং বংশপরম্পরাক্রমে কিছু কিছু শিল্পের উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প এবং কাঁসা পিতল শিল্পের সঙ্গে কিছু কিছু হস্তশিল্পের একটি ঐতিহ্য এই জেলার শিল্প কাঠামোর মেরুদণ্ড বা প্রাণস্বরূপ আজও শিল্প বিকাশে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। বৃটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে বিস্তৃত নীল চাষ নীলশিল্পকে একটা বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিল। পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালা বদল সুরু হলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভারতবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনস্রোতের চাপ এই জেলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে কৃষি থেকে কিছুটা শিল্প-মুখীন করে তোলে। জমির স্বল্পতা জেলার অধিবাসীদের নতুন জীবিকার পথে স্বাভাবিক ভাবেই শিল্প উন্নয়নের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টা, পুরনো শিল্পের সঙ্গে আধুনিক শিল্পের বিকাশে আজ দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতায় এই জেলায় ১৯৫২ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কর্মনিয়োগে এবং কিছু কিছু আধুনিক শিল্পের উন্নতি কল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ এই জেলায় বিভিন্ন ব্লককে উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে শিল্প পরিকল্পনার এক রূপরেখা গ্রহণ করেন।

নদীয়া জেলার বর্তমান শিল্প :

নদীয়া জেলায় মোটামুটি বর্তমান শিল্পসংস্থাগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়--যথা বৃহৎ ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রায়তন, কুটির এবং গ্রামীণ শিল্প। শিল্পগুলি এই জেলার বিভিন্নস্থানে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থনের শিল্প-বিকাশে সমতা বড় একটা নেই। যদি এই জেলার একটি শিল্পমানচিত্র আঁকা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পুরোনো এবং বংশ পরম্পরাগত শিল্পগুলি এক একটি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। যেমন শান্তিপুর ও নবদ্বীপের তাঁতশিল্প, কৃষ্ণনগরের ঘুনিতে মৃৎশিল্প, মাটিয়ারি, নবদ্বীপ এবং ধর্মদায় কাঁসাপিতল শিল্প ইত্যাদি। আবার আধুনিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলি বিশেষভাবে কল্যাণী ও রাণাঘাট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অথচ জেলার উত্তরভাগে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প বিকাশ আজ পর্যন্ত হয়নি। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিল্প গড়ে ওঠার মূলে পূর্বাহ্নেই প্রয়োজন আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিদা (Intrastructure facilities) আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বলতে বোঝা যায়--শিল্পস্থাপনের উপযুক্ত স্থান, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি।

বৃহৎ শিল্প :

বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে আছে চিনির কল, রোলিং মিল, চা বাগানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, মদ তৈরীর কারখানা, এবং বিভিন্ন যন্ত্রের যন্ত্রাংশ। নীচের তালিকটি এই সম্পর্কে দেওয়া হলো।

বৃহৎ শিল্পসংস্থার নাম	প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য
রতনজিৎ এ্যাণ্ড কোম্পানী, কল্যাণী	মদের কারখানা
কে, আব স্টীল ইউনিয়ন (প্রাঃ) লিঃ কল্যাণী	লোহার রড
এ্যান্ড্রিউল এ্যাণ্ড কোম্পনী, কল্যাণী	বিভিন্ন শিল্পকাজের জন্য পাখা, চা-বাগানের যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি।
কল্যাণী স্পিনিং মিল	সুতো
ট্যাপস্ এণ্ড ডাইস, কৃষ্ণনগর	ট্যাপস্ ডাইস ও চা বাগানের যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম।
রামনগর সুগার মিল, পলাশী	চিনি
সেন এ্যাণ্ড পণ্ডিত ইণ্ডাস্টীজ লিঃ, কল্যাণী	সাইকেলের যন্ত্রাংশ

কল্যাণী স্পিনিং মিলস্, কল্যাণী :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে পরিচালিত এই সংস্থাটি ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল কল্যাণীতে কাজ শুরু করে। বিভিন্ন নম্বরের সুতো এই মিলে উৎপন্ন হয়ে থাকে, এদের মধ্যে ১২০ নং, ১০০ নং এবং ৬০ নং সুতো তাঁত এবং যন্ত্রচালিত তাঁতে ব্যবহৃত হয়। গেঞ্জীকলের জন্য ৫০ নং, ৪২ নং এবং ৪০ নং এর সুতোও এখানে তৈরী হয়ে থাকে। সেলাই কলের জন্য ২/৪০ নং সুতোও এখানে তৈরী হয়। এই মিলের কর্মীসংখ্যা ১৭৫৭ জন। যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশের মূল্য ১,৮২,৯৪,৩৩০ টাকা। বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য দাঁড়ায় ১,৬০,২৪,৭২০ টাকার মতো। বিদেশী উন্নত মানের তুলো থেকে এখানে কোরা এবং শাদা দু'রকমের সুতোই প্রস্তুত হয়ে থাকে।

বৃহৎ শিল্পগুলি এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কিছু কিছু সংস্থা ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতায় চীফ ইনসপেক্টর অফ ফ্যাক্টরীজ (পশ্চিমবঙ্গ) এর সঙ্গে পঞ্জীভুক্ত। এই সব সংস্থার একটি হিসেব নীচে দেওয়া হলো, যে সমস্ত সংস্থায় দশ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করেন এবং যেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার হয় অথবা বিদ্যুতের ব্যবহার ছাড়া যদি কুড়ি বা ততোধিক শ্রমিক

নদীয়া জেলার মানচিত্র
শিল্পসূচী
তাঁত
কাঁসা ও পিতল
মৃৎ শিল্প
আধুনিক শিল্প
অন্যান্য শিল্প
শিল্প সম্ভাবনাপূর্ন অঞ্চল
স্কেল ১ ইঞ্চি = ৮ মাইল
মুর্শিদাবাদ
লালগোলা ঘাট
করিমপুর
তেহট্ট
কালিগঞ্জ
নাকাশীপাড়া
চাপড়া
কাটোয়া
বর্দ্ধমান
কৃষ্ণগঞ্জ
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
হাঁসখালি
হাওড়া
শান্তিপুর
রাণাঘাট
বনগাঁ
চাকদহ
হুগলী
কল্যাণী
হরিণঘাটা
কলিকাতা
২৪ পরগনা
উ
রেলপথ
নদী
সীমানা
সড়ক
থানার সীমানা

কাজ করেন, সেই সব সংস্থাগুলি ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতায় পড়ে।

ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত জেলার শিল্প সংস্থা :

সাল	সংস্থার সংখ্যা	শ্রমিকসংখ্যা
১৯৬৯	৬৮	৬,১০৬
১৯৭০	৫৬	৬,৩০৬

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প :

এই জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬ ভাগ বিভিন্ন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত। জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একটি বিস্তৃত তালিকা এই সঙ্গে সংযোজিত হলো। এই সব সংস্থাগুলিতে শিল্প হিসেবে শ্রমিকের নিযুক্তি নির্ভর করে। এমন অনেক সংস্থা রয়েছে যেখানে ২০০ জনের বেশী শ্রমিক কাজ পেয়েছেন। আবার জেলার বিভিন্ন গ্রামের কুটীর শিল্পগুলিতে এক একটি সংস্থা শুধুমাত্র এক একজন শ্রমিক নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং সে ক্ষেত্রে যিনিই শ্রমিক তিনিই মালিক।

জেলার ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পসংস্থা :

পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো অফ এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স এ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ১৯৬৫-৬৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংস্থাগুলির এক সমীক্ষা করেন। তাতে দেখা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই জেলায় মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল ৪৬,৭৮০ এবং ঐ সব সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯৮,০২০। ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের সমীক্ষার প্রতিবেদনটি এই সঙ্গে বিশদভাবে সন্নিবেশিত করা হল।

১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৭১-৭২ সালের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে এই জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সংখ্যা গত ৫ বছরে ১১১৩টি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার বৃদ্ধি ৫৩০১-এ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় যে জেলার কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার মোট সংখ্যা ৪৭,৮৯৩ এবং শ্রমিকসংখ্যা ১,০৩,৩২১।

জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (১৯৭১-৭২) :

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম	মোট সংস্থা
কৃষি সম্বন্ধীয় শিল্প :	মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ	৩
খাদ্যশিল্প :	পাঁউরুটি, বিস্কুট, লজেন্স	৮৬
	ঘানি	২২৭
	চিড়া-মুড়ি	৩৯২
	বিড়ি	৬৫২৮
	মাদুর, চাটাই ও শীতল পাটি	১৫৫
	চানাচুর ও ডালমুট	৫১
	মিঠাই	৯৬৩
	পাঁপড়	১১
	সনপাপড়ি	৬
	আখ ও খেজুর গুড়	২৫৩০
	ঘি ও মাখন	৯৭
	চালের কল	১
	ঢেঁকি	২৩৮৭
	কলে গম পেষাই	৬৩৮
	কলে ধান ভানাই	১০৫
	কলে আখ মাড়াই	২৩
	কলে গম ঝাড়াই	৩
	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	২৬০
বননির্ভরশীল :	বেত ও বাঁশের কাজ	১১৬৫
	কলে কাঠ চেরাই	২৫
	কাঠের আসবাবপত্র ও ছুতোরের কাজ	৪০৩৭
চর্মশিল্প :	কাঁচা চামড়া ও সেলাই	১০
	জুতো তৈরী	৫৮
	জুতো সারাই	৭২১
তাঁতশিল্প :	হস্তচালিত তাঁত	৭৩৫৫
	বিদ্যুৎচালিত তাঁত	১৩৬
	ববিনে সুতো জড়াই	৩৯৪০
	মাছ ধরার জাল	২১৫
	হাতে ছাপার কাপড়	৪১
মুদ্রণশিল্প :	ছাপাখানা	৫৯
	বই বাঁধাই	৩৯
ফোটোগ্রাফিশিল্প :	স্টুডিও	৭৮
	ছবি ও ফটোবাঁধাই	৩৩
মৃৎশিল্প :	ইটের ভাঁটা	৭২
	টালির ভাঁটা	৮৯
	কুমোরের কাজ	৩৯৮৭
	সুরকি কল	৪
	চিনামাটীর কাজ	৮
	স্পান পাইপ ও সিমেন্টের দ্রব্য	৩
রাসায়নিকশিল্প :	প্লাস্টিক দ্রব্য	১
	ঔষধপত্র	২
	সাবান	৬
	বাজী	৬
	কালি	৫

শিল্পের ধরণ	শিল্পের নাম	মোট সংস্থা
	চিরুণী	৮
	ধূপকাঠি	৪৫
	কাঁচের এ্যাম্পুল তৈরী	২
	মোমবাতি	৩
সাধারণ কারিগরীশিল্প :	ওয়েল্ডিং, ড্রিলিং, গ্রাইণ্ডিং ইত্যাদি	৭৫
	রেডিও তৈরী ও সারানো	১৯১
	বালতি তৈরী	১
	মাদুলী তৈরী	৮
	গেট গ্রিল	১১
সাধারণ কারিগরীশিল্প :	চুলের কাঁটা, চাবির রিং ইত্যাদি	১
	সিগারেট লাইটার	১৫
ধাতবশিল্প :	কাঁসা পিতল	৫৯০
	স্টীল ট্রাংক	২৮
	কামারশালা	১৭৮৯
	ছুরি, কাঁচি, সূচ, পিন ইত্যাদি	৩৯
	টিনের তৈরী পাত্র	২৫
যানবাহনশিল্প :	সাইকেল সারাই	৬২৪
	টায়ার রিট্রিড়িং	১৭
	মোটর গাড়ী সারাই	৪৯
	মোটর গাড়ীর ব্যাটারী তৈরী ও সারাই	২
	রিক্সা-বডি নির্মাণ	১৬
	নৌকা নির্মাণ ও সারাই	১০
কারুশিল্প :	মাটির মূর্তি নির্মাণ	৩৪৮
	শাঁখা তৈরী	৩৫৬
	শোলা ও ডাকের সাজ	১০১
	স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলংকার	১৪২৪
	কৃত্রিম অলংকার	৪১
	অন্যান্য পুতুল ও খেলনা তৈরী	৮
	খেস্ বয়ন	১১
	বিভিন্ন নক্সার কাজ	৪২
কৃষি ও সেচ সম্বন্ধীয় শিল্প :	কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও সারাই	৮৪
	কাতার ফিল্টার	২৩
বিবিধ শিল্প :	খড়ের মোড়ক	৩০৩
	ঘড়ি তৈরী	১
	ঘড়ি ও কলম সারাই	১০৩
	বাদ্যযন্ত্র তৈরী ও সারাই	৯৪
	সাইনবোর্ড লেখা	৫৭
	জর্দা ও মসলা তৈরী	৫
	বরফ ও আইসক্রীম	৩০
	হাতে তৈরী কাগজ	২
	দড়ি তৈরী ও মানি ব্যাগ	২৯
	প্রেক্ষাগৃহ	২৯
	সেলাই ও তৈরী পোষাক	২৩৯৩
	ধোপাখানা	১৮৮৭
	ছাতা তৈরী ও সারাই	৩৩৩
	গেঞ্জী সেলাই	৭৫
	সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ	১
	রাবারের বেলুন	১
	সার তৈরী	১
	কার্পেট ও কম্বল (পশম)	৪
	কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরী	১
	কাপড়ের কল	২
	মোট সংস্থা	**৪৭,৮৯৩**
	মোট নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা	**১,১৫,৬১৮**

শিল্প সমবায় সমিতি :

সমাজতন্ত্র রূপায়ণে সমবায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজিবাদ এবং মুনাফাখোর দালালদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থেকে ধীরে ধীরে শ্রমিকদের মধ্যে অধিকার কায়েম করা সমবায়ের মূল নীতি। এককথায় একতাবদ্ধ হ'য়ে এক শোষণমুক্ত পরিবেশে লভ্যাংশের সমবন্টনে আর্থিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলাই সমবায়ের উদ্দেশ্য। সমবায় আন্দোলন আমাদের দেশে বহুদিন থেকে সুরু হয়েছে। কৃষি ঋণদান থেকে সুরু করে ধর্মগোলা, সার ও বীজ বন্টন, উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণন প্রভৃতি ব্যবস্থা কিছুটা সফল হয়েছে বলা যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই প্রসারিত করা হয়েছে। শিল্পে সমবায় নীতি আজ দেশের বহু জায়গায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং এরও পরে বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ অধ্যায় এখনও আসেনি বলে সঠিকভাবে বলা শক্ত যে সমবায় আন্দোলন আমাদের জনজীবনে কতখানি সাফল্যের সঙ্গে দানা বেঁধেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় প্রচেষ্টা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া খুব একটা সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। এর কারণ প্রধানতঃ দুটো। প্রথমতঃ সমবায় আইন কানুনের কিছুটা কাঠিন্য এবং দ্বিতীয়ত সমবায়ে মানসিকতার অভাব।

জেলার সমবায় দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে এই জেলায় ১০৩টি শিল্প সমবায় সমিতি এ পর্য্যন্ত পঞ্জীভুক্ত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি সমিতি ছাড়া বেশীরভাগ সমিতিই বলা যায় নিষ্ক্রিয়।

শিল্প সমবায়ে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারের নতুন ভূমিকা :

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত শিল্পসমবায় সমিতি পরিচালন এবং হিসাবপরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের সমবায় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে শিল্পসমবায় সমিতিগুলির পঞ্জীকরণ ও হিসেব পরীক্ষা ছাড়া সংগঠন, পরিচালন, আর্থিক সাহায্য ও উত্তরোত্তর উন্নতি-বিধান সব কিছুই কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের আওতায় আনা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় সমিতিগুলির পুণরুজ্জীবন, বর্তমান সমিতি-গুলির পরিবর্দ্ধন ও নতুন নতুন সমিতি স্থাপনের ব্যাপারে কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার এক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

কয়েকটি কর্মরত শিল্পসমবায় সমিতি :

প্যাক্ কো: অপ: ইণ্ডাস্ট্রীয়াল মালটিপারপাস্ সোসাইটি, নবদ্বীপ —কৃত্রিম অলংকার ও পেনের কালি।

নবদ্বীপ ন্যাশন্যাল ক্লক কো: অপ: সোসাইটি লি:, নবদ্বীপ —দেওয়াল ঘড়ি

কালিনগর পাটিশিল্প সমবায় সমিতি, কৃষ্ণনগর —শীতলপাটি

চবণডাঙ্গা মাদুরশিল্প সমবায় সমিতি, হরিণঘাটা —মাদুর

নবদ্বীপ লুমস্ এ্যাণ্ড একসেসরিজ কো: অপ: সোসাইটি, নবদ্বীপ —তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম।

নবদ্বীপ থানা ব্রাস এ্যাণ্ড বেলমেটাল কো: অপ: সোসাইটি, নবদ্বীপ—কাঁসা পিতলের বাসন।

নবদ্বীপ পটারী এ্যাণ্ড ব্রিকস্ কো: অপ: সোসাইটি, নবদ্বীপ —ইট

বল্লভপাড়া ব্লক প্রিন্টিং কো: অপ: সোসাইটি, বল্লভপাড়া (কালিগঞ্জ) —ছাপাশাড়ী

বালিয়াডাঙ্গা শঙ্খ শিল্পী সমবায় সমিতি, বালিয়াডাঙ্গা (করিমপুর) —শাঁখা

মেট্রোপলিটান ইঞ্জিনিয়ারিং কো: অপ: সোসাইটি, চাকদহ —নির্মাণ কার্য

এ্যাগ্রো ডেভলপমেন্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কো: অপ: সোসাইটি কৃষ্ণনগর —নির্মাণ কার্য

প্রোগ্রেসিভ ইয়ং ইঞ্জিনীয়ার্স কো: অপ: সোসাইটি, কৃষ্ণনগর —নির্মাণ কার্য

সি. এম. ই. ইঞ্জিনীয়ার্স কো: অপ: সোসাইটি, নবদ্বীপ —নির্মাণ কার্য

কল্যাণী ইঞ্জিনীয়ার্স কো: অপ: সোসাইটি, কল্যাণী —নির্মাণ কার্য

শিল্প শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র :

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের ভূমিকা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাধান্য পায়। গ্রামের সম্পদ ও জনশক্তিকে কিছু পরিমাণে শিল্পে নিয়োজিত করবার উদ্দেশ্যে ব্লক পর্যায়ে কয়েটি শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষদের হাতে-কলমে ছোটখাটো শিল্পে শিক্ষা দেওয়া, গ্রাম্য শিল্পগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন নতুন শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ খুলে দেওয়া। এই জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন ব্লকে এই ধরনের কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। শিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা পরবর্তী পর্যায়ে কিছু কিছু সরকারী আর্থিক সাহায্যে নিজেদের শিল্প গড়ে তুলেছেন। আবার বেশ কয়েকজন মিলে শিল্প সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিল্পে নিযুক্ত হয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর-১, কৃষ্ণনগর-২, কালীগঞ্জ, নবদ্বীপ, হাঁসখালি, নাকাশিপাড়া, চাকদহ প্রভৃতি উন্নয়ন ব্লকে কতকগুলি শিক্ষণ ও উৎপাদন-কেন্দ্র ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের পরিচালনায় চালু করা হয়েছিল। এদের মধ্যে কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, ছাপাশাড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুদান-পুষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান :

এই জেলায় বিভিন্ন শহরাঞ্চলে কয়েকটি মহিলা সমিতি শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কাজে নিযুক্ত রয়েছে। তাঁতের কাজ, সেলায়ের কাজ, মাদুর তৈরী, খেস তৈরী, সেলাইয়ে লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা কোর্স, কাপড়ের পুতুল এই সমস্ত বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যাপারে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার এই সকল মহিলা সমিতিগুলিকে শিক্ষণের ব্যাপারে প্রতিবছর বিভিন্ন রকমের অনুদান দিয়ে আসছেন। এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো দুঃস্থ ও কর্মগ্রহণেচ্ছু মহিলাদের শিল্প কাজের মাধ্যমে ঘরে বসে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কৃষ্ণনগরের উমাশশী নারী শিক্ষা শিল্প-মন্দির, মহিলা সংঘ বিদ্যালয়, নবদ্বীপের মহিলামঙ্গল সমিতি, কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাণাঘাটের নারীকর্মী সমিতি উল্লেখযোগ্য।

হস্ত ও বিদ্যুত-চালিত তাঁত শিক্ষণ :

তাঁতের কাজ, আধুনিক এবং উন্নততর পদ্ধতিতে নক্সা ও পাড়ের কাজ, বিদ্যুৎচালিত তাঁতের শিক্ষণ, এবং উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের কলের জন্য উপযুক্ত নিপুণ ও অভিজ্ঞ কারিগর তৈরী করাই এই শিক্ষণ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই ধরনের তিনটি প্রকল্প বর্তমানে কৃষ্ণনগরে, নবদ্বীপ ও কল্যাণী শিল্প এস্টেটে চালু রয়েছে। এক বছর ধরে এই সব শিক্ষণকেন্দ্রে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং শিক্ষণকালে ছাত্রপিছু মাসিক ২০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

কাঠের কাজ :

আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত শিক্ষণ-পদ্ধতির এক প্রকল্প নিয়ে কাঠের আসবাবপত্র তৈরীতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার কল্যাণীতে উড্-ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামে একটি শিক্ষণকেন্দ্র চালু করেছেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট :

পশ্চিম বঙ্গ শিল্পাধিকার কর্তৃক কল্যাণীতে বিভিন্ন কারিগরী শিল্প শিক্ষণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়েছে। কৃষ্ণনগরেও এই ধরনের একটি শিল্প শিক্ষণকেন্দ্র (ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ট্রেনিং সেণ্টার) খোলা হয়েছে। এই সব শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রধানতঃ ফিটার, মোটর মেকানিক, ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

জেলার কয়েকটি বিশেষ শিল্প :

তাঁতশিল্প : পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁত শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন পুরনো ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে অন্যদিকে তেমনি আধুনিক নকশা ও উৎকর্ষের তালে তাল দিয়ে ভারতে অন্যান্য তন্তুজ দ্রব্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার তাঁতের শাড়ী তার সুক্ষ্ম ও নিপুণ শিল্প প্রাচুর্যে আজও ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অদ্বিতীয়, এবং এই প্রসঙ্গে নদীয়া জেলার শান্তিপুর তার শ্রেষ্ঠত্বে গর্ব অনুভব করতে পারে। কবে এই জেলায় প্রথম তাঁতের কাজ আরম্ভ হয় তার সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ এই শিল্পটি ঐতিহ্যে পুরানো এবং অতীতের বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বেঁচে রয়েছে। বিভিন্ন নক্‌শার কাজে তাঁতের উন্নতি হয়েছে। পুরানো তাঁতগুলিতে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বেশী উৎপাদনের জন্য এবং নক্‌শা ও কারুকার্যের সূক্ষ্মতা ও সরলীকরণের জন্য জ্যাকার্ড ও ডবী এবং চিত্তরঞ্জন প্রায়-স্বয়ংক্রীয় তাঁতের প্রবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শান্তিপুর অঞ্চলে ৺ভূপতিচরণ প্রামাণিক আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে জ্যাকার্ড ব্যবহারের প্রচলন করেন। পুরানো পদ্ধতিতে তাঁতের কাজে ৺গিরীশচন্দ্র পাল এবং কিশোরী-লাল প্রামাণিক পথিকৃৎ বলে আজও স্বীকৃত। শোনা যায় যে ৺গিরীশচন্দ্র পাল 'কলাবতী' নামে এক ধরনের শুধুমাত্র জরী দিয়ে শাড়ী বুনতে পারতেন এবং তাঁর দাম পড়তো আনুমানিক সেই আমলের ৫০০ টাকা। তখনকার দিনে এই সমস্ত সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্ট কাপড় দিল্লী, কাবুল, ইরাণ, আরব, তুরস্ক, গ্রীস ও ইটালীতে অত্যন্ত চাহিদার সঙ্গে বিক্রী হতো।

শান্তিপুরের পরেই ফুলিয়া এবং নবদ্বীপের তাঁত উল্লেখ করা যেতে পারে। ফুলিয়ায় খুব সূক্ষ্ম তাঁতের সাড়ী তৈরী হচ্ছে। নবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষে নয়, উৎপাদনে। মোটা সূতার তৈরী শাড়ী-ধুতি পশ্চিমবাংলার বিশেষ করে গ্রাম ও অন্যান্য রাজ্যগুলির নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদায় এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া কৃষ্ণনগরের কাছে ভাতজংলা, রাণাঘাট, তাহেরপুর, বীরনগর, স্বরূপগঞ্জ, চরব্রহ্মনগর এবং তেহট্টেও প্রচুর তাঁতশিল্পী রয়েছেন। তাঁতশিল্পের একটি প্রতিবেদন নীচে দেওয়া হলো

	বৎসর	১৯৭০-৭১
	সূতিবস্ত্র	পশমবস্ত্র
১। সমবায় সমিতির সংখ্যা	৭৪	১
২। (ক) সমবায় সমিতিভুক্ত তাঁত সংখ্যা	১০,৫৯৬	৩৮
(খ) সমিতি বহির্ভূক্ত তাঁত সংখ্যা	১৪,৭৯৫	১২
মোট তাঁত সংখ্যা	২৪,৩৯১	৫০
৩। আনুমানিক বার্ষিকউৎপাদন	৪ কোটী টাকা	৫০ হাজার টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ কর্তৃক সাহায্য :

	সূতিবস্ত্র (টাকা)	পশমবস্ত্র (টাকা)
৪। প্রধান প্রধান পরিকল্পনা খাতে ঋণ ও অনুদান বাবদ দেয় (১৯৬৫-৬৬ হতে ১৯৭০-৭১)		
(ক) কার্য্যকরী মূলধন	১,৪৭,৫০০	৬,০০০
(খ) (রিবেট) বিক্রয়ছাড়	৩,৯৪,২৯৫	--
(গ) উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম বাবদ	৩০,১৪৯	১,৭৬০

বিদ্যুৎ চালিত তাঁত :

এই জেলায় ১৬টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁত সমবায় সমিতি রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রায় ১৪০০ বিদ্যুৎ চালিত তাঁত রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ, নবদ্বীপ, বীরনগর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ করছে।

ঘূর্ণীর মৃৎশিল্প :

এই জেলার কারুশিল্পের মধ্যে কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণীর মাটির পুতুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় নাটোর থেকে একদল মৃৎশিল্পী ঘূর্ণীতে এই শিল্পের প্রবর্তন করেন। এই শিল্পের বিকাশে লালগোলা, নসীপুর ও কাশিমবাজারের মহারাজাদের যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য ছিল। এখানকার মৃৎশিল্পীদের প্রায় আট পুরুষের ঐতিহ্য নিয়ে এই শিল্পটি তার সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কাজের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মানবীয় মূর্তিগুলিতে দেহের গঠন ও তুলির টানে শিল্পসুষমার সঙ্গে যে বাস্তবতা ফুটে উঠে তাতে মৃন্ময়কে অনেক সময় চিন্ময় বলে ভুল হয়ে যায়।

মোটামুটি এখনও প্রায় ১০০ জন শিল্পী এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। এদের মধ্যে সবাই সমান দক্ষ নয়। দক্ষ শিল্পীদের মধ্যে সর্বশ্রী কার্তিকচন্দ্র পাল, বিষ্ণুপদ পাল, বীরেন পাল, মুক্তি পাল, শম্ভু পাল এবং গণেশ পালের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল, শ্রীমুক্তি পাল ও আরও কয়েকজন শিল্পী পাথর দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজেও বিশেষ পারদর্শী।

ঘূর্ণীর পার্শ্ববর্তী জলঙ্গী নদীর মাটি এই মৃৎশিল্পের উপাদান হিসেবে বিশেষ উপযুক্ত বলেই সম্ভবতঃ এই শিল্পটি এখানে গড়ে উঠেছিল। তবে নদীর পাড় ক্রমাগত ভেঙ্গে যাওয়ায় এখন এই মাটির সংগ্রহ খুব সহজ নয়। এখন স্থানীয় এজেন্টের মারফতে কাছাকাছি জায়গার উপযুক্ত মাটি সংগ্রহ করা

হয়। রাজমহল খড়িমাটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যে সব জিনিষগুলি সাধারণতঃ রং-এর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তা'হল মাজাখড়ি, বেলামাটি, পোড়ামাটি, খুনখারাপী বা মিনা, দেলা নীল, ভাসা কালি, ফর্সা ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকার রং। খুব সামান্য উপকরণ নিয়েই শিল্পীরা কাজ করে থাকেন—কোদাল, বালতি, ঝুড়ি, কাঠের খণ্ড, হাতুড়ী, ছুরি ও বাঁশের চিয়ারি এবং খুব উৎকৃষ্ট তুলি।

ঘূর্ণীতে তিন ইঞ্চি থেকে দুই ফুট পর্যন্ত আকারের মূর্তি ও নানারকমের পুতুল তৈরী হয়ে থাকে। যেসব মূর্তি ও পুতুল এখানে সচরাচর তৈরী হয় তা হল, চাষী, মিস্ত্রি, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বাউল, ভিখারী, সাঁওতাল নরনারী প্রভৃতি টাইপ কর্মজীবী মানুষের পূর্ণাকৃতি মূর্তি। এছাড়া নর্তকী, পল্লীবালা, স্নানরতা যুবতী, ভেনাস, বিভিন্ন প্রদেশীয় নরনারী, দেবদেবীর মূর্তিও শিল্পীরা তৈরী করেন। নানারকম ফল, মশলা, তরিতরকারী, বিস্কুট, বাদাম, পাখী, মাছ, আরশোলা, প্রজাপতি, টিকটিকি প্রভৃতির পুতুলও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য। এই পুতুলগুলি গড়ন ও রংয়ে এত বাস্তব হয় যে না জানা থাকলে এগুলি আসল জিনিস বলেই ভুল হবে।

ব্যবসায়িক কারণে এখন ছাঁচের বহুল প্রচলন হলেও সূক্ষ্ম ও মৌলিক কাজ কৃষ্ণনগরের দক্ষশিল্পীরা এখনও হাতে করে থাকেন। অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মূর্তিগুলি তৈরী করেন।

কৃষ্ণনগরের মূর্তির ও পুতুলের চাহিদা এখনও ভারতের সর্বত্র আছে। ঘূর্ণীতে কয়েকটি দোকানের মাধ্যমেই খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়। বিক্রীত মূল্যের আনুমানিক দাম বৎসরে এক লক্ষ টাকা।

শোলার সাজ ও ডাকের সাজ :

নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শোলার সাজ ও ডাকের সাজের কাজ একটি পুরনো শিল্প হিসাবে আজও বেঁচে আছে। এই ধরনের নিপুণ ও সূক্ষ্ম কাজ পশ্চিমবাংলায় অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। কবে বা কারা প্রথম এই জেলায় এই ধরনের শিল্প প্রয়াস সুরু করেছিলেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রতিমা সজ্জায় এবং পূজাপার্বণে ডাকের ও শোলার শিল্পীরা একদিন সারা বাংলাদেশে যথেষ্ট নাম ডাক নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই শিল্পটি 'ডাকের সাজ' নামে আজও প্রসিদ্ধ। এখনও কিছু কিছু শিল্পী ঘরে বসে এই কাজ করে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে কালিগঞ্জের শোলার টুপির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে শোলার টুপির ব্যবহারের দরুণ এই শিল্পটির অত্যন্ত প্রসার লাভ ঘটেছিল।

কাঁসা-পিতল শিল্প :

নবদ্বীপ, মাটিয়ারি এবং ধর্মদায় এই শিল্পটির উপর নির্ভর করে আজও প্রায় ১৫০টি পরিবার বেঁচে আছে। বিভিন্ন ধরনের রকমারী কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র, পূজার সামগ্রী ও দেবদেবীর মূর্তি বহুকাল ধরে এখানকার শিল্পীরা তৈরী করে আসছেন। কিন্তু আজকে বিভিন্ন ধরনের এ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টীল, প্লাস্টিকের তৈরী বাসনপত্রের সঙ্গে কাঁসা-পিতলের বাসন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। ফলে এই শিল্পে কিছুটা মন্দাভাব এসেছে। কিন্তু তবুও কাঁসাপিতলের বাসনের পুরনো বা ভাঙ্গা অবস্থায়ও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে বলেই এই শিল্পটি আজও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে নিজ বৈশিষ্ট্যে বেঁচে আছে।

শাঁখা শিল্প :

এই জেলার করিমপুরের কাছে বালিয়াডাঙ্গায় প্রায় ১৫০টি পরিবার এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনের মাধ্যমে টিউটিকরিন থেকে শঙ্খ আনা হয়, এবং বালিয়াডাঙ্গা শিল্পী সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে এই সব কাঁচামাল বিতরণ করা হয়। প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের সকলেই এই শিল্পে কিছু না কিছু ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এই সব শিল্পীদের তৈরী শাঁখা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় হয়। পরিবহন ব্যয়, শঙ্খের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে কাঁচা শঙ্খের দাম বৃদ্ধি হওয়ার ফলে উৎপাদিত শাঁখার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে তেমনি বিবাহিতাদের মধ্যে শাঁখা ব্যবহার আধুনিক কালে কিছুটা কমেও গিয়েছে। তবুও শাঁখা ব্যবহারে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য আছে বলে আজও এই শিল্পটির এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

কৃত্রিম অলংকার শিল্প :

তামা ও পিতল দিয়ে তৈরী অলংকার সোনার জলে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোনার ঔজ্জ্বল্য লাভ করে এবং দেখতে অবিকল সোনার অলংকারের মতোই মনে হয়। পূর্বে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে এই ধরনের কৃত্রিম অলংকার আমাদের দেশে প্রচুর আসত, দামে সস্তা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে এই সমস্ত অলংকার আজও যথেষ্ট চাহিদার সঙ্গে বিক্রী হয়ে থাকে। নবদ্বীপের প্যাক কোঅপারেটিভ এই শিল্পে এক যুগান্তর এনেছে।

ঘড়িতৈরী শিল্প :

নবদ্বীপে ন্যাশনাল ক্লক কোঅপারেটিভ দেওয়াল ঘড়ি তৈরীর কাজে বেশ কিছুকাল ধরে কাজ করে আসছে। বিভিন্ন আকারের ঘড়িগুলি আধুনিক ডিজাইন এবং উৎকর্ষের দিক থেকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই ধরনের শিল্প-প্রয়াস এই জেলার আধুনিক শিল্পের বিকাশে এক বিরাট সম্ভাবনার সূচনা করছে।

গেঞ্জী সেলাই :

কৃষ্ণনগরের কাছে শক্তিনগরে ৭৪টি পরিবার তাদের বাড়ীতে গেঞ্জীর কাপড় কিনে গেঞ্জী সেলাই করে থাকে। এই গেঞ্জীগুলি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়—বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামেও বিক্রি হয়ে থাকে।

খড়ের মোড়ক :

ফুলিয়ায় দুটি প্রতিষ্ঠান খড়, সুতলী, ক্রাফ্ট কাগজ এবং আঠা দিয়ে তৈরী করছে খড়ের মোড়ক। কাঁচের শিশি বোতল জড়াবার কাজে এই মোড়ক বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ফুলিয়া কলোনী, কৃষিপল্লী, ফুলিয়া পাড়া, চটকাতলা, প্রফুল্লনগর, বয়রা এবং কুমুলিয়ার প্রায় ৭০০ পরিবার এই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। ডাবর কোং, সিকিমের মদের কারখানা, কল্যাণীর রতনজি মদের কারখানা ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান এই ধরনের খড়ের মোড়ক কিনে থাকেন।

উড্ ইণ্ডাস্ট্রিজ :

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার পরিচালিত এই কেন্দ্র কল্যাণীতে উৎকৃষ্টমানের কাঠের কাজে নিযুক্ত। আধুনিক এবং উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ইত্যাদি এখানে তৈরী হয়ে থাকে।

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ্ কর্পোরেশান :

পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ভারত সরকারের এই সংস্থাটি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাহেরপুর, গয়েশপুর এবং চাকদহের খোস্বাস্ মহল্লায় তিনটি কেন্দ্র অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে বিশেষভাবে তাঁত-শিল্পে কাজ করছে।

ডন বস্কো :

কৃষ্ণনগরে এই সংস্থা বিভিন্ন রকমের কারিগরী কাজ করে থাকেন। এগুলির মান বেশ উন্নত।

কল্যাণী শিল্প এস্টেট্ :

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণী শিল্প এস্টেট পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহত্তম শিল্প এস্টেট। কল্যাণীতে এই শিল্প এস্টেট স্থাপনের অনুকূলে নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছিল। এই এস্টেট নবনির্মিত কল্যাণী উপনগরীর মধ্যে অবস্থিত। এই উপনগরী প্রশস্ত রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুবিধাতে সমৃদ্ধ। শহর কলকলকাতা থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে এই উপনগরী দুদিক দিয়ে দুটি প্রশস্ত হাইওয়ে দিয়ে বেষ্টিত। এছাড়া এই শিল্প এস্টেট কল্যাণী রেল স্টেশন থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই উপনগরী হুগলী নদীর খুব কাছে অবস্থিত ও হুগলী জেলার সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

এই শিল্প এস্টেটের কাছেই একটি সরকারী শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকায় দক্ষ কারিগরের দুষ্প্রাপ্যতা নেই। এছাড়া নিকটবর্তী উদ্বাস্তু কলোনীর বহু কর্মী অদক্ষ কারিগর হিসাবে এ অঞ্চলের কলকারখানায় নিযুক্ত হয়েছেন।

কৃষি থেকে ক্ষুদ্রশিল্পে দ্রুত অগ্রসর হয়ে এক বৃহৎ জনসমষ্টির কর্মসংস্থান করার জন্য কল্যাণী শিল্প এস্টেট স্থাপন করা হয়। কল্যাণী উপনগরীর জনসংখ্যা ১৮,৩৩৩। এই শিল্প এস্টেট কল্যাণী ইনডাস্ট্রিয়াল এরিয়া 'ডি' ব্লকের মধ্যে অবস্থিত। একটি রেলওয়ে মালগাড়ী লাইন এই শিল্প অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। বাস্তব দিক দিয়ে এই শিল্প এস্টেটের স্থান নিরূপণ সত্যই সবদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। এই এস্টেট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় ৯০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত।

শিল্প এস্টেটের শেডগুলো সাধারণতঃ শিল্পের গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই নির্মিত। এই শেডগুলোর আয়তন ৫,০০০ বর্গফুট থেকে ১৬,৫০০ বর্গফুট। ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগীরা এই সব বড় শেডের মধ্যে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী ৮০০ থেকে ৯,০০০ বা ততোধিক বর্গফুট নিয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিজের কারখানাটি অনায়াসে স্থাপন করতে পারেন। এই এস্টেটে সর্বদা জল, বিদ্যুৎ ও রাস্তাঘাট সহজলভ্য। শেডের মধ্যে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে শেডটি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এই শেডগুলোতে মোটামুটি ৪০টি ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান দেওয়া যায়। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) কল্যাণী শিল্প এস্টেটের প্রকল্পটি হাতে নেন।

১৯৫৯ সালে এপ্রিল মাসে প্রথম শিল্পসংস্থাটি মাত্র ২০ জন শ্রমিক নিয়ে এই এস্টেটে কাজ সুরু করে, তখন এই সংস্থাটির মাসিক উৎপাদন ছিল মোটামুটি ১৫,০০০ টাকা এবং কালক্রমে এই এস্টেটে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩৩টি শিল্প সংস্থায় প্রায় ১৭০০ শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছেন। এই ৩৩টি সংস্থার বছরের উৎপাদন আনুমানিক দেড় কোটি টাকা।

ইনডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে শিল্প শ্রমিকদের জন্য নির্মিত কোয়ার্টার এই এস্টেটের আধ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এছাড়া এখানে অফিসার ও কর্তৃপক্ষের জন্য থাকার সুব্যবস্থা আছে।

এই এস্টেটের আরও কয়েকটি ভাল ব্যবস্থা আছে। এখানে ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকারের স্মল ইনডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইন্সটিটিউট আছে। কাস্টিং ও গ্যালভানাইজিং-এর সুব্যবস্থা আছে। এখানে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্রশিল্পগুলো একে অপরের সাহায্যে লাগতে পারে।

এখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে। স্পেয়ার পার্টস্, থেকে সুরু করে বাইসাইকেল পার্টস, টিউব, চুম্বকচাক, কারবাইড, টিপডটুল, যান্ত্রিক খেলনা, ছোট গ্রিল, কাপড়, স্টীলের আসবাবপত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৬ দফা শিল্প কর্মসূচী :

বেকার সমস্যা আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকুরী সৃষ্টি এক অবাস্তব কল্পনা। শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবককে কাজ দিতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ আজ নিতেই হবে। তাই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে এই সমস্যার কিছু সুরাহা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে এক প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পে বলা হয়েছে ১৯৭১ সালের অক্টোবর

থেকে ১৯৭২ সালের সেপ্টেমবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২০০০টি নতুন শিল্প সংস্থা চালু করতে হবে। প্রত্যেক জেলার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে কাজ সুরু হল। নদীয়া জেলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫০টি নতুন শিল্প সংস্থা। সরকারী সাহায্য, পরামর্শ, শিল্প নির্বাচন এবং বেকার যুবকদের শিল্পে প্রণোদিত করে—এই প্রকল্প এক আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। এগিয়ে এসেছেন জেলার শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবকবৃন্দ। চালু হয়েছে এক একটি শিল্প নদীয়ার গ্রামে, এবং শহরে। সরকারী সাহায্যে এবং জাতীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যে নদীয়া জেলা নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছে গিয়ে ১৫০টি নতুন শিল্পের জায়গায় চালু করেছে ২০১টি। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২২৪টি নতুন শিল্প সংস্থা চালু হয়েছে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে। এইসব শিল্প সংস্থার কাজ পেয়েছেন ১২১৮ জন বেকার যুবক। মোট নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭,৯১,৬৩০ টাকা। চাকরীর মোহ ছেড়ে যুবসমাজকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বেকার যুবকদের সামনে নিয়ে এসেছে এক নতুন দিগ্‌দর্শন। এ জেলার যুবক সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই প্রমাণ রেখেছেন অনুকূল পরিবেশ, কিছু সাহায্য এবং সৎ পরামর্শ পেলে তারা নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টিতে বহু লোকের কর্মসংস্থান করে দিতে পারবেন। যে সব নতুন শিল্প তৈরী হয়েছে তাদের মধ্যে গমভাঙ্গা কল থেকে শুরু করে সাইকেল রিপেয়ারিং, রেডিও তৈরী, কয়্যার ফিল্টার, থ্র্যাশার মেসিন তৈরী, দর্জির কাজ, স্যুটকেস, পেনের কারখানা, কৃষির সাজসরঞ্জাম সারাই, ক্ল্যাম্প ও ওয়াসার, মোমবাতি, জুটমিলের পিন, রাবার 'ভি' বেল্ট, গেটগ্রীল, উডেন ড্রাম, খড়ের মোড়ক, পাঁউরুটীর কারখানা, ফোটোগ্র্যাফি, ছাপাখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীয়া জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য কৃষ্ণনগরে জেলা শিল্পকরণ সহ একজন জেলা শিল্প আধিকারিক আছেন। প্রতি ব্লকে একজন শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক আছেন। তাঁতশিল্পের উন্নতি এবং তাঁতীদের সাহায্য করার জন্য কৃষ্ণনগরে উপ-অধিকর্তা, শিল্প (তাঁত) রয়েছেন, তাঁর অধীনে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে তাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস আছে।
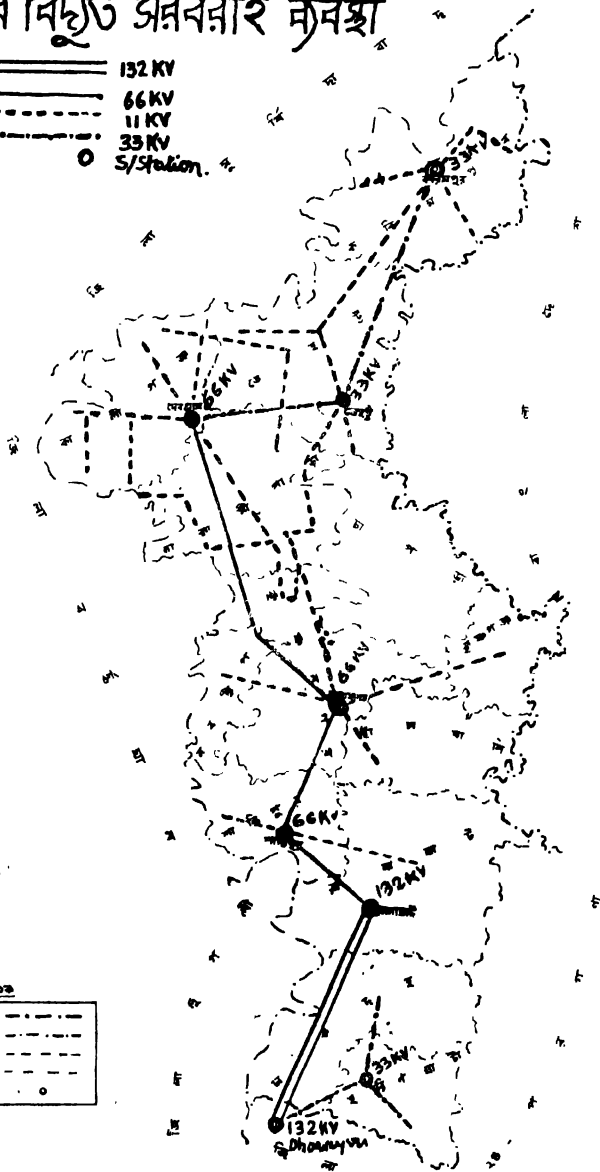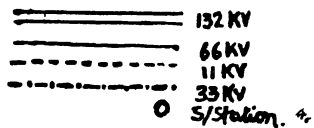
বিদ্যুৎ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এক কথায় কৃষি থেকে শুরু করে শিল্প এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রেখে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং করছেন। কয়লা পুড়িয়ে ডিজেল জ্বালিয়ে এবং জলকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বিদ্যুৎ আর দিকে দিকে খুলে দিচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন নতুন দরজা। নদীয়া জেলাও আজ পেছিয়ে নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ না পেলেও বিভিন্ন চেষ্টা চলেছে আরও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের মাধ্যমে নদীয়ার মাটিতে জলের ব্যবস্থা করে কী করে আরও ফসল তোলা যায়, কী করে শহর এবং পল্লীতে বিদ্যুৎকে সহজলভ্য করে তুলে; গড়ে তোলা যায় নতুন নতুন ক্ষুদ্র শিল্প, অন্ধকার দূর করে কত শীঘ্র গ্রামে গ্রামে এবং ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জেলে দেওয়া যায়।

নদীয়া জেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন কেন্দ্র নেই। ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার কেন্দ্র থেকে সমগ্র নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। ব্যাণ্ডেল থেকে ১৩২ কে, ভি, দুটি বিদ্যুৎবাহী লাইন ধরমপুর হয়ে রাণাঘাট উপ-কেন্দ্রে পৌঁছেছে। রাণাঘাট উপকেন্দ্র থেকে ৬৬ কে, ভি, একটি লাইন শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগর হয়ে দেবগ্রাম পৌঁছেছে। শান্তিপুর উপকেন্দ্র থেকে আবার চারটি ১১ কে, ভি, ফিডার লাইন ঐ অঞ্চলের জন্য প্রসারিত হয়েছে। দেবগ্রাম উপকেন্দ্র থেকে ৩৩ কে, ভি, একটি লাইন তেহট্ট হয়ে করিমপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর উপকেন্দ্র থেকে আবার আটটি ১১ কে, ভি, ফিডার লাইন বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। দেবগ্রাম উপকেন্দ্র থেকে তিনটি ১১ কে, ভি, ফিডার লাইন দেবগ্রামের বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে এই জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহের উর্দ্ধতম পরিমাণ ২২ মেগাওয়াট। দুটি বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা এই জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং নবদ্বীপ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই জেলার ১২৮২টি গ্রামের মধ্যে ৪৩৩টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ মোট গ্রামের ৩৩.৮৫ শতাংশ গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনা হয়েছে। জেলার ১২টি শহরেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যে পল্লী-বৈদ্যুতিকরণ সংস্থার আওতায় আরও ৩৫২টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়েছে এবং কার্যক্রমে মোট ১৪১.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। পল্লী অঞ্চলে চাষের কাজে বিদ্যুৎ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ৪৪৭টি (৩১শে মার্চ, ১৯৭২) গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াও বরণবেরিয়া ঠাকুর সোসাইটি পরিচালিত অগভীর নলকূপগুলি সহ প্রায় ২৫৮টি অগভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পল্লী-বৈদ্যুতিকরণে আজ অত্যন্ত জোর দেওয়া হলেও ১ম পরিকল্পনাকালেই পূর্বতন নর্থ ক্যালকাটা গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহে এই জেলার কিছু পল্লী-অঞ্চল প্রাধান্য পেয়েছিল। এদের মধ্যে বাদকুল্লা, ফুলিয়া, দেবগ্রাম, বেথুয়া-ডহরী, পলাশী, মুড়াগাছা, ধুবুলিয়া এবং মাটিয়ারী সেই সময় থেকেই বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আসে। গ্রাম-বৈদ্যুতিকরণের সর্বশেষ সংখ্যা ৪৭৯ (নভেম্বর ১৯৭২)।

১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক গ্রাম-বৈদ্যুতিকরণের একটি তালিকা দেখিয়ে বলা যায় যে গ্রাম-বৈদ্যুতিকরণে নদীয়া জেলা এখন পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করে আছে।

	জেলা	মোট গ্রামসংখ্যা	গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের সংখ্যা	১৯৭১ সালের শেষে বৈদ্যুতিকরণের হার
১।	বাঁকুড়া	৩৫৫০	৯৪	২.৭৬
২।	বীরভূম	২২৩৪	৮৯	৩.৯৪
৩।	বর্দ্ধমান	২৬৬৫	৫২০	১৯.৪৯
৪।	কুচবিহার	১১৩৫	১৩	১.১৪
৫।	দার্জিলিং	৫৩৬	১৫৫	২৮.৯১
৬।	হুগলী	১০১০	৩৪৬	১৮.১২
৭।	হাওড়া	৭৮৭	১২৩	১৫.৬৩
৮।	জলপাইগুড়ি	৭৭৪	১৬৩	২১.০৫
৯।	মালদহ	১৬০২	৭৫	৪.৬৮
১০।	মেদিনীপুর	১০৬১৮	২১৪	২.০১
১১।	মুর্শিদাবাদ	১৯৩২	২৩৪	১২.১১
১২।	নদীয়া	১২৮২	৪৩৩	৩৩.৮০
১৩।	২৪-পরগণা	৩৮১২	৪২৮	১১.২৩
১৪।	পুরুলিয়া	২৪৯০	৫৭	২.২৮
১৫।	পঃ দিনাজপুর	৩১৩০	১৮	০.৫৭
মোট		৩৮৪৮	২৯৬৬	৭.৭১

নদীয়া জেলায় ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশান লাইনের বিবরণ (৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত):

অপারেটিং ভোল্টেজ		লাইনের পরিমাণ	
১,৩২,০০০ ভোল্ট		৫৮	কিলোমিটার
৬৬,০০০ ,,		১৩০	,,
৩৩,০০০ ,,		২৪৯	,,
১১,০০০ ,,		১,৪৩৭	,,
৬,০০০ ,,		১	,,
৪০০,২৩০ ,,		৬৮১	,,
	মোট	২,৫৫৬	কিলোমিটার

গ্রাহকসংখ্যা (৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত):

বাড়ীতে ব্যবহারকারী	১১,১৩৪
ব্যবসায় ব্যবহারকারী	৬,০৩১
শিল্পে ব্যবহারকারী (মধ্যমচাপ অর্থাৎ ৪০০ ভোল্ট পর্যন্ত)	১,৬৫০
হাই ভোল্টেজ্ ও এক্সট্রা হাই-ভোল্টেজ্‌বিশিষ্ট বেশী বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারী সংস্থা	৪০
গভীর নলকূপ	৪৪৭
পাবলিক লাইটিং ,,	২১ (মোট বাতির সংখ্যা— ৪৪৮৫টি)
পাবলিক ওয়াটার ওয়ার্কস ,,	৬

পরিবহন ও যোগাযোগ

যখন আমাদের দেশে রেলপথ ছিল না, রাস্তার সংখ্যাও ছিল খুবই কম, মোটরের চলন হয় নি, তখন নদীই ছিল আমাদের প্রধান যোগাযোগের পথ, নৌকাই ছিল প্রধান বাহন। শুধু যাত্রী চলাচল নয়, ব্যবসাবাণিজ্যও তখন প্রধানতঃ নদীপথের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নদীয়ার প্রধান তিনটি নদী—ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বছরের সবসময়ই নৌ-পরিবহনের পক্ষে উপযোগী ছিল এবং এই নদীগুলিই ছিল জেলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এবং যাতায়াতের প্রধান পথ। ১৭৯৭ সালে কোলব্রুক এক বিবরণীতে বলেছেন যে ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ সালে ভাগীরথী ও মাথাভাঙ্গা গ্রীষ্মকালেও নৌ-পরিবহনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। তবে ক্রমে ক্রমেই নদীগুলির অবস্থার অবনতি হতে থাকে। কোথাও নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে, কোথাও নদীর বুক থেকে ঠিক মত পলি নিঃসরিত না হওয়ায় আবার কোথাও কোথাও নদীর পাড় ভেঙ্গে পার্শ্ববর্তী গাছগুলি নদীর মধ্যে পড়ে এই নদীগুলির নাব্যতা ব্যাহত হতে থাকে। ১৮১৩ সাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা চলতে থাকে এবং এই কাজের ব্যয়নির্বাহের জন্য নৌকার ওপরে টোল আদায়ের ব্যবস্থা হয়। সে সময় নদীয়ার পণ্যদ্রব্য নৌকাপথে কলিকাতায় গিয়ে জাহাজে বোঝাই হত। কিন্তু নদীগুলির অবনতি হওয়ায় নৌকা চলাচলে এত বিঘ্ন হতে থাকে যে কলিকাতার ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে এই নদীগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আবেদন জানান। সরকার মাথাভাঙ্গার সঙ্গে অন্য নদী দুটিকেও একত্র করে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং তিনটি নদীর সকল নৌকার ওপরেই টোল আদায় আরম্ভ করেন। সে সময় নদীবক্ষ থেকে অনেক গাছ এবং ভাঙ্গা নৌকা উদ্ধার করে এবং নদীতে বাঁধাল বেঁধে নদীর স্রোত ও গভীরতা বজায় রাখার চেষ্টা চলে।

এতে সাময়িক সুফল দেখা দিলেও স্থায়ী সুফল হয় না। ১৮২৪ সালে মে সাহেব যখন এই নদী তিনটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট তখন তাঁর প্রস্তাবক্রমে সরকার ড্রেজিং করে নদীর চড়া ও পলি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করেন। এই ড্রেজিংএর ব্যবস্থা ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য। কিন্তু তখন এই নদীগুলিতে এত নৌকা চলাচল ছিল যে তাদের ওপর টোল আদায় করে যে আয় হত, তা'থেকে যাবতীয় ব্যয় করেও সরকারের অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হত। কিন্তু ড্রেজিং করেও দীর্ঘস্থায়ী ফল পাওয়া যায়নি। গ্রীষ্মকালে নৌকা চলাচল ক্রমে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবুও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে নদীয়ার নদীগুলিতে নৌ-পরিবহন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নৌকার টোল আদায়ের হিসেব থেকে। নিচে ১৮৭১-৭২ থেকে প্রতি দশ বৎসরের বার্ষিক গড় আয়ব্যয়ের হিসেব দেওয়া হল।

সময়	গড় বার্ষিক আয় টাকা	গড় বার্ষিক ব্যয় টাকা	উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি টাকা
১৮৭১-৭২ থেকে ১৮৮০-৮১	২,৩২,৯৩৮	৪৭,০১৮	+ ১,৮৫,৯১৮
১৮৮১-৮২ থেকে ১৮৯০-৯১	১,৯৫,৬৩২	১,১৮,১৩৬	+ ৭৭,৪৯৫
১৮৯১-৯২ থেকে ১৯০০-০১	১,২৭,৪৭৯	১,২৫,৮৬৪	+ ১,৬১৫
১৯০১-০২ থেকে ১৯০৭-০৮	৭৬,৬২৯	১,২৩,৬৮৯	— ৪৭,০৬০

উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় নৌকা চলাচল কমে যাওয়ায় টোল আদায় থেকে বার্ষিক আয় ১৮৭১-৭২ সাল থেকে ক্রমাগত কমে এসেছে অথচ নদীগুলির সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ব্যয় বেড়ে গিয়েছে। তবুও ১৯০০-১৯০১ সাল পর্যন্ত কিছু উদ্বৃত্ত ছিল। কিন্তু ১৯০১ সাল থেকে আরম্ভ করে উদ্বৃত্তের পরিবর্তে ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯০৭-০৮ সালে মাত্র ৩৫,২২৯ টাকা আদায় হয়। ইতিমধ্যে রেলপথের প্রসার লাভ নদীপথে পরিবহন কমে যাওয়ায় আর একটি প্রধান কারণ।

গ্যাবেটের গেজেটিয়ারে উদ্ধৃত নদীয়া রিভার ডিভিসনের নির্বাহী বাস্তুকার প্রদত্ত একটি রিপোর্ট থেকে এই শতাব্দীর প্রথমে এ জেলায় নৌ-পরিবহন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যাবে।

কোন শ্রেণীর নৌকা	কোন স্থানের মাঝি	পণ্যদ্রব্যের নাম	নৌকার বহনক্ষমতা	কোন নদীতে কোন সময়
মালিনী	পশ্চিম অর্থাৎ বিহার যুক্ত প্রদেশ	শস্য	৫০০ থেকে ২৫০০ মণ	ভাগীরথীতে শুধু বর্ষাকালে
পাটলি	,,	,,	,,	
ভর	,,	,,	,,	
কাটরা	,,	পাথরের দ্রব্য	,,	
সারং	,,	শস্য	২০০ থেকে ১০০০ মণ	ভাগীরথীতে জল থাকলে সারাবছর
সাঙ্গরি	মুর্শিদাবাদ ও মালদহ	সাধারণ পণ্য	,,	
পানসি	নদীয়া ও বর্ধমান	,,	১০০ থেকে ১০০০ মণ	জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গায় সারাবছর
খাজনা খাট্টা	,,	,,	,,	
জং	রাজসাহী	ধান	২০০ থেকে ৫০০ মন	মাথাভাঙ্গায় শুধু বর্ষাকালে
উলক	ফরিদপুর	পাট	৫০০ থেকে ১৫০০ মন	
কোসা	পূর্ণিয়া	পাট ও কাঁচাতামাক	১০০ থেকে ৫০০ মন	ভৈরব-জলঙ্গী সারা বছর
ফুকলি	হাওড়া	ধান ও শস্য	৫০০ থেকে ১০০০ মন	জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও ভাগীরথীর নিম্নাংশে সারা বছর

হান্টার সাহেব তাঁর Statistical Account of Bengal-Nadia (1872)-তে লিখেছেন যে ১৮৬২ সালে কলিকাতা থেকে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া পর্যন্ত রেললাইন হবার পরও রেল স্টেশনগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের খুব বড় কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। নদীর ধারেই তখন ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি ছিল, কারণ নৌপরিবহন তখনও গুরুত্ব হারায়নি। নদীর তীরবর্তী যে স্থানগুলি সে সময় নদীয়ার ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল তা'হল, ভাগীরথী তীরে—কালীগঞ্জ, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, চাকদহ; জলঙ্গীতীরে—করিমপুর, চাপড়া, কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ; মাথাভাঙ্গাতীরে—কৃষ্ণগঞ্জ; চূর্ণীতীরে—হাঁসখালি, রাণাঘাট।

এখন যদিও নদীপথে পণ্যদ্রব্য কিছু চলাচল হয় কিন্তু তার পরিমাণ এত কমে গিয়েছে যে উপরোক্ত স্থানগুলির মধ্যে এখন আর নৌবন্দর হিসেবে কারুরই আর খ্যাতি নেই। শান্তিপুর, চাকদহ, চাপড়া প্রভৃতি স্থান থেকে নদী এখন অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। রেলপথ ও সড়কপথের প্রভূত উন্নতির ফলে এখন নদীপথে পণ্যদ্রব্য পরিবহনের প্রয়োজন বা গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে। তবু এখনও কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, রাণাঘাট, নৃসিংহপুর, নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, কালীগঞ্জ, বড় আন্দুলিয়া, দত্তফুলিয়া প্রভৃতি নদীতীরবর্তী স্থানগুলিতে স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে নৌপরিবহন কিছু কিছু চালু আছে।

রেলপথ :

১৮৬২ সালে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলের অধীনে কলিকাতা থেকে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। এই রেলপথ তখন বেসরকারী কোম্পানীর হাতে ছিল। ১৮৭৭ সালে ইস্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে নাম হয়ে এই রেলপথ সরকারের হাতে আসে। তখন নদীয়া জেলার মধ্যে ১০০ মাইল রেলপথ ও ২১টি স্টেশন ছিল। নদীয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান রেল-স্টেশন ছিল কাঁচড়াপাড়ার পরে চাকদা, রাণাঘাট, বগুলা, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্ঠিয়া। কৃষ্ণনগরে কোন রেলস্টেশন ছিল না, কৃষ্ণনগরের লোকদের ট্রেন ধরতে হলে ১১ মাইল দূরে বগুলায় এসে ট্রেন ধরতে হত। বগুলার আগে হাঁসখালির কাছে ফেরীতে চূর্ণীনদী পার হতে হত।

১৮৯৮ সালে রাণাঘাটের অদূরে চূর্ণীনদীর ওপারে আইশতলা ঘাট থেকে শান্তিপুর হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত (২০ মাইল) একটি মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলের লাইন চালু হয়। এই লাইনে তখন ৭টি স্টেশন ছিল। ১৯০৪ সালে রাণাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরের ওপর দিয়ে লালগোলা লাইন খোলা হয়। তখন নদীয়ার এলাকায় এই লাইনে ৪৮ মাইল রেলপথ ও ৮টি স্টেশন ছিল। ১৯০৪ সালে মার্টিন কোম্পানীর কাছ থেকে শান্তিপুরের ছোট লাইন সরকার গ্রহণ করেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে এবং কিছুদিন পরেও কলিকাতা-শিলিগুড়ি মেইন-লাইন নদীয়া জেলার মধ্য দিয়েই চালু ছিল।

স্বাধীনতার পর রেল-পরিবহনের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরের (১৯৪৮) হিসাবে দেখা যায় শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগরে ৪টি লোকাল ট্রেন, শিয়ালদহ-রাণাঘাটে ৮টি মেল ট্রেন, ২টি এক্সপ্রেস ট্রেন ও ৬টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, কলিকাতা-রাণাঘাটে ১০টি লোকাল, কলিকাতা-শান্তিপুরে ১০টি লোকাল, রাণাঘাট-বাণপুরে ৪টি লোকাল, রাণাঘাট-কৃষ্ণনগরে

৪টি লোকাল, শান্তিপুর-নবদ্বীপে ১০টি লোকাল, রাণাঘাট-শান্তিপুরে ৪টি লোকাল এবং রাণাঘাট-বনগাঁয় ৮টি লোকাল যাতায়াত করত। ১৯৪৮ সালে কলিকাতার সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের রেল যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। কাজেই বাণপুরের মেনলাইন তখনও তত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হলে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭২ সালের হিসেবে দেখা যায় রাণাঘাট-গেদে ৬টি ট্রেন, শিয়ালদহ-গেদে ৮টি ট্রেন, শিয়ালদহ-বানপুর ২টি ট্রেন, শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর ২০টি ট্রেন, রাণাঘাট-লালগোলা ১০টি ট্রেন, শিয়ালদহ-কল্যাণী ২০টি ট্রেন, রাণাঘাট-বনগাঁ ১০টি ট্রেন, শিয়ালদহ-শান্তিপুর ২২টি ট্রেন, শান্তিপুর-নবদ্বীপ ১০টি ট্রেন যাতায়াত করে।

বর্তমানে কলিকাতা থেকে নদীয়া জেলার প্রথম স্টেশন কল্যাণী এবং লালগোলা লাইনে শেষ স্টেশন পলাশী, বানপুর লাইনে শেষ স্টেশন গেদে। রাণাঘাট থেকে বনগাঁ লাইনে শেষ স্টেশন আকাইপুর হল্ট। হাওড়া-ফরাক্কা লাইনে নদীয়া জেলার একটি মাত্র স্টেশন আছে নবদ্বীপধাম।

রাণাঘাট-শান্তিপুর লাইনের শেষ স্টেশন শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে নবদ্বীপঘাট পর্যন্ত ন্যারো গেজের ছোট ট্রেন চালু আছে। এই লাইনে মোট স্টেশনসংখ্যা ৭টি। নদীয়ার এলাকায় ব্রডগেজ লাইনে মোট স্টেশনসংখ্যা ৩৪টি। রেলপথের দূরত্ব সর্বমোট ১৮৫ কি: মি:। স্বাধীনতার পরে কয়েকটি নতুন স্টেশন চালু হয়েছে। পূর্বের চাঁদমারী স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ১৯৫৪ সাল থেকে কল্যাণী রাখা হয়েছে। নতুন যে স্টেশনগুলি চালু হয়েছে তাদের নাম ও তারিখ: তাহেরপুর (৫-৭-৫৪), কালীনারায়ণপুর (১-৪-৫৫), গেদে (১৫-১-৫৯), পালপাড়া (১-১২-৫৯), তারকনগর হল্ট (১-৪-৬২), বাহিরগাছি (১৪-৪-৬৮), আকাইপুর হল্ট (২৪-৩-৭২)।

রেলপথের বৈদ্যুতিকিকরণ একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৬৩ সালে শিয়ালদহ-রাণাঘাট লাইন এবং ১৯৬৫ সালে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রেলপথের বৈদ্যুতিকিকরণ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বৈদ্যুতিকিকরণের আওতায় নদীয়া জেলায় ১৫টি স্টেশন আছে।

নবগঠিত কল্যাণী সহ নদীয়া জেলার ১৪টি থানার মধ্যে ৪টি থানা এলাকায় কোন রেলপথ বা রেলস্টেশন নেই। এই ৪টি থানা হল রাণাঘাট মহকুমার হরিণঘাটা ও সদর মহকুমার চাপড়া, তেহট্ট ও করিমপুর। করিমপুরে কয়েকবছর হল আউটএজেন্সীর মারফত রেল-কাম-বাস যোগাযোগ করা হয়েছে।

সড়ক :

১৭৭২ সালের রেনেলসের ম্যাপে নদীয়া জেলার এই রাস্তাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়: (১) কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর (২) কৃষ্ণনগর থেকে শিবনিবাস (৩) কৃষ্ণনগর থেকে রাণাঘাট হয়ে কলিকাতা (৪) শিবনিবাস থেকে রাণাঘাট দিয়ে বারাসাত (৫) শিবনিবাস থেকে বনগ্রাম ও ঝিকড়গাছা (৬) শ্রীনগর থেকে বনগ্রাম। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই কাঁচা রাস্তা ছিল।

Hunter's Statistical Account of Bengal-Nadia, 1872-তে দেখা যায় নদীয়া জেলায় সে সময় নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি প্রধান ছিল।

(১) কৃষ্ণনগর--শান্তিপুর--কালনাঘাট: ১৪½ মাইল
(২) কৃষ্ণনগর--কৃষ্ণগঞ্জ: ১৪½ মাইল
(৩) কৃষ্ণনগর--নবদ্বীপ: ৭½ মাইল
(৪) কৃষ্ণনগর--মেহেরপুর: ২৯ মাইল
(৫) কৃষ্ণনগর--রাণাঘাট--জাগুলী: ৩৬ মাইল
(৬) চাপড়া--তেহট্ট: ৯ মাইল

এ রাস্তাগুলি সরকারী হলেও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হত। এগুলি ছিল কাঁচা রাস্তা। এছাড়া সরাসরি পি, ডব্লু, ডির তত্ত্বাবধানে কয়েকটি রাস্তা ছিল। সেগুলি ছিল খোয়া বাঁধানো।

(১) কৃষ্ণনগর থেকে বগুলা--১১ মাইল
(২) চাকদহ থেকে সুখসাগর--৬ মাইল
(৩) চাকদহ থেকে বনগাঁ--২০ মাইল
(৪) রাণাঘাট থেকে শান্তিপুর--৯ মাইল

এছাড়া কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরের দিকে ২৮½ মাইল একটি কাঁচারাস্তাও তৎকালীন পি, ডব্লু, ডি অর্থাৎ পূর্তবিভাগের অধীনে ছিল।

১৮৮৬ সালে জেলাবোর্ড গঠিত হবার পর জেলাবোর্ডের হাতে রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। গ্যারেটের ১৯১০ সালের গেজেটিয়ারে পাওয়া যায় জেলাবোর্ডের পরিচালনাধীনে ১০৭ মাইল সেতুসহ পাকা রাস্তা (খোয়া বাঁধানো), ২৩০ মাইল সেতুসহ কাঁচা রাস্তা এবং ৩৯২ মাইল আংশিক সাঁকোসহ কাঁচা রাস্তা বর্তমান ছিল। জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল:

(১) কৃষ্ণনগর--বগুলা
(২) রাণাঘাট--শান্তিপুর
(৩) কৃষ্ণনগর--শান্তিপুর
(৪) কৃষ্ণনগর--নবদ্বীপ

কাঁচারাস্তাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল:

(১) কৃষ্ণনগর--পলাশী
(২) কৃষ্ণনগর--জাগুলী
(৩) কৃষ্ণনগর--মেহেরপুর
(৪) মেহেরপুর থেকে পলাশীপাড়া ও মীরা হয়ে কালীগঞ্জ।

স্বাধীনতার পরে রাস্তার দিক দিয়ে নদীয়া জেলায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। আগে জেলার থানাসদরগুলির সঙ্গেও বাসে যোগাযোগ করা যেত না। অতি সামান্য কয়েকটি রাস্তায় স্বল্পসংখ্যক বাস চলত। রেলপথ বাদ দিলে অন্যান্য স্থানগুলিতে যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল গরুর গাড়ী, কোন

কোন স্থানে নদীপথে নৌকা। গত ২৫ বছরে এই জেলায় এত দ্রুত রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে যে গরুরগাড়ী ও নৌকায় যাতায়াত এখন প্রায় অতীতের কাহিনী। এখন শুধু থানা সদর নয়, জেলার অভ্যন্তরের গ্রামাঞ্চলেও বাসযোগে যাওয়া যায়। সীমান্তরক্ষার প্রয়োজনেই সরকার স্বাধীনতার পর সীমান্তর সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী রাস্তাগুলি পাকা করবার ব্যবস্থা করেন। বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এসে এজেলার বিভিন্ন স্থানে বসবাস আরম্ভ করায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯৫১ সালের সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক অনুসারে ১৯৪৮ সালে বিভক্ত নদীয়া জেলায় পূর্তবিভাগের (পি. ডব্লু. ডি) পরিচালনাধীনে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল ৭৮·২৪ কি· মি: (৪৮·৯ মাইল), জেলাবোর্ড পরিচালিত পাকারাস্তার পরিমাণ ছিল ৪২·৫৬ কি: মি. (২৬·৬ মাইল) এবং মিউনিসিপ্যালিটির অধীন পাকারাস্তার পরিমাণ ছিল ১২৫·৪৪ কি· মি· (৭৮·৪ মাইল)।

এখন নদীয়া জেলার সরকারী রাস্তা ৪টি বিভাগের অধীনে রয়েছে। এই ৪টি বিভাগের অধীনে ১৯৭২ সালে মোট পাকা রাস্তার পরিমাণ ৮০৯ কি: মি:। এর মধ্যে জেলা সড়কের পরিমাণ ৬৮২ কি: মি: এবং জাতীয় সড়কের পরিমাণ ১২৭ কি: মি:।

	জেলা সড়ক	জাতীয় সড়ক	মোট
পূর্তবিভাগ (সড়ক), নদীয়া	৩৬৬ কি.মি· (৪৫টি)	১০ কি.মি·	৩৭৬ কি·মি.
পূর্তবিভাগ নদীয়া	২৭২ কি:মি· (১৫টি)	৯৯ কি মি	৩৭১ কি:মি:
উত্তর কলিকাতা বিভাগ ২৪ পরগণা	৩০ কি:মি:	১৮ কি.মি:	৪৮ কি.মি
নির্মাণ বিভাগ	১৪ কি:মি:	----	১৪ কি·মি:
	৬৮২ কি.মি:	১২৭ কি:মি:	৮০৯ কি.মি:

এছাড়া জেলাপরিষদের অধীন ৫১·০৯ কি: মি: পাকারাস্তা ও ১৩৮৬·৬৯ কি: মি: কাঁচা রাস্তা কি: মি: বর্তমানে আছে। স্বাধীনতার আগে পিচের রাস্তা এ জেলায় ছিল না বললেই হয়। এখন পাকারাস্তার সবগুলিই পিচের রাস্তা।

৩৪ নং জাতীয় সড়ক কলিকাতা থেকে বের হয়ে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যদিয়ে উত্তরবঙ্গে গিয়েছে। ফলে সড়কপথে এখন একদিকে কলিকাতার সঙ্গে, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের মালদহ, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ খুবই সহজ হয়েছে। ১৯৭১ সালে ফারাক্কা সেতু খোলার পর উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে। ব্যবসাবাণিজ্যেরও সুবিধা হয়েছে। এখন প্রত্যহ প্রচুর মালবাহী লরি নদীয়া থেকে কলিকাতায় যায় বা কলিকাতা থেকে নদীয়ায় আসে। শুধু তাই নয়, কয়েক বছর যাবত কলিকাতা থেকে নদীয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি বাস উত্তরবঙ্গের মালদহ, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও শিলিগুড়ি যায়। এই বাসগুলি নদীয়ার মধ্যে রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরীতে থামে। ১৯৭২ সালে কলিকাতা থেকে কৃষ্ণনগর বাস চালু হয়েছে। রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জেলার অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য এখন বাসরুট ও বাসের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক, নদীয়া অনুযায়ী ১৯৬১ সালে এ জেলায় বাসরুটের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি, বাসরুটের দৈর্ঘ্য ছিল ৬৫০ কি মি: এবং বাসের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি। ১৯৭২ সালে মোট বাসরুটের সংখ্যা ৪৫, বাসরুটের দৈর্ঘ্য ১১০৭ কি: মি· এবং মোট চালু বাসের সংখ্যা ১৬৮টি।

স্বাধীনতার পর এ জেলায় কয়েকটি খুব উল্লেখযোগ্য সেতু তৈরী করা হয়েছে। আগে সেতুগুলির অভাবে নদী পার হয়ে যানবাহনের যাতায়াতের খুব অসুবিধা ছিল। মোটর বা বাসকে ফেরীতে পার করতে হত অথবা যাত্রীদের ফেরীতে ওপারে গিয়ে বাস বদল করতে হত। সেতুগুলি তৈরী হওয়ায় সরাসরি বাস চলাচলে খুব সুবিধা হয়েছে। নিচে সেতুগুলির বিবরণ দেওয়া হল :

সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য	ব্যয় (টাকা)	বিবরণ
১। পাগলাচণ্ডী সেতু	৩০৮'৬"	৪,২০,০২৬	পানিঘাটায় পাগলাচণ্ডী দহের ওপরে
২। দ্বিজেন্দ্র সেতু	৭৩০'	২৩,০৭,৩৭১	কৃষ্ণনগরে জলঙ্গী নদীর ওপরে
৩। মাথাভাঙ্গা সেতু	৩০০'	১০,৯৪,৮২৭	কৃষ্ণগঞ্জে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপরে
৪। মোনগাঙ্গী সেতু	১৫৪'৬"	৫,৫৯,৩৬৫	কৃষ্ণনগর-শিকারপুর রাস্তায়
৫। ভৈরব সেতু	১০৯'৬"		ভৈরব নদীর ওপরে
৬। নাটনা সেতু	১৪২'		কৃষ্ণনগর-শিকারপুর রাস্তায়
৭। চূর্ণী সেতু	২৭০'	৬,৮৬,৫৫৫	হাঁসখালীতে চূর্ণী নদীর ওপরে
৮। ইছামতী সেতু	--	১,৩৮,৬০০	দত্তফুলিয়ায় ইছামতী নদীর ওপরে

নদীয়া জেলায় সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব রয়েছে পূর্ত বিভাগ (সড়ক) এর ওপরে এবং সড়কগুলি হস্তান্তর করলে সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন পূর্তবিভাগ। তবে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত পূর্তবিভাগ (সড়ক) সংরক্ষণের দায়িত্বও পালন করেন। উভয় শাখার নির্বাহী বাস্তুকারের (Executive Engineer) অফিস কৃষ্ণনগরে আছে। বিভিন্ন সরকারী অফিসভবন বা কোয়ার্টার নির্মাণ এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব পূর্তবিভাগের ওপরে।

ফেরী :

এ জেলায় নদী পারাপারের জন্য অনেকগুলি ছোট বড় ফেরী আছে। ফেরীগুলির কিছু জেলা পরিষদের অধীনে, কিছু ভূমিসংস্কার বিভাগের অধীনে। জেলা পরিষদের অধীনে ফেরীর সংখ্যা ২১টি, সরকারী ভূমি সংস্কার বিভাগের অধীনে ফেরীর সংখ্যা ৬৯টি। প্রতি বছর নীলামে ফেরীগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

ডাক ও তার :

কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে ২টি প্রধান ডাকঘর সহ এজেলায় মোট ডাকঘরের সংখ্যা ৩১৩। এরমধ্যে শাখা ডাকঘরের সংখ্যা ৬৬। ১৯৬১ সালে মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২০২। তার অফিসের বর্তমান সংখ্যা ২৬টি, ১৯৬১ সালে ছিল ১৮টি। ১৯৫১ সালে ডাকঘর ছিল মাত্র ৮৫ আর তার অফিস ১৩টি।

জেলার সবকয়টি শহরেই টেলিফোন ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রাণাঘাট, পলাশী, শান্তিপুর, বীরনগর, বেথুয়াডহরী উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট ১

নদীয়া জেলায় রেলষ্টেশনের নাম ও দূরত্ব :

থানা	রেল ষ্টেশন	দূরত্ব (কি:মি)
চাকদহ	কল্যাণী থেকে মদনপুর	৫
	মদনপুর থেকে শিমুরালী	৫
	শিমুরালী থেকে পালপাড়া	২
	পালপাড়া থেকে চাকদহ	২
	চাকদহ থেকে পায়রাডাঙ্গা	৬
রাণাঘাট	পায়রাডাঙ্গা থেকে রাণাঘাট জংশন	৬
	রাণাঘাট জংশন থেকে আড়ংঘাটা	৮
	আড়ংঘাটা থেকে বগুলা	১১
	বগুলা থেকে তারকনগর হল্ট	৭
	তারকনগর হল্ট থেকে মাজদিয়া	৫
কৃষ্ণগঞ্জ	মাজদিয়া থেকে বাণপুর	৬
রাণাঘাট	রাণাঘাট জংশন থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন	৪
	কালীনারায়ণপুর জংশন থেকে বীরনগর	৪
	বীরনগর থেকে তাহেরপুর	৩
	তাহেরপুর থেকে বাদকুল্লা	৫
হাঁসখালি	বাদকুল্লা থেকে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন	১০
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন থেকে বাহাদুরপুর	৭
	বাহাদুরপুর থেকে ধুবুলিয়া	৫
	ধুবুলিয়া থেকে মুড়াগাছা	৬
নাকাশীপাড়া	মুড়াগাছা থেকে বেথুয়াডহরী	১০
	বেথুয়াডহরী থেকে সোনাডাঙ্গা	৪
	সোনাডাঙ্গা থেকে দেবগ্রাম	৮
কালীগঞ্জ	দেবগ্রাম থেকে পাগলাচণ্ডী	৪
	পাগলাচণ্ডী থেকে পলাশী	৬
রাণাঘাট	কালীনারায়ণপুর জংশন থেকে হবিবপুর	৩
	হবিবপুর থেকে ফুলিয়া	৫
শান্তিপুর	ফুলিয়া থেকে শান্তিপুর	৬
	শান্তিপুর থেকে দিগনগর	৭
কৃষ্ণনগর	দিগনগর থেকে কৃষ্ণনগর সিটি	৩
	কৃষ্ণনগর সিটি থেকে কৃষ্ণনগর রোড	৯
	কৃষ্ণনগর রোড থেকে আমঘাটা	৫
	আমঘাটা থেকে মহেশগঞ্জ	২
নবদ্বীপ	মহেশগঞ্জ থেকে নবদ্বীপঘাট	২
রাণাঘাট	গাংনাপুর থেকে মাঝের গ্রাম	৪
নবদ্বীপ	পূর্বস্থলি (বর্দ্ধমান জেলা) থেকে নবদ্বীপধাম	৮

পরিশিষ্ট ২

নদীয়া জেলায় বাসরুটের তালিকা

	বাসরুটের নাম	বাসরুটের দৈর্ঘ্য কি: মি:	কয়টি বাস চলে
১।	কৃষ্ণনগর থেকে গোপালপুর ঘাট / শিকারপুর	৯৩	২৮
২।	কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপঘাট	১৬	১২
৩।	কৃষ্ণনগর থেকে বানপুর / ভাজনঘাট	৩২	৯
৪।	কৃষ্ণনগর থেকে রাণাঘাট / শান্তিপুর	৩৫	৯
৫।	কৃষ্ণনগর থেকে রাণাঘাট / হাঁসখালি / দত্তফুলিয়া / আড়ংঘাটা	৪৫	১৩
৬।	কৃষ্ণনগর থেকে কালনাঘাট / শান্তিপুর	২৩	২
৭।	কৃষ্ণনগর থেকে পাটিকাবাড়ীঘাট / করুইগাছি / শ্যামনগর	৫৯	৪
৮।	কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর	৮৭	৪
৯।	কৃষ্ণনগর থেকে কাটোয়াঘাট / দেবগ্রাম	৬৭	২
১০।	কৃষ্ণনগর থেকে ভালুকা	১৪	১
১১।	কৃষ্ণনগর থেকে পাটুলীঘাট / বেথুয়াডহরী	৪২	২
১২।	কৃষ্ণনগর টাউন সার্ভিস	৫	৩
১৩।	কৃষ্ণনগর থেকে বীরপুরঘাট	৪০	২
১৪।	কৃষ্ণনগর থেকে বনগাঁ	৭১	১
১৫।	কৃষ্ণনগর থেকে রাণাবন্ধ	২৮	৩
১৬।	কৃষ্ণনগর থেকে খালবোয়ালিয়া	৬৫	৩
১৭।	কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী মনুমেন্ট	৫৬	২
১৮।	কৃষ্ণনগর থেকে হৃদয়পুর / চাপড়া	৩০	৩
১৯।	কৃষ্ণনগর থেকে নোনাগঞ্জ / হাঁসখালি	৩৭	১
২০।	কৃষ্ণনগর থেকে কালীগঞ্জ / দেবগ্রাম	৫১	২
২১।	কৃষ্ণনগর থেকে তেহট্টঘাট / বাণিয়া	৬৯	২
২২।	কৃষ্ণনগর থেকে রঘুনন্দনপুর / মাজদিয়া	৫১	১
২৩।	কৃষ্ণনগর থেকে হুলোরঘাট / ধুবুলিয়া	২১	১
২৪।	কৃষ্ণনগর থেকে কাটোয়াঘাট / মেটিয়ারী / কালিগঞ্জ	৭৫	১
২৫।	কৃষ্ণনগর থেকে রঘুনন্দনপুর	৪৬	—
২৬।	কাটোয়াঘাট থেকে তেহট্টঘাট / দেবগ্রাম	৫৩	১
২৭।	করিমপুর থেকে বহরমপুর	৭১	১
২৮।	করিমপুর থেকে পলাশী মনুমেন্ট	৭১	১
২৯।	বেতাই থেকে পলাশী	৩০	৪
৩০।	নবদ্বীপ টাউন সার্ভিস	৪	১
৩১।	নবদ্বীপ থেকে কালনাঘাট / নাদনঘাট	৪৫	১
৩২।	নবদ্বীপ থেকে বর্দ্ধমান	৭৭	১

বাসরুটের নাম	বাসরুটের দৈর্ঘ্য	কয়টি বাস চলে
৩৩। রাণাঘাট থেকে কালনাঘাট	২৪	২
৩৪। রাণাঘাট থেকে গাইঘাটা	৫৫	১
৩৫। রাণাঘাট থেকে হাবড়া	৫৬	৩
৩৬। রাণাঘাট থেকে বাস আঁচড়া / শান্তিপুর	২৯	২
৩৭। রাণাঘাট থেকে বনগ্রাম	৪৬	১
৩৮। রাণাঘাট থেকে নিমতলা, চাকদহ	৪০	১
৩৯। চাকদহ থেকে নিমতলা	২৮	২
৪০। চাকদহ থেকে বনগ্রাম	৩২	১০
৪১। কল্যাণী রেলস্টেশন থেকে কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন	১২	৮
৪২। কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন থেকে নিমতলা / হরিণঘাটা / নগরউখড়া / কাষ্ঠডাঙ্গা	২৪	১১
৪৩। কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন থেকে গায়েশপুর	৮	২
৪৪। পলাশীপাড়াঘাট থেকে কাটোয়াঘাট / দেবগ্রাম	৪৬	১
৪৫। কৃষ্ণনগর থেকে চাঁদেরঘাট	৩৪	১

পরিশিষ্ট ৩

নদীয়া জেলায় ডাকবাংলোর তালিকা

	অবস্থান	থানা	কর্তৃপক্ষ
১।	কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর	জেলা পরিষদ, নদীয়া
২।	হরিণঘাটা	হরিণঘাটা	,,
৩।	বগুলা	হাঁসখালি	,,
৪।	চাপড়া	চাপড়া	,,
৫।	মাজদিয়া	কৃষ্ণগঞ্জ	,,
৬।	রাণাঘাট	রাণাঘাট	,,
৭।	নাটনা	করিমপুর	,,
৮।	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ	,,
৯।	পলাশীপাড়া	তেহট্ট	জেলাপরিষদ
১০।	তেহট্ট	তেহট্ট	,,
১১।	বেথুয়াডহরী	নাকাশীপাড়া	,,
১২।	স্বরূপগঞ্জ	নবদ্বীপ	সেচবিভাগ
১৩।	বেথুয়াডহরী	নাকাশীপাড়া	বনবিভাগ
১৪।	পলাশী	কালীগঞ্জ	পূর্তবিভাগ
১৫।	হরিণঘাটা	হরিণঘাটা	পশুপালনবিভাগ

পরিশিষ্ট ৪

নদীয়া জেলার ডাকঘরের তালিকা

১। কৃষ্ণনগর প্রধান ডাকঘর+++
২। অমিয়নারায়ণপুর×
৩। ভাতজাংলা×
৪। বেরিজ×
৫। বেতাই++
৬। চাঁদের ঘাট ×
৭। দৈয়ের বাজার ×
৮। ধোপাট্টা
৯। দোগাছি ×
১০। ফাজিলনগর ×
১১। গোয়াস ×
১২। ঘূর্ণী ×
১৩। গোবরাপোতা ×
১৪। গোপালপুর ×

১৫। নরিপুর ছিট্‌কা ×
১৬। ঝিট্‌কাপোতা ×
১৭। জয়পুব ×
১৮। কালীরহাট ×
১৯। কড়ুইগাছি ×
২০। কৃষ্ণনগর ×
২১। কুলগাছি
২২। লালবাজার
২৩। মহতপুর ×
২৪। মালিয়াপোতা ×
২৫। মাধবপুর
২৬। নদীয়া বিষ্ণুপুর ×
২৭। নাজিরপুর ×
২৮। পাথবঘাটা
২৯। পুটিমারি ×
৩০। রহনতপুর ×
৩১। রাধানগর
৩২। শক্তিনগর ×
৩৩। সুন্তিয়া ×
৩৪। তালুকহুদা ×
৩৫। তারকগঞ্জ ×
৩৬। তরণীপুব ×
৩৭। তিলকপুর ×
৩৮। টোপলা ×
৩৯। বাদকুল্লা শাখা ডাকঘর +++
৪০। ভাদুবি ×
৪১। বাপুজিনগর ×
৪২। চাঁদরা ×
৪৩। চন্দনদহ ×
৪৪। খামাব শিমুলিয়া ×
৪৫। মামজোয়ান ×
৪৬। বাগচী জামশেরপুর শাখা ডাকঘর
৪৭। বাঁশবেড়িয়া
৪৮। আরবপুর ×
৪৯। হোগলবেড়িয়া ×
৫০। জয়বামপুর ×
৫১। কাছাবীপাড়া ×
৫২। নদীয়া সুন্দলপুর ×
৫৩। বাঙ্গালঝি শাখা ডাকঘর ++×
৫৪। চড়ুইডিপি ×
৫৫। দক্ষিণ বহিরগাছি ×
৫৬। ডোমপুকুরিয়া ×
৫৭। হৃদয়পুর ×
৫৮। কলিঙ্গ ×
৫৯। পিপড়াগাছি +
৬০। রাণাবন্ধ +
৬১। বীরনগর শাখাডাকঘর ×+++
৬২। ব্যাসপুর ×
৬৩। কামগাছি ×
৬৪। কালীনারায়ণপুর ×
৬৫। বড় আন্দুলিয়া শাখাডাকঘর
৬৬। বাণিয়াখড়ি
৬৭। হাতীশালা ×
৬৮। মেলেপোতা ×
৬৯। পেটুয়াভাঙ্গা×
৭০। শিবপুর ×
৭১। বেলপুকুর শাখা ডাকঘব ×+
৭২। বাহাদুরপুর ×
৭৩। শোনডাঙ্গা ×
৭৪। বেথুযাডহরী শাখাডাকঘর× +++
৭৫। আরপাড়া ×
৭৬। বীরপুর ×
৭৭। ভোলাডাঙ্গা ×
৭৮। চিচুঁরিয়া ×
৭৯। দাদুপুর নদীয়া ×
৮০। গোটপাড়া ×
৮১। যুগপুর কলোনী ×
৮২। নাকাশীপাড়া ×
৮৩। পাটিকাবাড়ী ×
৮৪। রাধানগর কলোনী ×
৮৫। সোনাডাঙ্গা ×
৮৬। উত্তর বহিবগাছি ×
৭৫। বৌবাজার শাখা ডাকঘর। (কৃষ্ণনগর প্রধান ডাকঘর থেকে ডাক বিলি হয়)
৭৬। চর ব্রহ্মনগর শাখা ডাকঘর।
৭৭। দেয়ারাপাড়া শাখা ডাকঘর। (নবদ্বীপ সহর এলাকায়)
৭৮। দেবগ্রাম শাখাডাকঘর ×+++
৭৯। আশাচিয়া ×
৮০। বিলকুমারী ×
৮১। বসরখোলা ×
৮২। বোড়া আটাগী ×
৮৩। চর চুয়াডাঙ্গা ×
৮৪। ঘোড়াইক্ষেত্র ×
৮৫। হরনগর ×
৮৬। কামারী ×
৮৭। মাঝেরগ্রাম ×
৮৮। মদনডাঙ্গা ×
৮৯। পাগলাচণ্ডী ×
৯০। পালিলবেগিয়া ×
৯১। রাধাকান্তপুর ×

৯২। সাপজোলা।
৯৩। ধর্ম্মদা শাখাডাকঘর ×
৯৪। বিল্বগ্রাম ×
৯৫। কাণ্ডোয়া ×
৯৬। কাশিয়াডাঙ্গা ×
৯৭। তেঁতুলবেড়িয়া।
৯৮। ধুবুলিয়া শাখাডাকঘর।
৯৯। ধুবুলিয়া যক্ষ্মা হাসপাতাল শাখাডাকঘর +++
১০০। রূপদহ ×
১০১। দিগ্‌নগর শাখাডাকঘব ×
১০২। ফুলিয়াকলোনী শাখাডাকঘর ×++
১০৩। বেলেব মাঠ ×
১০৪। বৈঁচা ×
১০৫। ফুলিয়া বয়বা ×
১০৬। তারাপুর ×
১০৭। গোলাপটি শাখাডাকঘব। (কৃষ্ণনগর শহর এলাকা)
১০৮। হবিবপুর শাখাডাকঘর
১০৯। কালীগঞ্জ শাখাডাকঘব × ++
১১০। বড় কুলবেড়িয়া ×
১১১। জুড়নপুর ×
১১২। মানিকডিহি ×
১১৩। করিমপুর শাখাডাকঘব ×+++
১১৪। চরমুক্তারপুব ×
১১৫। পোড়াদহ ×
১১৬। নতিডাঙ্গা ×
১১৭। পশ্চিম দোগাছি ×
১১৮। সেনপাড়া ×
১১৯। থানেরপাড়া ×
১২০। কাঠুরিয়াপাড়া শাখাডাকঘর (কৃষ্ণনগর প্রধান ডাকঘর থেকে ডাক বিলি হয়)
১২৩। কোলেরডাঙ্গা শাখাডাকঘর (নবদ্বীপ থেকে বিলি হয়)
১২৪। কৃষ্ণনগর কোর্ট শাখাডাকঘর। (কৃষ্ণনগর প্রধান ডাকঘর থেকে ডাক বিলি হয়)
১২৫। মাটিয়ারী শাখাডাকঘব।
১২৬। মতিরায় বাঁধ, শাখাডাকঘর। (নবদ্বীপ থেকে ডাক বিলি হয়)
১২৭। মিউনিসিপ্যাল অফিস রোড। নবদ্বীপ। (শাখাডাকঘর)
১২৮। মুড়াগাছা শাখাডাকঘর ×+
১২৯। বহিরগাছি ×
১৩০। ঘাটেশ্বর ×
১৩১। পাটপকুর।
১৩২। রুকনপুর ×
১৩৩। শালিগ্রাম ×
১৩৪। সুখসাগর ×
১৩৫। নবদ্বীপ শাখাডাকঘব ×+++
১৩৬। বাবলারি ×
১৩৭। বিদ্যানগর ×
১৩৮। মহিসুরা ×
১৩৯। শ্রীরামপুর ×
১৪০। নবদ্বীপ বাজার ,শাখাডাকঘব। (নবদ্বীপ থেকে ডাক বিলি হয়)
১৪১। নদীয়া বিদ্যালয় পর্যদ, শাখাডাকঘর। (কৃষ্ণনগব)
১৪২। নতুনবাজাব শাখাডাকঘব (কৃষ্ণনগব)
১৪৩। নগেন্দ্র নগর শাখাডাকঘব। (কৃষ্ণনগর)
১৪৪। পলাশীপাড়া শাখাডাকঘব।
১৪৫। বকশীপুব ×
১৪৬। বিনোদনগব ×
১৪৭। গোপীনাথপুব ×
১৪৮। শ্যামনগর ×
১৪৯। পলাশী চিনিরকল, শাখাডাকঘব।
১৫০। পলাশী, শাখাডাকঘব ×+++
১৫১। বড় চাঁদঘর ×
১৫২। বাণিয়া ×
১৫৩। ছোট নালদা ×
১৫৪। ধাওয়াপাড়া ×
১৫৫। মলানদি ×
১৫৬। পানসুণ্ডা ×
১৫৭। পাঁচদারা অভয়নগব ×
১৫৮। সাহেবনগর ×
১৫৯। রুদ্রপাড়া শাখাডাকঘর (নবদ্বীপ)
১৬০। শান্তিপুর শাখাডাকঘর ×+++
১৬১। বাবলা গোবিন্দপুর ×
১৬২। বাগআঁচড়া ×
১৬৩। বড়বাজার শান্তিপুর ×
১৬৪। ঘোড়ালিয়া ×
১৬৫। গয়েশপুর, হাজরাতলা ×
১৬৬। হরিপুর-নদীয়া ×
১৬৭। কন্দখোলা ×
১৬৮। কুটিরপাড়া (শান্তিপুর) ×
১৬৯। শান্তিপুব কলেজ ×
১৭০। শ্যামচাঁদপাড়া, (শান্তিপুর) ×
১৭১। রামনগর চর (শান্তিপুর)
১৭২। শিকারপুর শাখাডাকঘর ×+++

১৭৩। বালিয়াডাঙ্গা ×
১৭৪। দিগনকান্দি ×
১৭৫। দবেরমাঠ ×
১৭৬। কেচুয়াডাঙ্গা ×
১৭৭। পিপুলবেড়িয়া ×
১৭৮। রঘুনাথপুর, বামনগর ×
১৭৯। বড়বাকপুর ×
১৮০। শ্রীমায়াপুর শাখাডাকঘর ×+++
১৮১। বামনপকুর ×
১৮২। সুত্রাগড় শাখাডাকঘর (শান্তিপুর)
১৮৩। স্বরূপগঞ্জ শাখাডাকঘর ×++
১৮৪। আমঘাটা ×
১৮৫। গাদিগাছা ×
১৮৬। জোয়ানিয়া ভালুকা ×
১৮৭। মহেশগঞ্জ ×
১৮৮। উশীদপুর ×
১৮৯। তাহেরপুর শাখাডাকঘর
১৯০। তেঘরিয়াপাড়া শাখাডাকঘর (নবদ্বীপ)
১৯১। তেহট্ট শাখাডাকঘর ×+++
১৯২। হাঁসপুকুরিয়া ×
১৯৩। জিতপুর ×
১৯৪। কৃষ্ণচন্দ্রপুর ×
১৯৫। খোসপুর ×
১৯৬। নাটনা ×
১৯৭। নিশ্চিন্তপুর ×
১৯৮। নতিপোতা ×
১৯৯। রঘুনাথপুর ×
২০০। রাণাঘাট প্রধানডাকঘর ×+++
২০১। আনুলিয়া ×
২০২। বৈদ্যপুর, (রাণাঘাট) ×
২০৩। বেগোপাড়া ×
২০৪। চুনারীপাড়া ++
২০৫। দয়াবাড়ী ×
২০৬। হরধাম ×
২০৭। হিজুলী ×
২০৮। জগদানন্দ মঠ, নোকারী ×
২০৯। মহাপ্রভুপাড়া ×
২১০। নাসরা ×
২১১। ন'পাড়া ×
২১২। পানপাড়া ×
২১৩। রাণাঘাট বাজার ×
২১৪। রাণাঘাট রূপশ্রী ×
২১৫। হালালপুর কৃষ্ণপুর ×
২১৬। বগুলা শাখাডাকঘর ×+++
২১৭। ভৈরবচন্দ্রপুর ×
২১৮। গরাপোতা ×
২১৯। হলদিয়াপাড়া ×
২২০। কুমরী রামনগর ×
২২১। ময়ূরহাট ×
২২২। নবরূপদহ ×
২২৩। তারকনগর ×
২২৪। উলোসী ×
২২৫। হরিতলা ×
২২৬। বাণপুর শাখাডাকঘর ×+
২২৭। দিগম্বরপুর ×
২২৮। গেদে ×
২২৯। জয়ঘাটা ×
২৩০। খাল বোয়ালিয়া ×
২৩১। মহাখোলা ×
২৩২। নদীয়া শিমুলিয়া ×
২৩৩। বড়জাগুলি শাখাডাকঘর।
২৩৪। দিঘলগ্রাম ×
২৩৫। ফতেপুর ×
২৩৬। কাষ্ঠডাঙ্গা ×
২৩৭। মহাদেবপুর ×
২৩৮। মল্লাবেলিয়া ×
২৩৯। নগরউখরা ×
২৪০। পানপুর ×
২৪১। সুবর্ণপুর ×
২৪২। চাকদহ শাখাডাকঘর ×+++
২৪৩। বালিয়া ×
২৪৪। চৌগাছা ×
২৪৫। দেউলি ×
২৪৬। দিঘরা ×
২৪৭। গৌরীপুর ×
২৪৮। ঘেটুগাছি ×
২৪৯। হিংনারা ×
২৫০। কদম্বগাছি ×
২৫১। পোড়াডাঙ্গা ×
২৫২। পূর্ব বিষ্ণুপুর ×
২৫৩। রাজার মাঠ ×
২৫৪। স্যাম্নালচর ×
২৫৫। সিলিন্দা ×
২৫৬। তাতলা ×
২৫৭। ছোটো বাজার শাখাডাকঘর (রাণাঘাট)
২৫৮। কুপারস্ ক্যাম্প শাখাডাকঘর
২৫৯। দত্তফুলিয়া শাখাডাকঘর
২৬০। বরণবেরিয়া ×
২৬১। গাংনাপুর শাখাডাকঘর
২৬২। অনিসমালি ×

২৬৩। ইরুলি ×
২৬৪। গাংসারা-মাঝেবগ্রাম ×
২৬৫। গোপীনগর ×
২৬৬। ঘোলা ×
২৬৭। হুমনিপোতা ×
২৬৮। নাসেরকুলি ×
২৬৯। উজির পুকুরিয়া ×
২৭০। গয়েশপুব শাখাডাকঘব।
২৭১। হাঁসখালি শাখা ডাকঘব ×+++
২৭২। বেতনা
২৭৩। চিত্রশালী ×
২৭৪। দক্ষিণপাড়া ×
২৭৫। গোবিন্দপুব ×
২৭৬। ইটাবেড়িয়া ×
২৭৭। কৃষ্ণগঞ্জ শাখা ডাকঘব ×++
২৭৮। আসানন্‌গব ×
২৭৯। ভীমপুব ×
২৮০। চন্দনগব ×
২৮১। শাকদহ ×
২৮২। শিবনিবাস ×
২৮৩। স্বর্ণখালি ×
২৮৪। কল্যাণী শাখা ডাকঘর ×+++
২৮৫। মাঝেব চব ×
২৮৬। কল্যাণী শাখা ডাকঘর ++
২৮৭। খোশবাস মহল্লা শাখা ডাকঘর
(চাকদহ থেকে ডাক বিলি হয়)
২৮৮। লালপুর শাখা ডাকঘব (চাকদহ থেকে ডাক বিলি হয়)
২৮৯। মদনপুর শাখা ডাকঘব ×++।
২৯০। আলাইপুব ×
২৯১। বিরহী ×
২৯২। চরসরাতি ×
২৯৩। চাঁদমারি ×
২৯৪। ঘোড়াগাছা ×
২৯৫। সাগুনা ×
২৯৬। মাজদিয়া শাখা ডাকঘব ×+++
২৯৭। ভাজনঘাট ×
২৯৮। গাজনা ×
২৯৯। মোহনপুর শাখা ডাকঘব ×+
৩০০। প্রীতিনগব শাখা ডাকঘব
৩০১। বামনগর শাখা ডাকঘর
(রাণাঘাট থেকে ডাক বিলি হয়)
৩০২। রাণাঘাট কোর্ট শাখা ডাকঘব
(রাণাঘাট থেকে ডাক বিলি হয়)
৩০৩। শিমুবালি শাখা ডাকঘর ×++
৩০৪। ভাগীরথী শিল্পাশ্রম ×++
৩০৫। রাওতাড়ি ×
৩০৬। আড়ংঘাটা শাখা ডাকঘর ×+++
৩০৭। বড়বেড়িয়া ×
৩০৮। চূর্ণী রঘুনাথপুব ×
৩০৯। দলুয়াবাড়ী ×
৩১০। হাটবহিরগাছি ×
৩১১। পূর্ব নওপাড়া ×
৩১২। পাঁচবেড়িয়া ×
৩১৩। শিবনারায়ণপুব ×

চিহ্ন

টেলিগ্রাফের সুবিধাযুক্ত +
টেলিফোনের সুবিধাযুক্ত ++
সেভিংস ব্যাঙ্কেব সুবিধাযুক্ত ×

ব্যাঙ্ক ও বীমা

ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ক্ষেত্রে নদীয়ার অগ্রগতির কথা আলোচনা করতে হলে নদীয়ার অর্থনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কোনও অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসার অগ্রগতি নির্ভর করে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা, সঞ্চয়ের আগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেনের মোট পরিমাণ ইত্যাদির উপর। এছাড়াও ব্যাঙ্কের ঋণদানের নীতি, ঋণদানের ক্ষেত্র, সুদের হার, ঋণগ্রহণের সহজ পদ্ধতি এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অনুকূল অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ কোনও অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবসার অগ্রগতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে।

উপরোক্ত কারণগুলির পটভূমিকার আলোচনা করলে দেখা যাবে যে নদীয়ার সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল নয়। সেই কারণেই সঞ্চয়ের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয়ের ক্ষমতা খুব বেশী নয়। অপরদিকে কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই নদীয়ার অগ্রগতির পথে এ যাবৎকাল অনেক বাধা ছিল। সেজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও নদীয়ার স্থান খুব উর্ধ্বে নয়। অপর-দিকে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষার উন্নতি, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক উন্নতি করার সরকারী নীতি, স্বল্পসঞ্চয়ে আগ্রহ সৃষ্টি, ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা জাতীয়করণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পুরানো দিনের অচলায়তন সরে গিয়ে জেলার ব্যাঙ্ক ও বীমার অগ্রগতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। শিরা উপশিরার জাল বিস্তারের মাধ্যমে যেমন জীব-জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান রক্তের সরবরাহ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেহে, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার জালবিস্তারের মাধ্যমে ঠিক তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান মূলধন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র অর্থনীতিতে। জাতীয়-করণের পরবর্তীকালে জেলার অর্থনীতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সবল পদক্ষেপ ঘটেছে, যদিও এখনও পর্যন্ত জেলার মোট প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবস্থা আদৌ পর্যাপ্ত নয়।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের এক সমীক্ষা অনুসারে নদীয়ায় ব্যাঙ্কের শাখাপ্রতি জনসংখ্যার চাপ ১·০৫ লক্ষ, সেক্ষেত্রে রাজ্য ও জাতীয় হিসাব যথাক্রমে ৭৪ হাজার ও ৫২ হাজার। এ বিষয়ে আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই হিসাব ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। জাতীয়করণের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই হিসাব আরও শোচনীয় ছিল।

বর্তমানে নদীয়ায় তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট ২৯টি শাখা অফিস কাজ করছে। এরমধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার ১৬টি, স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার ১১টি এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার ২টি শাখা অফিস আছে।

১৯৭১ সালের মে মাসে ব্যাঙ্ক অফিস পিছু নদীয়ার জন-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২·৬ হাজার। সেক্ষেত্রে ১৯৬৯ সালে এই হিসাব ছিল ১·০৫ লক্ষ। ব্যাংক জাতীয়করণের পরবর্তী পর্যায়ে শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক অফিস পিছু জনসংখ্যার চাপের পরি-প্রেক্ষিতেই নদীয়ার উন্নতি হয়েছে তা'ই নয়, মোট আমানত ও ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়।

১৯৬৭ সালে যেখানে নদীয়ার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪·৪৫ কোটি এবং ২২ লক্ষ টাকা, যেখানে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এই অঙ্ক দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫·২৪ কোটি ও ৪৫·৫৫ লক্ষ টাকা।

স্টেট্ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

নদীয়া জেলার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অন্যতম স্টেট-ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। এই ব্যাঙ্কের মোট এগারটি শাখা অফিস কৃষ্ণনগর, বগুলা, গয়েশপুর গভঃ কলোনী, বীরনগর, কল্যাণী, রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, তেহট্ট, পলাশী এবং ফুলিয়ায় কার্যরত। এই ব্যাঙ্ক একদিকে যেমন সরকারী লেনদেনের দায়দায়িত্ব পালন করে চলেছে সেই সঙ্গে সরকারী আর্থিক নীতি ও পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা করছে। এই জেলায় স্টেট্ ব্যাঙ্ক কর্মসংস্থানভিত্তিক বহু প্রকল্পে ও বেকারী নিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করে চলেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে ও স্বনির্ভরতার কার্যসূচীর সার্থক রূপদানের জন্য স্টেট্ ব্যাঙ্ক এই জেলায় তার বিভিন্ন শাখা অফিসগুলির মাধ্যমে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র চাষীদের অধিকতর আর্থিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য সোনার গহনা ইত্যাদির বন্ধকের ভিত্তিতেও ঋণগ্রহণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রেও এই ব্যাঙ্ক এই জেলায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শক্তিনগরের হোসিয়ারী শিল্প ও ভাতজাংলাতে প্রস্তাবিত শিল্প-উপনগরীর বিভিন্ন শিল্পো-দ্যোগে আর্থিক সহায়তা দানের প্রস্তাব এই ব্যাঙ্কের কৃষ্ণনগর শাখার বিবেচনাধীন।

পরিবহনশিল্পের ক্ষেত্রেও নূতন ও পুরাতন লরি, বাস, টেম্পো, অটোরিক্সা, নৌকা ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্টেট্ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণসাপেক্ষে স্টেট ব্যাঙ্ক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিয়ে চলেছে। এছাড়া

এই জেলায় লন্ড্রি, সেলুন, ঘড়ি মেরামতি, বই বাঁধাই, হোটেল ও রেস্তোঁরা, পোশাক নির্মাণ, ফটো বাঁধাই, সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্রের স্টল ইত্যাদি বিভিন্ন নতুন নতুন ক্ষেত্রে অধুনা স্টেট্ ব্যাঙ্ক আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

নিম্ন আয়সম্পন্ন ও সামাজিক অনগ্রসর সম্প্রদায়কে সুবিধা-জনক সুদে ঋণ দানের নীতি কার্যকরী করতে ও অতি নিম্ন আয়সম্পন্ন উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তিদের সুবিধাজনক শর্তে আর্থিক সহায়তাদানে স্টেট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা এই জেলায় সক্রিয় রয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী বহু-সংখ্যক মৃৎশিল্পী, রিক্সাচালক, তাঁতশিল্পী, পোশাকনির্মাতা ইত্যাদি ইতিমধ্যেই স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণের সাহায্যে জীবিকার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষির ব্যাপক উন্নতির জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তারই রূপায়ণের অংশ হিসাবে দেবগ্রামে একটি কৃষি উন্নয়ন শাখা (Agriculture Developement Branch) স্থাপিত হতে চলেছে। এই শাখার মাধ্যমে নাকাশীপাড়া, কালীগঞ্জ এবং তেহট্ট ব্লকের কৃষিজীবীদের সহায়তা দান করা হবে। এছাড়া স্টেট ব্যাঙ্কের কৃষ্ণনগর শাখা দোগাছীতে সরকারী দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে দুগ্ধ সরবরাহ করার জন্য কয়েকটি দুগ্ধ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনে আর্থিক সাহায্যদানে আগ্রহী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

জেলার অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কের ভূমিকা আলোচনা করতে হলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্ করতে হয়। কারণ নদীয়ায় এই ব্যাঙ্কই অগ্রণী ব্যাঙ্ক (Lead Bank) এবং সেই হিসাবে জেলার অর্থনৈতিক পরি-কল্পনা ও প্রগতির ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নদীয়া জেলায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার প্রথম শাখা স্থাপিত হয় ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগরে এবং বর্তমানে এই জেলায় এই ব্যাঙ্কের মোট ষোলটি শাখা অফিস কাজ করছে। এই শাখা অফিসগুলি কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, নবদ্বীপ, চাপড়া, নাজির-পুর, করিমপুর, মাজদিয়া, তাহেরপুর, স্বরূপগঞ্জ, মদনপুর, শান্তিপুর, তাত্‌লা, জাগুলী, কাঁটাগঞ্জ, গোকুলপুর, বেথুয়াডহরী ও আড়ংঘাটায় অবস্থিত।

বর্তমানে এই ষোলটি শাখার মোট স্থায়ী আমানত, চলতি আমানত, সঞ্চয় আমানত এবং পৌনঃপুনিক আমানত ইত্যাদির পরিমাণ ৬০৭ লক্ষ টাকা এবং মোট অগ্রিমের পরিমাণ ১২১·১৯ লক্ষ টাকারও বেশী।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই ব্যাংকের আমানত নিম্নরূপ :

কৃষি	৩৩·৯০ লক্ষ টাকা
ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প	১৩·৪৯ ,,
ক্ষুদ্র ব্যবসায়	৩২·৭৮ ,,
সড়ক পরিবহন	১৮·০০ ,,
স্বনির্ভরতা কার্যসূচী ও অন্যান্য	১৩·৬৫ ,,

জাতীয়করণের পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের পর থেকে এই ব্যাঙ্কের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে এবং জেলার পরিকল্পিত অর্থনীতিতে এই ব্যাঙ্ক ক্রমশঃই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। একদিকে জেলার কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য এই ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্নক্ষেত্রে ঋণদান করা হচ্ছে সেইসঙ্গে মৃৎশিল্প, কাঁসা-পিতল শিল্প, তাঁতশিল্প ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের আরও বহু ক্ষেত্রে উদার ঋণদানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষিসহায়ক কার্যসূচী রূপায়ণে শিক্ষিত যুবকদের স্বনির্ভর কার্যসূচীর আওতায় আনার পরি-কল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশী যুবককে স্বনির্ভরতার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মাঝি, ঢাকী, দর্জি এবং রিক্সাচালক ইত্যাদি এই জেলার বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ এই ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছে। প্রস্তাবিত অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা (Area Development Programme)-র মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট রয়েছে।

স্বনির্ভরতা কার্যসূচীতে অর্থ সরবরাহ করে প্রায় ২৭৫ জন যুবকের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা হয়েছে। এছাড়া এই জেলায় এই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় ১৮৮ জন কর্মরত রয়েছেন এবং নতুন নতুন শাখাস্থাপনে এই সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে দুইশ'তে দাঁড়াবে আশা করা যায়।

কৃষিজীবীদের আয়বৃদ্ধির পরিকল্পনায় বাগিচা তৈরী, উদ্যান পালন, দুগ্ধ উৎপাদন ও শীতলীকরণ প্রকল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং স্বনির্ভরতা কার্যসূচীকে রূপায়িত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ছাড়া আরও একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক — ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, নদীয়াতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাচ্ছে। নদীয়ায় এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস রয়েছে চাকদহ ও কল্যাণীতে।

সমবায় ব্যাংক

জেলার ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ ক'রে চলেছে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কাজ স্বল্প ও মাঝারি ধরনের ঋণদান করা।

নদীয়া জেলার সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে নদীয়া জেলা সেন্ট্রাল কো-অপা-রেটিভ ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় কৃষ্ণনগরে অবস্থিত। এছাড়া রাণাঘাট, করিমপুর, হরিণঘাটা, বেথুয়াডহরী, চাকদহ, বাদকুল্লা ও দেবগ্রামে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস রয়েছে। শীঘ্রই তেহট্টের পাটনীপাড়া ও চাপড়াতে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ নদীয়া জেলার কৃষিজীবী জন-

সমাজকে গ্রামসমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দান করা।

এই ব্যাঙ্কের ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসের শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা এবং এই বছরের জুন মাস পর্যন্ত মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪৭.১০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে এই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে যথাক্রমে ১৭৫ লক্ষ ও ১৯৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে আমানতের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে যথাক্রমে ৮০ লক্ষ এবং ৯০ লক্ষ টাকা। কৃষ্ণনগরে একমাত্র এই ব্যাঙ্কেই সেফ্ ডিপজিট লকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কৃষিঋণ প্রদানের ব্যাপারে এই ব্যাঙ্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে জুন মাসে এই ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব ও সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৪.৫৭ লক্ষ ও ১৯১.৭৫ লক্ষ টাকা। উক্ত সময়ে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.৭৭ ও ৫৪.২০ লক্ষ টাকা ও ঐ একই সময়ে মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৭.৯৬ ও ১৪৭.১১ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে (৩০-৬-৭২) এই ব্যাঙ্কের সভ্যসংখ্যা ৭১৯; তারমধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬৮১ এবং ব্যক্তিগত সভ্যসংখ্যা ৩৮ জন। এছাড়া রাজ্য সরকার এই ব্যাঙ্কের শেয়ারের অন্যতম অংশীদার।

এই জেলায় আলোচ্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া দুইটি পৌর-সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে—একটি কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও অপরটি রাণাঘাট পিপ্লস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসাব মতে এই জেলার প্রাথমিক ঋণদান সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০৪। এই ৬০৪টির মধ্যে ৩৭১টি কৃষ্ণনগর সদর মহকুমায় ও ২৩৩টি রাণাঘাট মহকুমায় অবস্থিত। এই সকল পৌর ও প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কৃষি, সম্পত্তি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করে থাকে।

স্বল্পসঞ্চয়

ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসার উন্নতি ও মূলধন সংগঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে জনসাধারণের সঞ্চয়ের উপর। গত কয়েকবছর ধরেই তাই সর্বস্তরেই স্বল্পসঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে। নিম্ন আয়স্তরে বাস করা সত্ত্বেও নদীয়া জেলা স্বল্পসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পেছিয়ে নেই এবং ১৯৭০-৭১ সালে ৬০.৬০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে এই জেলা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পসঞ্চয়ে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে এই জেলার স্বল্পসঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১.৭৯ লক্ষ টাকা সেখানে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে এই জেলার অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত জেলার ১৭১টি পোস্ট অফিসে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৭৫ কোটি টাকা এবং আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১.০৪ লক্ষ। বর্তমানে উভয়ক্ষেত্রেই আরও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

স্বল্পসঞ্চয় অভিযানে নদীয়ার প্রয়াস ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে প্রতি বছরই প্রশংসার দাবী রাখে, স্বল্পসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নদীয়ার ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্রটি নিম্নরূপ :

সাল	লক্ষ্যমাত্রা	সংগ্রহ	স্থানাধিকার
১৯৬৯-৭০	৪৪,০০,০০০	৬৪,১৯,০০০	প্রথম
১৯৭০-৭১	৪৯,০০,০০	৬০,৬০,০০০	প্রথম
১৯৭১-৭২	৪৯,০০,০০০	৭৯,২৭,০০০	দ্বিতীয়.।

জীবনবীমা কর্পোরেশন

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জীবনবীমা জাতীয়করণ করা এবং জীবনবীমা কর্পোরেশন স্থাপন করার সুরু থেকেই নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগরে জীবনবীমার শাখা অফিস রয়েছে এবং নদীয়া জেলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কাজকর্মের দেখাশোনা করছে কৃষ্ণনগর কার্যালয় এবং বাকী অংশের দেখাশোনা করছে পরবর্তীকালে স্থাপিত জীবনবীমার কল্যাণী শাখা।

জীবনবীমা কর্পোরেশন স্থাপনের পূর্বে এই জেলায় ন্যাশনাল, হিন্দুস্থান, মেট্রোপলিটান, আর্যস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করত। ১৯৭০-৭১ সালে এই জেলায় মোট ৬১৯৩টি পলিসি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২.৮১ কোটি টাকা এবং সেই বছরে প্রিমিয়াম থেকে আয় হয় মোট ৫৩.০১ লক্ষ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে সেক্ষেত্রে মোট ৫৩১৩টি পলিসি অনুমোদন করা হয় এবং বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ ও প্রিমিয়মলব্ধ আয় ছিল যথাক্রমে ২.১৫ কোটি ও ৪৩.২২ লক্ষ টাকা। ১৯৭১-৭২ সালে কৃষ্ণনগর শাখার মাধ্যমে ৪২২৭টি পলিসি মঞ্জুর করা হয় এবং বীমাকৃত অর্থ ও প্রিমিয়মলব্ধ আয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ও ৩৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৪৪ টাকা।

সাম্প্রতিককালে কৃষ্ণনগর শাখার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বাবদ ঋণ দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে জাতীয়করণের পরবর্তীকালে নদীয়ার মতো কৃষি ও ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প প্রধান জেলার অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাঙ্ক ও বীমা সংস্থা আশার আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিশিষ্ট

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের
অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত নির্বাচিত অঞ্চলের তালিকা
(List of selected areas under Area Development Programme)

শাখার নাম	ব্লকের নাম	নির্বাচিত অঞ্চলের নাম
জাগুলী	হরিণঘাটা	বিরহী।
মদনপুর	চাকদহ	
তাতলা	চাকদহ	দুবরা, শ্রীকৃষ্ণপুর।
রাণাঘাট	রাণাঘাট–১	কালিনারায়ণপুর, গোপীনাথপুর, পাহাড়পুর, রাধানগর, দেবীপুর, বেড়কামগাছি, কৃষ্ণপুরচক, কামগাছি, জয়পুর ও সিম-আইশতলা।
শান্তিপুর	শান্তিপুর	নবলাঅঞ্চল ও তারাপুর গ্রাম।
মাজদিয়া	হাঁসখালি	তালদিয়া-মাজদিয়া, ভাজনঘাট-টুঙ্গী ও গাজনা।
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর–১	দিগনগর, চক্‌দিগনগর, জোয়ানিয়া ও ভালুকা।
স্বরূপগঞ্জ	নবদ্বীপ	গাদিগাছা, তিয়রখালী, আমঘাটা, সুবর্ণবিহার, শিমুলতলা, রুইপুকুর, স্বরডাঙ্গা, বামণপুকুর, বল্লালদীঘি, কল্লাপাড়া, রুদ্রপাড়া, টোটা, মাজদিয়া, উশিদপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, শিমুলগাছি।
তাহেরপুর	রাণাঘাট–২	বারাসাত।
করিমপুর	করিমপুর	রহমৎপুর।
নাজিরপুর	তেহট্ট–১	কানাইনগর।
বেথুয়াডহরী	নাকাশীপাড়া	বেথুয়াডহরী ও পাটিকাবাড়ী।
আড়ংঘাটা	রাণাঘাট–২	যুগোলকিশোর, বরণবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, মনসাহাটি ও দত্তফুলিয়া।

———

অর্থনৈতিক সমীক্ষা

ইতির পরেও যেমন পুনশ্চ থাকে তেমনি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি অর্থনীতির সব কটি শাখার আলোচনার শেষেও প্রশ্ন থেকে যায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্রটি তাহলে কী দাঁড়াল। এই সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্রটির প্রতিফলন আমাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনে -- আয়, মূল্যস্তর, জীবনযাত্রার ব্যয় ও প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক জীবনে অসংখ্য সেবা ও ভোগ্যপণ্যের সহজ লভ্যতার মোট খতিয়ানে। এই সব ভোগ্যপণ্যের আকর কোনটির প্রয়োজন বাঁচার একান্ত তাগিদে আবার কোনটির প্রয়োজন জীবনযাত্রাকে আরও একটু আরামপ্রদ বা আড়ম্বরপূর্ণ করতে -- আর সামগ্রিকভাবে এগুলিই আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের দর্পণ, তাই সাধারণ মানুষের কাছে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির গাণিতিক হিসাব তখনই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন এই দর্পণে প্রতিফলিত জীবনটা তাদের কাছে সুন্দর মনে হয়।

নদীয়ার সাধারণ মানুষের এই অর্থনৈতিক জীবন উত্থান পতনের অজস্র ঘটনায় চিহ্নিত। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের গ্রামপ্রধান অর্থনীতির মূলধারাটির সঙ্গে নদীয়া বহুকাল তাল মিলিয়ে চলেছে। কিন্তু তারপর দীর্ঘদিন চলেছে এক বিস্মৃতির অধ্যায়--নদীগুলি ভরাট হয়ে এসেছে, কিন্তু গড়ে ওঠেনি বিকল্প কোন জলসেচ ব্যবস্থা, সহস্র ব্যবহারে জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর হয়ে উঠেছে; পুরোন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের সঙ্গে কৃষিজীবী প্রজাদের সম্পর্কের একটি মাত্র সূত্রই ছিল--খাজনা দেওয়া-নেওয়া। জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে হয়েছেন শহরের বাসিন্দা। তাই গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের ভালোমন্দ, শুভাশুভ সবের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, শুধু ছিন্ন হয়নি টাকার সম্পর্কটি--সেটি বজায় থেকেছে নায়েব নামধারী জমিদারের প্রতিভূর মাধ্যমে। নদীয়ার গরীব চাষীর সাধ্য হয়নি চাষের জমির, সেচের সারের আর চাষের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। তাই সেন ও পাল রাজাদের যুগে যে গ্রামীন অর্থনীতি ছিল নদীয়ার মেরুদণ্ড, তা' ক্রমেই ভেঙ্গে পড়েছে আর ভেঙ্গে পড়েছে নদীয়ার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন।

নদীয়ার কৃষির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলেও হয়নি বৃহদায়তন শিল্পের নবজন্ম। নদীয়া বেঁচেছিল শুধুমাত্র তার ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প নিয়ে -- মাটির পুতুল, তাঁতের কাপড় আর কাঁসাপেতলের বাসন ইত্যাদি। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এগুলিরও যৌবনপ্রাপ্তি ঘটলো না। এই ভাবেই নদীয়ার অর্থনীতি চলেছে বহুদিন।

নদীয়ার অর্থনীতির উপর সর্বশেষ আঘাত দেশবিভাগ। নদীয়ার ঘটেছে অঙ্গহানি, পরিবর্তে অসংখ্য হতভাগ্য, অসহায়, ছিন্নমূল শরণার্থী ছুটে এসেছে নদীয়ার বুকে আশ্রয়ের আশায়। এই পটভূমিকাতেই বিচার করতে হবে নদীয়ার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন।

নদীয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক জীবন, পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সমগ্রেরই একটি অংশমাত্র। তবু নদীয়ার নিজস্ব সমস্যা আছে, আর তারই অংশীদার নদীয়ার সাধারণ মানুষ।

প্রশ্ন উঠতে পারে নদীয়ার সেই বিশেষ সমস্যাটি কি? সেই সমস্যাটি দেশবিভাগজনিত। দেশবিভাগের ফলে নদীয়া হারিয়েছে তার কৃষিপ্রধান তিনটি মহকুমা অর্থাৎ পূর্বতন আয়তনের অর্ধাংশ, এর ফলে নদীয়ার খাদ্যসমস্যা হয়েছে প্রকট। ঘাটতি এই জেলার চাল ও শাকসব্জী, ডাল ও অন্যান্য শস্যের যোগান কমেছে ব্যাপকভাবে তাই দামও হয়েছে উর্ধ্বমুখী। পাটের ঘাটতি মেটাতে নদীয়ার ধানচাষের জমিতে পড়েছে টান। সংস্কারের অভাবে মজে গিয়েছে খাল, বিল, পুকুর, নদী। দেশবিভাগের ফলে এর অনেকগুলি আবার পড়েছে অধুনা বাংলাদেশে। তাই মাছের যোগানও কমতে কমতে নদীয়ায় মাছ হয়েছে মরীচিকা।

তাই এখন যদি একবার মাছের বাজার ঘুরে আসি তাহলে দেখি কাটা রুই, কাতলা, ইলিশ দশ থেকে বার টাকা, আস্ত ইলিশ আট টাকা থেকে দশ টাকা। খয়রা, রুই, মৃগেল পোনা – পাঁচ থেকে সাত টাকা। কই, মাগুর--আট থেকে দশটাকা, গলদা চিংড়ী--আট থেকে দশটাকা, মাঝারি চিংড়ী--ছয় থেকে আটটাকা, মৌরলা, ছোট চিংড়ী, পুঁটি--আড়াই থেকে চারটাকা।

মাছের বাজারে যেমন বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন ও পূজাপর্বে তেজী মন্দা আছে তেমনি সবজীর বাজারেও তেজী মন্দা আছে। সাধারণতঃ শীতকালে সবজীর বাজার একটু নরম আবার গ্রীষ্মকালে বেশ উত্তপ্ত। সেই উত্তাপের বেশীটাই এসে লাগে নদীয়ার সাধারণ মানুষের গায়ে।

গ্রীষ্মে নদীয়ার বাজার:

আলু -- প্রতি কিলোগ্রাম ১ টাকা ৫০ পয়সা এবং উর্ধ্বে।
পটল -- প্রতি কিলোগ্রাম ১ টাকার বেশী।
কাঁচাকলা -- ১ জোড়া ২৫ থেকে ৩০ পয়সা।
পান -- ১ পন ১ টাকা বা উর্ধ্বে।
কাঁচালঙ্কা -- প্রতিকিলোগ্রাম দুই থেকে চার টাকা।
কুমড়া -- প্রতিকিলোগ্রাম ৫০ পয়সা থেকে ৬০ পয়সা।

শীতে সব্জী ওঠার সাথে সাথে সবজির বাজারে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে -- বৈচিত্র্যে ও দামে। কিন্তু ১৯৭২ সাল বুঝি সেদিকেও বিশেষ ব্যতিক্রম কারণ এখন জানুয়ারীর প্রথমেও –

বেগুন -- পঞ্চাশ থেকে ষাট্ পয়সা প্রতি কি. গ্রাঃ।

টম্যাটো -- প্রতি কি: গ্রা: সত্তর থেকে আশী পয়সা।
মটরশুঁটী -- প্রতি কি: গ্রা: এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বড় ফুলকপি -- ষাট্ থেকে পঁচাত্তর পয়সা।
বাঁধাকপি -- প্রতি কিলো গ্রাম পঞ্চাশ, ষাট পয়সা।

আমিষের বাজারে যাঁরা মাছের গগনছোঁয়া দাম দেখে পিছিয়ে যাবেন তাঁরা হয়তো গিয়ে ঢুকবেন মাংস ডিমের বাজারে কিন্তু সেখানেও খুব সুবিধা নেই।

পাঁঠার মাংস -- প্রতি কিলো ৭ টাকা থেকে ৮ টাকা।
হাঁসের ডিম -- প্রতি জোড়া ৭০ পয়সা।
মুর্গীর ডিম -- প্রতি জোড়া ৫০ থেকে ৬০ পয়সা।

আমাদের প্রাত্যহিক খরচের খাতায় একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে তেলমশলা ডালের হিসাব। সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি:

সরিষার তেল	প্রতিকিলো	চস টাকা
বনস্পতি	..	৬ ৮০ টাকা
আখের গুড়	,,	২·০০ টাকা
লবণ	,,	০·২৬ পয়সা
সুপারী	..	৭·০০ টাকা
খয়ের	,,	৩০·০০ টাকা
মুগ ডাল	,,	৩·৫০ টাকা
মুসুরী	..	২·৫০ টাকা
কলাই	..	২·৭০ টাকা

নদীয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খাদ্য তালিকায় ভাতই বরাবর প্রধান খাদ্য ছিল। এখন তারই পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে গমজাত দ্রব্য। খাদ্যাভ্যাসের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রধান কারণ অবশ্য চালের ঘাটতি এবং সেই ঘাটতি পূরণে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গমের আমদানী বৃদ্ধি। নদীয়ায় কৃষি উৎপাদনের তালিকাতে অবশ্য গম একটি প্রধান স্থান অধিকার করতে চলেছে এবং সেই তুলনায় ডাল ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম।

চালের মূল্য তালিকা ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় বর্তমানে (১৯৭২-৭৩) যথেষ্ট কম, যদিও প্রাক্ স্বাধীনতা কালের তুলনায় বেশী। চালের মূল্যের বর্তমান স্থিতাবস্থা সাধারণ মানুষের চোখে যথেষ্ট স্বস্তির কারণ হয়েছে। চালের ১৯৭২-৭৩ সালের বাজার দর -- সাধারণ মোটা চাল প্রতিকিলো ১·৫০ টাকার মধ্যে, মাঝারি ১·৫০-১·৮০ টাকা ও সরু উৎকৃষ্ট চাল ১·৮০ টাকার ঊর্ধ্বে। অবশ্য সাম্প্রতিক খরার জন্য খাদ্য পরিস্থিতিতে অন্যান্য জেলার মতো নদীয়াতেও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও নদীয়ার মতো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত জেলার সাধারণ মানুষের আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্যের ক্রয়ে তবুও আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করতে হয় -- বাড়ীভাড়া, পরিবহন, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে। এই প্রসঙ্গে বাষট্টি বছর আগে প্রকাশিত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত নদীয়াকাহিনীতে আলোচিত তৎকালীন জীবনযাত্রার ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একালের জীবনযাত্রার ব্যয়ের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাটি কৌতুহলোদ্দীপক।

সেই সময়ের হিসাব অনুসারে দেখা যায়--
চাল মণ প্রতি চার টাকা
ধুতি প্রতিটি বার আনা
গামছা প্রতিটি চার আনা
শীতের চাদর প্রতিটি এক টাকা।

উক্ত লেখকের উক্তি অনুযায়ী "ধান্য, চাউল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের খোরাকী খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্তমান সময়ে কৃষক শ্রেণীর একটি লোকের গড়ে মাসিক ৪॥০-র কমে খোরাকী নির্বাহ হয় না।" এই হিসাবে একজন কৃষকের বাৎসরিক তৎকালীন খরচ দাঁড়ায় ৬৪।০ আনা।" তাঁর প্রদত্ত হিসাবটি নিম্নরূপ:

চাউল মাসে ২৫ সের ৪ টাকা মণ দরে	২॥০
ডাউল, তবকারী, মাছ রোজ ৶১০ (দুই পয়সা) হিসাবে	১৲
হলুদ, লঙ্কা ইত্যাদি মশলা	॥০
লবণ	৵০
তেল, খাওয়া ও মাখা	॥০
	৪॥৵০

সেক্ষেত্রে বর্তমানে (১৯৭২-৭৩ সালে):

চাল কুড়ি কেজি	৩০·০০ টাকা
ডাল, তবকারী, মাছ প্রতিদিন ৭৫ পয়সা হিসাবে	২২·৫০ টাকা
লবণ ও মশলা প্রতিদিন ২৫ পয়সা হিসাবে	৭·৫০ টাকা
তেল খাওয়া ও মাখা	৫ ০০ টাকা
	৬৫·০০ টাকা

অবশ্য সব চাষীর পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কেনা সম্ভব হয় না।

কিন্তু নদীয়ার সাধারণ মানুষের জীবনেও অনেক নাগরিক জীবনের অভ্যাস সংযুক্ত হয়েছে। পোষাকে এসেছে বৈচিত্র্য, গৃহ ও গৃহসজ্জায় এসেছে উন্নত মানের নিদর্শন, আসবাবপত্রের দিকেও এসেছে আগের চেয়েও অনেক বেশী আড়ম্বরপ্রিয়তা।

বর্তমানে (১৯৭২-৭৩) একখানা মোটা ধুতি কম করে ছয় থেকে আট টাকা, মাঝারি ১২ থেকে ১৫ টাকা এবং মিহি ধুতি কুড়ি টাকা ও তদূর্ধ্বে। মঝারী সুতোর শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ী একখানা ষোল থেকে কুড়ি টাকা কিন্তু পোষাকে গত দুই দশকে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ধুতির পরিবর্তে টেরিলীন, টেরিকটন ইত্যাদির সার্ট ও প্যান্টের বহুল প্রচলন হয়েছে। মেয়েদের পোষাকে এখনও সুতি ও সিল্কের শাড়ীর

প্রাধান্য থাকলেও টেরিলীন ও টেরীকটনেব শাড়ীরও ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে।

খাদ্য ও বস্ত্রের পরই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের তালিকায় পড়ে বাসস্থান। নদীয়ার শহরাঞ্চলে এখন বাড়ী ভাড়া ক্রমশঃই উর্ধ্বমুখী। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ভাড়াও বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই এক কক্ষযুক্ত গৃহে বাস করে এবং শতকরা মাত্র ১৭·০৪ ভাগ দুই কক্ষযুক্ত গৃহে বাস করে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে দুই কক্ষযুক্ত গৃহের ভাড়া ষাট টাকা থেকে আশী টাকা। তিন কক্ষযুক্ত গৃহের ভাড়া কমপক্ষে আশী টাকা এবং একটি মাত্র ঘবের ভাড়া প্রায় ত্রিশ টাকা। অবশ্য গৃহের অবস্থান ও সুযোগ সুবিধার উপর এই ভাড়ার তারতম্য হয়ে থাকে।

গৃহের আসবাবপত্রের দিক দিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশী আড়ম্বর দেখা যায় অবশ্য এই আড়ম্বব শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আগেকার দিনে যেখানে একমাত্র কাঠের খাট, চেয়ার টেবিল ও আলমারী ইত্যাদির ব্যবহারই প্রধান ছিল বর্তমানে সেক্ষেত্রে স্টীলের আলমারী, টেবিল ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে হাতঘড়ি, রেডিও, ট্রান-সিস্টার, রেকর্ডপ্লেয়ার ও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নদীয়ার পরিবহনেব যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনি পরিবহন জনিত ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে গ্রামে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল একমাত্র গরুর গাড়ী। এখন অনেক গ্রামের মধ্য দিয়েও বাসরাস্তা তৈরী হয়েছে। তাই বাসভাড়া বাবদ খরচও বেড়েছে কারণ বর্তমান নগরকেন্দ্রিক জীবনে গ্রামের মানুষের নানাকাজে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এছাড়াও অনেক রিক্সাও চলছে নদীয়ার শহর ও আধাশহর প্রতিটি এলাকায় যার নিম্নতম ভাড়াই ৫০ পয়সা। বর্তমানে তাই পরিবহণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে।

সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং বিদ্যুতের ব্যবহারজনিত ব্যয়। জ্বালানীর ক্ষেত্রে ব্যয় ছিল আগেকার দিনে নগণ্য কিন্তু বর্তমানে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কয়লা চল্লিশ কিলোগ্রাম (মুটেসহ) প্রায় পাঁচ টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশী। এছাড়া কাঠ, ঘুটে ইত্যাদির দরও উর্ধ্বমুখী।

নদীয়ায় সাম্প্রতিক ভোগ্যপণ্যের মূল্যের উর্ধ্বগতি ও জীবন-যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতার ধারাটি নিম্নলিখিত সূচকসংখ্যার ভিত্তিতে দেখান যেতে পারে।

ভোগ্যপণ্যের মূল্যের সূচকসংখ্যা

নির্ধারিত বাজার=কৃষ্ণনগর

ভিত্তিবছর ১৯৫০--১০০ (সূচক)

আলোচ্য বছর ১৯৬৭

দ্রব্যসামগ্রী	
চাল	৩১২·০০
গম	৩১২·০০
মুসুর ডাল	২৮৮·০০
মুগ ডাল	৩০৮·০০
কলাই ডাল	২৮৬·০০
অন্যান্য ডাল	৩২২·০০
ভেলী গুড়	২১২·০০
চিনি	১৬৩·০০
সঃ তেল	৫০৮·০০
মশলা	২৯৯·০০
লবণ	১০৮·০০
দুধ	১৩৩·০০
ঘি	১৯২·০০
আলু	১২৬·০০
পেঁয়াজ	১৭৭·০০
অন্যান্য সব্জি	১৫৪·০০
মাছ	২২৬·০০
মাংস	১৫৪·০০
ডিম	২০৮·০০

উপরোক্ত সূচকসংখ্যার হিসাবে দেখা যায় ১৯৫০ সালেব তুলনায় ১৯৬৭ সালে কৃষ্ণনগর বাজারের ভোগ্যপণ্যের দাম সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে চাল, ডাল, গম ইত্যাদির দর গড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঃ তেলের দাম পাঁচগুণ, মশলার দাম তিনগুণ, মাছ সওয়া দুগুণ, মাংসেব দাম দেড়গুণ এবং ডিমের দাম প্রায় দুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে জীবনযাত্রার ব্যয়েও এসেছে ক্রমবৃদ্ধিব প্রবণতা। কৃষ্ণনগরের বাজারদরের ভিত্তিতে জীবনযাত্রাব ব্যয়ের চিত্রটি ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে।

ভিত্তিবছর ১৯৬০=১০০ (সূচক)

উপরে : মাসিক ব্যয়স্তর (টাকার অংকে)

নীচে । আলোচ্য সূচক

১-১০০	১০১-২০০	২০১-৩৫০	৩৫১-৭০০	৭০০ এবং উর্ধ্বে
২৩৪·০০	২২৫·৫	২১৪·২	২১৬·১	২০৩·৯

সেই তুলনায় ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আলোচ্য বাজারের ভোগ্যপণ্যের মূল্যের সূচক অনেক কম ছিল।

নদীয়ার মোট জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ আয়সীমার সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিপুল চাপ তাঁদের উপর ক্রমাগত অধিকতর ক্লেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

তপশীলজাতি ও উপজাতি কল্যাণ

নদীয়া জেলায় তপশীল জাতির লোকসংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়। নদীয়া জেলার মোট লোকসংখ্যা ২২,৩০,০০০ এর মধ্যে তপশীল জাতির লোক ৪,৭৫,৪৮৯ জন অর্থাৎ শতকরা ২২·৩ ভাগ (১৯৭১ সালের আদমসুমারী)। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে এই জাতিভুক্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। বর্তমানে এ জেলার প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজনেরও বেশী তপশীলী। এই জেলার তপশীলীদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু।

নদীয়া জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তপশীল জাতির লোক বাস করেন রাণাঘাট থানায়। তারপরই চাকদহ থানার স্থান। এরপর যে থানাগুলিতে এই জাতির লোকসংখ্যা বেশী তা'হল কৃষ্ণনগর সদর, হাঁসখালি, তেহট্ট ও নাকাশীপাড়া থানা। সবচেয়ে কম হল নবদ্বীপ থানায়।

এই জেলার তপশীল জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী নমঃশুদ্র। নমঃশুদ্রদের সংখ্যাই সমগ্র তপশীলীদের অর্দ্ধেক। এর পরেই আসে বাগ্দী, যদিও এদের সংখ্যা নমঃশুদ্রদের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম। তৃতীয় স্থানের অধিকারী চামার। তপশীল শ্রেণীর মধ্যে আর যাদের এ জেলায় বেশী দেখা যায় তারা হল মালো, রাজবংশী, পোদ, রাজোয়ার, জেলে কৈবর্ত, ধোপা, হরি, ভুইমালী, বিন্দ, পাটনি।

কি শহরে কি গ্রামে নমঃশুদ্রদের সংখ্যাই বেশী। নমঃশুদ্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী রাণাঘাট থানায়—তারপরেই চাকদায়। বাগ্দীদের সবচেয়ে বেশী দেখা যায় কৃষ্ণনগর সদর থানায়। চামারদের সংখ্যাধিক্য কালীগঞ্জ থানায়। সারা জেলার মালোদের অর্দ্ধেকের বেশী থাকে কৃষ্ণনগর ও আশেপাশে। জেলার ধোপার তিনভাগের একভাগ বাস করে শান্তিপুর শহরে।

এ জেলার তপশীল শ্রেণীর লোকদের অধিকাংশই চাষী বা ক্ষেতমজুর। পশুপালন কাজেও অনেকে লিপ্ত। দেখা যায়, কৃষিকাজে রত তপশীলী লোকের মধ্যে নমঃশুদ্র, বাগ্দী, বিন্দ, রাজোয়ার ও রাজবংশীই প্রধান। অন্যান্য চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে নমঃশুদ্ররাই অগ্রগণ্য।

শিক্ষার দিক দিয়ে স্বাধীনতার পর অনেক চেষ্টা করা হলেও তপশীল জাতির লোক এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে এ জেলার শিক্ষার সাধারণ হার ছিল ২৭·৩% কিন্তু তপশীলীদের মধ্যে এই হার ছিল ১৬·৮%। তপশীল জাতির মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত শুঁড়ীরা। এর পরে ধোপার স্থান। তৃতীয় স্থান নমঃশুদ্রের।

নদীয়া জেলায় তপশীল উপজাতির সংখ্যা নগণ্য। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে ছিল ২১,৭২৩ জন, ১৯৭১ সালের আদমসুমারীতে বেড়ে হয়েছে ৩১,৭৯৯। জেলার সমগ্র অধিবাসীর শতকরা মাত্র ১·৪ ভাগ তপশীল উপজাতিভুক্ত।

নদীয়া জেলার তপশীল উপজাতির মধ্যে রয়েছে ওঁরাও, সাওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ। এদের মধ্যে ওঁরাওদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তারপর সংখ্যার দিক দিয়ে যথাক্রমে সাওতাল, মুণ্ডা ও ভূমিজের স্থান।

ওঁরাওদের বসবাস সবচেয়ে বেশী কৃষ্ণনগর সদর থানা এলাকায়। তারপরই নাকাশীপাড়া ও চাকদহ থানায়। সাওতাল সবচেয়ে বেশী আছে হরিণঘাটা থানায়। তারপর চাকদহ ও কৃষ্ণনগর সদর থানায়। মুণ্ডাদের সংখ্যাধিক্য চাকদহ ও শান্তিপুর থানায়। শিক্ষায় তপশীল উপজাতি এ জেলায় খুবই পিছিয়ে আছে—শতকরা ৬ জনের বেশী শিক্ষিত নয়। তপশীল উপজাতির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ কৃষিকাজে জীবিকা নির্বাহ করে—তবে জমির মালিক খুবই কম, অধিকাংশই হয় বর্গাদার, না হয় ক্ষেতমজুর।

এ জেলার উপজাতিরা তাদের আদি আচার আচরণ ভাষা সহ স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে নিয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুন্নত সম্প্রদায় হিসেবে তপশীল জাতি ও উপজাতির উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা করছেন। শিক্ষা, সমবায়, গৃহনির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে।

শিক্ষা :

তপশীল জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত সুদূর পল্লী অঞ্চলে বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে তপশীল জাতির জন্য যে ভবনগুলি হয়েছে তা হল রামদুলালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়—হাঁসখালি থানা, বেজপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়—নাকাশীপাড়া থানা, নিচের পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়—কৃষ্ণনগর সদর থানা, উদমডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়—নাকাশীপাড়া থানা। তপশীল উপজাতির জন্য নফরচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়—তেহট্ট থানা, বেহারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়—হরিণঘাটা থানা, তেঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়—কৃষ্ণনগর সদর থানা।

উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাঠরত বহুসংখ্যক তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রদের স্কুলের মাহিনা, বই কেনার খরচ, পরীক্ষার ফি ও ছাত্রাবাসের ব্যয় সরকার থেকে বহন করা হয়। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের থাকবার জন্য শঙ্কর মিশন ছাত্রাবাস (কৃষ্ণনগর থানা), হাঁসখালি উচ্চবিদ্যালয় ছাত্রাবাস (হাঁসখালি থানা), রাজারমাঠ উচ্চবিদ্যালয় ছাত্রাবাস (চাকদহ থানা), বীরপুর ললিতা শ্রীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রাবাস (নাকাশীপাড়া থানা) নির্মাণে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবছর প্রায় ১১০০ অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রকে জেলার বিভিন্ন কলেজে লেখাপড়া চালানোর জন্য নানাবিধ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। কারিগরি শিক্ষারত তপশীল জাতি ও উপজাতির ৩১টি ছাত্রকে এবং বৃত্তিশিক্ষারত ৯৩টি ছাত্রকে বেতন দেওয়া হয়।

সমবায় :

তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জেলায় ১৫টি সমবায় শস্যগোলা স্থাপন করা হয়েছে। এই শস্যগোলাগুলির উদ্দেশ্য প্রয়োজনের সময়ে দরিদ্র তপশীলীদের ধান দিয়ে সাহায্য করা। পরে ধানেই ঐ ঋণ শোধ নেওয়া হয় সামান্য সুদ সহ। এই শস্যগোলার ধান কেনা, গুদাম তৈরী করা এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনা প্রভৃতির জন্য সরকার থেকে অর্থসাহায্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে এই শস্যগোলার মাধ্যমে এদের সভ্যদের জন্য কৃষিঋণও পাওয়া যায়। গ্রামের মহাজনদের হাত থেকে দরিদ্র ও সরল তপশীলী সমাজের লোকদের রক্ষা করতে এই গোলাগুলি খুবই সহায়তা করেছে। এখন প্রায় ১৫০০ তপশীলী পরিবার এই শস্যগোলাগুলির আওতাভুক্ত এবং এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধির পথে।

এই ধর্মগোলাগুলির অবস্থান নিচে দেওয়া হল.

১।	ছোট জিয়াকুর সমবায় শস্যগোলা	শান্তিপুর থানা
২।	বাবলা-গোবিন্দপুর সমবায় শস্যগোলা	,, ,,
৩।	গাছা সমবায় শস্যগোলা	নাকাশীপাড়া থানা
৪।	যাত্রাপুর সমবায় শস্যগোলা	কৃষ্ণনগর সদর থানা
৫।	একতারপুর সমবায় শস্যগোলা	,, ,,
৬।	হাজারীপোতা সমবায় শস্যগোলা	,, ,,
৭।	সিলিন্দা সমবায় শস্যগোলা	চাকদহ থানা
৮।	গরালী সমবায় শস্যগোলা	হরিণঘাটা থানা
৯।	চান্দা সমবায় শস্যগোলা	,, ,,
১০।	মোল্লাবেলিয়া সমবায় শস্যগোলা	,, ,,
১১।	মদনা সমবায় শস্যগোলা	হাঁসখালি থানা
১২।	শ্রীরামপুর সমবায় শস্যগোলা	চাকদহ থানা
১৩।	দামুরিয়া সমবায় শস্যগোলা	,, ,,
১৪।	কোরাবারি সমবায় শস্যগোলা	রাণাঘাট থানা
১৫।	দক্ষিণ ঢাকুরিয়া সমবায় শস্যগোলা	,, ,,

বাসস্থান :

আলো হাওয়াযুক্ত স্বাস্থ্যকর ঘরের অভাব অনুন্নত সম্প্রদায় বিশেষতঃ হরিজনদের এক বিরাট সমস্যা। সভ্যমানুষের পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে তোলে হরিজনরা, কিন্তু তাদের নিজেদের ঘরবাড়ী থাকে সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর হয়ে। সরকার গ্রাম ও সহর এলাকার অনুন্নত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য টিন বা টালির ছাউনিযুক্ত আলোহাওয়া পাওয়া যায় এমন প্রশস্ত মাটির ঘর করে দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে অধিকতর অনুন্নত শ্রেণীর ১৩৫টি পরিবারের এবং উপজাতিদের ১৮৫টি পরিবারের জন্য এই ধরনের ঘর সরকার থেকে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। সহরাঞ্চলে সরকার থেকে নদীয়া জেলার ৬টি পৌরসভায় মোট ১৩৩টি কোয়ার্টার করে দেবার জন্য পৌরসভাগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

পানীয় জল :

অনুন্নত সম্প্রদায়প্রধান অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব আর এক সমস্যা। অর্থাভাবে নিজব্যয়ে নলকূপের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সরকারের তরফ থেকে এ জেলায় তপশীল সম্প্রদায়ের জন্য ৪১৭টি নলকূপ এবং উপজাতিদের জন্য ২৭৮টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি :

তপশীল জাতি ও উপজাতিদের চাষবাসেও সরকার থেকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। ৩২৬টি তপশীল জাতি এবং ২৬৭টি তপশীল উপজাতি পরিবারের জন্য যথাক্রমে ১১৬ একর এবং ২৮ একর সরকারী ন্যস্ত জমি বিতরণ করা হয়েছে। ১৮৪টি তপশীল চাষী পরিবার ও ৬৩টি উপজাতি চাষী পরিবারকে চাষের বলদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জমি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র সেচ, পশুপালন প্রভৃতি ব্যাপারেও আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

তপশীলীদের কারিগরি শিক্ষা দেবার জন্য একটি উৎপাদন তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। এখানে প্রতিবছর ১০ জনকে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৬৪ জন এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে বেরিয়েছে।

তপশীল জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণে নানাবিধ প্রকল্প-গ্রহণ ও রূপায়ন করা, তাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা এবং তাদের অন্যান্য স্বার্থদেখার জন্য নদীয়া জেলায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তরসহ তপশীল জাতি ও উপজাতি কল্যাণের একজন বিশেষ আধিকারিক আছেন।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় তপশীল জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণে যে অর্থব্যয় করা হয়েছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

	শিক্ষা		অর্থনৈতিক উন্নয়ন	
	তপশীল জাতি	উপজাতি	তপশীল জাতি	উপজাতি
১ম পরিকল্পনা	৩১,৩২৪ টাকা	২,১৩৮ টাকা	৩২,৭২৮ টাকা	৫৩,৪৬৬ টাকা
২য় পরিকল্পনা	৩৭,৩৮২ ,,	২৫,২৯৬ ,,	১,২৯,৩৮৯ ,,	১,১৯,৪১১ ,,
৩য় পরিকল্পনা	১,২২,২৩১ ,,	৮০,৩০২ ,,	৩,৭২,০০০ ,,	৩,৬৬,০৯৪ ,,
৩য় ও ৪র্থ পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালে	১,৭৬,৬২৪ ,,	৪১,৭০২ ,,	১,০৯,৭২১ ,,	৪৯,৩৮৪ ,,
৪র্থ পরিকল্পনা	২৩,১৫,৭৯০ ,,	৯১,৮৫৯ ,,	২,২৮,৯৫৫ ,,	১,৬২,৩০৫ ,,

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে নদীয়া শুধু অন্যতম নয় সম্ভবতঃ সর্বাগ্রগণ্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর নদীয়ার পূর্বের আয়তন প্রায় অর্দ্ধেক কমে গিয়েছে, কিন্তু আগমন হয়েছে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকেই উদ্বাস্তুর আসা সুরু হয়, কিন্তু ১৯৫০ সাল থেকে এই আসা নানাকারণে অনেক বেড়ে যায়।

এই অসংখ্য আশ্রয়প্রার্থী আগন্তুকদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নদীয়া জেলায় কয়েকটি আশ্রয় শিবির খোলা হয়। তার মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্প ও ধুবুলিয়া ক্যাম্প। গত মহাযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর কাজে ব্যবহার হওয়া এই বিরাট দুটি\জায়গা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। কল্যাণীর কাছে চাঁদমারীতেও অনুরূপ একটি পরিত্যক্ত জায়গায় আর একটি আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল।

আশ্রয় শিবিরে সাময়িক আশ্রয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে জমি অধিগ্রহণ করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করে দেন। এই সব উপনিবেশের মধ্যে কল্যাণীর কাছে গয়েশপুর, কাঁটাগঞ্জ, গোকুলপুর, বীরনগরের কাছে তাহেরপুর এবং চাকদহের সংলগ্ন খোশবাস মহল্লা ও হামিদপুর উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে ফুলিয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় উদ্বাস্তুদের জন্য একটি নতুন উপনগরী গড়ে তোলা হয়। এই উপনগরীতে রাস্তা, বিদ্যুৎ, জলের সুবিধা ছাড়াও কৃষি ও কারিগরী শিল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী সহায়তায় এখানে উদ্বাস্তুদের কয়েকটি ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে ওঠে।

কৃষিজীবী উদ্বাস্তুরা প্রধানতঃ করিমপুর, তেহট্ট, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি থানা এলাকায় এবং মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুরা প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও চাকদহ সহরে এবং দেবগ্রাম, নাকাশীপাড়া, রাণাঘাট, চাকদহ থানা অঞ্চলে বিশেষতঃ রেললাইনের সংলগ্ন এলাকায় বসবাস আরম্ভ করেন। নবদ্বীপ, রাণাঘাট ও শান্তিপুরের আশেপাশে সহস্র সহস্র তাঁতী নতুন করে জীবিকা আরম্ভ করেন।

নদীয়া জেলায় ২২ লক্ষ ৩০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে সরকারী হিসাবমতে বর্তমানে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১০,৯১,৭৬ অর্থাৎ জেলার প্রতি দুজনের মধ্যে একজনই উদ্বাস্তু। নদীয়া জেলায় একটি জিনিষ বিশেষ লক্ষণীয় যে উদ্বাস্তুরা স্থানীয় লোক ও পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে নিয়েছেন। নদীয়ার অপরাংশের উদ্বাস্তুদের বেশীর ভাগ এপারের নদীয়াতেই পুনর্বাসন নিয়েছেন।

১৯৬৪ সাল থেকে দ্বিতীয় দফায় উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধি পায়। তখন থেকে এপর্যন্ত জেলায় নতুন উদ্বাস্তুর আগমন হয়েছে ৩,১২,৭৪৯। এদের মধ্যে ৪৫,৬৫৪ জন উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে পাঠানো হয়েছে।

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের তরফ থেকে উদ্বাস্তু পরিবারদের গৃহনির্মাণ ও ব্যবসায় ঋণ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বাস্তুঅধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপন, উদ্বাস্তু ছাত্রদের বেতন দান, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি করেও উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা হয়েছে। ত্রাণবিভাগের আশ্রয়শিবিরগুলিতে এখনও বহুসংখ্যক পুনর্বাসন না হওয়া অসহায় উদ্বাস্তুকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়। তাহেরপুর, খোসবাস মহল্লা ও গয়েশপুর কলোনীতে তাঁতের কারখানা স্থাপন করেও উদ্বাস্তুদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করা হয়েছে। তাহেরপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন শিল্পসংস্থার একটি তাঁতশিল্প কেন্দ্র রয়েছে।

এ পর্যন্ত এ জেলায় সরকার থেকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ঋণ দেওয়া হয়েছে ১০,৪৬,৭১,৪৪৫ টাকা।

সরকারী তরফ থেকে যা কিছু চেষ্টাই হোক, একথা সত্য যে নদীয়া জেলায় এখনও বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়নি। এখনও আশ্রয় শিবিরগুলিতে বহু উদ্বাস্তু স্থায়ী পুনর্বাসনের অপেক্ষায় রয়েছেন। এখনও বহু উদ্বাস্তু যুবক কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বৎসরের পর বৎসর বেকার হয়ে রয়েছেন। উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে কোন পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পোদ্যোগ গড়ে না ওঠাতেই আর্থিক পনর্বাসন সম্ভব হচ্ছে না।

আশ্রয় শিবিরে স্থান নিয়ে যারা শেষ পর্যন্ত পুনর্বাসন লাভ করতে পারেন নি তাদের জন্য এখনও কয়েকটি আশ্রয় আশ্রয় কেন্দ্র বা ক্যাম্প চালু আছে। এদের মধ্যে ৩টি শুধু মহিলাদের জন্য। বর্তমানে নদীয়া জেলায় যে উদ্বাস্তু আশ্রয় কেন্দ্রগুলি আছে সেগুলি হল:

(১) ধুবুলিয়া আশ্রয় কেন্দ্র
(২) চামতা মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র
(৩) কুপার্স আশ্রয় কেন্দ্র
(৪) রাণাঘাট মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র
(৫) রূপশ্রী পল্লী মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র
(৬) রূপশ্রী পল্লী আশ্রয় কেন্দ্র
(৭) চাঁদমারী আশ্রয় কেন্দ্র

এ জেলায় সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির সংখ্যা মোট ৪৪টি, তার মধ্যে সদর মহকুমায় অবস্থিত ১৮টি ও রাণাঘাট মহকুমায় অবস্থিত ২৬টি। এই উপনিবেশগুলির নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কৃষ্ণনগরে জেলা ত্রাণ ও পনর্বাসন অফিস ও রাণাঘাটে মহকুমা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস

আছে। ধুবুলিয়া ও কুপার্স আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রশাসক ও অন্য আশ্রয় কেন্দ্রগুলির জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আছেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পরে পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে ১২ লক্ষ শরণার্থী নদীয়া জেলার প্রায় ৫০টি বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। এদের আশ্রয়, আহার্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধার যথাসম্ভব ব্যবস্থা স্থানীয় জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে করা হয়। এই ক্ষুদ্র জেলার অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের ওপর আকস্মিক এত অধিক সংখ্যক শরণার্থী আসায় এক প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এই শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে সুরু করেন এবং মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের সকলের প্রত্যাগমন শেষ হয়।

পরিশিষ্ট ১

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত উদ্বাস্তু উপনিবেশ

সদর মহকুমা

১। কৃষ্ণনগর শ্রীদুর্গাকলোনী (চাঁদ সড়ক)
২। কালীনগর
৩। ধুবুলিয়া
৪। আমঘাটা ১নং
৫। আমঘাটা ২নং
৬। বেলপুকুর-পলতা
৭। কামারহাটি-লোহাগাছি
৮। চরমাজদিয়া
৯। বেথুয়াডহরী
১০। জয়ঘাটা
১১। খুঁটিয়া
১২। আসল্লানগর
১৩। মোবারকপুর
১৪। রহমৎপুর
১৫। কাঁঠালিয়া
১৬। হরেকৃষ্ণপুর
১৭। রসিকপুর-গন্ধরাজপুর
১৮। চকহাতীশালা

রানাঘাট মহকুমা

১। গোবিন্দপুর
২। বগুলা-মুড়াগাছা
৩। নাসরা
৪। বড় বেড়িয়া
৫। পাঁচবেড়িয়া
৬। তাহেরপুর
৭। রাণাঘাট রথতলা
৮। কুপার্স
৯। হামিদপুর
১০। খোশবাস মহল্লা
১১। গয়েশপুর
১২। কাঁটাগঞ্জ ১নং ও ২নং
১৩। কাঁটাগঞ্জ ৩নং
১৪। কাঁটাগঞ্জ ৪নং
১৫। কাঁটাগঞ্জ ৫নং
১৬। গোকুলপুর
১৭। চাকুডাঙ্গা
১৮। লিচুতলা
১৯। সগুনা
২০। জাগুলি
২১। কপিলেশ্বরপুর
২২। নৃসিংহপুর
২৩। গোবিন্দপুর ১নং ও ২নং
২৪। গোবিন্দপুর ৪নং
২৫। মাঝের চর
২৬। কুপার্স (এগ্রিঃ)

স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসন ইংরাজদের রাজত্বকালে এদেশে চালু হয় বটে, কিন্তু এ প্রথাটি প্রাচীন। প্রাচীন প্রথা বাদ দিয়ে, ইংরাজদের সুবিধা মত নতুনভাবে নতুন নামে এদেশে স্বায়ত্তশাসন তারা চালু করে। অন্যান্য জেলার সঙ্গে নদীয়াতেও এই স্বায়ত্তশাসন প্রথা চালু হয় under the Act III (B. C.) of 1885। স্বায়ত্তশাসন প্রথার মধ্যে জেলায় প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল জেলা বোর্ড। তার অধীনে লোকাল বোর্ড। সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন বোর্ড। নদীয়া জেলাতেও এই প্রথানুযায়ী স্বায়ত্তশাসন রূপ নেয়। তখন অবিভক্ত নদীয়ায় পাঁচটি মহকুমা—কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্ঠিয়া আর মেহেরপুর। প্রতিটি মহকুমায় লোকাল বোর্ডগুলির প্রথম নির্বাচন হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং সারা বাংলাদেশে নদীয়াতেই নির্বাচন প্রথম। প্রতিটি লোকাল বোর্ড থেকে দুজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে ১০ জন আর সরকার কর্তৃক মনোনীত ১০ জন মোট ২০ জন সভ্য নিয়ে জেলাবোর্ড গঠিত। জেলাশাসক জে, এ, হপকিন্‌স এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। প্রতিটি লোকাল বোর্ডের ৩১ জন সভ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে সভ্য নির্বাচিত হতেন: জমিদার—১৬, উকিল—৯, ব্যবসাদার—৩ এবং অন্যান্য—৩। নদীয়া জেলাবোর্ড গঠন হওয়ার পর ১৯০৪-০৫ সালে জেলাবোর্ডের বাৎসরিক আয় ছিল ১,৫৫,৩৫০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১,০৪,-৯১০ টাকা। ১৯০৭-০৮ সালে নদীয়া জেলাবোর্ডের অধীন ১০৭ মাইল পাকা রাস্তা, ৭১৬ মাইল কাঁচা রাস্তা আর গ্রাম্য রাস্তা ছিল ৫২৬ মাইল। অন্যান্যর মধ্যে ছিল ২৫০ পশুব বা খোঁয়াড়, তিনটি মিডল স্কুল, ৪৫টি এডেডসহ ৯৭টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৬৪৩ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়। ২টি সহ ৯টি এডেড ডাক্তারখানা ছিল। তখনকার দিনে লোকাল বোর্ডে কতজন সদস্য কিভাবে আসতেন তার নমুনা পাশের কলমে দেওয়া হলো। দ্রষ্টব্য: Bengal District Gazetteers, Nadia (1910) by J. H. E. Garrett.

	লোকাল বোর্ডের নাম	মোট সদস্য	নির্বাচিত	মনোনীত	পদাধিকার বলে
১।	কৃষ্ণনগর লোকাল বোর্ড	১২	২	১০	×
২।	রাণাঘাট ,,	৯	৬	৩	×
৩।	চয়াডাঙ্গা ,,	৯	৬	৩	×
৪।	মেহেরপুর ,,	৯	৬	২	১
৫।	কুষ্টিয়া ,,	৯	৪	৫	×

চারটি ইউনিয়ন কমিটি ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। লোকাল বোর্ডের কাজ হচ্ছে নিজের এলাকায় রাস্তাঘাট মেরামত, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা করা। তারপর হয় ইউনিয়ন বোর্ড:

জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের পর এর মাধ্যমেই জেলা, গ্রাম প্রভৃতি এলাকায় রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খোঁয়ার, ফেরী প্রভৃতির কাজ হতো। তখন কত আয় এবং কি কাজ হত সংক্ষেপে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

এরপর আসে পৌরসভার কথা, তখন অখণ্ড নদীয়ায় মোট ৯টি পৌরসভা ছিল—কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, নবদ্বীপ, কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি, মেহেরপুর, বীরনগর ও চাকদহ। ১৯০৭-০৮ সালে মোট করদাতার সংখ্যা ছিল ২৬,৩৪০ জন। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর খণ্ডিত নদীয়ায় ৬টি পৌরসভা বর্তমান। কোন্ পৌরসভা কোন্ সালে স্থাপিত হয়েছে, এবং তখনকার দিনে সভ্যসংখ্যা, পৌরসীমা প্রভৃতি নিম্নে বিস্তারিত জানানো হলো। Bengal District Gazetteers, Nadia (1910) by J. H. E. Garrett দ্রষ্টব্য।

পৌরসভা ও করদাতার সংখ্যা	কোন সালে স্থাপিত	মোট সভ্যসংখ্যা (কমিশনার)	নির্বাচিত	মনোনীত	পদাধিকার বলে	সীমানা
(১) কৃষ্ণনগর (৬২২৬)	১৮৬৪ খ্রী:	২১	১৪	৩	৪	৭ বর্গমাইল
(২) শান্তিপুর (৭৮২৪)	১৮৬৫ খ্রী:	২৪	১৬	৮	মহকুমা শাসক সভাপতি	৭ বর্গমাইল
(৩) রাণাঘাট (৭৮২৪)	১৮৬৪ খ্রী:	১৪	×	৯	৫	২½ ,,
(৪) নবদ্বীপ (৩৯৩১)	১৮৬৯ খ্রী:	১২	৮	৪	×	৩½ ,,
(৫) বীরনগর (৭৯০)	১৮৬৯ খ্রী:	১২	৮	৪	×	২ ,,
(৬) চাকদহ (১৩৪০)	১৮৮৬ খ্রী:	১২	×	১২	×	৫ ,,

প্রথমেই নদীয়া জেলা বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা বলা যাক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে নদীয়া জেলাবোর্ড স্থাপিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে রোডসেস কমিটি নামে পরিচালিত হত। তখন এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সরকার পরিচালনাধীন ছিল এবং পরিচালনার ভার নদীয়ার কালেকটারের ওপর ন্যস্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই কমিটি তুলে দিয়ে সরকার জেলাবোর্ড স্থাপন করেন। কিন্তু পরিচালক বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থাকত নদীয়ার জেলাশাসক ও কালেকটরের ওপর। এই ব্যবস্থা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জেলা-

শাসকের পরিবর্তে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে জেলাবোর্ডের পরিচালনা সুরু হয়। তদানীন্তন মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ১৯২০ হতে ১৯২৪ খ্রী: পর্যন্ত তিনি জেলাবোর্ডের কাজ পরিচালনা করেন। তখন এই জেলাবোর্ডের সদস্যসংখ্যা ৩০ জন ছিল। তারমধ্যে ২০ জন আসতেন নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ১০ জনকে সরকার মনোনয়ন দিতেন। এই ব্যবস্থা ১৯৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কার্যপরিচালনা করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন রাণাঘাটের খ্যাতনামা ব্যাহারজীবী রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সময়েই মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় নবদ্বীপ প্রভৃতি বিশিষ্ট খেয়াঘাটগুলির পরিচালনার ভার জেলা বোর্ডের হাতে আসে। যার ফলে জেলাবোর্ডের আয় বৃদ্ধি পায়। তাঁর সময়ে নদীয়া জেলাবোর্ডের অধীন ৩৭টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ও ২৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। এই সময়েই কলকাতায় লেডি ডাফরিন হাসপাতালে দশ হাজার টাকা দিয়ে দুটী (ফ্রি-বেড) শয্যা স্থাপিত হয়। তাছাড়া এ সময়ে নদীয়া জেলায় বহু নলকূপ, ইঁদারা, অনেকগুলি পাকা রাস্তা নির্মিত হয়। হরিণঘাটা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত ১৫ মাইল রাস্তা এ সময়েই পাকা হয়। চুয়াডাঙ্গা মহকুমার নবগঙ্গা ও বিজয়কাট নামে দুটি খালও খনন করা হয়। বর্তমান জেলাবোর্ডের অফিস গৃহটি পূর্বে কেরীসাহেবের কুঠি বলে পরিচিত ছিল। জমিদারী সেরেস্তায় খাজনা প্রভৃতির চেকমুড়ি দেখলে এখনও ঐ নাম পাওয়া যাবে। পরে জেলাবোর্ডের অফিস হয় ১৯০৫ সালে। এই সময়টিকে নদীয়া জেলাবোর্ডের 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত খানবাহাদুর মৌলভী সামসুজ্জোহা নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান থাকেন। ১৯৪৭-এর অক্টোবর থেকে ১৯৫৭-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ ভাগ হওয়ার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে নবদ্বীপ জেলাবোর্ড নাম হয়। পরে ৩১।১২।৫১ তারিখে ১৫ জন সদস্য নিয়ে নদীয়া জেলাবোর্ড গঠিত হয়। এই সময় জেলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় জেলাবোর্ডকে দারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য আনিয়ে জেলাবোর্ডের কাজই কেবল চালান না, অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। রাস্তা, ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, নলকূপ প্রভৃতি নির্মাণ করে জেলাবাসীর ও পল্লীবাসীর প্রভূত উপকার করেন। জেলাবোর্ডের গচ্ছিত তহবিল থেকে একলক্ষ টাকা দান করে বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজী স্থাপন করেন (১৯৫৬ সালের জুন মাসে)। বর্তমান খণ্ডিত নদীয়ায় যা কিছু উন্নতি দেখা যায় তার সব কিছুরই সুরু তাঁর সময় থেকে। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত 'স্বর্ণযুগ' হলে ১৯৪৭-এর শেষভাগ থেকে ১৯৫৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেলাবোর্ডের 'হীরকযুগ' বলা যেতে পারে। ১৯৫৭ খ্রী: ৩রা মে থেকে ১৯৫৯ খ্রী: ২রা মে পর্যন্ত নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ব্যবহারজীবী শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য। তিনি সরকারের মনোনীত চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৯ সালের ৩রা জুন থেকে সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় ১৯৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে বহু জনহিতকর কাজ করেন। তাঁর সময়েই 'নদীয়া' নামে জেলাবোর্ডের একটি সাপ্তাহিক পত্র ১৯৬১ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে প্রকাশিত হয়, পরে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'নদীয়া মুকুর' হয়। ১৯৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর জেলাবোর্ডের অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুন আইনে নতুন নামকরণ হয় জেলাপরিষদ। জেলাপরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান হন ডা: বিশ্বরঞ্জন রায়। ১৯৬৫ সাল থেকে জেলাপরিষদের ওপর আবার সরকারী তত্ত্বাবধান সুরু হয়। ৬ই মে ১৯৬৫ সাল থেকে জেলাপরিষদের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য একজন একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। তারপর ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৯ সাল থেকে পরিষদের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বর্তমানে ঐভাবে কাজ চলছে। জেলাপরিষদের অধীনে যে ১৬টি আঞ্চলিক পরিষদ ছিল তার কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে। বর্তমান জেলাপরিষদের অধীনে আছে:

পাকারাস্তা	৫১.০৯ কি:মি:	
কাঁচারাস্তা	১৩৮৬.৬৯ কি:মি:	
সাঁকো ও কালভার্ট পাকা		৫০০টি
কাঠের		৫টি
দাতব্য চিকিৎসালয়		৯টি
ডাকবাংলো		১১টি
ফেরী		২১টি

জলকর (পুকুর ১৪, অন্যান্য ৩১) মোট ৪৫টি।

নলকূপ ২৫টি, ইন্দারা ৯৯০টি, মোট ১০১৫টি। জেলাবোর্ডের অধীন জেলায় ছোট বড় ৬৪টি মেলা চলে। এ ছাড়াও সরকারের অধীন এবং পৌরএলাকার পৌরসভার অধীন মেলা আছে।

জেলাপরিষদের পর আঞ্চলিক পরিষদ। তারপর অঞ্চলপঞ্চায়েত ১৪৬টি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ১০৪৬টি। গ্রামের সংখ্যা ১৮৯২। জেলায় তিনটি ইউনিয়ন বোর্ড এখনও আছে, যেমন ভীমপুর (কৃষ্ণনগর-২), তাতলা (চাকদহ), নাটনা (তেহট্ট)। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ৬৮টি অঞ্চলপঞ্চায়েতের নিজস্ব গৃহ আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য ছোট ছোট এলাকা নিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রামপঞ্চায়েতের পর অঞ্চলপঞ্চায়েত। গ্রামপঞ্চায়েত ও অঞ্চল-

পঞ্চায়েতের সভ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। প্রতি গ্রামপঞ্চায়েতে একজন গ্রামাধ্যক্ষ এবং অঞ্চলপঞ্চায়েতে অঞ্চল-প্রধান পরিচালনা করেন। গ্রাম ও অঞ্চলের রাস্তাঘাট, পানীয় জল প্রভৃতির ব্যবস্থা নিজ নিজ এলাকায় গ্রামপঞ্চায়েত ও অঞ্চলপঞ্চায়েত করে থাকেন। বর্তমানে নদীয়ার ৬টি পৌর-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হলো।

শান্তিপুর পৌরসভা

১৮৫০ সালের বঙ্গীয় ২৬ আইন মতে এই পৌরসভা গঠিত হয় ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে। তদানীন্তন আণ্ডার সেক্রেটারী গর্ডন ইয়ং মহাশয়ের আদেশানুসারে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীশিবচন্দ্র পাল ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভ প্রামাণিক এই তিনজনকে নিয়ে বোর্ড অফ কমিশনার গঠিত হয় এবং ১লা অক্টোবব ১৮৫৩ প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল প্রথম চেয়ারম্যান হন। শান্তিপুর পৌবসভা প্রায় ১২০ বছরের প্রাচীন। এই পৌরসভার পুরাতন কাগজপত্র দেখে এর কার্যকাল শুরুর বিববণ পাওয়া যায়। কিন্তু J. H. E. Garrett রচিত Bengal Dist. Gazetteers, Nadia (1910) তে দেখা যায় যে শান্তিপর পৌরসভা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এবং প্রথম চেয়ারম্যান এস, ডি, ও। বর্তমানে এই পৌবসভাব আয়ব্যয় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো। হোল্ডিংসংখ্যা—১৫,১২৩টি এবং ১৯৭১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৬১,২৮৯ জন। পাকা রাস্তা—৮৩'৮০ কি:মি:। পাকা ড্রেন—১০,৭০০ ফুট। এখনও জলকল পরিকল্পনাটি পৌরসভার অধীনে আসেনি। ১৬১টি নলকূপ দ্বাবা কাজ চলছে। এখানে বেশীর ভাগই খাটা পায়খানা।

এই পৌবসভা কর্তৃক পাঁচটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পবিচালিত হয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য বাৎসবিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। পৌর এলাকায় বিখ্যাত রাসমেলা প্রাচীন উৎসব, প্রায় একমাস মেলাটি থাকে। প্রায় লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়। সে সময় স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরববাহ প্রভৃতি সব কিছুর দায়িত্ব এই পৌরসভা নিয়ে থাকে। এছাড়াও শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর পুন্য জন্মতিথি মাঘী সপ্তমীতে বাবলাপাটে পালিত হয়। সে সময় সেখানে লোক সমাগম প্রচুর হয় ও মেলা বসে।

পৌরসভার আয়ব্যয়

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	৪,৬৬,১৮২'০১	৪,৬৪,৫৫০'৬৩
১৯৭০-৭১	৫,১১,৯০৩'২৮	৪,৭০,২৯৩'৯৬
১৯৭১-৭২	৫,৬৬,৮১১'৭২	৬,৫০,৫৭৫'৯২

বীরনগর পৌরসভা

১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল বীরনগর পৌরসভা প্রথম চালু হয়। বর্তমান হোল্ডিংসংখ্যা—৪,৫০০টি এবং লোকসংখ্যা ১০,৫৭৩ জন। পানীয় জলের ব্যবস্থা নলকূপ। খাটা পায়খানা নাই। স্যানিটারী, আধা-স্যানিটারী, কুয়া-পায়খানা। পাকা-রাস্তা—'৩৮'৬৮ কি:মি:, পাকা ড্রেন—৫০০ ফুট, কাঁচা ড্রেন—১'৬ কি:মি:।

বীরনগর শিবকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উলা সাধারণ পাঠাগার ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পৌবসভা Grant-in-aid দিয়ে থাকেন। এই পৌরসভা পরিচালিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে (উলা পাবলিক ডিস্পেন্সারী) এবং তৎ-সংলগ্ন ১২টি শয্যাবিশিষ্ট মাতৃসদন আছে। তাছাড়া একটি (পশু হাট ও 'ট' হাট) হাট এবং একটি দৈনিক বাজার এই পৌরসভা পরিচালনা করেন। এই পৌবসভার অধীন তিনটি এলাকায় প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাইচণ্ডী, বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষমর্দিনী পূজা উপলক্ষে মেলা হয় ও প্রচুর লোকসমাগম হয়। মেলাটি প্রাচীন।

পৌরসভার আয়ব্যয়

	আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	১,০১,১৮৫ টাকা	৯৬,৯৬৬ টাকা
১৯৭০-৭১	১,২৬,৯৫৪ ,,	১,০৬,৩৯৬ টাকা
১৯৭১-৭২	১,২৩,৮০৮ ,,	১,১৪,৯১৬ টাকা

রাণাঘাট পৌরসভা

স্বর্গীয় সুবেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশরেব চেষ্টায় ১৮৬৪ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর রাণাঘাট পৌরসভা সুরু হয়।

বর্তমান হোল্ডিংসংখ্যা ৬২৮৮টি এবং লোকসংখ্যা ৪৭,৭৯২ জন।

পাকারাস্তা—১১'৩ কি:মি:। কাঁচারাস্তা—১০'৩০ কি:মি:।

পাকা খোলা নর্দমা—৪০ কি:মি:। কাঁচানর্দমা—৬২ কি:মি:। জলের কল আছে, দৈনিক চাবলক্ষ গ্যালন পানীসজল সরবরাহ কবা হয়। এছাড়া নলকূপ আছে।

এই পৌরসভার নিজস্ব কোন স্কুল, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎ-সালয়, বাজার নেই। তবে ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১৮০ টাকা হিসাবে, ২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৭৫ টাকা হিসাবে, আরও দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৬০ টাকা হিসাবে এবং ৪টি গ্রন্থাগারকে মোট ৪৩০ টাকা বাৎসরিক এককালিন দান এই পৌরসভা কবে থাকেন। তাছাড়া স্থানীয় ২টি হাসপাতালকে বাৎসরিক ৫০০ টাকা দিয়ে থাকেন। উল্লেখযোগ্য কোন মেলা শহর এলাকায় হয় না।

পৌরসভার আয়ব্যয়

সাল	আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	৬,০৫,৪০৫ টাকা	৬,৩৪,২৩১ টাকা
১৯৭০-৭১	৬,৬৪,৮১৫ টাকা	৬,৭১,৮৪২ টাকা
১৯৭১-৭২	৭,২১,৩৯৩ টাকা	৭,২৭,৬৩১ টাকা।

চাকদহ পৌরসভা

১৮৮৬ খ্রী: চাকদা পৌরসভা সুরু হয় ১লা মে তারিখে।

প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ জন বেগলার। বর্তমান হোল্ডিং-সংখ্যা ৭,৫২৩টি এবং লোকসংখ্যা ৪৬,৬৪৫ জন (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)।

পাকারাস্তা—৬২'১৫ মাইল, পাকাড্রেন—১৫ মাইল।

পানীয় জলের ব্যবস্থা নলকুপ, যার সংখ্যা প্রায় ৪ শতাধিক। এই পৌরসভায় কোন খাটা পায়খানা নেই। অনুমতি দেওয়া হয় না।

পৌরসভার আয়ে ঝাড়ুদার দ্বারা রাস্তা ইত্যাদি ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার করা হয়। এই পৌরসভার অধীন ৬টি মেলা হয়।

পৌরসভার আয়ব্যয়

সাল	আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	২,৫৩,৪৮৯ টাকা	১,৯২,০৩৪ টাকা
১৯৭০-৭১	৩,৮৫,৫৩৫ ,,	৩,০৭,৪৯৫ ,,
১৯৭১-৭২	৪,৭২,৭২৯ ,,	৩,৯৯,৬৫৭ ,,

নবদ্বীপ পৌরসভা

নবদ্বীপ পৌরসভা প্রায় ১০৩ বৎসরের পুরাতন। ১৮৬৯ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল প্রথম স্থাপিত হয়। খাতাপত্রে দেখা যায় তদানীন্তন টাউন কমিটি (মিউনিসিপ্যাল কমিটি) তার প্রথম সভা করেন ১৮৬৯ খ্রীঃ ২৯শে এপ্রিল, প্রথম চেয়ারম্যান মিঃ টুইডাই। তখন নদীয়ার ইংরাজী বানান লেখা হত Nuddia বর্তমান হোল্ডিংসংখ্যা—১৩,৯৩০টি এবং লোকসংখ্যা ৯৪ হাজার (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)।

পাকারাস্তা	৫৩.৪৪	কিঃমিঃ
কাঁচারাস্তা	১১.১৩	,,
পাকাড্রেন	৩৪.২৪	,,
কাঁচাড্রেন	২.৪০	,,

পানীয় জল

৪টি গভীর নলকুপ থেকে পাম্পের সাহায্যে শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। দৈনিক ৩,৫০,০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া যেখানে কল নেই এমন স্থানে ৩০০ নলকুপ আছে। নবদ্বীপ শহরে ১টি হাসপাতাল, ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টি টি. বি. ক্লিনিক, ১টি মাতৃসদন, ১টি নার্সিংহোম, ৮টি হায়ার সেকাণ্ডারী স্কুল, ৪টি সেকেণ্ডারী স্কুল, ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২টি অন্যান্য প্রাইমারী স্কুল, ১৭টি টোল বা চতুষ্পাঠি, ১৮টি সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি, ৪টি অন্যান্য স্কুল, এর মধ্যে ৫টি শয্যাযুক্ত মাতৃসদনটি পৌরসভা পরিচালনা করে থাকেন।

পৌরসভার আয়ব্যয়

সাল	আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	৯,২৪,৩৬৭,০০ টাকা	৯,৩৮,৮২১-০০ টাকা
১৯৭০-৭১	৯,৬০,৪৭৫-০০ ,,	৯,২৮,১৪৭-০০ ,,

কৃষ্ণনগর পৌরসভা

১৮৬৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে কৃষ্ণনগর পৌরসভা সুরু হয়। প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন জেলাশাসক মিঃ ইং গ্রে। প্রথম কাজ সুরু হয় তদানীন্তন ভাইস চেয়ার-ম্যান এফ, জে, আর্ল এর একখানি ঘরে। কৃষ্ণনগর পৌরসভা কোনদিন ভুলতে পারবে না কনজারভেন্সি প্রতিষ্ঠাকল্পে র‍্যামজে সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টা, ভুলতে পারবে না গেইট সাহেবকে যিনি জলাঙ্গী নদীর হাত থেকে সহরকে বাঁচাবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাই নদীর ধারের রাস্তাটি আজও গেট রোড এবং রামজে রোড নামে আর একটি রাস্তা সাধারণ্যে পরিচিত হয়ে অতীতকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ১৮৮৫ সালে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর যদুনাথ রায় (২৮।১।৮৫)। কৃষ্ণনগরে জলকল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ সালে, তার আগে ইন্দারা স্থপিত হয়েছিল ১৮৭৯ সালে। তার আগে পুলিশপাহারা ঘেরা লালদীঘি ও ডাকবাংলার পুকুর থেকে পানীয়জল দেওয়া হত। ১৯৩৬ সালে কৃষ্ণনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সুরু হয়। যখন প্রথম জলকল হয় তখন কৃষ্ণনগরে লোকসংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল। ১৮৮০ সালে প্রথম ঘোড়ার গাড়ির প্রবর্তন হয়; এই শহরে, আজ তা একে-বারে লুপ্ত হয়েছে। সেইস্থানে অধিকার করেছে সাইকেল রিক্সা। বর্তমানে ১২০০ সাইকেল রিকসা শহরে চলছে (পৌরসভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত)। কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৮৬৮ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব (বাজেট) দেওয়া হল; ২৫শে মার্চ এই বাজেট পাশ হয়।

আয় ১৫,৯৫০ টাকা ব্যয় ১৩,৮৩৬ টাকা

পূর্বে জেলাশাসকের বাসভবনে পৌরসভার সভা হত। ১৮৬৪ সালে ১০ই ডিসেম্বর থেকে তিনমাসের জন্য স্থানীয় সারকিট হাউসে পৌরসভার কার্যালয় সাময়িক ভাবে হয়। ১৮৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী ২৫ টাকা বেতনের একজন করণিক, ৫ টাকা বেতনের দুজন পেয়াদা নিযুক্ত হয়। পরের বৎসর বৎসর ১৫ টাকা বেতনের আরও একজন করণিক ও একজন পেয়াদা নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭৬ সালে উপ-পৌরপতি ডি, বি, এ্যালেন অসুস্থতার জন্য ছুটি নিলে সর্বসম্মতিক্রমে পৌরসদস্য শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু সেপ্টেম্বর মাসের সভার উপ-পৌরপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম বাঙ্গালী উপ-পৌরপতি। ১৮৮৩ সালের পৌরসভাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পৌরবাসীরা এই বৎসরেই গণতান্ত্রিক অধিকার পান। পৌরসদস্যদের ⅔ অংশ সদস্য পৌরসভার করদাতা দ্বারা নির্বাচিত হন এবং সভাপতি মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচন হবে স্থির হয়। বর্তমান কৃষ্ণনগর পৌরএলাকার আয়তন ৬.১ বর্গ-মাইল। এলাকা ২৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। সদস্যসংখ্যা ২৯ জন। কর-দাতার সংখ্যা ১৩,০৮১ এবং লোকসংখ্যা ৮৬,৩৫৪ জন (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী।

পাকা রাস্তা ৮০.৭০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ৯৯.৫৫ কিঃমিঃ

কৃষ্ণনগর পৌরসভা পরিচালিত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ১৮৮০ সালে এই পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত সদর হাসপাতালটির ভার আজ সরকার সম্পূর্ণ নিয়েছেন। তখন ১৫০ টাকা বেতনে প্রথম ডাক্তার হয়ে আসেন মিস্টার বেন্‌সলে।

বর্তমানে পানীয় জল পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। রথতলা, ডাকবাংলো ও নাজিরাপাড়ায় পাম্পিং স্টেশনে গভীর নলকূপ থেকে জল তোলা হয়। প্রধান ও পুরাতন মেন-স্টেশনটি ঘূর্ণীতে অবস্থিত। এই স্টেশনটি নদী থেকে জল নিয়ে সরবরাহ করে।

পৌরসভার আয়ব্যয় ঃ

সাল	আয়	ব্যয়
১৯৬৯-৭০	১২,৯৪,১২৬,৩৬	১২,৪৮,৯৬১.৭৫
১৯৭০-৭১	১৩,৭৯,৮৬২.০০	১৪,১৫,৩৭৯.২১
১৯৭১-৭২	১৬,৬৯,৭১২.২৮	১৫,১২,০৩২.৯৬

কৃষ্ণনগর সহরে খাটা-পায়খানার সংখ্যাই বেশী। তবে নতুন নতুন যে সব বাড়ী হচ্ছে তাতে খাটা পায়খানা হচ্ছে না। স্যানিটারী পায়খানা হচ্ছে।

কল্যাণী পৌরসভা :

নদীয়ার শেষ প্রান্তে বনজঙ্গল কেটে গড়ে উঠেছে কল্যাণী উপনগরী। নকসা করে রাস্তা, আলো, জলের ব্যবস্থা করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে উপনগরী। পৌরসভা এখানে নেই বটে, কিন্তু নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে কাজ এগিয়ে চলছে। গত ১৯৬৫ সালের ১৫ই নভেম্বর এই নোটিফায়েড এলাকায় কাজ সুরু হয়। প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীডি, সি, সেন।

বর্তমানে হোল্ডিংসংখ্যা ৮৭৫টি এবং লোকসংখ্যা ১৮৩৩৩ জন (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)। শান্ত, সুন্দর ছবির মত এই উপনগরীতে একদিকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর একদিকে হাসপাতাল, আর একদিকে কল-কারখানা নির্মিত হয়ে কেবল নদীয়া জেলার নয় সারা পশ্চিম-বাংলার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে কল্যাণী। পান্নালাল ইনস্টিটিশন, বিধানচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল, কিছু প্রাথমিক ও কে, জি, স্কুল ছাড়াও এখানেকার বিশ্ববিদ্যালয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে পৌরএলাকায় দুটি হাসপাতাল (জে, এন, এম এবং ই, এস, আই) আছে। সরকারী বাজার একটি ও অনুমোদিত বাজার দুটি আছে। কল্যাণীতে পাকা রাস্তা ১১৭½ মাইল, ১০৪ মাইল ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী। কয়েকটি জলাধারে জল পাম্প করে তুলে সারা নোটিফায়েড এরিয়াতে পানীয় জলকলের পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করা হয়। মল অপসারণের ব্যবস্থাও ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালীর দ্বারাই হয়ে থাকে। এখানকার বিখ্যাত সতীমায়ের মেলা প্রাচীন। আজও বহুদূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত সতীমায়ের স্থানে ডালিমতলার মাটি আর হিম-সাগরের জল নিতে আসে তাদের ব্যাধি নিরাময়ের পূর্ণবিশ্বাস নিয়ে ও মনস্কামনা পূরণের আশায়।

গত তিন বৎসরের আয়ব্যয় সরকারী অনুদানসহ

	সরকারী অনুদান	মোট আয়	মোটব্যয়
১৯৬৯-৭০	৫,৭৭,৩৪৩.০০	১২,৬৫,৪৯১.৮৫	৮,৬৩,৮৮১,২১
১৯৭০-৭১	৭,৬৮,০৭৫.৮৮	১৭,৩৬,৪৩০.৯৭	১০,৪১,৫০১.০১
১৯৭১-৭২	১১,৫৮,৭৪৮.৪৯	১৭,৪০,০০১.১৪	১৮,৫৭,২৮১.০০

———————

নদীয়া জেলার ১৬টি ব্লকের অধীন গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের পরিচয়

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	অঞ্চল পঞ্চায়েতের সংখ্যা	নিজস্ব গৃহ	অঞ্চল পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য কাজ	ইউনিয়ন বোর্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কৃষ্ণনগর ১নং	৬৫	১১	৮টি আছে। চকদিগনগর, দেপাড়া, ভাণ্ডার খোলা, জোয়ানীয়া অঞ্চলপঞ্চায়েত গৃহ সম্প্রতি তৈরী হয়েছে।	আসাননগর অঞ্চলপঞ্চায়েত নিজস্ব এলাকায় ৪টি গ্রাম সভার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছেন। চকদিগনগর অঞ্চলপঞ্চায়েত ধর্মদহ থেকে বাদকুল্লার রাস্তায় আট হাজার টাকা ব্যয় করে একটি কালভার্ট করেছেন।	ভীমপুরে এখনও অঞ্চলপঞ্চায়েত হয়নি। ইউনিয়ন বোর্ড আছে।
২	কৃষ্ণনগর ২নং	৪৫	৪	বেলপুকুরে ১টি আছে।	—	—
৩	রাণাঘাট ১নং	৫৩	৯	আনুলিয়াতে ১টি আছে।	গত খরা পরিস্থিতিতে অঞ্চলপঞ্চায়েতগুলি ৫৩টি নলকূপ পানীয় জলের জন্য মেরামত করেছেন ও নূতন বসিয়েছেন।	—
৪	চাপড়া	৮১	১১	৪টি আছে। ১৯৬৮ সালে ৩টি ও ১৯৭২ সালে ১টি হয়েছে।	নতুন নলকূপ স্থাপন ও পুরাতন নলকূপ সংস্কার, রাস্তা ও কালভার্ট তৈরী ও মেরামত।	—
৫	নাকাশীপাড়া	৯৫	১৩	২টি আছে। ধর্মদা ও মাঝেরগ্রাম	গ্রাম উন্নয়ন, সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন, কিছু রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা।	—
৬	নবদ্বীপ	৩৯	৭	বাবলারীতে ১টি আছে।	—	—
৭	হরিণঘাটা	৬০	৬	২টি আছে। বিরহী ১৯৫৯ ও কাষ্ঠডাঙ্গা ১৯৬৯ সালে পঞ্চায়েতের নিজস্ব গৃহ হয়েছে।	গ্রাম উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি।	—
৮	তেহট্ট ১নং	৫৮	৮	৩টি আছে। চাঁদেরঘাট ১৯৬৬ এপ্রিল পাথরঘাটা ১৯৭২ এপ্রিল শ্যামনগর ১৯৬৫ মে মাসে হয়েছে	চাঁদেরঘাট অঞ্চলপঞ্চায়েত ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করে। পাথরঘাটা অঞ্চল একটি কুয়া, তেহট্ট অঞ্চল ১টি রাস্তা, ছিটকা অঞ্চল ১টি কালভার্ট এবং বেতাই অঞ্চল ১টি পুকুর ও ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করেছে।	নাটনায় এখনও অঞ্চল পঞ্চায়েত হয়নি। ইউনিয়ন বোর্ড আছে।

৯	শান্তিপুর	৪০	৮	২টি আছে। নবলা ও বেল গড়িয়া। ১৯৬৯ সালে হয়েছে।	গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার, নলকূপ স্থাপন, ইন্দারা সংস্কাব, প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ সংস্কার। ফুলিয়া উপনগরীর রাস্তা তৈয়ারী ফুলিয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত করেছে।	—
১০	কালিগঞ্জ	৮৮	১৩	৮টি আছে। দেবগ্রাম ১৯৬৪, গোববা ১৯৭১, জুড়ানপুব ১৯৬৯ পানিঘাটা ১৯৬৭, মীবা ১৯৭০ কালীগঞ্জ ১৯৬৯, বড়চাঁদ ঘব—১৯৬৮, পলাশীতে নির্মাণ হচ্ছে।	গ্রাম্য রাস্তা সংস্কারাদি ছাড়াও কালীগঞ্জ ব্লকের অফিসেব জন্য ১০ বিঘা জমি দান, যার আনুমানিক মূল্য ৩০০০ টাকা। দেব-গ্রাম অঞ্চলের রাস্তায় বৈদ্যুতিকীকরণ।	—
১১	হাঁসখালি	৬০	৮	৭টি আছে। দক্ষিণপাড়া ১৯৭০, ময়ূরহাট ১৯৬৪, বেতনা গোবিন্দ-পুর ১৯৭০, মামজোয়ান—১৯৬৬, বগুলা ১৯৬২, রামনগর বড় চুপড়িয়া ১৯৬২, গাজনা ১৯৬৪ বাদকুল্লায় এখনও হয় নাই।	বাদকুল্লা অঞ্চলপঞ্চায়েত বাদকুল্লার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা কবেছে।	—
১২	তেহট্ট ২নং	৪২	৬	৪টি আছে। পলাশীপাড়া ১৯৬৯, হাঁসপুকুরিয়া ১৯৬৮, বাণিয়া ১৯৭০, পলসুণ্ডা—১৯৭১।	—	—
১৩	বাণাঘাট ২নং	৭৮	১১	৫টি আছে। কামালপুর। যুগোল-কিশোব অঞ্চল ১৯৬৯, আড়ং-ঘাটা ১৯৭০, আঁইসমালি ১৯৬৯ রঘুনাথপুর—১৯৬৯।	গ্রাম্য রাস্তা, নলকূপ প্রভৃতি সংস্কাব ও নূতন স্থাপন। কৃষি, মৎস্য চাষ উন্নয়ন, রিলিফ বন্টন। বাংলাদেশ শবণার্থী সহায়তা, দত্তফুলিয়া অঞ্চলে ববাণবেড়িয়া গ্রামে ৩০০ একরের যৌথ কৃষি খামাব।	
১৪	কবিমপব	১০০	৩	১০টি আছে। করিমপুব, নতি-ডাঙ্গা, ধোঁড়াদহ, জামশেবপুর, হরে কৃষ্ণপুব, মধুগাড়ী, শিকাবপুব, মুরুটিয়া, রহমৎপুর, নন্দনপুব।	রাস্তা উন্নয়ন প্রভৃতি কবিমপুবে রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছে।	—
১৫	কৃষ্ণগঞ্জ	৪১	৭	৬টি আছে। শিবনিবাস, কৃষ্ণগঞ্জ, জয়ঘাটা, গোবিন্দপুর, মাটিয়ারী, বানপুর, তালদহ-মাজদিয়া।	তালদহ-মাজদিয়া অঞ্চলে মথুরাপুব খালেব উপর একটি পুল নির্মাণ।	—
১৬	চাকদহ	৭৫	১১	৪টি আছে। ঘেটুগাছি, দেউলি, দুবাড়া, রাউতাড়ী অঞ্চলপঞ্চায়েত	—	এখনও তাতলাতে ইউ-নিয়ন বোর্ড আছে। অঞ্চল পঞ্চায়েত হয়নি।

জেলা প্রশাসন

ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পর ১৭৬৫ সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলার দেওয়ানী দেওয়া হয়। ১৭৭২ সাল থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময় প্রধান রাজস্ব অফিস মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা স্থানান্তরিত হয় এবং জেলাগুলিতে একজন করে ইউরোপীয়ান কালেক্টর নিযুক্ত হন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত হন একজন করে দেশীয় দেওয়ান। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের এই দ্বৈতব্যবস্থায় কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিলে ১৭৭৪ সালে ইউরোপীয়ান কালেক্টরদের সরিয়ে এনে তাদের স্থলে এদেশীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। এদের নাম ছিল 'আমিল'। এদের কাজকর্ম পরিদর্শন করার জন্য ছয়টি প্রাদেশিক পরিষদ তৈরী করা হয়। ১৭৮১ সালে এই পরিষদগুলিকে তুলে দিয়ে 'কমিটি অব রেভেনিউ' (যা পরে 'বোর্ড অব রেভেনিউ'তে পরিবর্তিত হয়) গঠিত হয় এবং ইওরোপীয়ান কালেক্টরদের আবার জেলাগুলিতে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়ে পাঠান হয়। তখনকার জেলা এখনকার মত ছিল না। শুধু রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ৩৬টি ভাগে সারা বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে তৎকালীন বোর্ড অব রেভেনিউ বা রাজস্ব পর্ষদের প্রেসিডেন্ট সরকারের কাছে ৩৬টি রাজস্ব বিভাগ তুলে দিয়ে ২৩টি জেলা তৈরী করে এক একজন কালেক্টরের অধীনে দেবার প্রস্তাব করেন। ১৭৮৭ সালের ২১শে মে এই প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে মিঃ এফ, রেডফার্ণ নদীয়ার প্রথম কালেক্টর এবং মিঃ জি, চেরী তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই ক্রমে ক্রমে শুধু রাজস্ব আদায়ের কাজ ছাড়াও প্রশাসনের দায়িত্বও সরকারীভাবে কালেক্টরদের ওপর এসে পড়ে।

১৮৫৪ সাল পর্যন্ত নদীয়া যশোহর বিভাগের অধীন ছিল, কিন্তু ঐ বছরে ডিভিশনাল কমিশনারদের এলাকার পুনর্বিন্যাস করে 'নদীয়া ডিভিশন' নামে একটি নতুন ডিভিশন তৈরী করা হয় এবং কৃষ্ণনগরে হয় এর সদর দপ্তর। কিন্তু এই সময় বিভাগীয় কমিশনার সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়ার ভয়ে কৃষ্ণনগরে না থেকে আলীপুরে থাকতেন। তিনি চেষ্টা করেন বিভাগীয় সদর কৃষ্ণনগর থেকে আলীপুর নিয়ে যেতে। তখন তাঁর চেষ্টা সফল না হলেও ১৮৬০ সালে নদীয়া বিভাগের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলা রাজসাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলে সরকার কৃষ্ণনগর থেকে নদীয়া বিভাগের সদর দপ্তর আলীপুরে নিয়ে যান এবং তখন এই বিভাগের নামকরণ করা হয় প্রেসিডেন্সী বিভাগ। নদীয়া জেলা সেই থেকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অধীনে।

শাসন বিভাগ

জেলাশাসক ও সমাহর্তা (District Magistrate and Collector জেলার শাসন ব্যবস্থার প্রধান। স্বাধীনতার পূর্বে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ই জেলাশাসক ও সমাহর্তার মুখ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে সরকার নানাবিধ উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করায় জেলাশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন অনেক ব্যাপক হয়েছে। উন্নয়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় জেলা শাসকের ভূমিকা এখন গুরুত্বপূর্ণ।

জেলাশাসক হিসেবে জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর ওপরে ন্যস্ত—জেলার পুলিশ সুপারের সহায়তায় তিনি এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রাজস্বআদায় ছাড়াও ভূমিসংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা জেলা সমাহর্তা হিসেবে তাঁর কর্তব্য। এই কাজে এ জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক তাঁকে সাহায্য করেন। আর একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণ প্রশাসনসহ অন্য বিষয়গুলিতে জেলাশাসককে সহায়তা করেন। এ জেলায় অতিরিক্ত জেলাশাসকের পদ দুটি স্বাধীনতার পরেই সৃষ্টি হয়েছে।

জেলায় বিভিন্ন বিভাগীয় কাজের সঙ্গেও জেলাশাসককে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হয় এবং তিনিই হলেন জেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরগুলির মধ্যে প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার। জেলায় তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আবগারী দপ্তর, তপশীলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর, তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, উন্নয়ন দপ্তর, পরিবহন দপ্তর প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এই দপ্তরগুলির প্রত্যেকটির জেলাপর্যায়ের অফিসার নদীয়ায় আছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা, নির্বাচন, আদমসুমারী ইত্যাদি পরিচালনা করা, পাশপোর্ট ও বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান করা প্রভৃতি কাজ জেলাশাসকের দায়িত্ব।

১৯৭১ সালের ২৫শে জুনের পূর্বপর্যন্ত নদীয়ায় ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা জেলাশাসকের অধীনে ছিল। ঐ তারিখ থেকে ফৌজদারী বিচার জেলাজজ তথা হাইকোর্টের অধীনে গিয়েছে। তবু ফৌজদারী আইনের কয়েকটি ধারা বলে প্রশাসনিক আদেশ জারীর ক্ষমতা জেলাশাসক ও মহকুমা-শাসকদের রয়েছে।

সাধারণ প্রশাসনের দিক দিয়ে নদীয়া জেলা এখন দুটি মহকুমায় বিভক্ত—সদর ও রাণাঘাট। অবিভক্ত নদীয়ায় এদুটি ছাড়াও চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্ঠিয়া মোট পাঁচটি মহকুমা ছিল।

৮টি থানাবিশিষ্ট নদীয়া সদর মহকুমা আয়তনে খুব বড় বলে সদর (দক্ষিণ) ও সদর (উত্তর) এই দু'ভাগে বিভক্ত করে প্রশাসনিক দিক থেকে দু'জন মহকুমা শাসকের অধীনে রাখা হয়েছে। উভয়েরই সদর দপ্তর কৃষ্ণনগর।

সদর (দক্ষিণ) মহকুমার এলাকাভুক্ত থানাগুলি হল: (১) কোতয়ালী, (২) নবদ্বীপ, (৩) চাপড়া, (৪) কৃষ্ণগঞ্জ।

সদর (উত্তর) মহকুমার এলাকাভুক্ত থানাগুলি হল: (১) নাকাশীপাড়া, (২) কালীগঞ্জ, (৩) তেহট্ট, (৪) করিমপুর।

রাণাঘাট মহকুমার এলাকাভুক্ত থানাগুলি হল: (১) রাণাঘাট, (২) চাকদহ, (৩) কল্যাণী, (৪) হরিণঘাটা, (৫) শান্তিপুর, (৬) হাঁসখালি।

জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে জেলার উন্নয়নকর্ম ১৬টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও বিভিন্ন বিভাগীয় সম্প্রসারণ আধিকারিকদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। উন্নয়ন-কর্মসূচী ছাড়াও ব্লক-উন্নয়ন আধিকারিকরা জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের নির্দেশমত ত্রাণ ও অন্যান্য কাজ করে থাকেন। প্রতিটি ব্লকে ব্লক-উন্নয়ন আধিকারিক (বি, ডি, ও,) ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক, শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক, সমবায় পরিদর্শক, পশুচিকিৎসা আধিকারিক আছেন। এঁরা নিজ নিজ বিভাগীয় কাজ ব্লক-উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বাধীনে করে থাকেন।

বর্তমানে জেলার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আই, এ, এস, ক্যাডার-ভুক্ত জেলাশাসক ও দু'জন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্যাডারভুক্ত তিনজন মহকুমাশাসক ছাড়া মোট ৯ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৭ জন সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন জেলা সদরে এবং ৫ জন রাণাঘাটে নিযুক্ত।

নদীয়া জেলায় মোট ৪৪,৯২৮·৬৯ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২০,৪৪৫ একর কৃষিজমি। ভূমিহীন কৃষকদের জমি বিলির কাজ চলছে। নভেম্বর '৭২ পর্যন্ত রায়তী স্বত্বে ১৮০২·৯৪ একর এবং বার্ষিক লাইসেন্স ৪৮৩৫·৮৩ একর জমি বিলি করা হয়েছে। ৩৮·২৪ একর বাস্তুজমি হিসেবে বিলি করা হয়েছে।

১৩৭৮ বাংলা সালে এ জেলায় রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২,৬৭,৬২৫ টাকা। তার আগের বছর আদায়ের পরিমাণ ছিল, ২১,৯৩,০৪৬ টাকা। এ জেলায় ভূমিরাজস্বের বার্ষিক দাবীর পরিমাণ ২৭,৫৭,৯৫৯ টাকা।

১৯৭১-৭২ সালে আবগারী থেকে আয় হয়েছিল ৫০ লক্ষ টাকা। ঐ বছর আমোদকর ও স্ট্যাম্প বিক্রয় থেকে এ জেলায় সরকারী আয় হয়েছে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ও ২৪ লক্ষ টাকা।

পুলিশ বিভাগ

স্বাধীনতার পরে উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত কয়েকটি ক্যাম্প এলাকা ছাড়া পুলিশকে এ জেলায় আইনশৃঙ্খলা বা শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু ১৯৬৬ সাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে বামপন্থী দলগুলি খাদ্য আন্দোলন সুরু করলে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটে এবং কৃষ্ণনগরে এক দিনে ১৬টি সরকারী অফিস ও শান্তিপুরে কয়েকটি সরকারী অফিস আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। এই আন্দোলনের ফলে ১ জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও একজন কনেস্টবল নিহত হন। এর পর থেকেই ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে পুলিশকে অনেকবার রাজনৈতিক হাঙ্গামার সম্মুখীন হতে হয় এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। উগ্রপন্থীদের একটি শক্তঘাটি হিসেবে ১৯৭০ সাল থেকে নদীয়া জেলা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। নদীয়ার নানা জায়গায় বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও চাকদহে উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়ে শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিকদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। হিংসার রাজনীতিতে বহু তরুণের জীবন শেষ হয়। অতর্কিত নৃশংস আক্রমণে ১২ জন পুলিশ খুন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টায় পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে আনতে সমর্থ হয় এবং ১৯৭২ সালের প্রথম থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। হিংসার রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ জনসাধারণও উগ্রপন্থীদের দমন করতে পুলিশের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। বর্তমানে এই জেলায় উগ্রপন্থীরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। তবে রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ কমলেও চুরি ডাকাতির সংখ্যা খুব কমেনি। নিচে কয়েকবছরের অপরাধের সংখ্যা দেওয়া হল:

	ডাকাতি	ছিনতাই	চুরি	খুন
১৯৬৬	৩৩	৭৫৮	১৩৪৯	২৮
১৯৬৭	৩৩	১১২৭	২১২২	৩২
১৯৬৮	৫৩	৯১৫	১১৮'৩	২৪
১৯৬৯	৪৩	৭৬২	১৯১৯	৫১
১৯৭০	৪৮	৪৩০	১৫৫৫	৫৮
১৯৭১	১০৫	৬৩০	১৩৭৯	১১০
১৯৭২ (নভেম্বর পর্যন্ত)	১৬৮	৭৪৭	১৯৯৯	৪৫

এ জেলার ১৪টি থানার মধ্যে তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থানা কোতয়ালী, রাণাঘাট ও নবদ্বীপ একজন করে পুলিশ ইন্সপেক্টরের অধীন। বাকী থানাগুলির ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা হলেন সাব-ইন্সপেক্টর পর্যায়ের। এঁদের কাজ দেখাশোনা করার জন্য পাঁচ জন সার্কেল ইন্সপেক্টর আছেন। উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের মধ্যে আই, পি, এস, ক্যাডারভুক্ত একজন সুপারিনটেডেন্ট অব পুলিশ ও একজন অ্যাডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সার্ভিসের ৩ জন ডি, এস, পি, আছেন। এছাড়া রাণাঘাটে একজন মহকুমা পুলিশ অফিসার ও জেলায় একজন রিজার্ভ ইন্সপেক্টর, দু'জন ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টর এবং দু'জন ডি, ই, বি ইন্সপেক্টর আছেন। এ জেলার পুলিশ বাহিনীতে আছেন মোট ১৫৫০ জন কর্মচারী।

বিচার বিভাগ

জেলার বিচার বিভাগীয় প্রধান আদালত কৃষ্ণনগরে। রাণাঘাটে মুন্সেফ ও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে।

জেলার বিচার বিভাগের প্রধান জেলা ও দায়রা জজ। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের পদ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণনগরে সাবজজ একজন, অতিরিক্ত সাবজজ একজন এবং মুন্সেফ তিনজন আছেন। ২৫শে জুন, ১৯৭১ থেকে ফৌজদারী মামলা বিচারের দায়িত্ব বিচার বিভাগের অধীনে আসায় সদরে ঐসব মামলা বিচারের জন্য একজন মহকুমা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও তিনজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। রাণাঘাটে দু'জন মুন্সেফ ও একজন মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও দু'জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছেন।

কারা বিভাগ

জেলার দু'বছরের দেওয়ানী মামলার পরিসংখ্যান (পাশে) দেওয়া হল:

	রুজু করা মামলার সংখ্যা		বিচার শেষ হওয়া মামলার সংখ্যা	
	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭০	১৯৭১
স্মল কজেজ মামলা	২৬৫	১৬৪	২৫১	১৯৬
টাকার দাবী সংক্রান্ত মামলা	১৫৪	১৪১	১৩৯	১৮১
স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা	১৬৮৮	১০৮৬	১৬৪৫	১৬৬৫
দাম্পত্য বিষয়ক মামলা	৫১	৪৬	৪১	৪৫
স্বত্বের আপীল	২৫৪	২৭৮	২২০	২৫৩
টাকাব দাবী সংক্রাণ্ত মামলা	১৫	২০	১৭	১৮
বিবিধ আপীল	৯১	৭০	১১৩	৬৯

নদীয়ায় কৃষ্ণনগরে একটি জেলাজেল এবং রাণাঘাটে একটি সাবজেল আছে। কৃষ্ণনগর জেলা জেলে ৪৯৮ জন বন্দীর এবং রাণাঘাটে ৬০ জন বন্দীর রাখবার ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ নির্বাচন
(১৯৫২—১৯৭২)

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নির্বাচন সম্বন্ধে নদীয়া জেলার মানষের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। কারণ সেই সময় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাত্র শতকরা ১৪ জন মানুষ ভোটের অধিকার পেয়েছিল। বর্তমানে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগই নির্বাচক। এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়াব ফলে। এই ভোটাধিকাব ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, বংশ, জন্মসূত্র, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনেব সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি বর্জন করে করে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ কবা হয়েছে। তবে তপশীলী উপজাতি ও সম্প্রদায়েব জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এখনও বর্তমান আছে। অবশ্য এই সকল সংরক্ষিত অঞ্চলে সকল সম্প্রদায়েব মানুষ একত্রে ভোট দেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে নদীয়া জেলার অধিবাসীর সংখ্যা ১৭,১৩,৩২৪ জন। তাব মধ্যে ভোটাবদের সংখ্যা ১০,৮৭,২০৬ জন। নদীয়া জেলার শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩১·৩১ জন। তবু জনসাধারণের ভোটদানের উৎসাহ বিপুল। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে (বিধানসভা) শতকরা ৬৮ জন অংশ গ্রহণ করেন। জেলার সাধারণ মানষের পৌব ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয় তাব প্রতিফলন সাধাবণ নির্বাচনে দেখা যায়। বর্তমানে নদীয়া জেলায় লোকসভায় ২টি। বিধানসভায় ১৪টি আসন যথা—করিমপুর, তেহট্ট, কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগব পূর্ব ও পশ্চিম, রাণাঘাট পূর্ব ও পশ্চিম, শান্তিপুব, হাঁসখালি, তেহট্ট, নবদ্বীপ, চাকদহ ও হরিণঘাটা।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যে সব সাধাবণ নির্বাচন ও উপনির্বাচন হয়েছে তাতে নানা চিত্র পাওয়া যায়। তবে আশাব কথা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বড় রকমের সংঘর্ষ দেখা যায় নি। উপরন্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনেব সময় অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। নানা প্রকার হিংসাত্মক ঘটনা ও হুমকীব ফলে জনসাধারণের মনে নির্বাচনের পূর্বে যে স্বাভাবিক উৎসাহ প্রতিবার দেখা যায় এইবার তার একান্ত অভাব হয়। নির্বাচনেব সময় অবশ্য জনসাধারণের মনোবল ফিরে আসে এবং অধিকাংশ ভোটার ভোট দেন।

রাজ্যব্যাপী যে নির্বাচনী আঁতাত হয় স্বাভাবিক ভাবেই নদীয়া জেলার সাধারণ নির্বাচনে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তবে স্থানীয়ভাবেও কিছু বোঝা পড়া হয়ে থাকে। নির্বাচনী প্রচাব অভিযান সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মতই চলে নানাভাবে। দেওয়াল চিত্র ও ছড়া জনসাধারণের মনে সাড়া জাগায়। বিরাট জনসভা থেকে অরম্ভ করে পথ-সভা, পথ-নাটক প্রভৃতি নানাভাবে প্রার্থীরা ও বিশেষভাবে দলগুলি ভোট পাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ পক্ষে, বিপক্ষে নানা অভিমত নানাভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নদীয়া জেলার নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ প্রাধান্য পায়। এই জেলার স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলি বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে। নির্বাচনী ফলাফল ও বিশ্লেষণ বিশেষভাবে স্থান পায়। এখানে আমরা নির্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ উল্লেখ করতে পারি। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তেহট্টের এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে লোকসভা ও বিধানসভার উভয় ভোটপত্রগুলি পৃথক বাক্সের পরিবর্তে একই বাক্সে ভুল করে জমা দেওয়া হয়। একবার সংবাদের শিরোনাম হল 'ভোট বাক্সে প্রণামী'। ঘটনাটি হল হরিণঘাটাব সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর ব্যালট বাক্সে ১২ (বার) টাকা পাওয়া যায়। উক্ত প্রার্থী শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের গুরু তাই সংবাদপত্রে লেখা হল—'হয়ত তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ভোটদানের সময় প্রণামী বাবদ ঐ অর্থ দান করেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করে।" আরও লেখা হল—'প্রণামীর পরিণাম কি হইবে জানা যায় নাই।'

আর ১৯৬৯ সালের বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে একজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেও ফিরে গেলেন কারণ, তিনি জানতেন না যে ২৫০ টাকা জমা দিতে হয়।

গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নির্বাচনের ফলাফলের দ্বারা জনমত জানা যায়। আর নির্বাচনী অভিজ্ঞতা জনগণের মনে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করে। সেইজন্য সাধারণ মানুষেব রাজনৈতিক মতামত জানতে হলে নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রথম সাধাবণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। এই সময় নদীয়া জেলায় বিধান-সভার আসন সংখ্যা ছিল ১০টি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মোট ১০টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং লাভ করে ৯টি আসন। কৃষকপ্রজা মজদুর পার্টি (K.M.P.) ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১টি (করিমপুর কেন্দ্র) আসন লাভ করে। কেন্দ্রগুলি ছিল: কৃষ্ণনগর, তেহট্ট, করিমপুর, কালীগঞ্জ, চাপড়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, নাকাশীপাড়া

* ১৯৭১-৭২ সালে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান

* Hindusthan Standard Dt. 8. 3. 1957.

×× আনন্দবাজার পত্রিকা—তাং ১১।৩।৫৭

++ আনন্দবাজার পত্রিকা ৯।১।৬৯

এবং রাণাঘাট। রাণাঘাটে মোট ২টি আসন ছিল—সাধারণ ও তপশীলী। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু কোন আসন লাভ করতে পারে নি। এই নির্বাচনে প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড সোসালিস্ট ফ্রন্ট ও জনসংঘ পৃথক পৃথক ভাবে ৪টি আসনের জন্য প্রার্থী দেয়। ফরওয়ার্ড ব্লক (রুইকর উপদল) ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল, রিপাবলিকান সোসালিস্ট দল, রামরাজ্য পরিষদ এবং ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক প্রত্যেকে ১টি করে প্রার্থী দেয়। এছাড়া নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৯ জন। মোট ৫৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০টি আসনে। এই নির্বাচনে নদীয়া জেলাতে কংগ্রেস মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৩·৭৫ ভাগ পেয়ে ৯টি আসন লাভ করে। এইবার প্রদত্ত ভোটের হার ছিল মোট ভোটের শতকরা ৪০·১৩ ভাগ। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় (K.M.P.) করিমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসনেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে জয়ী হন ৯,০৫০ ভোট পেয়ে। এই কেন্দ্রে ভোটারসংখ্যা ছিল ৫৪,৪১৭ এবং ভোট পড়ে মাত্র ১৮,৬৮২টি।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে লোকসভায় নদীয়া জেলার আসন ছিল মোট ২টি। নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের শতকরা ৫৭·৫২ ভাগ ভোট (৯১,৪৬৪) পেয়ে নির্বাচিত হন কংগ্রেস প্রার্থী পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। শান্তিপুর কেন্দ্রে জয়ী হন কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। তিনি ৮০,৪৩৯টি ভোট পান। অবশ্য পণ্ডিত মৈত্রের মৃত্যু হলে উপ-নির্বাচন হয় ১৯৫৩ সালে এবং সেই নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে শতকরা মাত্র ৩২ জন ভোট দেন। শ্রীমতী পালচৌধুরী পান ৬৯,৬০৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসুশীল চ্যাটার্জী পান ২৭,৪৫৫। অপর একজন পি, এস, পি, প্রার্থী এবং ১ জন নির্দল প্রার্থী ছিলেন। উভয়েরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে নদীয়া জেলার বিধানসভার আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১টি। এই নির্বাচনে কেন্দ্রগুলির এলাকা পরিবর্তন হয়। ১৯৫২ সালের কালীগঞ্জ ও চাপড়া কেন্দ্র দুইটি অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে মিশে যায়। চাকদহে নূতন কেন্দ্র হয় এবং এই কেন্দ্র থেকে নদীয়া জেলার একমাত্র কংগ্রেসবিরোধী সদস্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী জয়লাভ করেন। তিনি প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য ছিলেন। বাকী ১০টি আসনেই কংগ্রেস জয়লাভ করে। নাকাশীপাড়াতে একটি তপশীলী আসন বৃদ্ধি হয় এবং এই কেন্দ্রের দুটি আসনই কংগ্রেস লাভ করে। সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় ১৯৫২ সালের করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গতবারের নির্বাচিত প্রার্থী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবার কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ১৩,৬৭৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন ও তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এবার রাণাঘাট কেন্দ্রটি কেবল একটি মাত্র সাধারণ আসনবিশিষ্ট হয়। হরিণঘাটায় নূতনভাবে দুইটি আসন (সাধারণ ও তপশীলী) বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়। এই দুইটি আসনেই কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ১০টি বিধানসভার আসন লাভ করে এবং প্রদত্ত ভোটের ৪৫·৪৯ শতাংশ ভোট পায়।

১৯৫৭ সালের লোকসভার নবদ্বীপ কেন্দ্রে তৎকালীন সদস্যা শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী পুনর্নির্বাচিত হন ১,৩৪,০৮৪ ভোট পেয়ে। তিনি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬১·৪৬ ভাগ ভোট পান। লোকসভাকেন্দ্রের অঞ্চলের পরিবর্তন হয়। রাণাঘাট মহকুমা সহ বারাসাত কেন্দ্র গঠিত হয় এবং তৎকালীন সংসদ সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ (কংগ্রেস) ১,৩৯,৭৮৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ৪,৮৩,৬৪২ জন কিন্তু ভোট দেয় মাত্র ২,৭৩,৫২০ জন। জেলার দলগত পরিস্থিতি (১৯৫৭): বিধানসভা

কংগ্রেস	১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসন লাভ করে ১০টি
প্রজাসমাজতন্ত্রী (পি, এস, পি,)	৪টি ---------- ১টি
ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্টদল (R.C.P.I.)	৩টি ---------- ×
কমিউনিস্ট (C.P.I.)	৩টি ---------- ×
জনসংঘ	১ ---------- ×
নির্দল	১৬টি ---------- ×
মোট	৩৮ জন প্রার্থী আসন ১১

১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের মত এবারও নদীয়া জেলায় বিধানসভায় আসনসংখ্যা ছিল ১১টি এবং তার মধ্যে ২টি তপশীলী সংরক্ষিত আসন। এই জেলার ভোটার সংখ্যা হয় ৮,৯১,৬২০। এবারও শান্ত পরিবেশেই নির্বাচন হয়। তবে উল্লেখ করা যায় যে ২ জন মিথ্যা পরিচয়ে ভোট দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে একজন মূক বধির প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী নির্দল প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পঞ্চমুখী প্রতিযোগিতায় ২৪৭টি ভোট পান। এই রকম ঘটনা ভারতের নির্বাচনের ইতিহাসে বিরল। ১১টি আসনের জন্য ৪৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তার মধ্যে ২২ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মোট ভোটের শতকরা ৫০ ভাগ ভোট প্রদত্ত হয়।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। বিরোধী দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করে। কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

নিম্নের তালিকাটি লক্ষ্য করলে দলগত শক্তি জানা যায়।

(১৯৬২)

কংগ্রেস	১১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ৬টি আসন
কমিউনিস্ট পার্টি	৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ২টি আসন
পি, এস, পি	২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ১টি আসন
বামপন্থী ফ্রন্ট (আর.সি.পি.আই)	২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ১টি আসন
জনসংঘ	৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে × আসন
নির্দল	১৫টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ১টি আসন

হিন্দুমহাসভা, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার একটি এবং আর,সি,পি,আই ও কৃষক প্রজা পার্টি ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু কোন আসন লাভ করতে পারে নি।

এইবার লোকসভার নির্বাচনকেন্দ্রগুলির পরিবর্তন করা হয়। ফলে কেবলমাত্র নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র থাকে। নদীয়া জেলার ২টি বিধানসভার কেন্দ্রের এলাকা বারাসাতে ও ২টি এলাকা চুঁচুড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইবার নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে মোট প্রদত্ত ভোটের (৩০১১৭৯) মধ্যে ১৫২৮৬৯ ভোট পেয়ে বামপন্থী ফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তৎকালীন সংসদসদস্যা কংগ্রেসের শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীকে ১৩২৩৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নানা কারণে এই নির্বাচন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শুধু নদীয়া জেলায় বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে এই নির্বাচনের প্রভাব সুদূর প্রসারিত। স্বাধীনতার সময় থেকেই কংগ্রেস দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং এই রাজ্যেও বিশেষ করে নদীয়া জেলায় তার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সর্বপ্রথম বিরোধী দলগুলি বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। এই প্রথম দুই কমিউনিস্ট পার্টি পৃথক পৃথক ভাবে প্রার্থী দেয়। বাংলা কংগ্রেস (বাং কং) গঠিত হয় এবং সর্বপ্রথম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ক'রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশেষ ক'রে নদীয়া জেলায় তার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। দুটি ফ্রন্ট গঠিত হয় (U.L.F. এবং P.U.L.F.)। পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি নিদারুণ ভাবে হ্রাস পায়। এই বৎসর বিধানসভায় আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪টি।

এই নির্বাচনে খাদ্য সমস্যাই নদীয়া জেলার নির্বাচনে প্রধান প্রশ্ন হয়ে উঠে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই নির্বাচনে কৃষ্ণনগর পশ্চিম কেন্দ্রে একই ফ্রন্টের (U.L.F.) দুই শরিক কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) ও সংযুক্ত সোসালিস্ট (সং, সো,) পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অবশ্য পঞ্চমুখী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিউনিস্ট (মাঃ) প্রার্থী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী মোট প্রদত্ত ৪৩৬৪৩ ভোটের মধ্যে ১৭৬৭৮টি ভোট পেয়ে জয়ী হন। এই কেন্দ্রে ৩০৬৫টি ভোট বাতিল হয়।

ইহা ব্যতীত ব্যবসায়ী সমিতি ২টি আসনে, জনসংঘ ৩টি, আর,সি,পি,আই, এবং রিপাবলিকান ১টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু কোন আসন লাভ করতে পারে নি।

১৯৬৭ সালে নদীয়া জেলায় লোকসভার আসনসংখ্যা ছিল ২টি—একটি সাধারণ ও একটি তপশীলী সংরক্ষিত আসন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দুইটি আসনেই প্রার্থী দেয় এবং একটিও লাভ করতে পারে নি। বিধানসভার নির্বাচনের প্রভাব লোক-সভার নির্বাচনে পড়ে। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ভোটদাতাদের মোট সংখ্যা ছিল ৪,৬৪,৩৬৩ তার মধ্যে ৩,৪৩,৯৩৫ জন ভোট দেয়। এবার বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১,৫৫,৩০৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীকে ৩২,৭৯৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এখানে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে ৫,০৪,১৪৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩,৬৪,৫৯৯ জন ভোট দেয়। এই নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীপ্রমথ-রঞ্জন ঠাকুর ২,১৪,৫৬৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী ১,৩৬,৩৬৭ ভোট পান। অবশ্য শ্রীঠাকুর পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত শাসক কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে কাজ করেন।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য উপনির্বাচন হয় ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে। এই নির্বাচনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ১,৩৪,৩৬১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রার্থী পান ৯২,৩৯৬ ভোট। ইনি ছিলেন ফ্রন্ট (United Front) এর প্রার্থী। এই উপ-নির্বাচনের ফল অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকারের পতন হয় এবং রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর জন্য ১৯৬৯ সালে বিধান সভার মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এইবার নির্বাচন হয় কেবলমাত্র বিধানসভার আসনগুলির জন্য। আসন সংখ্যা পূর্বের মত ১৪ থাকে। এর মধ্যে নাকাশীপাড়া ও রাণাঘাট আসন দুটি সংরক্ষিত। নাকাশীপাড়ায় মোট প্রদত্ত ৪৩,৬৫৫ বৈধ ভোটের মধ্যে কংগ্রেস-প্রার্থী ২৩,৪২৮ ভোট পেয়ে এবং রাণাঘাট পূর্বকেন্দ্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি, পি, আই) প্রার্থী ২৬,৫৫৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ সালের দলগত অবস্থা

কংগ্রেস ১৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাভ করে ৪টি আসন

বাং কং	৬টি------------	৫টি	,,
কমিউনিস্ট (দঃ)	২---------------	১টি	,,
কমিউনিস্ট (মাঃ)	৪---------------	১টি	,,
সং, সো,	২টি-------------	১টি	,,
নির্দল	১২টি-------------	২টি	,,

১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী বিধানসভার নির্বাচনে দলগত অবস্থা

কংগ্রেস ১৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে লাভ করে ৫

আমরা বাঙালী	৯---------------	×
*নির্দল	৭---------------	১

* এর মধ্যে ১ জন কমিউনিস্ট (মাঃ) সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন।

× ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল

+সি, পি, আই(এম)	৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করে	২
+সি, পি, আই	১ - - - - - - - - - - - - - - - -	১
+বাং কংগ্রেস	৫ - - - - - - - - - - - - - - - -	৩
প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ	৩ - - - - - - - - - - - - - - - -	×
আর, সি,পি,আই (ঠাকুর)	২ - - - - - - - - - - - - - - - -	×
ভারতের জাতীয় দল (আই,এন,ডি)	৭ - - - - - - - - - - - - - - - -	×
লোকদল	১ - - - - - - - - - - - - - - - -	×
বাংলার জাতীয় দল	১ - - - - - - - - - - - - - - - -	×
+সংযুক্তসোসালিস্ট	১ - - - - - - - - - - - - - - - -	১
+আর,সি,পি,আই, (মোকসেদ)	১ - - - - - - - - - - - - - - - -	১

১৪টি আসনের জন্য মোট ৫৭ জন প্রার্থী ১১টি দলের পক্ষ থেকে বা নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কংগ্রেস ১৪টি আসনেই প্রার্থী দিয়ে লাভ করে ৫টি আসন। এবং যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ৫টি দল ১৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৯টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে একজন ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থীও ছিলেন। অন্যান্য ৬টি দল ও নির্দল প্রার্থীদের সংখ্যা ২৯ হলেও তাঁরা কোন আসন লাভ করতে পারে নি।

১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী বিধান সভার নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী সরকার গঠন করতে সঠিকভাবে সাহায্য না করার ফলে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আবার প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি চতুর্থ লোকসভা ভেঙ্গে দেন। ফলে লোকসভার জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে–– অর্থাৎ পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের এক বৎসর পূর্বে। এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার জন্য নির্বাচন হয়। সুতরাং এই নির্বাচন সাধারণ নির্বাচনের পরিপূর্ণতা পায়। এই সময় নির্বাচনবিরোধী উগ্রপন্থী রাজনীতি নদীয়া জেলায় ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। নানা দুর্যোগ কাটিয়ে অবশেষে প্রায় শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নির্বাচন হয়।

১৯৭১ সালের নির্বাচনেও বিধানসভার আসন সংখ্যা থাকে ১৪টি এবং লোকসভার ২টি। এই নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়। তৎকালীন সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বাধীন অংশ সংগঠন কংগ্রেস (সংক্ষেপে কং, সং) এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অংশ-শাসক বা নব কংগ্রেস (সংক্ষেপে কং শা) নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী অংশের সভাপতি হন শ্রীজগজীবন রাম। সর্বভারতীয় রাজনীতির এই প্রভাব নদীয়া জেলাতেও পড়ে। এবার মুসলীম লীগ রাজ্য মুসলীম লীগ হিসাবে প্রার্থী দেয় এবং একটি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে গড়ে শতকরা ৫০ জন ভোট দেয়।

+ যুক্ত ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্তদল।

১৯৭১ সালের বিধান সভার নির্বাচনের দলগত অবস্থা

কংগ্রেস (শাঃ)	১২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লাভ করে		১ টি আসন
কংগ্রেস (সং)	১৩টি	- - - - - - - - - -	× আসন
সি,পি,আই, (এম)	১২টি	- - - - - - - - - -	৯ টি আসন
রাজ্য মুসলীম লীগ	৭টি	- - - - - - - - - -	১ টি আসন
বাংলা কংগ্রেস	৮টি	- - - - - - - - - -	× আসন
সি,পি, আই	৬টি	- - - - - - - - - -	× আসন
আর,সি,পি,আই (ফ্রন্টপন্থী)	১টি	- - - - - - - - - -	১ টি আসন
পি,এস,পি,	১টি	- - - - - - - - - -	× আসন
আর,এস,পি, (বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল)	১টি	- - - - - - - - - -	× আসন
নির্দল×××	১৩টি	- - - - - - - - - -	২ টি আসন

১৯৭১ সালের নির্বাচনে নদীয়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী) [সংক্ষেপে সি, পি, আই, (এম,)] এর শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে আসন লাভ করে ৯টি। এর মধ্যে আছে রাণাঘাট পূর্ব (তপশীলী) কেন্দ্র যেখানে জয়ী হন শ্রীনরেশচন্দ্র বিশ্বাস (সি, পি, এম,) ১৮,৫৫৮ ভোট পেয়ে। কংগ্রেস (শাঃ) কেবলমাত্র হাঁসখালি সংরক্ষিত (তপঃ) আসনটি লাভ করে। এখানে শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস ২৩,৬৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। বাংলা কংগ্রেস ৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে একটিও আসন পায় না। এইবার মোট ৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

অন্যদিকে এইবার লোকসভার দুটি আসনই সি, পি, আই (এম) দল লাভ করে। কৃষ্ণনগর আসনে পঞ্চমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শতকরা ৬২ জন ভোটার ভোট দেন। সি, পি, আই, (এম) প্রার্থী শ্রীরেণুপদ দাস ১,০৮,৮৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী ৭১,২৪১ ভোট পান। অপর তিনজন প্রার্থীর (বাং কং,

××× ১৩ জন নির্দল প্রার্থীর মধ্যে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ছিলেন। ইনি গতবার সংযুক্ত সোসালিস্ট প্রার্থী হিসাবে জয় লাভ করেন এবং এইবার তিনি ঐ দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় নির্দল প্রার্থীরূপে পরিগণিত হন। তাছাড়া ছিলেন আর, সি, পি,আই, এর অন্য গোষ্ঠীভুক্ত শ্রীমোকসেদ আলি ও শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। একজন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীও নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শ্রীমৈত্র ছাড়া পূর্বোক্ত সকলে পরাজিত হন। অবশ্য আর একজন নির্দল প্রার্থী মীর ফকির মোহম্মদ কালীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ১০,৬৮৬ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। তাঁর কেন্দ্রে মোট ৭ জন প্রার্থী ছিলেন।

সং, কং ও মুসলীম লীগ) জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। প্রতি জনের ৫ শত টাকা। নবদ্বীপ (তপশীলী সংরক্ষিত) কেন্দ্রে জয়ী হন কমিউনিস্ট (মাঃ) প্রার্থী শ্রীমতী বিভা ঘোষ (গোস্বামী) ১,৭৬,৫৪৩ ভোট পেয়ে। এই কেন্দ্রে শতকরা ৬৮ জন ভোট দেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাসক কংগ্রেসের শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর পান ১,৬৫,৯৪৩ ভোট। অপর দুইজন প্রার্থীর (বাংলা কংগ্রেস ও একজন সংগঠন কংগ্রেস) জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৭১ সালে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাও স্থায়ী হতে পারল না। ফলে ১৯৭২ সালে ভারতের অধিকাংশ বিধান সভাগুলির নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও কেবলমাত্র বিধান-সভার নির্বাচন করতে হয়। নদীয়া জেলায় এই নির্বাচনে মোট ৩৯ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন। এরমধ্যে ১০ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। - যথা: কংগ্রেস (সংগঠন) ৩ জন, রাজ্য মুসলীম লীগ ৪ জন, নির্দল ৩ জন। এই নির্বাচনে শতকরা ৬৮ জন ভোট দেন।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই) নির্বাচনী মোরচা বাঁধে এবং সব কয়টি আসনে প্রার্থী দিয়ে নদীয়া জেলার ১৪টি আসনেই জয়ী হয়। এই ঘটনা অভূতপূর্ব। মোরচার বাইরে কোন দল বা নির্দলীয় প্রার্থী কেহই কোন আসন পায় নি। সমগ্র নদীয়া জেলার মোট ১০,৮৭,৯২৭ জন ভোটারের মধ্যে বৈধ ভোট পড়ে ৬,৭৩,০১৪টি। আর বাতিল হয় ১৭,০৪৮টি ভোট। সংরক্ষিত তপশীলী আসন একটি কংগ্রেসের এবং অপরটি সি. পি. আই-এর অংশে পড়ে। এই নির্বাচনে (১৯৭২) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস একত্রে পায় ৪,০৯,৪৬৯টি ভোট।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে দলগত অবস্থা

দল	আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	ভোট	আসন
কংগ্রেস	১২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভোট পেয়েছে	৩,৪৯,০৩৭ এবং আসন	১২টি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি	২টি	৬০,৪৩২ এবং আসন	২টি
কমিউনিস্ট (মা:)	১৩টি	২,২১,৭৮২ এবং আসন	×
কংগ্রেস (সং)	৩টি	৩,৬৮০ এবং আসন	×
ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (আর. সি. পি. আই) [কুমারপন্থী]	১টি	১৮,৬২৫ এবং আসন	×
রাজ্য (State) মুসলীম লীগ	৪টি	৮,৪৭৬ এবং আসন	×
নির্দল	৪টি	১০,৯৮০ এবং আসন	×

লোকসভার দুটি আসনে ১৯৫২ সাল থেকেই কংগ্রেসের প্রাধান্য দেখা যায়। ১৯৫২, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৬২ সালে অবশ্য নবদ্বীপ কেন্দ্রে বামপন্থী ফ্রন্টের সমর্থিত প্রার্থী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১৩,২৩৭ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করেন। অবার ১৯৬৭ সালের দুটি আসনের মধ্যে একটি বামপন্থী ফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং অপর কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর জয়ী হন। কিন্তু পরে শ্রীঠাকুর কংগ্রেসে যোগ দেন এবং শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী জয়ী হন। অবশ্য ১৯৭১ সালের লোকসভার নির্বাচনে নদীয়া জেলার দুটি আসনেই মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট প্রার্থীরা জয়ী হন।

× বর্তমানে কংগ্রেস (শা:) ভারতীয় কংগ্রেস বা কংগ্রেস নামে স্বীকৃত।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণ করলে বিধান সভায় নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী দলগত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল : বিধানসভা নির্বাচন :

নদীয়া জেলাতে কোন দল কত আসন পেয়েছিল
নির্বাচনের বৎসর ও নিচে আসন প্রাপ্তি

রাজনৈতিক দলের নাম	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৭১	১৯৭২
কংগ্রেস ×	৯	১০	৬	৪	৫	১	১২
কমিউনিস্ট ×× (সি, পি, আই,)			২	১	১		২
প্রজা, সমাজতন্ত্রী দল (পি, এস, পি,)	১(ক)	১	১				
সংযুক্ত সমাজবাদী দল (এস, এস, পি,)				১	১		
কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী)(সি, পি, আই, এম)				১	২	৯	
বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (খ)(আর, সি, পি, আই)			১		১	১	
বাংলা কংগ্রেস				৫	৬		
রাজ্য মুসলীম লীগ (এস, এম, এল,)						১	
নির্দল			১	২[গ]	১[ঘ]	২[ঙ]	
মোট আসনসংখ্যা	১০	১১	১১	১৪	১৪	১৪	১৪

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নির্বাচনগুলির ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নদীয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক দলগুলি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নাই। একমাত্র ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিধান সভায় রাজ্য মুসলীম লীগের প্রার্থী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল ১০,৮২৬ ভোট পেয়ে নাকাশীপাড়া কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। এখানে মোট ৭২,৯৪১ জন ভোটারের মধ্যে ৪২,৯৬৩ জন ভোট দেন। তার মধ্যে ৩,৩০৪টি ভোট বাতিল হয়। এই কেন্দ্রে মোট ছয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে কংগ্রেসের দুই অংশই প্রার্থী দেন। ১৯৬৯ সালের অবিভক্ত কংগ্রেসের শ্রীনীলকমল সরকার শাসক কংগ্রেস (শা:) হিসাবে পান ২৩,৪২৪টি ভোট আর সংগঠন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীহরিসাধন বর্মন পান ৪,০৬৯ ভোট। দুই কংগ্রেস মোট পায় ১২,৪৯৩ ভোট।

নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীদের গুরুত্ব বেশী নয়। প্রায় সর্বক্ষেত্রে জয়ী নির্দল সদস্যগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়েছেন। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়াই নির্দল সদস্য জয়যুক্ত হয়েছেন। যেমন, ১৯৬২ সালে চাপড়া কেন্দ্রে মহানন্দ হালদার মোট প্রদত্ত ৩২,৮০৭ ভোটের মধ্যে ১৪,২৫৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন। আর ১৯৭১ সালে কালীগঞ্জ বিধানসভা আসনে সাত জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নির্দল সদস্য শ্রীমীর ফকীর মোহম্মদ ১০,৬৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ৭২,২০৮ জন। তারমধ্যে ভোট দেন ৪৫,১৩৪ জন। অবশ্য ৫,৪৬৭টি ভোট বাতিল হয়।

নদীয়া জেলার লোকসভা নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরা প্রায়ই অংশ গ্রহণ করেন এবং জয়ী হন। পূর্বের আলোচনায় জানা যায় যে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী কয়েকবার নির্বাচিত হয়েছেন এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী বিভা ঘোষ (গোস্বামী) নির্বাচিত হন। কিন্তু বিধান সভার নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য এবং কেবলমাত্র ১৯৬২ সালের চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী শ্রীমতী শান্তি দাস ব্যতীত কোন মহিলা

× ১৯৬৯ সালের নির্বাচন পর্যন্ত অবিভক্ত কংগ্রেসকে দেখান হয়েছে এবং তারপর ১৯৭১ সাল ও ১৯৭২ সালের নির্বাচনে শাসক বা নব কংগ্রেসকে ধরা হয়েছে। কারণ ইহাই এখন কংগ্রেস নামে স্বীকৃত। সংগঠন কংগ্রেস নদীয়া জেলায় কোন আসন লাভ করে নাই।

×× ১৯৬২ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' এবং তারপর দক্ষিণপন্থী নামে পরিচিত পার্টিকে দেখান হয়েছে।

(ক) ১৯৫২ সালে কৃষক প্রজা পার্টি নামের অংশটি।

(খ) বামপন্থী ফ্রন্টের আর, সি, পি, আই।

(গ) একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সমর্থিত।

(ঘ) যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল।

(ঙ) একজন বিক্ষুব্ধ সংযুক্ত সোসালিস্টপ্রার্থী সহ।

সদস্য নদীয়া জেলা থেকে বিধান সভার আসন লাভ করেন নি।

পরিশেষে বলা যায় নদীয়া জেলার সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণ আইন সভায় ভিতরে ও বাইরে সরকারী বা বিরোধীপক্ষের সদস্য হিসাবে রাজ্য বা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ স্থান লাভ করেছেন। অবশ্য এ পর্যন্ত নদীয়া জেলার নির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের মধ্যে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ব্যতীত অপর কেহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আসন লাভ করেন নি। শ্রীগুহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় উপমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু নদীয়া থেকে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যগণও বিশেষতঃ স্বর্গত পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলার যে সমস্ত নির্বাচিত সদস্য রাজ্য মন্ত্রীসভার আসন অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারি। ১৯৫২ সালে নদীয়া জেলা থেকে রাজ্য মন্ত্রীসভায় ছিলেন কেবলমাত্র শ্রীস্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায় (কংগ্রেস)। ইনি এই সময় উপমন্ত্রী ছিলেন। পরে রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। নদীয়া জেলা থেকে তারপর ১৯৬৭ সালের সাধাবণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ মন্ত্রীরূপে কাজ করেন শ্রী এস, এম, ফজলুর রহমান এবং শ্রীশঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল রাজ্যবিধান সভায় অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র (সং, সোঃ) এবং শ্রীচারুমিহির সরকার (বাং. কং) দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় বিধান সভার উপ-অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন শ্রীহরিদাস মিত্র (বাং. কং)। ১৯৬৭ সালের শেষদিকে (নভেম্বর মাসে) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতনের পর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (P.D.F.) মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তৎকালীন বাংলা কংগ্রেস সদস্য ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল দলত্যাগ করেন এবং এই মন্ত্রীসভায় যোগ দান করেন। ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় নদীয়া থেকে একমাত্র শ্রীচারুমিহির সরকার (বাং. কং) স্থান পান। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস কোয়ালিশন (সম্মিলিত) মন্ত্রীসভায় নদীয়া জেলার শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস (কং) রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এবং শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র (নির্দল) পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন এবং উভয়ই ১৯৭২ সালে গঠিত কংগ্রেস, সি. পি, আই, মোরচা সমর্থিত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় স্থান লাভ করেছেন। ১৯৭২ সালে নদীয়া জেলার চাকদহ কেন্দ্রে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য শ্রীহরিদাস মিত্র বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৭২ সালের বিধান সভা নির্বাচনে নদীয়া জেলা থেকে নির্বাচিত :

	কেন্দ্র	সদস্যের নাম	দল
(১)	চাকদহ	শ্রীহরিদাস মিত্র	জাতীয় কংগ্রেস
(২)	কালীগঞ্জ	শ্রীশিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
(৩)	হাঁসখালি (সংরক্ষিত)	শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস	,,
(৪)	নাকাশীপাড়া (সংরক্ষিত)	শ্রীনীলকমল সরকার	,,
(৫)	করিমপুর	শ্রীঅরবিন্দ মণ্ডল	,,
(৬)	নবদ্বীপ	শ্রীরাধারমণ সাহা	,,
(৭)	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	শ্রীনিতাই সরকার	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
(৮)	রাণাঘাট পশ্চিম	শ্রীনরেশচন্দ্র চাকি	জাতীয় কংগ্রেস
(৯)	শান্তিপুর	শ্রীঅসমঞ্জ দে	,,
(১০)	কৃষ্ণনগর পূর্ব	শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র	,,
(১১)	কৃষ্ণনগর পশ্চিম	শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়	,,
(১২)	চাপড়া	শ্রীগিয়াসুদ্দিন আহমেদ	,,
(১৩)	তেহট্ট	শ্রীকার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস	,,
(১৪)	হরিণঘাটা	শ্রীশক্তিপদ ভটাচার্য	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

———

খেলাধুলা ও শরীরচর্চা

খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় নদীয়া জেলার ভূমিকা উল্লেখ্য। নদীয়ার অনেকেই বিভিন্ন খেলাধুলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে 'নদীয়া জেলা স্টেডিয়াম' গঠিত হবার ফলে এখন নদীয়ায় খেলাধুলার আসর জমজমাট।

অতীতের দিকে ফিরে তাকালে মনে পড়ে যায় আশানন্দ ঢেঁকী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, গৌরসুন্দর গোস্বামী এবং দীনবন্ধু প্রামাণিকের কথা। তাঁদের অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির কথা আজ গল্পে বা রূপকথায় পরিণত হয়েছে।

শান্তিপুর হল স্বাস্থ্যচর্চা ও শক্তি-সাধনার প্রাচীন পীঠ। মহাবীর ব্যায়াম সমিতি ও দেশবন্ধু ব্যায়ামাগার পুরনো প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া আছে শান্তিপুর ব্যায়াম সমিতি, নবমিলন ব্যায়াম সংঘ, ন্যাশন্যাল ক্লাব ও তরুণ সংঘ প্রভৃতি।

রাণাঘাটের রেলওয়ে জিমনাসিয়াম ও শারীর শিক্ষা কলেজের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও জয়গোপাল বিশ্বাস এখানকার কৃতি ব্যায়ামশিক্ষক।

চাকদহ ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র ও পালপাড়া পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিও পিছিয়ে নেই।

নবদ্বীপের শক্তি সমিতি ও বয়েজ ইউনিয়ান ক্লাবের ব্যায়ামচর্চা অনেকদিনের। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং জহর সরকার এখানকার কৃতি ব্যায়ামশিক্ষক।

কৃষ্ণনগরে এক সময় মোমিন পারকে, সেবক সংঘে ও এ, ভি, স্কুলে ব্যায়ামচর্চা হত। সেদিনের ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলাই চ্যাটার্জি, মন্মথনাথ প্রামাণিক, কুঞ্জ বসু, নির্মল বিশ্বাস, শান্তি চ্যাটার্জি, সুশীল চক্রবর্তী, নারায়ণ সরকার, হেমেন দাস এবং কালিদাস দত্ত।

ঘূর্ণীতে বিশ্বাস ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন কৃতি ব্যায়ামবিদ্ ও শিকারী জগদীশ বিশ্বাস। এই প্রতিষ্ঠান থেকে নদীয়াশ্রী, বঙ্গশ্রী, স্ট্রংম্যান ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। মহম্মদ আলম ১৯৭২ সালে পুনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় 'ভারতশ্রী' উপাধি লাভ করেছেন। জগদীশ বিশ্বাসের পুত্র জয়ন্ত এবং কন্যা চিত্রা সর্বভারতীয় রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতায় বহুবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কৃতি দেহী হলেন সুনীল পাল, পঙ্কজ পাল, দুলাল পাল, বিশ্বনাথ সান্যাল ও অপর্ণা ভট্টাচার্য।

এবার খেলাধুলার চিত্র তুলে ধরি। নদীয়ার নির্মল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম কীর্তিমান ফুটবল খেলোয়াড় যিনি অক্স্ফোর্ড ব্লু লাভ করে দেশে-বিদেশে খ্যাত হন। ১৯০৫ সালে বৈদ্যনাথ দাক্ষী মোহনবাগান ক্লাবে ফুটবল খেলেছিলেন। এই সময়ে ফুটবল খেলায় অপর তিনজন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন —জ্ঞানেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (শোভাবাজার), কালী ভট্টাচার্য ও ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকালের 'টপ স্কোরার' রূপচাঁদ দফাদার এরিয়ানস ও মোহনবাগান ক্লাবে ফুটবল খেলে খ্যাত হন ১৯১৯ সালে। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন। এ যুগের নদীয়ার কৃতী খেলোয়াড়েরা হলেন—মাদার মিঞা, ধীরা মিত্র, সুধীন মৌলিক, জুয়েল বিশ্বাস, সত্য ব্যানার্জি ও বসন্ত চৌধুরী।

অশ্বিনী মৈত্র এরিয়ান্সে ফুটবল খেলেছিলেন ১৯২২-২৪ সালে।

এই সময় এরিয়ান্সের পক্ষে খেলেছেন—গঙ্গেশ দাস, সুরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কালা ঘোষ, রবীন গুপ্ত, সুখদা চট্টোপাধ্যায়, ফণী বাগচী, জ্ঞান সান্যাল ও বলাইদাস চ্যাটার্জি। ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন রবীন ঘোষ, ভবানীপুরে জ্ঞানতোষ চ্যাটার্জি। জর্জ টেলিগ্রাফে খেলেছেন ননী ব্যানার্জি, প্রলয়াংশু বিশ্বাস, কাশী মজুমদার ও নিত্যানন্দ ব্যানার্জি। ভবানীপুরে খেলেছেন মণি গাঙ্গুলী।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সত্যেন্দ্রনাথ গুঁই (মানা) ১৯২৭-৩৩ ভবানীপুরে, ১৯৩৪-৩৭ মোহনবাগানে, ১৯৩৮ ভবানীপুরে এবং ১৯৩৯-৪২ মোহনবাগানে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেন। তিনি ১৯40 সালে ভারতীয় হিন্দুদলের অধিনায়কত্ব করেন এবং ১৯৩৯-৪০ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দলে খেলেন। তিনি বহির্ভারতেও খেলতে গিয়েছেন। মোহনবাগান ও ভবানীপুর দু' দলেরই তিনি অধিনায়কত্ব করেন।

১৯৪৫ সালে দ্বিজেন সান্যাল (টনি) মোহনবাগানে ফুটবল খেলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সুভাষ সর্বাধিকারী বি, এন, আর, এরিয়ান্স ও মোহনবাগানে খেলেন এবং ১৯৫২ সালে হেলসিংকী অলিমপিকে ভারতীয় দলে খেলেন।

১৯৪১-৫০ দশকের কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়েরা হলেন—ধর্ম মজুমদার, হৃদয় দাস, ভূপেন দাস, মণি দাস, শান্তি ঘোষ, প্রমথ বসু (সকলেই এ্যালবার্ট ক্লাবে খেলেন) এবং সুরঞ্জন বিশ্বাস ও চাঁদু সেনগুপ্ত (জর্জ টেলিগ্রাফ)।

১৯৫১-৬০ দশকে খ্যাতি অর্জন করেন—সুজয় সর্বাধিকারী, মন্টু মৌলিক, জ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, তুষার চৌধুরী, নিশীথ বিশ্বাস, শচীন বিশ্বাস, প্রণব সরকার ও বুদ্ধদেব সরকার প্রভৃতি।

জেলার প্রাচীনতম ফুটবল শীল্ড টুর্ণামেন্ট হল ক্রফোর্ড শীল্ড। শিকারপুরের নীলকুঠির ক্রফোর্ড সাহেব প্রদত্ত এই শীল্ডে খেলতেন নদীয়ার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এবং ১৯২৮ পর্যন্ত নিয়মিত খেলা হয়েছে। এছাড়া ছিল, পি, সি, কাপ, রায়বাহাদুর কাপ, প্রভাস শীল্ড এবং ক্ষৌণীশ শীল্ড।

১৯৩০ সাল থেকে জেলায় হকি লীগ সুরু হয়। ১৯৩৮ সালে সেঞ্চুরী ক্লাব কলকাতার বেটন কাপে অংশ গ্রহণ করে

কৃতিত্ব দেখায়। বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্টবেঙ্গলের হকি টিমের অধিনায়ক ছিলেন (১৯৪৭-৪৮)। শ্যামা দাক্ষী যাদবপুর ইউনিভারসিটির হকিদলের অধিনায়কত্ব করেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ এগারটন স্মিথের (১৯২৪-২৬) উৎসাহে কৃষ্ণনগরে তথা নদীয়ায় ক্রিকেট খেলা সুরু হয়। অল ইণ্ডিয়া হিন্দু টিমের খেলোয়াড় ওয়াদেকার কৃষ্ণনগরে কয়েক বছর ক্রিকেট খেলেছেন।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে একসময় নিয়মিত টেনিস খেলা হত।

কৃষ্ণনগরের পঙ্কজ পাল চৌধুরী, অলক মুখার্জি ও অমরেশ মজুমদার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ব্যাডমিন্টনে সুহৃদ চ্যাটার্জি ও প্রভাস চক্রবর্তী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এ্যাথলেটিকসে রূপচাঁদ দফাদার লংজাম্পে বাংলায় রেকর্ড করেন। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা স্কুল প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করেন। অপর যাঁরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেন তাঁরা হলেন—নলিনী সান্যাল (১৯২১-২২), ফণীভূষণ গুঁই (১৯১৭-১৮), উমা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২৫), কালা ঘোষ (১৯২৪), সত্যেন গুঁই, হৃদয় দাস, সুরপ্রসাদ চ্যাটার্জি, নবকুমার ঘোষ—দূরপাল্লার দৌড়ে, শচীন মুখার্জি—হাই জাম্পে, সমর মুখার্জি—পোলভোল্টে এবং বর্শা নিক্ষেপে বিশ্বনাথ পাল।

স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় শিখাশ্যাম রায়চৌধুরী নিখিলভারত প্রতিযোগিতায় হাইজাম্পে প্রথম হন।

কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তর্কলেজ (মহিলা) ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কয়েকবার ১ম/২য় স্থান লাভের সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্যের মূলে কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজের ছাত্রী নমিতা সান্যালের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি জেলার বাইরেও কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হন। কৃষ্ণনগরের ভারতী মৈত্র ও রাণাঘাটের বন্দনা বিশ্বাসও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের মাঠে নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে সুরম্য 'নদীয়া জেলা স্টেডিয়াম'। বাংলাদেশের ফুটবলদল সর্বপ্রথম এই স্টেডিয়ামেই আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭২ সালে ইনদোনেশিয়া জাতীয় ফুটবল দলও এই মাঠে ফুটবল খেলেছেন। নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের পরিচালনায় জেলায় খেলাধুলা হয়ে থাকে। ১৯৭২ সালে স্টেডিয়ামে স্পোর্টস লাইব্রেরীর উদ্বোধন হয়েছে।

নদীয়া জেলা শারীর শিক্ষা ও যুবকল্যাণ আধিকারিকের পরিচালনায় নদীয়া জেলা-বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা (Nadia District School Sports Association) গঠিত। জেলার প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্থার উদ্যোগে জেলার বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের শীতকালীন খেলাধুলা, ফুটবল, হকি, ভলিবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আন্তর্জেলা প্রতিযোগিতায় এই সংস্থাদলও প্রতিনিধি পাঠায়। ১৯৭০ সালে আন্তর্জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া-দল বিজয়ী হয়ে রেনজারস্ জুবিলী ট্রফি লাভ করে। ১৯৭২ সালের আন্তর্জেলা স্পোর্টসে নদীয়া জুনিয়ার বালক বিভাগে দলগত ও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলাধুলার ভিত্তিতে নদীয়া জেলার বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী রাজ্য স্কলারশিপ পেয়েছে। জেলায় প্রতিবছর আন্তবিদ্যালয় ফুটবল খেলা (সুব্রত মুখার্জি কাপ) হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে খেলাধুলাব উন্নতির জন্য সরকার অনুদান দিয়ে থাকেন। খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, জিমনাসিয়াম নির্মাণ, মাঠ উন্নয়ন ও মাঠ না থাকলে জমি ক্রয়, বিদ্যালয়-সংলগ্ন নিজস্ব পুকুর থাকলে প্ল্যাটফরম নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে অর্থসাহায্য করা হয়।

জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ে মোট ৩০টি Physical Efficiency Test Drive Centre আছে। শ্রেষ্ঠ শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্নদের ব্যাজ (Star) দেওয়া হয়। এই জেলার অশোককুমার গুহ গত ১৯৬৬ সালে গোয়ালিয়রে সারা ভারত শারীরিক যোগ্যতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়।

এই জেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ৮০টি এন. সি. সি. গ্রুপ আছে।

নদীয়া জেলায় যুব-কল্যাণের জন্য Nadia District Youth Welfare Council সংস্থা আছে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০। গ্রামের ক্রীড়া ও যুব-উন্নয়ন কর্মসূচীতে জেলার বিভিন্ন ব্লকের গ্রামএলাকার যুবক্রীড়াসংস্থাগুলি আর্থিক সাহায্যাদি পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে।

এ জেলার বিভিন্ন যুবপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে মাঝে মাঝে Club Leaders' Training Camp অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদেরও শরীর শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

নদীয়ায় Youth Hostels Association of India-র শাখা আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এস. এম. বদরুদ্দীন

ধর্ম

'সমগ্র নদীয়ায় যত সংখ্যক শ্রীপাট বা বিখ্যাত দেবস্থান, মন্দির ও মসজিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিম্নবঙ্গের অন্য কোনও জেলায় সেরূপ নাই।' লিখেছেন কুমুদনাথ মল্লিক 'নদীয়া কাহিনী'তে।

নদীয়ার খ্যাতি নবদ্বীপে। পবিত্র গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ যুগ যুগ ধরে হিন্দুতীর্থ। নানা পালপার্বণ, পবিত্র স্নান এবং ক্রিয়াকর্মের জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে নবদ্বীপে। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম নবদ্বীপে। হিন্দু-কুল-চূড়ামণি মহারাজ আদিশূরের সময় থেকেই নবদ্বীপ হিন্দুতীর্থ হিসাবে বিখ্যাত। আদিশূর নবদ্বীপে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসেন। তাঁরা সাড়ম্বরে যাগযজ্ঞাদি করতেন। শূরনৃপতিরা নদীয়ায় ব্রাহ্মণদের গ্রামদান করেছেন। ক্ষিতিশূর যাগযজ্ঞাদির জন্য ব্রাহ্মণদের ৫৬টি গ্রামদান করেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত বংশী বিদ্যাবত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা)।

পালরাজাদের আমলে নদীয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়। নদীয়ায় বৌদ্ধপ্রভাবিত লোক দেবদেবীর সংখ্যা অসংখ্য। এইসব লোকায়ত দেবদেবীর মধ্যে উলা-বীরনগরের বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজিত 'উলাইচণ্ডী', আনুলিয়ার কাতিকীসংক্রান্তির ধর্মগাজন, নবদ্বীপের অনতিদূরে জহ্নুনগরের (জাননগর) 'গাছপূজা' উল্লেখ্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এইসব পূজার কথা উল্লেখ আছে।

নাকাশীপাড়ার শালিগ্রামে ছিল একদা বৌদ্ধপীঠ। নাকাশীপাড়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদুলালরঞ্জন সেনের কাছ থেকে জানা যায় যে শালিগ্রাম এলাকায় পুষ্করিণী পুনর্খননের সময় অনেক মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। এগুলি পালযুগের বৌদ্ধমূর্তি।

'নবদ্বীপমহিমা' থেকে জানা যায় যে নবদ্বীপের ষষ্ঠী, শীতলা, শিব, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধস্তূপ চৈত্যাদি থেকে প্রাপ্ত। 'নবদ্বীপে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে পাড়ডাঙ্গার শিব, যুগনাথ, মালোদেব শিবের নিকটস্থ ষষ্ঠীঠাকুরাণী, জয়দুর্গা ও দণ্ডপাণি বৌদ্ধভাবাপন্ন'।

পাড়ডাঙ্গার শিব হস্তপদহীন কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড। এই মূর্তি শূন্যের প্রতীক এবং প্রাচীনত্বে খ্যাত। সম্রাট অশোকের সময় থেকে এই মূর্তি পূজিত বলে অনুমিত হয়।

নবদ্বীপের যুগনাথ শিব লোড়াকৃতি প্রস্তরখণ্ড। এটিও প্রাচীন। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সময় থেকে এই মূর্তি পূজিত বলে অনুমিত হয়।

এছাড়া, নবদ্বীপে এবং নদীয়ার অন্যত্র অনেক প্রস্তরমূর্তি আছে যেগুলি একদা ছিল বৌদ্ধদেবদেবী, পরে হয়েছে হিন্দু-দেবদেবী। প্রস্তরশিল্প বৌদ্ধযুগেই ছিল সমৃদ্ধ। নদীয়ার বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত অখণ্ড ও খণ্ডিত ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে একদা নদীয়ায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ ছিল না। নদীয়া দীর্ঘদিন বৌদ্ধরাজাদের শাসিত ছিল। ফলে নদীয়ায় তখন জাতিভেদপ্রথা লোপ পেয়েছিল।

নদীয়ায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মও প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম অহিংসামূলক কিন্তু তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে হিংসামূলক বলিদান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রথা প্রচলিত হয়। নবদ্বীপের অনতিদূরে বৈশাখী (বুদ্ধ) পূর্ণিমায় পূজিত লোকায়ত দেবতা বুড়োরাজের (বুড়োশিবের 'বুড়ো'+ধর্মরাজের 'রাজ') পূজায় অসংখ্য পশুবলি আজও হয়ে থাকে।

সেনরাজাদের আমলে নদীয়ায় হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়। সেনরাজারা সমাজশাসনের অবসর পেয়েছিলেন। 'নবদ্বীপ-মহিমা' অনুযায়ী, এই সময় দেশে ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তারমধ্যে ৬৫০ ঘর রাঢ়ী এবং ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র। বল্লালসেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ এবং দানসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের কুলীন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কুলীনদের মধ্যে সদাচার রক্ষা করবার জন্য কুলাচার্য নিযুক্ত করেন। শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যেই নয়, বল্লালসেন হিন্দুধর্মের অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও সমাজশাসন করেন এবং সামাজিকনিয়মবিধি প্রবর্তন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা দিল কুফল। পদমর্যাদা নিয়েই গোলমাল। একে অপরকে হীন ভাবতে লাগলেন। ফলে হিন্দুসমাজে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা এবং অসাম্য। তখন রাজা লক্ষ্মণসেন 'সমীকরণ' করলেন---কুলমর্যাদায় সকলেই সমান।

এই সময়েও সমাজের অন্ত্যজেরা লোকদেবদেবীর পূজার্চনা করতেন।

এই সময়েই নদীয়ায় দেখা দেয় ধর্মের গ্লানি। ধর্মাধর্ম ক্রিয়াকাণ্ড অনেকে ভুলে যায়। অধর্মে সমাজ হয়ে ওঠে অসুস্থ।

এমন সময় বখ্তিয়ার দখল করলেন নদীয়া। বখ্তিয়ার হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তিনি নদীয়ায় হিন্দু দেবদেবীর মন্দির বিনষ্ট করেছিলেন কী না---এ সম্পর্কে মিনহাজ নীরব। তবে মুসলমান আমলে নদীয়ায় ইসলামধর্ম প্রবর্তিত হয় এবং মন্দিরাদি বিনষ্ট হয়। দেশের শাসনকর্তা মুসলমান। তাই বৈষ্ণব ও শৈবেরা শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। 'বীরাচারী তান্ত্রিকেরা তখন বামাচারী।' 'নদীয়াকাহিনী' থেকে জানা যায় যে তখন নদীয়ায় বীরাচার, পশ্বাচার, ভৈরবীচক্র ও পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় হিন্দুরা উন্মত্ত। অস্পৃশ্যতায় হিন্দুসমাজ ক্ষতবিক্ষত।

এমন সময় নবদ্বীপে অধর্মের গ্লানি দূর করতে আবির্ভূত হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গমহাপ্রভু। মহাপ্রভু এবং তাঁর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও যবন হরিদাস প্রভৃতি পার্ষদদের প্রভাবে

সারা নদীয়ায় প্রেমভক্তিময় ধর্মভাব জাগ্রত হল। দূর হল ভেদাভেদ।

কিন্তু সাময়িক সাম্য দেখা দিলেও রক্ষণশীলতা হিন্দু-সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে গোপন ছিল। ফলে, শ্রীচৈতন্যের অল্পদিন পরেই ভেদাভেদ দেখা দিল। অন্ত্যজেরা অপাঙ্ক্তেয় হলো। ফলে চৈতন্য সম্প্রদায় অনেক উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেন এবং এই উপ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা কেউই ব্রাহ্মণ নন।

চৈতন্য-উপসম্প্রদায়গুলি হল বাউল, ন্যাড়া, নেড়ী, সহজিয়া, গৌরবাদী, দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা, সাহেবধনী, আউল, খুশী-বিশ্বাসী, বলরামী, কুলিগায়েন ও ফকির প্রভৃতি।

বাউলেরা নিজেদের সাধনপ্রণালী প্রকাশ করেন না। অক্ষয়-কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' থেকে জানা যায় যে বাউলদের ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতি সাধন সংক্রান্ত নিগূঢ়ভাব সাংকেতিক শব্দে সন্নিবেশিত।

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র প্রবর্তিত উপসম্প্রদায় হল ন্যাড়ানেড়ী।

সহজিয়া-মত নিগূঢ়। সাধনভজন প্রণালীর আশ্রয় হল নাম-প্রেম-ভাব-মন্ত্র এবং রস।

গৌরবাদীদের মতে রাধাকৃষ্ণ মিলিত হয়ে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন।

দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সনাতন গোস্বামী। দরবেশরা 'দীনদরদী' নাম উচ্চারণ করেন। দরবেশ ফারসী শব্দ। দরবেশ-সম্প্রদায়ে মুসলমানেরাও আছেন।

সাঁইও হিন্দু-মুসলমান ধর্মমিশ্রিত। বিখ্যাত লালন ফকির হলেন সাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত।

কর্তাভজার প্রবর্তক আউলচাঁদ। ঘোষপাড়া হল কর্তা-ভজাদের পীঠ। আউলচাঁদের শিষ্য রামশরণ পাল এবং তাঁর স্ত্রী হলেন সতীমা।

সাহেবধনীদের পীঠ হল নাকাশীপাড়া থানার নাংলা গ্রামের সাহেবতলা। প্রবর্তক দুঃখীরাম পাল হলেও সাহেবতলায় একজন পীরসাহেবের সমাধি আছে। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সাহেবতলা জাগ্রত স্থান।

আউল কর্তাভজাদের অনুরূপ।

কালীগঞ্জ থানার ভাগার খুশী বিশ্বাস নামে এক ধার্মিক মুসলমান প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম খুশী-বিশ্বাসী।

অবিভক্ত নদীয়ার মেহেরপুর গ্রামের বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত সম্প্রদায় হল বলাহাড়ি বা বলরামী সম্প্রদায়। দেশভাগের পর তেহট্টের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে বলারামীদের আখড়া স্থাপিত হয়েছে। বলাহাড়ী নিরক্ষর এবং ঘোর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন। এক-সময় তাঁর শিষ্য-শিষ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০।

কুলিগায়েন শৈবউপ-সম্প্রদায় হলেও বৈষ্ণবানুগ পন্থায় বিশ্বাসী। রাতভিখারী সম্প্রদায়ের মতো কুলিগায়েনরা রাতেও ভিক্ষা করেন দলবেঁধে। নবদ্বীপের শ্রীনিবাস আচার্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

একসময় কৃষ্ণনগরে ফকির নামে এক মুসলমান উপাসক সম্প্রদায় ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহকর্মী কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্তকে জানিয়েছিলেন যে ফকিরেরা ছদ্মবেশী কর্তাভজা, এঁরা পীর পয়গম্বর মানেন না।

এছাড়া, 'নদীয়াকাহিনী' থেকে জানা যায় যে নদীয়ায় নাগা, অবধূত, কিশোরভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী, তিলকদাসী, রাধাবল্লভী, হরিবোলা, সখীভাবক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাসক-দের অস্তিত্ব আছে।

নদীয়ায় সিয়া মুসলমান নেই বললেই চলে। নদীয়ায় সুন্নী ও মোহম্মদী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা আছেন। নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছর সাড়ম্বরে মহরম, আখিরী-চাহার-সুম্বা, ফতেহাদোয়াজদোহান, শবেবরাত, ঈদুলফেতর ও ঈদুজ্জোহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নদীয়ায় অনেক-গুলি প্রাচীন মসজিদ আছে। শান্তিপুরের তোপখানা এবং বাগেব গ্রামের মসজিদ প্রাচীনত্বে খ্যাত। এ ছাড়া, লোকায়ত পীর-ফকির গাজির কাছে মুসলমানেরা ধর্মানুষ্ঠান করেন। হিন্দুরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং লোকদেবদেবী হিসেবে মানেন।

ইংরেজ শাসনকালে নদীয়ায় খ্রীস্টধর্ম প্রচলিত হয়। এখানে রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট দুই সম্প্রদায়ের খ্রীস্টানেরা আছেন। ১৮১১ খ্রীঃ চার্চ অব ইংলনডের 'লনডন চার্চ মিশ-নারী'র পাদরীত্রয় হিল, ওয়ারডেন এবং ট্রাউইন শান্তিপুরে আসেন এবং মিশনকেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন করেন। ১৮৩২ খ্রীঃ পাদরী ডিয়ার কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে বিদ্যালয়স্থাপন করে ব্যাপকভাবে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে মোট ৫৬০ জন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। নদীয়ায় প্রথম (১৮৩৮) চার্চ নির্মিত হয় ভবেরপাড়া গ্রামে (সাম্প্রতিক কালের মুজিবনগরের অদূরে)। তারপরে ১৮৪১ খ্রীঃ চাপড়া ও কৃষ্ণনগরে প্রোটেস্টান্ট চার্চ নির্মিত হয়। ক্যাপটেন স্মিথ গির্জার নকশা তৈরি করেন। ১৮৪৩ সালে নদীয়ায় খ্রীস্টানদের সংখ্যা ছিল ৩,৯০২ জন। ১৮৫৭ খ্রীঃ ফাদার লইগী লিমানা কৃষ্ণনগরে আসেন এবং তিনি যে বাড়িতে তখন থাকতেন সেই বাড়িটিই ছিল রোমান ক্যাথ-লিক গির্জা। পরে ১৮৯৮ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে রোমান ক্যাথেড্রাল গির্জা নির্মিত হয়।

১৯০১ সালের জনগননায় দেখা যায় যে নদীয়ায় ভারতীয় খ্রীস্টান ছিলেন (রোমান ক্যাথলিক ২,১২৫ ও প্রোটেস্টান্ট ৫৭১৫) মোট ৭,৮৪০ জন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য হলেন নদীয়ার পালপাড়ার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু নদীয়ায় ব্রাহ্মধর্ম বিশেষ প্রচারিত হয় নি। নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়ের সময়ে কৃষ্ণনগরে রাজ-বাড়িতে রাজপোষকতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা থেকে একজন অন্ত্যজকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন রক্ষণশীল সমাজের চাপে মহারাজ রাজবাড়ি থেকে ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়ে দেন। পরে রাজবাড়ির অদূরে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ী যুবকবয়সে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁর সঙ্গে আরও অনেক যুবক ব্রাহ্ম হন।

শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায় হলেও অদ্বৈতাচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর শান্তিপুর এবং নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারিত হয়। তিনিই সংকীর্তনকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গীভূত করেন। পরে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব হন। শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজমন্দির আছে। চাকদহে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় ১৮৪৫ খ্রীঃ।

এছাড়া নদীয়ায় জৈন, বৌদ্ধ এবং পার্শী ধর্মাবলম্বীরা আছেন। ১৮৯১ সালের জনগণনার ধর্মাবলম্বী চিত্র নিচে দেওয়া হল। এই বছর নদীয়ায় ধর্মভিত্তিক বিশেষ আদমসুমারী হয়।

ধর্মাবলম্বী	পুরুষ	মহিলা	মোট
হিন্দু	৩৩৩১৪৯	৩৫৫০৭৫	৬৮৯২২৪
মুসলমান	৪৬৪০৮১	৪৮৩৩০৯	৯৪৭৩৯০
খ্রীষ্টান	৩৮১০	৩৪৮৭	৭২৯৭
জৈন	৭৩	৬৬	১৩৯
ব্রাহ্ম	২৯	২৪	৫৩
জিউ	১	--	১
বৌদ্ধ	৪	--	৪

নদীয়ার সাম্প্রতিক ধর্মাবলম্বী জনগণনা চিত্র নিচে দেওয়া হল (১৯৭১):

ধর্মাবলম্বী	পুরুষ	মহিলা	মোট
হিন্দু	৮৭০৯২৯	৮২২০৭৭	১৬৯৩০০৬
মুসলমান	২৬৫৭৯৭	২৫৪৭৭৪	৫২০৫৭১
খ্রীষ্টান	৮০৬২	৮২৭৫	১৬৩১৭
শিখ	৪২	৩৫	৭৭
বৌদ্ধ	২৪	৩১	৫৫
জৈন	৯৩	৭৫	১৬৮
অন্যান্য	৩০	২৬	৫৬
ধর্ম উল্লেখ করেননি		--	৭

সতীদাহ :

ধর্মের সঙ্গে সতীদাহ প্রথার প্রত্যক্ষ যোগ। একদা নদীয়ায় হিন্দু সদ্যবিধবাদের মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণবিসর্জন দেওয়ানো হত তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অমানুষিক নির্মমভাবে —তথাকথিত স্বর্গলাভের (?) জন্য। সতীদাহের মর্মান্তিক বিবরণ আছে 'নদীয়াকাহিনী'তে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ায় প্রায় পাঁচশো সতীদাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি সতীদাহ হয়েছিল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৮, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ জন।

সন্তান বিসর্জন :

নদীয়ায় এক সময় গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এবং গঙ্গাবক্ষে শিশু পুত্রকন্যা বিসর্জনের কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। Calcutta Review (Vol-VI, Page 421-29) পত্রিকায় নদীয়ার সন্তান বিসর্জনের মর্মন্তুদ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

নরবলি :

নদীয়ায় একসময় নববলি প্রথাও চালু ছিল। ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত নাকি নদীয়ায় গোপনে ও প্রকাশ্যে নরবলি হত।

প্রায়শ্চিত্ত :

নদীয়ায় একদা কোন হিন্দু ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করলে (অবশ্য তৎকালীন সমাজপ্রধানদের বিধান অনুসারে) যাগযজ্ঞাদি করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

পুরাকীর্তি

মালদহ জেলার গৌড়, পাণ্ডুয়া, আদিনা; পশ্চিমদিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, অগ্রদিগুণ; ২৪ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা, হরিনারায়ণপুর এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পান্নার মতো পুরাকীর্তির বিস্ময়কর আবিষ্কারে নদীয়া জেলা সুসমৃদ্ধ না হলেও এই জেলা পুরাকীর্তির দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বোক্ত বা অন্যান্য জেলার চেয়ে যে খুব একটা পেছনে পড়ে নেই, তা বর্তমান নদীয়ার নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। অবশ্য বেড়াচাঁপার (২৪ পরগণা) চন্দ্রকেতু গড়ে মৌর্য ও গুপ্তযুগের শহর ও বন্দর, কিংবা বাণগড়ে-মৌর্য-শুঙ্গ আমলের বহু জিনিষপত্র বা ব্রাহ্মী হরফে পোড়ামাটির সীলমোহর অথবা মহাস্থানগড়ের (বগুড়া জেলা—বাঙলাদেশ) গুপ্তযুগের পুরাকীর্তির মতো দুর্লভ বস্তু নদীয়া জেলায় পাওয়া না গেলেও এর থেকে এই জেলার অর্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয় না, যেমন হয় না মেদিনীপুর জেলার পান্নাগ্রামের, যেখান থেকে কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে গুপ্তযুগের বহু পুরাবস্তু। দিগন্তপ্রসারী মাঠ, খানা ডোবায় ভরা মেদিনীপুর জেলার পান্না গ্রামটিতে যে এত প্রাচীন পুরাবস্তুর ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হতে পারে একথা কেই বা ভাবতে পেরেছিল? কেই বা জানত শিলাই নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার বছর আগের এক সভ্যতার অস্তিত্ব? সে সবই নদীর পলিমাটির আস্তরণে চাপা পড়ে যুগ যুগ ধরে বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিল। আবার আজ থেকে আশীবছর আগে গৌড়ের পূর্বে ভাতিয়ার বিলের কাছে খালিমপুর গ্রামের একটি উঁচু জায়গায় চাষ করতে করতে লাঙলের ফালে উঠে আসা এক তাম্রফলকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রজাবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধি গোপালদেবের রাজ্যকালের যে গৌরবময় ইতিবৃত্ত উদঘাটিত হয়েছে, সেকথা তো অজ্ঞাতই থেকে গেছে এতদিন পর্যন্ত। পালবংশের মহান্ রাজা ধর্মপালদেবের এই তাম্রশাসনে পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের বংশপরিচয় ও বাঙলার ইতিহাসের এক বিলুপ্ত অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

পশ্চিমদিনাজপুর ও মালদহের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত নদীয়া জেলায় সুপ্রাচীন কোন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পলিমাটির আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে না এলেও এককালে যে এ অঞ্চল নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গের মতো সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার আলোকে আলোকিত ছিল না, সেকথা জোর করে বলা যায় না। সুপ্রাচীন মার্কণ্ডেয় ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত নয়টি দ্বীপের মধ্যে নবম দ্বীপটিকে নবদ্বীপ বলে অনুমান করা যায়। সে সময় নবদ্বীপ এবং পরবর্তিকালে যা নদীয়া নামে খ্যাত তার প্রান্তবর্তী ছিল সমুদ্র। বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তীর (যিনি ঘনশ্যাম দাস নামেও পরিচিত) 'ভক্তিরত্নাকরে' এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশে' নবদ্বীপ 'নগ্‌গদিবো' নামে উল্লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সিংহবাহর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহের উল্লেখ আছে, যিনি বুদ্ধদেবের নির্বাণ দিনে সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ কথা সত্য হলে নবদ্বীপের অস্তিত্ব যে আড়াই হাজার বছরেরও আগে তা অনুমান করা যায়। এ দ্বীপ গ্রীকপর্যটক টলেমির সময়েও গঙ্গারাষ্ট্রের যে অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তা জানা যায়। গঙ্গারিডি প্রদেশের রাজধানী ছিল পালিবোথ্রা বা পাটলিপুত্র, আর এই প্রদেশের পূর্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত হত গঙ্গানদী। গঙ্গানদীর দুই কূলে প্রসারিত হয়েছিল সুপ্রাচীন গাঙ্গেয় সভ্যতা। নদীয়া যে একসময় সে সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'মহাবংশ' থেকে অনুমিত নবদ্বীপ বা 'নগ্‌গদিবো' ঠিক বর্তমানের নদীয়া কিনা তা বলা কঠিন। গ্রাম্যভাষায় আজও নবদ্বীপ বা নদীয়ার 'নাগোদিপ' নামে পরিচিতি এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও 'নগোদিপির ভসচাজ্জি' প্রভৃতির ব্যবহার দেখে 'মহাবংশ'-কথিত 'নগ্‌গদিবো'ই যে বর্তমানের নবদ্বীপ তা অনুমান করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। কিন্তু নবদ্বীপ বা নদীয়ার প্রাচীনত্ব প্রমাণে এ সবই প্রায় অনুমানমাত্র।

সে যাই হোক আজ পর্যন্ত নদীয়া থেকে পুরাকীর্তির যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে অনেকগুলি নদনদী-অধ্যুষিত এ অঞ্চলে সুপ্রাচীন কোন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নি। সেন আমলের দুএকটি তাম্রশাসন বা গুপ্ত ও পালযুগে নির্মিত বলে অনুমিত কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি, সেনরাজবংশের গঙ্গাতীরবর্তী প্রাসাদের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া হিন্দু বা তৎপূর্ববর্তী আমলে নির্মিত এ জেলার উল্লেখযোগ্য কোন পুরাকীর্তির নিদর্শন আছে বলে মনে হয় না। তাই পুরাকীর্তির নব নব বিস্ময়কর আবিষ্কারে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলা যেমন তার প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাস ও সংস্কৃতির রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে, সেদিক থেকে নদীয়া যে বহুলাংশে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বলাই বাহুল্য। ভূপ্রকৃতির এই নীরবতা ভঙ্গ করে নদীয়া যে কবে তার সম্ভাব্য লুপ্ত ইতিহাসের দ্বার নব নব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করবে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বপ্রেমীরা তারই জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এই জেলার পুরাকীর্তির আলোচনায় তাই আমাদের সুনিশ্চিতভাবে সেন আমল থেকেই যাত্রা সুরু করতে হবে, বড়জোর পাল আমল পর্যন্ত এর সীমারেখা টানা যেতে পারে। শহর নবদ্বীপে অবস্থিত প্রাচীন কয়েকটি প্রস্তরমূর্তিতে বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষ্য করে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজগণের রাজ্যের অন্তর্গত এই নবদ্বীপ বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। এবং নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপের অংশ সুবর্ণবিহারে প্রাপ্ত ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করে এই অনুমান সত্য বলে স্বীকার করেছেন। (১)
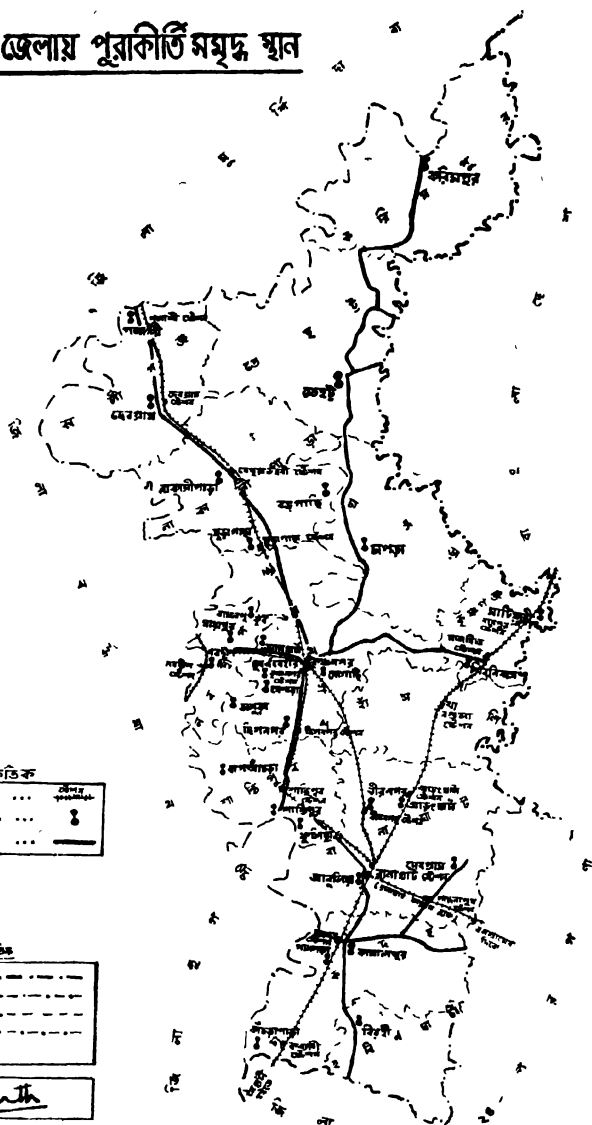
কিন্তু তা হলেও অনুমানকে ইতিহাসের সুনিশ্চিত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। অশোকের সময় থেকে পালরাজগণের রাজত্বকাল পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ২৫০-৯০০ খ্রীঃ অঃ) বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাধান্যের কথা স্বীকৃত হলেও নদীয়ায় সুবর্ণবিহারের ধ্বংসস্তূপ তার প্রমাণ কিনা সে বিষয় সন্দেহাতীতরূপে স্থিরীকৃত হয় নি। তবে পূর্বোক্ত গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও তৎপরবর্তিকালে পালবংশের মহান্ রাজা ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন থেকে একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে বারেন্দ্র-ভূমি ও গাঙ্গেয় উপত্যকার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ পালরাজাদের অধীন ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময়েই এ অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব বেশী করে পড়ে। তাহলে শশাঙ্ক ও পালরাজগণের আগেও এ অঞ্চলে কোন না কোন রাজার অধিকার যে বিস্তৃত ছিল, তা মনে করা যায়। নদীয়া বলে বর্তমানের ন্যায় নির্দিষ্ট সীমারেখাযুক্ত ভূভাগের জন্ম যে তখন হয় নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় উপলক্ষ্য করে প্রাচীন নদীয়ার ইতিহাস রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজুদ্দীনের 'তবকাত্-ই-নাসিরি'তেই সর্বপ্রথম 'নোদিয়াহ্'এর উল্লেখ পাওয়া যায় যার রচনাকাল ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ বঙ্গবিজয়ের সাতান্ন বছর পরে। অতএব এই নাম যে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই চালু ছিল তা মনে করা যায়। মিন্‌হাজের প্রায় তিন শ বছরেরও বেশী পরে আকবরের সময়ে ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'নোদিয়াহ' বা নদীয়াকে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। তখন এই অঞ্চল ছিল জনবিরল, কিন্তু জ্ঞানিগুণী অধ্যুষিত।(২) বঙ্গবিজয়ের পরে মিন্‌হাজুদ্দীন লক্ষ্মণসেনের (যাকে তিনি 'রায় লখ্‌মণিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন) গঙ্গাতীরবর্তী বিশাল রাজপ্রাসাদ ও নিকটবর্তী অরণ্যসমাকীর্ণ ভূভাগ দেখেছিলেন যার মধ্যে লুকিয়েছিল বখ্‌তিয়ারের সৈন্যবাহিনী। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের রাজধানীও ছিল এই নদীয়ায়। এর নাম ছিল বিজয়পুর। বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন কর্ণাটরাজ্য থেকে এসে ভাগীরথীতীরে নবদ্বীপে তাঁর রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ স্থাপন করেছিলেন। (৩) ভাগীরথী তীরবর্তী নবদ্বীপে সেনরাজাদের সেই বিশালাকার প্রাসাদসমূহ কালক্রমে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। জলাঙ্গীর উত্তরে অবস্থিত বল্লাল ঢিবি ও বল্লাল দীঘি সেই প্রাচীন রাজবংশের স্মৃতিটুকু নিয়ে আজ কোনক্রমে টিকে আছে। বল্লালদীঘির কাছ দিয়ে তখন প্রবাহিত হত ভাগীরথী আর তার তীরেই অবস্থিত ছিল বল্লালসেনের বিরাট্ প্রাসাদ। বিগত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেও গঙ্গা এই স্থান দিয়ে প্রবাহিত হত, আর নদীর পাড়ভাঙার জন্যে মাটীর মধ্য থেকে সেই অট্টালিকা বেরিয়ে পড়েছিল এবং গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সে সময় অনেকেই তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। বর্তমানে বামুনপুকুর অঞ্চলে 'বল্লাল ঢিবি' বলে যা পরিচিত, সেটি সামন্তসেনের গঙ্গাতীরবর্তী বাসস্থানের ধ্বংসস্তূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। (৪) নদীয়ায় সেনরাজাদের রাজধানী স্থাপনের পর থেকে এ অঞ্চলে হিন্দুধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে নানাবিধ সুদৃশ্য ইমারত ও দেবালয়ও নির্মিত হয়ে থাকবে। মুসলমান বিজয়ের পর এইসব ইমারত ও সৌধ যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। নদীয়ায় আজ তাই হিন্দু বা তৎপূর্ববর্তী আমলে নির্মিত একটিও সৌধের নিদর্শন নেই, যা থেকে সেন আমলের অনেক কথা জানা যেতে পারত। চাকদহের কাছাকাছি পালপাড়ার প্রাচীন চারচালা মন্দিরটি হিন্দু আমলের নির্মিত বলে কারও কারও ধারণা।(৫) কিন্তু এটা যে ভ্রান্ত, পরবর্তী আলোচনায় তা বোঝা যাবে। List of Ancient Monuments in Bengal (1896) গ্রন্থে এ মন্দিরটিকে তখন থেকে ৫০০ বছরের পূর্ববর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব হিন্দু আমলের অনেক পরবর্তী যে এ মন্দিরটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খ্রীষ্টীয় তের শতকের সুরুতে নদীয়া জয় করে গৌড়ের রাজধানী 'লখ্‌নাবতী'তে তাঁর রাজধানী ('দার-উল্-মুল্‌ক') স্থাপন করেছিলেন বলে মিন্‌হাজুদ্দীন উল্লেখ করেছেন।(৬) নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ তার পরেও বহুকাল ছিল বলে জানা যায়। ধোয়ী কবি বিরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারে একটি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ছিল। এই শ্লোকে সভার পঞ্চরত্ন গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজের নামের উল্লেখ ছিল। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাস তাঁর 'কড়চায়' (?) বল্লালদীঘির কাছাকাছি এটিকে বল্লাল রাজার বাড়ী বলে উল্লেখ করেছেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বল্লাল-দীঘিতে স্নান করতেন বলে গোবিন্দদাস উল্লেখ করেছেন। কবি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে একথা লিখে গেছেন :

> প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়।
> কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সায়র॥
> বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
> ডাঙ্গাচূরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥
>
> (গোবিন্দদাসের কড়চা)

বল্লালরাজার বাড়ী বলে পরিচিত সেই বিশাল প্রাসাদটি ষোল শতকের গোড়ার দিকেই ভগ্নদশায় উপস্থিত হয়েছিল। সেন-রাজাদের আমলের যা কিছু নিদর্শন তা এইসব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। ভাগীরথীর গতি-পরিবর্তন ও তীরের ভাঙনে সে সব প্রাচীন ইমারত প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মুসলমান আক্রমণের ফলে সে যুগের হিন্দুমন্দিরগুলি, যার কোনরূপ ধ্বংসাবশেষ ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে আজ আর বেঁচে নেই।

মসলমানরাজত্বকালে দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে নদীয়ার প্রাচীন কীর্তির কোন নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ সময়কে ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা যায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সব কিছুরই অগ্রগতি এ সময়ে যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষোল শতকের সুরুতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যায় এইসব দিক থেকে রুদ্ধ

বাঙালী জাতি আবার নবজীবন লাভ করল। শিল্প ও সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ বিকাশ ঘটল এই সময়ে। নবদ্বীপ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সমগ্র নদীয়ায় তথা বঙ্গে নব বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় হল। শ্রীচৈতন্যের নববৈষ্ণবধর্মের ছোঁয়া এ যুগের সাহিত্য ও শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এ সময় এল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। মন্দিরশিল্প ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য অদ্ভুতভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। বাঙলাদেশের নানাস্থানে অসংখ্য মন্দির পোড়ামাটি ও পাথরের কারুকার্যশোভিত হয়ে বিরাজ করতে লাগল। চৈতন্যোত্তর-যুগের এসব মন্দির বাঁকুড়াজেলার বিষ্ণুপুরে, হুগলী ও বর্ধমান জেলায়ও বহু নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু নদীয়ায় এযুগে নির্মিত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির নেই বললেই চলে। অবশ্য পালপাড়ার মন্দিরটিকে এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠাকাল নির্দেশক লিপির অভাবে এটি ঠিক কোন্ সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলা কঠিন। তবে এই মন্দিরের সামনের একাংশে পোড়ামাটির যে ভাস্কর্যগুলি রয়েছে তাদের কারুকার্য ও গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্য করে মন্দিরটিকে চৈতন্যের অল্প পূর্ববর্তী বলে মনে করা যেতে পারে। রামায়ণোক্ত লঙ্কাযুদ্ধ বা রাম-রাবণের যুদ্ধ যা চৈতন্যোত্তরযুগের মন্দিরভাস্কর্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল, পালপাড়ার এই চতুঃশাল বা চারচালা মন্দিরে তার নিদর্শন আছে। তবে এ মন্দিরে সন্নিবিষ্ট ইঁটের আকৃতি, বর্ণ, ও সর্বোপরি মন্দিরের সামগ্রিক গঠন-বিন্যাস লক্ষ্য করে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালের অল্প পূর্ব বা পরবর্তী বলতে হয়। বহু পরবর্তিকালে নির্মিত নদীয়া-জেলার অন্যান্য চতুঃশাল মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। পালপাড়ার এ মন্দিরটিকে যদি চৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে বা পরে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে নদীয়ায় এসময়ে এইটিই একমাত্র টিকে থাকা ইমারত বলে মনে করা যেতে পারে। এই মন্দির-টিকে বাদ দিয়ে নদীয়ায় পনের বা ষোল শতকে নির্মিত কোন প্রাচীন ইমারত আর আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমান শহর-নবদ্বীপ বা নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যেসব মন্দির দেখা যায় সেগুলি পালপাড়ার এই মন্দিরটির তুলনায় যে খুবই অর্বাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তিযুগে (বিশেষ করে ষোল শতকে) বা তৎপূর্বে নির্মিত কোন ইমারত বা সৌধ নদীয়ায় আজ আর অবশিষ্ট নেই। এই জেলায় এ ধরনের ইমারত বা সৌধের আশ্চর্যজনক অনু-পস্থিতি পুরাতত্ত্বপ্রেমীদের যে বিস্মিত ও ব্যথিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা বা অর্থহীনযুক্তির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেউ কেউ হয়তো ভাগীরথীর সর্বগ্রাসী তরঙ্গমালার কথা উল্লেখ করবেন যার কবলে পড়ে সে যুগের প্রসিদ্ধ ইমারত বা স্থানগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, যেমন শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপের ঠিক কোন্ স্থানে, তা আজ কারুর পক্ষে সুনিশ্চিত-ভাবে বলা সম্ভব নয়। বিখ্যাত বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিতেও এ যুগে নির্মিত ইমারত বা সৌধের সুস্পষ্ট কোন উল্লেখও পাওয়া যায় না যার থেকে এ শতকের পুরাকীর্তিগুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারত। নদীয়ার আশ-পাশের জেলাগুলিতে যেমন, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও হুগলীতে ষোল শতকের শেষের দিকে তৈরী অনেকগুলি মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যেমন সুন্দর নিদর্শন মেলে, এ জেলায় সে ধরনের নিদর্শন প্রায় একটিও নেই বললেও চলে।

নদীয়ার বর্তমান মন্দির সৌধগুলির (অবশ্য প্রাচীনত্বের দিক থেকে) প্রায় সবই নির্মিত হয়েছিল নদীয়ারাজবংশের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পর থেকে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের কাল থেকে (১৬০৬ খ্রীঃ অঃ) তাঁর পৌত্র রাঘবের পূর্ববর্তী কালপর্যন্ত কোন মন্দির বা উল্লেখযোগ্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষ তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত বানপুরের সন্নিহিত মাটিয়ারী গ্রামে ভবানন্দ মজুমদার-প্রতিষ্ঠিত গড় ও অট্টালিকার ক্ষয়িষ্ণু লুপ্তপ্রায় প্রাচীরের অংশ ছাড়া ওখানে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায়ের প্রতিষ্ঠিত বলে পরিচিত রুদ্রেশ্বর শিবের একটি চারচালা মন্দির গড়ের কিছুদূরে এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু ভবানন্দ প্রতিষ্ঠিত কোন দেবমন্দিরের অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে বের করার কোন উপায় নেই। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাঘবের সিংহাসনলাভের পর থেকে নদীয়ায় মন্দির-স্থাপত্যভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা দেখা যায়। রাঘব স্বয়ং এই যুগের সূচনা করেন কয়েকটি সুন্দর দেবালয় নির্মাণ ক'রে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হলো দিগনগরের রাঘবেশ্বরের, যার পোড়ামাটির অলঙ্করণ-ভাস্কর্য খুবই উন্নতমানের বলে অনেকের ধারণা। সতেরো শতকের শেষের দিক (১৬৬৯ খ্রীঃ অঃ) এই মন্দিরটির নির্মাণ-কাল। রাঘবের প্রতিষ্ঠিত আরও দুএকটি মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন 'মর্দানা' নামক গ্রামের (যার নাম তিনি 'শ্রীনগর' রেখেছিলেন) একটি মন্দির। এর প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক লিপিতে রাঘবের নামের উল্লেখ ছিল।(৭) নবদ্বীপেও তিনি গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলেন, পরে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র রুদ্র মন্দিরটি সমাপ্ত করেন।(৮) শেষোক্ত দুটি মন্দিরের আজ আর কোনটিরই অস্তিত্ব নেই। শান্তিপুরের মতিগঞ্জ-বেজপাড়ায় সুন্দর কারুকার্যময় ও সুউচ্চ জলেশ্বর মন্দিরটিও রাঘবের প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে সেটি ঠিক কার প্রতিষ্ঠিত তা নিশ্চিত-ভাবে বলা যাবে না। অবশ্য জলেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে রাঘব-প্রতিষ্ঠিত দিগ্নগরের মন্দিরটির এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র উচ্চতা ছাড়া গঠন, অলঙ্করণ-বিন্যাস ও সুন্দর সুন্দর নক্সাকাজের সঙ্গে রাঘবেশ্বর মন্দিরের বেশ মিল আছে। তাছাড়া দিগ্নগরের রাঘবেশ্বরমন্দির ও মাটিয়ারীর (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) রুদ্রেশ্বর মন্দিরও প্রায় একই ধরণের—তবে প্রথমটিতে পোড়ামাটির কাজ অনেক বেশী। রাঘবেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েকবছর আগে শান্তিপুরের কাছাকাছি বাগআঁচড়া (ব্রহ্মশাসন) গ্রামে চাঁদরায় নামে এক

ব্যক্তি সুন্দর একটি মন্দির তৈরী করেছিলেন যেটিকে মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বাংলা আটচালা শ্রেণীতে ফেলা যায়। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৮৭ শকাব্দ বা ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ। মন্দিরটির অদ্ভুত কারুকার্য ও নক্‌শা সেকালের মন্দিরভাস্কর্যকলার সবিশেষ পরিচয় দেয়। সেটি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বাগআঁচড়ার বিধ্বস্ত মন্দির ও দিগ্‌নগরের বর্তমান রাঘবেশ্বর মন্দিরের পূর্ববর্তী কোন মন্দির নদীয়ায় ছিল কিনা বলা কঠিন (অবশ্য পালপাড়ার মন্দিরের কথা বাদে)। থাকলেও সে সম্পর্কে জানার আজ আর কোন উপায় নেই। তবে এই জেলার কিছু কিছু দুর্গম পল্লীতে ঘুরলে কোন কোন ধ্বংসপ্রায় মন্দির চোখে পড়ে, অবশ্য প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে এগুলিকে আরও আগে ফেলা যাবে কিনা চিন্তা করার বিষয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণপূর্ববর্তী দোগাছি গ্রামের একটি ধ্বংসপ্রায় মন্দির ও চাকদহ স্টেশন থেকে প্রায় ৬ মাইল পূর্বে কামালপুর গ্রামের বিধ্বস্ত জোড়া আটচালা মন্দির। শেষোক্ত স্থানে ভগ্ন লিপির অংশ এখনও বিদ্যমান। একদা নদীয়ায় অবস্থিত আলমডাঙা স্টেশনের ৪ মাইল পূর্বদক্ষিণে গোঁসাই-দুর্গাপুর গ্রামে (এইটি বর্তমানে বাঙলাদেশের অন্তর্বর্তী) জয়দিয়াবাসী রাজা রায়মুকুটের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায় রাধারমণদেবের মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে। তেহট্টের কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা (১৬৭৮ খ্রীঃ) এবং বীরনগরের মুস্তোফীদের জোড়বাংলাটি (১৬৯৪ খ্রীঃ) এ জেলায় সতেরো শতকের উল্লেখযোগ্য মন্দির। শান্তিপুরের হাটখোলাপাড়ায় মধ্যমগোস্বামী বাড়ীর অদ্বৈতপ্রভুর ও গোকুলচাঁদের আটচালা শ্রেণীর মন্দির দুটিকেও নানাকারণে এই শতকে ফেলা যেতে পারে। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাটিয়ারীর পূর্বোক্ত মন্দিরটি রুদ্রেশ্বরের বলে ঐ অঞ্চলে পরিচিত এবং স্থানীয় এক বৃদ্ধব্যক্তির মতানুসারে (যিনি প্রাচীন লিপিফলকটি দেখেছিলেন) মহারাজ রুদ্ররায় হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। রুদ্রের রাজ্যকাল ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে। অতএব এই মন্দিরটিও যে সতেরো শতকে তৈরী তাতে সন্দেহ নেই।

সতেরো শতকে নির্মিত বা নির্মিত বলে অনুমিত পূর্বোক্ত মন্দিরগুলি নদীয়ার তথা বাঙলার মন্দির ভাস্কর্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় স্থান লাভ করবার যোগ্য। এইসব মন্দিরে টেরাকোটা ছাড়াও সুন্দর সুন্দর নক্‌শা প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত হয়েছে। পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সূক্ষ্ম রেখায় মণ্ডিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থান গভীরভাবে খোদিত হয়েছে দেখা যায়। দেহের ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে। এইসব মূর্তির প্রায় সবই পাশ থেকে দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে বা কিছু পূর্ব থেকে অর্থাৎ ষোল শতকের কিছু আগে থেকে সতেরো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত বাঙলার নির্মীয়মান টেরাকোটা-মন্দিরসমূহে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য টেরাকোটাশিল্পের এই 'স্কুল' চৈতন্যের বেশ কিছু আগে থেকেই যে চলিত ছিল তার উপযুক্ত প্রমাণ বাঙলার অত্যল্প দুএকটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়, যেমন মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল শহরের সিংহবাহিনীর মন্দিরে (৯) এই কালের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ৬ ও ৩ ইঞ্চিরও কম। নদীয়া জেলায় সতেরো শতকে নির্মিত পূর্বোক্ত মন্দিরগুলিতে টেরাকোটাশিল্পের এই 'স্কুল'টি যে পুরোপুরিভাবে অনুসৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রাঘবেশ্বর (দিগ্‌নগর), জলেশ্বর (শান্তিপুর), রুদ্রেশ্বর (মাটিয়ারী) ও কৃষ্ণরায়ের (তেহট্ট) মন্দিরগুলিতে এই স্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলি নিখুঁতভাবে অনুসৃত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়, বিষ্ণুপুরী টেরাকোটার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য খুবই বেশী। ফুল, লতাপাতার সুন্দর সুন্দর নক্‌শা ও কাজ, বাতিদান এবং বড়ো-ছোট আকারের ফুল এই মন্দিরগুলিতে ন্যস্ত হয়েছে। এই নক্‌শার সঙ্গে গৌড় অঞ্চলের মসজিদে খোদিত নক্‌শার সাদৃশ্যও খুব বেশী। এ ছাড়া খিলান ও প্রবেশদ্বারের দুপাশে ক্ষুদ্রায়তন স্তম্ভগুলির (বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যা মাত্র দুইটি থাকে) সঙ্গে গৌড় বা অন্যান্য প্রাচীন মসজিদের খিলান ও স্তম্ভের নৈকট্য নদীয়া জেলার উল্লিখিত মন্দিরসমূহে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। খিলানটি অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার এ ধরনের দুটি থামের ওপর ন্যস্ত। এর থেকে কেউ কেউ মুসলমান আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিদ্যার প্রভাব পরবর্তিকালে নির্মিত হিন্দু-মন্দিরে লক্ষ্য করেছেন। (১০) অবশ্য এ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কিছু বলা বেশ কঠিন।

আঠারো শতকের তৃতীয় দশকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যকাল থেকে নদীয়ার দেবালয় সৌধের গঠন ও আয়তনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই শতকে নির্মিত নদীয়া জেলায় মন্দিরের সংখ্যা অবশ্য পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় কিছু বেশী হলেও ভাস্কর্যের দিক থেকে এইসব মন্দির একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এগুলিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, চিরাচরিত স্থাপত্যশৈলী থেকে একপ্রকার অস্বাভাবিক বিচ্যুতি, যাকে কতকটা বিকৃতিও বলা যেতে পারে। অবশ্য এই শতকে নির্মিত এ জেলার সব মন্দিরের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য নয়, পূর্বতন শৈলী অনুসারী কোন কোন মন্দিরও যে এ শতকে নির্মিত না হয়েছে, এমন নয়, যেমন শান্তিপুরের (শ্যামচাঁদপাড়ার) শ্যামচাঁদের (১৭২৬ খ্রীঃ) এবং কাঁচড়াপাড়ার কাঞ্চনপল্লী গ্রামের কৃষ্ণরায়ের (১৭৮৬ খ্রীঃ)। উচ্চতা, আয়তন ও গঠনের দিক থেকে এদুটি মন্দির প্রায় একই রকমের। গতানুগতিক আটচালা পদ্ধতিতে নির্মিত এই দুটি মন্দিরে পঙ্কের কাজ, কিছু কিছু নক্‌শা এবং অল্প কিছু পোড়ামাটির ফুল ছাড়া এখানে টেরাকোটা বলতে কিছুমাত্র নেই। গর্ভগৃহসংলগ্ন আবৃত বারান্দা (যাকে মন্দিরের পরিভাষায় 'জগমোহন' বা চলতি কথায় 'বৈঠকখানা' বলা চলতে পারে) ও ইমারতি থামের ব্যবহার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে (যা নদীয়া জেলার অন্যান্য মন্দিরে একপ্রকার অনুপস্থিতই বলা যেতে পারে)। বাঙলার অন্যান্য জেলায় ষোল বা সতেরো শতকীয় মন্দিরসমূহে গর্ভগৃহসংলগ্ন সম্মুখস্থ বারান্দা (যার ছাদ সর্বসাকুল্যে অন্যূন পাঁচটি অর্ধ ও পূর্ণস্তম্ভের উপর স্থাপিত)

দুর্লভদর্শন না হলেও এ জেলায় পূর্ববর্তী শতকে নির্মিত মন্দিরে তার একান্ত অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আঠারো শতকের একেবারে গোড়ায় ও শেষদিকে নির্মিত শ্যামচাঁদ ও কৃষ্ণরায়ের মন্দির দুটি এ দিক থেকে যে কিছুটা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এগুলির কথা বাদ দিলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি বাঙলার মন্দিরশিল্পের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। প্রথমতঃ, চিরাচরিত স্থাপত্যশৈলী এসব মন্দিরে একান্তভাবে অনুপস্থিত অর্থাৎ বাঙলার নিজস্ব একচালা, দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা প্রকৃতি স্থাপত্যরীতিকে একপ্রকার বাদ দিয়ে এসব মন্দির নতুন এক রীতিতে বিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সমসাময়িক মুসলিমস্থাপত্যশৈলীর সম্ভাব্য প্রতিফলন এই মন্দিরগুলির ওপর আত্যন্তিক না হলেও আংশিকভাবে পড়েছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত কলকাতার লর্ডবিশপ হেবার সাহেবের ভ্রমণবিবরণীতে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। 'শিবনিবাসে'র মন্দিরগুলি সম্পর্কে হেবার সাহেব তাঁর Hebber's Journal এর প্রথমখণ্ডে একথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।(১১) 'শিবনিবাসে'র রামসীতার মন্দির হেবার সাহেবের ভাষায় 'a very handsome Gothic arch, with an arabesque border' এবং বুড়ো শিবের মন্দির 'Octagonal with domes not unlike with those of glass houses বলে উল্লিখিত হয়েছে। মাঝের শিবমন্দিরটি (রাজ্ঞীশ্বরের) চারচালা রীতির হলেও ছাদ কতকটা পিরামিডাকৃতি। তৃতীয়তঃ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহ টেরাকোটা বা কোনও প্রকার নক্‌শাবিবর্জিত। শিবনিবাসের মন্দিরগুলি বর্তমানে সংস্কৃত করা হলেও বহুদিন আগেকার কোন আলোকচিত্রেও এগুলিতে টেরাকোটাবিন্যাসের কোন চিত্র পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাজরাজেশ্বরের (বুড়ো শিব নামে পরিচিত) মন্দিরটি ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর শাসনকালে এবং অপর দুটি ১৭৬২ খ্রীঃ নির্মিত হয়েছিল। মুসলমান নবাবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনের ফলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মন্দিরস্থাপত্যকলার প্রয়োগে একদেশদর্শী ছিলেন না, শিবনিবাসের অন্তত দুটি মন্দিরে বিশেষ করে বুড়ো শিবের মন্দিরে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরই সমসাময়িক বর্ধমানরাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহে কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রীয় রীতি স্বীকৃত হয় নি। এক্ষেত্রে বর্ধমানরাজারা পূর্বাপর ঐতিহ্যানসারী শৈলীরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবনিবাসের উক্ত মন্দিরটি তৈরী হওয়ার মাত্র তিন বছর আগে বর্ধমান জেলার কালনায় ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশাল পঁচিশচূড়ো মন্দিরটি নির্মিত হয়। কালনায় অনন্তবাসুদেবের আটচালা মন্দিরটিও ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। এসব মন্দিরে ভাস্কর্যের প্রাচুর্যও বর্তমান। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আমঘাটার নিকটবর্তী 'গঙ্গাবাসে'র হরিহরের মন্দিরেও (১৭৭৬ খ্রীঃ অঃ) কৃষ্ণচন্দ্রীয় রীতি অনুসৃত—একটি আয়তক্ষেত্রাকার চাঁদনীর ওপরে চতুষ্কোণাকৃতি চূড়া খাড়াইচালযুক্ত। চারচালার মতো খানিকটা দেখতে হলেও এটিকে কোনমতেই বিশুদ্ধ চারচালা শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে না। গঙ্গাবাসের অপর বিধ্বস্ত মন্দিরটিও সম্ভবতঃ এ ধরনের ছিল। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজ্যকালের প্রথম বছরে (১৭২৮ খ্রীঃ) আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের একটি মন্দির তৈরী করেছিলেন। (১২) বর্তমানে মন্দিরটি কিন্তু নতুন ও দালানশ্রেণীর, পুরানোটি সম্ভবতঃ নিশ্চিহ্ন।

পূর্ববর্তী ঐতিহ্যানুসারী শৈলী থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই বিচ্যুতি শুধুমাত্র মন্দিরনির্মাণে পরিলক্ষিত হয় না, শিবনিবাসের বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদ ও কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদও গতানুগতিক সৌধনির্মাণশৈলীর বিপরীত ছিল। কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের বর্তমান তোরণপথও গতানুগতিক শৈলীকে অনুসরণ করে তৈরী হয় নি। পরবর্তিকালে কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তরপুরুষ প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ীর যে মন্দির (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেও কৃষ্ণচন্দ্রীয় ঐতিহ্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দময়ীর মন্দির এবং নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির প্রায় সমসাময়িক ও গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত। উচ্চতা, গঠন ও আয়তনে এই দুটি মন্দিরের সাদৃশ্য খুব বেশী। এগুলিকে প্রচলিত শৈলী অনুসারে একরত্নের পর্যায়ে ফেলা যাবে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। আনন্দময়ীর মন্দির চাঁদনীর ওপর উচ্চ চারচালাশিখরযুক্ত ও পোড়ামাতলার ভবতারিণীর মন্দিরও এই ধরনের। আনন্দময়ীর মন্দিরে কিছু কিছু পঙ্কের কাজ ছাড়া পোড়ামাটির কোন মূর্তি নেই। অনুরূপভাবে ভবতারিণীর মন্দিরটির কথাও বলা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নদীয়ারাজ প্রবর্তিত আঠারো শতকে মন্দিরশৈলীর এক স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই ধারায় পরবর্তিকালে কোন মন্দিরই প্রায় নির্মিত হয় নি দেখা যায়। যে অজ্ঞাত কারণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই স্বতন্ত্র শৈলীর প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর রাজ্যকালের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরনির্মাণের এই রীতি একরকম শেষ হয়ে যায়। পরবর্তিকালে নির্মিত আনন্দময়ী বা ভবতারিণীর মন্দির প্রচলিত একরত্নেরই বিকৃতরূপ বলে মনে করা যেতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮১৮ খ্রীঃ) নির্মিত উলা-বীরনগরের দক্ষিণপাড়ায় (বর্তমানে ভক্তিবিনোদগোষ্ঠীর মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত) এ ধরনের একটি উচ্চ একরত্ন মন্দির লক্ষ্য করা যায়। নদীয়াজেলার অন্যতম প্রাচীন স্থান উলায় (বর্তমান বীরনগরে) পূর্বোল্লিখিত জোড়বাংলামন্দিরটি ছাড়াও আরও অনেক মন্দির দেখা যায়। এসবের মধ্যে বেশীর ভাগই চালাশ্রেণীর, যেমন মুস্তোফীপাড়ায় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জোড়া আটচালা। অবশ্য রত্নমন্দির যে নেই তা নয়—একটি ধ্বংসপ্রায় জোড়া পঞ্চরত্ন (এতে কোন লিপি নেই) এবং উত্তরপাড়ায় শিবের পঞ্চরত্ন (১৮৩৬ খ্রীঃ), রত্ন বা বহুচূড়মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শহর-নবদ্বীপে অবশ্য দু-একটি বহুচূড় মন্দির দেখা গেলেও সেগুলির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। বীরনগরের পূর্বকথিত মন্দিরগুলিতে (একমাত্র জোড়বাংলাটি

ছাড়া) টেরাকোটার কোন চিহ্ন নেই। বীরনগরপ্রসঙ্গে মুস্তোফী-দের কাঠের দুর্গাদালান আবশ্যিকভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি এখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে, শুধুমাত্র কয়েকখণ্ড সুন্দর কারুকার্যযুক্ত কাষ্ঠফলকছাড়া। বীরনগরে প্রাচীন ইমারতের মধ্যে এখানে ওখানে মৃত্তিকাপ্রোথিত ইষ্টকপ্রাচীরের চিহ্ন, ভগ্ন রাসমঞ্চছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। এক-কালে এইস্থানে যে ঘনজনবসতিপূর্ণ ও সৌধ-ইমারতে পরিপূর্ণ ছিল তা সহজেই চোখে পড়ে।

এ পর্যন্ত নদীয়াজেলার পুরাকীর্তি বলতে হিন্দু-পুরাকীর্তি বিশেষ করে সৌধ ও মন্দিরের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু এ জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন মস্‌জিদ ও পীরের দরগা অথবা সমাধিক্ষেত্র এখনও পর্যন্ত এ আলোচনার আওতায় আসেনি। সংখ্যার দিক থেকে দেবালয়ের তুলনায় এগুলি নগণ্য হলেও দু-একটি অবশ্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। গৌড় বা আদিনার মস্‌জিদের মতো এ জেলার মস্‌জিদ-গুলিতে স্থাপত্য বা ভাস্কর্যগত বিশেষত্ব কিছুই নেই, আর প্রাচীনত্ব বলতে বড় জোর দু-তিন শ বছর পেছনে যাওয়া যেতে পারে—অবশ্য মায়াপুরের বামনপুকুরে চাঁদকাজীর সমাধি বলে পরিচিত স্থানটি ঠিক কত বছরের পুরানো, তা বলা আজ আর কঠিন নয়, ইতিহাসকে যদি এক্ষেত্রে প্রদর্শকরূপে স্বীকার করে নেওয়া যায়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষকরূপে যদি চাঁদকাজীকে স্বীকার করা যায় যিনি শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন-পরিক্রমা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাহলে এই সমাধি-ক্ষেত্রের বয়স অন্তত পক্ষে চারশ বছরের ওপর হবে। প্রাচী-নত্বের দিক দিয়ে মাটিয়ারীর (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) মল্লিকগস্‌-এর দরগা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নদীয়া জেলায় যতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা আছে তার মধ্যে এটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়া বহু দরগা এই জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ-যোগ্য মসজিদের মধ্যে শান্তিপুরের তোপখানা ও নদীয়া-চব্বিশ-পরগণা সীমান্তে অবস্থিত বাগের মসজিদের নাম করা যেতে পারে। তোপখানা মসজিদটি আওরঙ্গজেবের সময় নির্মিত বলে জানা যায়। শিলালিপিটি আরবীয় হরফের ও সামনের দিকে স্থাপিত। নদীয়ার প্রান্তবর্তী একদা বাগেরখাল নামে পরিচিত একটি মজাখালের ধারে (বর্তমান 'মিলননগর' গ্রামে) একটি বৃহৎ ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন মস্‌জিদ দেখা যায়। দুইটি বৃহৎগম্বুজযুক্ত এই মস্‌জিদটির ভেতরের একটি প্রকোষ্ঠে আরবীহরফে খোদিত একটি লিপি আছে। এর কিছুদূরে আর একটি ছোট মস্‌জিদ। এটিও ভগ্নপ্রায়। চাকদহের কাজীপাড়ায় কাজীবাড়ীর প্রাচীন সৌধটিও একটি উল্লেখ্য মুসলিম পুরাকীর্তি।

উপরি উল্লিখিতগুলিই নদীয়ার প্রধান প্রধান মুসলিম পুরা-কীর্তি বলে সকলের পরিচিত। এইগুলি ছাড়াও এ জেলার নানাস্থানে ছোটবড় মস্‌জিদ ও মুসলিম ইমারত চোখে পড়ে যাদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। কৃষ্ণনগরের প্রায় ১মাইল পূর্বে রাধানগরগ্রামে কৃষ্ণনগর মাজদিয়া পাকা-রাস্তার দুধারে বিস্তীর্ণ মুসলমান গোরস্থান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গোরস্থানটি ঠিক কতদিনের প্রাচীন বলা কঠিন। তবে এইস্থানে বেশকিছু প্রাচীন সমাধিফলকের সন্ধান পাওয়া গেছে। কৃষ্ণনগরে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদেরও দুটি প্রাচীন সমাধিস্থান আছে।

নদীয়াজেলায় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায় ছাড়াও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো। কৃষ্ণ-নগরেই এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী এবং অন্যান্য স্থান যেমন চাপড়া, পুটিমারী প্রভৃতি স্থানেও বেশ কিছু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী আছেন। কৃষ্ণনগরে প্রোটেস্ট্যান্ট্ চার্চটি এখানকার মধ্যে প্রাচীনতম বলা যায়। এটি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। নিকটবর্তী রোম্যান ক্যাথলিক চার্চটি অবশ্য এর কিছু পরে আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে। চাপড়া গ্রামেও এই সম্প্রদায়ের একটি চার্চ প্রতিষ্ঠিত আছে। এগুলি ছাড়া আরও দু-একটি ছোটবড়ো চার্চ এজেলার কোন কোন স্থানে দেখা যায়। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ছাড়াও কর্তাভজা-সম্প্রদায় নামে একটি বহুপরিচিত সম্প্রদায় এ জেলায় আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত এটিকে একটি উপ-সম্প্রদায় বলা যেতে পারে এবং এই সম্প্র-দায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদ আঠারো শতকের প্রথমভাগে তাঁর নবধর্ম প্রচার করেন। আউলচাঁদের পত্নী কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের কাছে 'সতীমা' নামে পরিচিতা। কাঁচড়াপাড়া থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরে ঘোষপাড়ায় 'সতীমার' একটি সমাধিমন্দির লক্ষ্য করা যায়।

উপরের আলোচনায় নদীয়ার পুরাকীর্তি বলতে প্রধানতঃ প্রাচীন ধর্মীয় ইমারতগুলিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে, কিন্তু পুরাকীর্তি বলতে শুধুমাত্র ধর্মীয় ইমারত যথা মন্দির মস্‌জিদ ও গীর্জাকেই বোঝায় না, অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে পুরাকীর্তি বেঁচে থাকে বর্তমানের কোন প্রায়বিধ্বস্ত ইমারতের মধ্যে ,অথবা কোন গড় বা কোন প্রাচীন দীঘির মধ্যে, যাকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তী বা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। পুরাকীর্তি কথাটির মধ্যে 'কীর্তি' বলতে এমন কোন বস্তু যা ইতিহাসের অন্যতম উপাদানরূপে স্বীকৃত হতে পারে। কীর্তি মানে শুধু গৌরবই নয়, এমন অনেক বিষয় আছে যা একজনের কাছে গৌরবজনক বলে গৃহীত, আবার অপরের কাছে দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ, অবস্থাভেদে একই বস্তুই গৌরব ও কলঙ্কের বাহক হতে পারে। পলাশীর মনুমেন্ট যেমন একদিকে ইংরেজ শক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রকাশ করে, অন্যদিকে তা আবার মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমাদের কাছে দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ, আবার এই স্মৃতিস্তম্ভই ঘোষণা করছে মোহনলাল-মীরমদনের ন্যায় দুঃসাহসিক যোদ্ধার আত্মদানের বীরত্বময় কাহিনী। অন্যান্য জেলার মতো নদীয়া জেলাও এসব পুরাকীর্তির দ্বারা সমৃদ্ধ। আজও তাই এ জেলার অনেক পল্লী পরিক্রমা করলে চোখে পড়বে রাজাজমিদারদের প্রাচীন গড় ও ভগ্নপ্রাসাদের অস্তিত্ব যেগুলি এখন অনেকাংশেই জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে রয়েছে, কোথাও বা আবার জঙ্গল কাটিয়ে চাষবাস আরম্ভ হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত বল্লাল ঢিবি ও মাটিয়ারীতে ভবানন্দ মজুমদারের গড়ের ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও নদীয়ায় প্রাচীন রাজবংশের গড়ের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। রাণাঘাট মহকুমার

অন্তর্গত দেবগ্রামে 'দেগাঁয়ের ঢিবি' নামে পরিচিত কুম্ভকার-বংশীয় রাজা দেবপালের গড়ের ধ্বংসস্তূপ (অবশ্য এখন তা একপ্রকার নিশ্চিহ্ন) এ জেলার একটি পুরাকীর্তি ছিল। ষোল ও সতের শতকের সন্ধিকালে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ভূস্বামী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন, এই দেবপাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' এই দেবপালের ভাগ্যবিপর্যয় ও ভবানন্দের পৌত্র রাঘবকর্তৃক দেবপালের রাজ্য অধিকারের উল্লেখ আছে। রাঘব সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাই দেবপালকে ষোল-শতকের শেষদিকের রাজা বলা যেতে পারে। রাণাঘাট থানার অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রামটি পুরাকীর্তির কিছু কিছু মূল্যবান আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। এইগ্রামে লক্ষ্মণসেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে কিছুকাল আগে। (১৪) কলকাতার 'বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎসংগ্রহশালা'য় এটি এখন রক্ষিত আছে। এই তাম্রশাসন ছাড়া এ গ্রামে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিও আছে। নিকটবর্তী চূর্ণীনদীর চর থেকে এটি পাওয়া গেছে। তাছাড়া এই গ্রামের একাংশে 'সিংহীপোতা' নামক স্থানে একটি প্রাচীন ঢিবি দেখা যায় যা ক্রমশঃ চূর্ণীনদীর ভাঙনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পূর্বে এখানে পাঠানদের ধনাগারের অস্তিত্ব ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। শোনা যায়, কিছুকাল আগে এ ঢিবি থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গিয়েছিল। শান্তিপুর শাখার রাণাঘাট থেকে ৯ মাইল দূরে গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন ফুলিয়া গ্রামটি বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান হিসেবে স্মরণীয়। শুধু কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের সঙ্গেই ফুলিয়ার কীর্তি জড়িত নয়, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাধক হরিদাসের ভজনগুম্ফা কৃত্তিবাসের জন্মভিটার খুব কাছেই। তাই ফুলিয়া নদীয়ার একটি কীর্তিযুক্ত স্থান হিসেবে পরিগণনযোগ্য। শহর নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে উঁচু একটি ঢিবি আছে। এটির নাম পাড়ডাঙ্গা। জনশ্রুতি এই, এখানে বৌদ্ধস্তূপ বা পাহাড় ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শহর নদীয়ার সার্ভে ম্যাপে পাড়ডাঙ্গার অবস্থান চিহ্নিত রয়েছে। কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবগ্রামেও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। এখানেও দু-একটি উঁচু ঢিবি আছে। কারও কারও অনুমান, সেনরাজগণের সময়ে এখানে একটি জয়স্কন্ধাবার বা সেনানিবাস ছিল। (১৫) স্থানটিতে ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে এই অনুমান ভিত্তিহীন মনে হয় না। তাছাড়া এ গ্রামটি সংস্কৃতচর্চারও একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। দেবগ্রাম লালগোলা লাইনের অন্যতম রেলস্টেশন। নদীয়াজেলার শেষ স্টেশন পলাশী একটি ইতিহাসবিশ্রুত স্থান। এই স্টেশনের প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত। বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রের বেশীরভাগ স্থান ভাগীরথীগর্ভে বিলীন। যুদ্ধজয়ের স্মৃতিস্বরূপ এখানে একটি স্তম্ভ আছে। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনিবাসে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। মন্দিরগুলির পশ্চিমাংশে এই ভগ্নস্তূপ এখন জঙ্গলসমাকীর্ণ এবং অনেকখানি বিস্তৃত। এই প্রাসাদের মধ্যে 'হীরামহল' নামে একটি বড় মহল ছিল। ধ্বংসস্তূপের একাংশে উপরে উঠবার এখনও একটি সিঁড়ি দেখা যায়। প্রাচীন কেয়াঝাড় ও জঙ্গল এখন স্থানটিকে দুর্গম করে তুলেছে। রাণাঘাট থানার অন্তর্গত 'হরধাম' ও 'আনন্দধামে'ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

এই ধ্বংসপ্রায় ইমারতগুলি ছাড়া নদীয়া জেলায় বেশ কিছু প্রাচীন দীঘি বর্তমান। উল্লেখযোগ্য দীঘিগুলি হলো, দিগনগরের বিরাট দীঘি, চাকদহ স্টেশনের প্রায় ৭ মাইল পূর্বে সরাবপুর গ্রামের কাছাকাছি 'খলসিয়ার বিল', মাটিয়ারীর (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) হাতিয়ারী বিল, দেপাড়ার চামটার বিল, কৃষ্ণনগর থেকে উত্তরপশ্চিমে ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে হাঁসাডাঙার বিল প্রভৃতি। উলা-বীরনগরেও কয়েকটি বিশালাকার দীঘি দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায়, এদের মধ্যে দুএকটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খনন করিয়েছিলেন। উল্লিখিত দীঘিগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই আয়তনে লম্বা, এমন কি এদের মধ্যে কোন কোনটি বা একমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু প্রস্থে এগুলি খুবই কম। এ ধরনের দীঘি অন্যান্য জেলায় খুব কমই দেখা যায়। এর একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ মনে হয়, সেকালে দূরবর্তী পাশাপাশি গ্রামগুলির জলসরবরাহের সুব্যবস্থা করা। দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তৃতি আনুপাতিক হারে বাড়ালে দূরবর্তী গ্রামগুলির একই সঙ্গে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হতো না। তাছাড়া আয়তনে লম্বা দীঘি পরিখার প্রয়োজনও অনেকটা মেটাতে সমর্থ হতো। মাটিয়ারীর হাতিয়ারী বিলটির সঙ্গে গড়বাড়ীর উত্তর ও পূর্বদিকের পরিখাগুলির যে যোগ ছিল তা বুঝতে পারা যায়।

নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে এই কথাগুলিই মোটামুটিভাবে বলা যায়। এই জেলার আয়তনের অনুপাতে পুরাকীর্তির অল্পতা বিশেষ করে দেবালয়ের স্বল্পতা একটা লক্ষ্য করার বিষয়। আবার দেবালয়গুলির (বিশেষ করে আঠারো শতকে নির্মিত দেবালয়গুলির) স্থাপত্যশৈলীতে যে একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল তা বেশ বোঝা যায়। উচ্চ শিখরযুক্ত দেউলমন্দির বা রত্নমন্দির এ জেলায় একরকম নেই বললেই চলে। হিন্দু দেবালয়ের তুলনায় মুসলমান পীরের দরগা নদীয়া জেলায় খুব বেশী, মসজিদের সংখ্যাও অল্প নয়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মীয় উপাসনা-গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও কোনক্রমেই অবহেলার যোগ্য নয়।

পুরাকীর্তিসমৃদ্ধস্থান ও বিবরণী

মহারাজ বল্লালসেনের সময় নদীয়া বলতে সমগ্র বঙ্গদেশকেই বোঝাত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়া ছিল চুরাশীটি পরগণা নিয়ে গঠিত। সে সময়ে উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,. পূর্বে ধুলিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী ছিল এ জেলার সীমা।(১৬) ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে নদীয়া বলতে প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বোঝাত। বর্তমানে উত্তরে কুষ্ঠিয়া, পূর্বে যশোহর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ বর্তমান

নদীয়ার চতুঃসীমা। পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থানসমূহকে এই সীমা-রেখার মধ্যে ছয়টি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) উত্তরাঞ্চল (তেহট্ট ও করিমপুর থানা)
(২) উত্তরপশ্চিমাঞ্চল (কালীগঞ্জ ও নাকাশীপাড়া থানা)
(৩) পশ্চিমাঞ্চল (নবদ্বীপ থানা)
(৪) মধ্যাঞ্চল (কৃষ্ণনগর থানা)
(৫) পূর্বাঞ্চল (কৃষ্ণগঞ্জ থানা)
(৬) দক্ষিণাঞ্চল (শান্তিপুর, রাণাঘাট ও চাকদহ থানা)

(১) উত্তরাঞ্চল:

(ক) তেহট্ট (তেহট্ট থানা): সমগ্র উত্তরাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র তেহট্টগ্রামেই অল্প দু'একটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন মেলে। গ্রামটি জলাঙ্গীর পূর্বতীরে অবস্থিত। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে শিকারপুর রোড্ ধরে বাসে এখানে পৌঁছানো যায়। তেহট্ট গ্রামটি কৃষ্ণনগরের চব্বিশ-পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। শোনা যায়, গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল ত্রিহট্ট। অর্থাৎ একসময় এইখানেব তিনটি স্থানে সপ্তাহে দুদিন করে হাট বসত। পরে স্থানীয় জনগণের নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই তিনটি হাটকে নদীতীরবর্তী একটি প্রশস্ত স্থানে এনে একত্র বসানো হয়। সেই থেকে এই স্থানটির নাম হল ত্রিহট্ট। ইংরেজ আমলে একে 'তেহাটা' বলা হত। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ গ্রামটি 'তেহট্ট' নামেই পরিচিত হয়েছে। তেহট্ট বাজারের অল্প পূর্বে ঠাকুরপাড়ায় পুরাকীর্তির নিদর্শন-রূপে কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। দুটি দোচালা বা একবাংলা আগে-পিছনে জোড়া দিয়ে এ ধরণের মন্দির সেকালে নির্মিত হতো বলে এই স্থাপত্যশৈলীর নাম হয়েছে জোড়বাংলা। এই শৈলীটি এককালে যে বেশ জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পশ্চিমবাঙলার বহুস্থানেই পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট জোড়বাংলাটি (কৃষ্ণরায়ের—১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই শৈলীর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তেহট্ট কৃষ্ণরায়ের এই মন্দিরটি ১৬০০ শকাব্দ বা ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে মন্দিরটির দক্ষিণাংশের দেওয়ালে পোড়ামাটির হরফে উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে জানা যায়। মূল সংস্কৃত লিপিটি যথাযথ উদ্ধার করা হলো:

> ১৬০০ শাকে শূন্যনভঃষডিন্দুগণিতে মেষগতে ভাস্করে
> শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দনিরতঃ শ্রীরামদেব মহান
> লক্ষ্মী যস্য পদারবিন্দসেবনবেধৌ ব্যাপারসম্পাদিনী
> তস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য চ গৃহং যত্নৈরকার্ষীত্ স্বয়ং॥

সারিগুলি সংস্কৃত শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দের অনুসারী স্থাপিত। কিছু কিছু ব্যাকরণগত অশুদ্ধি থাকলেও পংক্তি অনুসারী সারিস্থাপন ও অক্ষরবিন্যাস পোড়ামাটির লিপিফলকগুলিতে খুব কমই দেখা যায়। সে দিক থেকে এই লিপিটির প্রতি সারি, পংক্তি বা চরণানুযায়ী স্থাপিত হওয়ায় লিপিবিশারদদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই শ্লোকটির তৃতীয় পংক্তিতে দু' অক্ষর বেশী আছে। শ্লোকটির অর্থ হল, '১৬০০ শকাব্দের (= ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) বৈশাখ মাসে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মসেবী রামদেব নামে এক মহাশয় ব্যক্তি যত্নসহকারে শ্রীপুরুষোত্তমের এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। লক্ষ্মী দেবী তাঁর পদসেবা করতেন এবং তাঁর উপাসনার জন্য রামদেব এই মন্দির নির্মাণ করেন।' এই রামদেব এবং সম্ভবতঃ তাঁর শিষ্যা বা কন্যা লক্ষ্মীসম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানা আজ আর সম্ভব নয়। শোনা যায়, লক্ষ্মী রামদেবের বালবিধবা কন্যা ছিলেন। স্থানীয় অনেকে লিপিতে উল্লিখিত রামদেবকে 'বামদেব' পাঠ ধরে তাঁকে সুপ্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বামদেবজীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু এধারণা যে ভুল, তার প্রথম যুক্তি হলো, লিপিতে উল্লিখিত শব্দটি 'রামদেব'ই হবে 'বামদেব' হবে না। সেকালে 'র' অক্ষর 'ব' এর মাঝখান কেটে লেখা হতো। লিপিতে অক্ষরটি এইভাবে আছে। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ মূল হিন্দীতে রচিত। কাজেই ভক্তমালগ্রন্থে উল্লিখিত বামদেবজীর সঙ্গে রামদেবের কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্রের রাজ্যকাল।

মন্দিরটি ইষ্টকনির্মিত ও পশ্চিমমুখী। সামনের দোচালাটির কয়েক বছর আগে সংস্কার করার জন্যে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলঙ্করণের স্থান দখল করেছে চূণ বালির পলেস্তারা, অবশ্য স্থাপত্যগত সামগ্রিক কোন বিকৃতি হয় নি। প্রথম দোচালাটির সামনের দিকে পোড়ামাটির বহু মূর্তি বা টেরাকোটা ছিল জানা যায়। জীর্ণ ও ভগ্ন হয়ে যাওয়ায় সংস্কারের সময় সেগুলি অপসারিত ও বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমানে পিছনের দোচালাটির (বা গর্ভগৃহের) প্রবেশপথে যে ক্ষুদ্র সংলগ্ন তোরণ আছে সেখানে প্রাচীন কারুকার্য ও সর্বসাকুল্যে পোড়ামাটির ৪টি ক্ষুদ্র মূর্তি দেখা যায়। এদের মধ্যে দুটি চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের ও দুটি রাজ-কর্মচারী বা রাজার। এছাড়া মেঝের ঠিক ওপরে মন্দিরগাত্রে হংসশ্রেণী ও খিলানের চারপাশে ৭টি ৭টি করে প্রতীক আটচালা শিবালয় অঙ্কিত। এছাড়া রয়েছে ফুল ও লতাপাতার সুন্দর সুন্দর কাজ। পোড়ামাটির কয়েকটি ফুলও এখানে দেখা যায়। প্রতীক মন্দিরগুলিকে বেষ্টন করে বারোটি বাতিদান লক্ষ্য করা যায়। গর্ভগৃহটি দোচালা বলে বলাই বাহুল্য আয়ত-ক্ষেত্রাকার এবং এর দক্ষিণে একটি দ্বার আছে। কৃষ্ণরায়ের ক্ষুদ্র মূর্তিটি শ্ল্যাক মার্বেলজাতীয়, বিগ্রহটি একক, রাধিকা-বিহীন। কিছু কিছু শালগ্রাম শিলাও এখানে আছে। রাধিকা-বিহীন কৃষ্ণরায় সম্পর্কে এই অঞ্চলে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে তা হলো, লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণজীউর একনিষ্ঠভাবে সেবা করতে করতে হঠাৎ গর্ভবতী হন, এজন্যে তাঁর গুরু বা পিতা রামদেব তাঁকে তিরস্কার করেন। তখন তিনি রাধিকার বিগ্রহের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেলে, সেই বিগ্রহটি পরে পিছনের একটি পুকুরে বিসর্জিত হয়। সেই থেকে কৃষ্ণরায় বিরহীর জীবন যাপন করে চলেছেন। অবশ্য এ কিংবদন্তীর সত্যতা-সম্পর্কে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। সেই পুকুরটি আজও বর্তমান, তবে দৈন্যদশার মধ্যে। কৃষ্ণরায়ের একটি দোলমঞ্চও

ছিল মূল মন্দিরের বেশ কিছুটা দূরে। সেটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। কৃষ্ণরায়ের এই মন্দির নদীয়ারাজের আওতায় ঠিক কতদিন আগে আসে তা বলা কঠিন। বারদোলের সময় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে এই বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয়।

তেহট্ট গ্রামের কেন্দ্রস্থলে 'চাতর' বলে একটি বিস্তীর্ণ স্থান আছে। শোনা যায়, এখানে অনেক আগে একটি চত্বর (চত্বর < চাতর) ছিল। হরিনাম সঙ্কীর্তন, পূজা, যাগযজ্ঞ, হোম প্রভৃতি এইস্থানে অনুষ্ঠিত হতো। এই চত্বরের মধ্যে একটি উচ্চ দোলমন্দির ছিল। বর্তমানে এগুলি একপ্রকার নিশ্চিহ্ন। এই চত্বর থেকে এ পাড়ার নাম 'চাতরপাড়া' হয়েছে বলে মনে হয়। এইসব থেকে তেহট স্থানটি যে এককালে বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল তা অনুমান করা যায়। কৃষ্ণরায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য এই অঞ্চলে বহু কাহিনী ও উপকথার সৃষ্টি করেছে।

কৃষ্ণরায়ের মন্দির ছাড়া এই গ্রামে কালীর নির্দিষ্ট একটি বাঁধানো বেদি আছে। জনশ্রুতি এই, এই বেদিতে জনৈক শক্তিসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। গাছতলায় বহুকালের একটি প্রাচীন খাঁড়াকে কালীজ্ঞানে যথাবিধি পূজা করা হয়। দেবীর কোন মূর্তি নেই। তেহট্ট গ্রামের নওদা পাড়ায় বড় পীরের একটি দরগাও আছে। এই দরগাটি বেশ প্রাচীন।(১৭)

(খ) উত্তরাঞ্চলের মধ্যে করিমপুর থানার অন্তর্গত কাবিমপুর গ্রামে জলাঙ্গীর তীরে একটি প্রাচীন কালীমন্দির, শোভারাজপুর মৌজার অন্তর্গত নতিডাঙ্গায় রাণীভবানী প্রতিষ্ঠিত কালীপূজার জন্য একটি বেদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিকারপুরে সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান ও মন্দির আছে।

(২) উত্তরপশ্চিমাঞ্চল :

(ক) পলাশী (কালীগঞ্জ থানা): পলাশীগ্রাম কলকাতা থেকে ৯৩ মাইল উত্তরে ও নদীয়া জেলায় এই লাইনের শেষ স্টেশন। বহুপূর্বে এখানে পলাশের জঙ্গল থাকায় এই স্থানের নাম পলাশী হয়েছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ক্লাইভের যে যুদ্ধ হয়, তারই স্মৃতিতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন এখানে একটি বিরাট স্তম্ভ স্থাপন করেন। অবশ্য এর আগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এখানের শেষ আমগাছটির ৬০।৭০ হাত দক্ষিণপূর্ব-কোণে গ্র্যানাইট পাথরের একটি ছোট্ট বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। লর্ড কার্জন সেটি ভেঙে ফেলে এই বিরাট স্তম্ভটি স্থাপন করেন।(১৮)

(খ) দেবগ্রাম (কালীগঞ্জ থানা): কলকাতা থেকে ৮৭ মাইল দূর। শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের এটি একটি স্টেশন। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও কয়েকটি উঁচু ঢিবি এই গ্রামে আছে। দেব-গ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। অনুমান করা যায়, এইসব ধ্বংস-স্তূপ ও ঢিবি সেনরাজাদের 'জয়স্কন্ধাবার' বা সেনানিবাসের অংশ। সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে এখানে এককালে খ্যাত-নামা পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিখ্যাত বৈষ্ণবপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এখানের অধিবাসী ছিলেন।

(গ) নাকাসীপাড়া (নাকাসীপাড়া থানা): নাকাসীপাড়া গ্রামটিও বেশ প্রাচীন। জানা যায়, পূর্বে এর নাম ছিল 'নাগরকি-পাড়া', পরে এর নাম হয় নাকাসীপাড়া। লালগোলা লাইনের বেথুয়াডহরী রেল স্টেশনের প্রায় ৩ মাইল দূরে এই গ্রাম। এই গ্রামটির ঠিক পাশ দিয়েই একটি খাল আছে। মনে হয়, অনেক আগে ভাগীরথী এই গ্রামটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। গ্রামের পুরাকীর্তি বলতে তিনটি মন্দির বর্তমান। এগুলি চারচালা শ্রেণীর। মন্দিরগুলিতে কিছু কিছু কাজ আছে। প্রতিষ্ঠাকাল-নির্দেশক কোন লিপি এখানে নেই। সামনের দিকে চূণবালির কিছু কাজও আছে।

(ঘ) বড়গাছি (নাকাসীপাড়া থানা) : নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী। বড়গাছি গ্রামটি বেশ প্রাচীন। গ্রামটির পূর্বদিকে মাথাভাঙা নামে একটি বিল আছে। বিলের অল্পদূরে পূর্বদিকে জলাঙ্গী নদী। গ্রামটির পশ্চিমাংশে একটি পুরানো গড়ের চিহ্ন আছে। গড়ের চারদিকে পরিখার চিহ্ন বোঝা যায়। মহাকবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' উল্লিখিত হরিহোড় এখানে বাস করতেন। সে সময় এই গ্রামটি বাগোয়ান পরগণার অন্তর্গত ছিল। ভারতচন্দ্র বলেছেন :

ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিমপারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥(১৯)

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত নদীয়া জেলার মানচিত্রে এই গ্রামটি জলাঙ্গীর পশ্চিম তীরবর্তিরূপেই চিহ্নিত হয়েছে। বড় আন্দুলিয়া গ্রামটি তেঘরি খেয়াঘাটের বিপরীত দিকে জলাঙ্গীর পূর্বতীরে চিহ্নিত। ভবানন্দ মজুমদারের পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দার (যিনি 'অন্নদামঙ্গলে' রাম সমাদ্দার নামে উল্লিখিত হয়েছেন) এই আন্দুলিয়াবাসী ছিলেন। দেবী অন্নদা হরিহোড়কে পরিত্যাগ করে রাম সমাদ্দারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন আর তখন থেকেই নদীয়ারাজবংশের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। বড়গাছিনিবাসী হরিহোড়ও দেবীর কৃপালাভ করেছিলেন বলে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' উল্লেখ করেছেন। এই গ্রামের পূর্বদিকে 'লক্ষ্মীজোলা' বলে একটি প্রাচীন খাল আছে। শোনাযায়, ঐ খাল দিয়েই ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে জলাঙ্গী ('অন্নদামঙ্গলে' যার নাম 'গাঙ্গিনী) পার করে দিয়েছিলেন। ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের ফর্মানে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। হরিহোড় তাঁর পূর্ববর্তী, অতএব অন্ততঃ ষোল শতকের শেষ দিকে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। বড়গাছির গড়টি সম্ভবতঃ হরিহোড়ের নির্মিত হলে সেটি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছু পরে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

(ঙ) মুড়াগাছা (নাকাসীপাড়া থানা) : এই গ্রামটি সদর কৃষ্ণনগর থেকে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি লালগোলা লাইনের একটি স্টেশন। এই গ্রামে দুটি মন্দির

বর্তমান—একটি শিবের এবং অপরটি সর্বমঙ্গলার। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি হিজলীর লবণ উৎপাদনকেন্দ্রের দেওয়ান দেবীদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত।(২০)

(৩) পশ্চিমাঞ্চল:

নবদ্বীপ শহর ও তৎপার্শ্ববর্তীকয়েকটি স্থানকে এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী শহর-নবদ্বীপ এবং জলাঙ্গীর উত্তরদিকে মায়াপুর, বামনপকুর প্রভৃতি গ্রাম নদীয়ার প্রাচীনতম পুরাকীর্তিসমৃদ্ধস্থান।

(ক) নবদ্বীপ (নবদ্বীপ থানা): কৃষ্ণনগর থেকে আট মাইল পশ্চিমে নবদ্বীপঘাট। শান্তিপুর-নবদ্বীপ ছোট রেলপথের এটি শেষ স্টেশন। নবদ্বীপঘাট থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমপারে নবদ্বীপ শহর। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রভৃতিতে এই শহর-নবদ্বীপ নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর থেকে অভিন্ন। প্রাচীন নবদ্বীপ শহর গঙ্গার ভাঙনে বিনষ্ট হবার উপক্রম হলে সেখানকার অধিবাসিগণ নিকটবর্তী কুলিয়ার চরে বসবাস করেন এবং কালক্রমে সেইখানেই বর্তমানের এই নবদ্বীপ শহর গড়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ এই স্থানকে অন্তর্দ্বীপ বলে মনে করেন। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে নবদ্বীপকে একটিমাত্র দ্বীপ বলা হয়েছে, অবশ্য নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাসের 'ভক্তিরত্নাকরে' নবদ্বীপ বলতে নয়টি দ্বীপকে বলা হয়েছে—

নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥

কিংবদন্তী এই, পালরাজগণ কোনও সময়ে নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।(২১) সে সময় এইস্থানে ও আশেপাশে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব বেশ পড়েছিল। বর্তমানে নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি হিন্দু মঠমন্দিরের দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও ভালোভাবে লক্ষ্য করলে নবদ্বীপ শহরে বৌদ্ধ পুরাকীর্তির কিছু নিদর্শন মিলতে পারে। শহরের পশ্চিমাংশে পাড়ডাঙ্গা নামে বেশ উঁচু একটি স্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস, এটি বৌদ্ধস্তূপ বা পাহাড় ছিল। চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে পাড়ডাঙ্গার অবস্থানের উল্লেখ আছে। কারও কারও মতে শহরের নানাস্থানে বৌদ্ধ-চিহ্নযুক্ত যেসব মূর্তি ও প্রস্তরফলকাদি পূজিত হন, সেগুলির প্রায় সবই পাড়ডাঙ্গার প্রাচীন বৌদ্ধবিহারে অবস্থিত ছিল। তবে এ সবই অনুমানমাত্র।

পাড়ডাঙ্গার শিব নামে পরিচিত একটি হস্তপদহীন কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড বর্তমানে যুগনাথ শিবমন্দিরে পূজিত হন। 'যোগনাথ-তলা' পাড়ায় এই শিবমন্দিরটি অবস্থিত। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই ধরণের প্রস্তরখণ্ড মহারাজ অশোকের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ থেকে দুশ বছরেরও বেশী আগে পাড়ডাঙ্গার বারুজীবীরা এই প্রস্তরখণ্ডটি পেয়েছিলেন। যুগনাথ শিবমন্দিরে বেশ কিছুকাল আগে একটি পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি ছিল বলে জানা যায়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তদানীন্তন সরকারী পুরাতত্ত্ব-বিভাগের জনৈক ব্যক্তি পরীক্ষার জন্য এটি নিয়ে যান।(২২) যুগনাথ মন্দিরে যুগনাথ শিব একটি গোড়াকৃতি প্রস্তর-খণ্ড। এই শ্রেণীর প্রস্তরখণ্ডও বেশ প্রাচীন ও বৌদ্ধগণের স্থাপিত বলে অনুমিত হয়।

দণ্ডপাণিতলায় দণ্ডপাণি শিবের আসল মূর্তিটি প্রায় ৪১ বৎসর আগে (১৩৩৮ সালের চৈত্রমাসে) বিনষ্ট হয়ে গেছে বলে জানা যায়। ক্ষুদ্র একটি কক্ষে দণ্ডপাণি শিবের বর্তমান মূর্তিটি একটি কালো পাথরে খোদিত। আসল মূর্তিটি গাজনের সময় এক ভক্তসন্ন্যাসীর হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায় বলে জানা যায়, তখন সেই মূর্তিটিরই অনুরূপ আরেকটি মূর্তি পাথরে খোদাই করে রাখা হয় ও ভগ্নমূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জিত হয়। অষ্ট-ধাতুনির্মিত সেই আসলমূর্তিটির একটি মুখোশও তৈরী করে রাখা হয়েছে। বর্তমান মূর্তিটি পুরাপুরি একটি শিবের। মূর্তিটি দণ্ডায়মান, বামপদের উরুতে ডানপদ স্থাপিত। মস্তক জটাজুট-মণ্ডিত ও দুইদিকে সর্প। ডানহাত ঊর্ধ্বে ও বাম হাত নীচে করে একটি দণ্ডধৃত। পদতলে একটি হংস ও মড়ার মাথার খুলি। বিনষ্ট মূর্তিটি শোনা যায় স্থানীয় এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশী থেকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য নতুন মূর্তিতে পুরানো মূর্তির সাদৃশ্য কতখানি রয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। 'নবদ্বীপমহিমা'লেখক কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় কিন্তু আসল মূর্তিটি দেখে সেটিকে কোন বৌদ্ধশ্রমণ বা বুদ্ধমূর্তি বলেই মনে করেছিলেন। সেই মূর্তিটির মস্তকটি একটু অবনত আকারের ছিল বলে জানা যায়।(২৩) বর্তমান মূর্তিতে কিন্তু মস্তকটি অবনত নয়। এছাড়া বর্তমান মূর্তিতে আরও অনেক ভাস্করকল্পিত অঙ্কনও আছে মনে হয়। দণ্ডপাণি শব্দের অর্থ যম বা ধর্মরাজ অর্থাৎ বুদ্ধ ('সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্ত-থাগতঃ'—অমরকোষ)। তাই এটিকে বুদ্ধমূর্তি বলা যাবে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। দণ্ডপাণির মন্দিরে কতকটা তরমুজের ন্যায় লম্বা আকারের আরেকটি প্রস্তরও পূজিত হন।

দেয়াড়াপাড়ার 'এ্যালানে শিব' নামে পূজিত একটি লিঙ্গ মূর্তি বর্তমানে ঐ পাড়ার একটি প্রাচীন দালানমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। নবদ্বীপের মধ্যে এই শিবটি গৌরীপট্টে স্থাপিত। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই নবদ্বীপে প্রথম এই শিবটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান জরাজীর্ণ দালানটির পাদপীঠের ইষ্টকরাশি বেশ প্রাচীন মনে হয়।

নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু প্রস্তরখণ্ড শিবরূপে পূজিত হন, যেমন বুড়োশিবতলার বুড়ো শিব, নবদ্বীপ থানার কাছে মালোদের শিব, দেয়াড়াপাড়ায় আলোকনাথ শিব, চারি-চারাপাড়ায় বালকনাথ শিব প্রভৃতি। এসব প্রস্তরখণ্ডের কোন কোনটিতে বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধ প্রতীকচিহ্ন আছে বলে জানা যায়। পোড়ামাতলার ভবতারণ শিবের মন্দিরে ছোট একটি পাথরে একটি মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। অস্পষ্ট হলেও মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট কতকটা বুদ্ধমূর্তির ন্যায়। পাড়ডাঙ্গার প্রায় দুই মাইল দূরে, প্রাচীন গঙ্গাখাতের পশ্চিম তীরবর্তী কোবলা গ্রামে বাগ্‌দেবী নামে দুখণ্ড প্রস্তর পূজিত হন। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটটি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ এবং শিরোভাগে

সামান্য কারুকার্য আছে। অপরখানি পিঙ্গলাভ ভগ্ন স্তম্ভখণ্ড।

উপরি উল্লিখিত মূর্তি বা প্রস্তরখণ্ড ছাড়াও বৈষ্ণব ও শাক্তদের প্রতিষ্ঠিত বহু মূর্তি, মঠ ও মন্দির এই শহরে আছে। এদের মধ্যে পাড়ার মা বা সিদ্ধেশ্বরী কালী এখানকার বেশ প্রাচীন দেবতা বলে পরিচিতা, বিদগ্ধজননী বা পোড়া মা, পোড়ামাতলায় একটি প্রাচীন বটগাছের তলে স্থাপিতা। কথিত আছে, পোড়ামা বা জগন্মাতার ঘট বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধসন্ন্যাসী স্থাপন করেছিলেন। তারপর বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন করে দেবীর ঘটটিকে গ্রামের মধ্যে এনে একটি বটগাছের নীচে স্থাপন করেন। গাছটি একসময় পুড়ে গেলে দেবী 'পোড়ামা' নামে পরিচিতা হন।

এছাড়া নবদ্বীপে পঞ্চপ্রভুর মন্দিরসমূহে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসের মন্দির আছে। এদের মধ্যে মহাপ্রভুপাড়ায় 'মহাপ্রভুবাটী'তে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ আছেন। মহাপ্রভু বাড়ীর মধ্যে একটি পরিত্যক্ত পুরানো আটচালামন্দির দেখা যায়। এই সব মন্দিরে স্থাপত্য বা ভাস্কর্যগত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই এবং এদের প্রাচীনত্বও সংশয়িত। অবশ্য শহরে দুচারটি বড়মন্দির যে নেই, এমন নয়—তবে সেগুলি কত প্রাচীন বলা কঠিন। পোড়ামাতলার ভবতারিণী ও ভবতারণের মন্দির দুটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে' উল্লেখ আছে, গিরিশচন্দ্রের জমিদারী বিক্রী হয়ে গেলেও তিনি ১২৩২ সালে (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে) নবদ্বীপে দুটি বিরাটাকার মন্দির নির্মাণ করে তার একটিতে ভবতারিণী নামে দেবীমূর্তি ও অপরটিতে ভবতারণ নামে বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।(২৪) ভবতারণ ও ভবতারিণী মূর্তি সম্পর্কে শোনা যায়, গিরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মহারাজ রুদ্র রাঘবেশ্বর নামে যে শিবলিঙ্গ নবদ্বীপের ভাগীরথীতীরে প্রতিষ্ঠা করেন, পরে গঙ্গার ভাঙনে রাঘবেশ্বরের মন্দিরটি ভেঙে গেলে লোক ঐ শিবলিঙ্গকে নিয়ে সরার সময় অস্পর্শীয় লোকের ছোঁয়া লাগার ফলে শিবকে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়। পরে গিরিশচন্দ্র ঐ শিবকে তুলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান ভবতারিণী মূর্তিটিও প্রথমে মহারাজ রাঘবপ্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট গণেশমূর্তির ছিল। গণেশের মন্দিরও ভাগীরথী-নিমগ্ন হলে পরে মূর্তিটি দীর্ঘকাল মাটিচাপা অবস্থায় পড়ে থাকে। সেই মূর্তিটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গিরিশচন্দ্র যখন মাটি থেকে তোলান তখন মূর্তিটির শুঁড় ভেঙে গেলে নবদ্বীপপণ্ডিতসমাজের মতানুসারে অঙ্গহীন মূর্তিকে ধ্যানানুযায়ী ভবতারিণী মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।(২৫) লম্বোদরা ভবতারিণীকে দেখলে এটি যে প্রাচীন গণেশমূর্তি থেকে রূপান্তরীকৃত হয়েছে তা বোঝা যায়। পোড়ামাতলার ভবতারিণীর মন্দিরের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ীতলার আনন্দময়ীর মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ভবতারিণীর মন্দিরের কোন শিলালিপি দেখা যায় না। মন্দিরটির শীর্ষদেশ বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন।

নবদ্বীপ শহরে মণিপুর রাজবাড়ীতে অণুমহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। অণুমহাপ্রভুর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বেশীদিনের হবে বলে মনে হয় না।

(খ) মায়াপুর (নবদ্বীপ থানা) : প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যামদাস নামেও পরিচিত) তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' বলেছেন :

> নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
> যথা জনমিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
> যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
> তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

এই মায়াপুর গ্রামটি বর্তমানে ভাগীরথীর পূর্বতীরে 'ভক্তিরত্নাকর'-কথিত সীমন্তদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। এই সীমন্ত বা সামন্ত দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান মায়াপুর গ্রামটিকে আজ অনেকেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে বিশ্বাস করেন। প্রাচীন মিয়াপুর নাম থেকে মায়াপুর হয়েছে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। এই মায়াপুর একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গৌরবান্বিত অন্যদিকে বল্লাল সেনের নামে প্রাচীন বল্লালদীঘি সেন আমলের এক অবিস্মরণীয় পুরাকীর্তিরূপে পরিগণিত। 'চৈতন্য-ভাগবতে' আছে, মহাপ্রভু কীর্তনানন্দে নাচতে নাচতে সিমুলিয়া-নগরে উপস্থিত হলেন, তারপর গঙ্গা পার হয়ে সেখান থেকে তিনি কুলিয়ায় গেলেন। এই সীমন্তদ্বীপ বা সামন্তদ্বীপেরই অপর নাম সম্ভবতঃ সিমুলিয়া ছিল। মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সুউচ্চ মঠ ও মন্দির নির্মিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'যোগপীঠ মঠ'টিই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত। এটি গৌরাব্দ ৪৪৮ অর্থাৎ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে নির্মিত। মঠনির্মাণের সময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এখানে একটি ছোট সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি এই মঠে গৌরনিতাই বিগ্রহের সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন। এঁর নাম 'অধোক্ষজ'। মূর্তিটি যে বেশ প্রাচীন তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

যোগপীঠমঠের অল্প উত্তরে 'খোলভাঙার ডাঙা' বা শ্রীবাস-অঙ্গন প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন চলাকালে কাজী মৃদঙ্গ বা খোল ভেঙে দিয়েছিলেন। 'যোগপীঠ মঠে' মহাপ্রভুর জন্মস্থান অংশটি একটি পাকা চালাগৃহ নির্মাণ করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যোগপীঠ মঠের কিছু উত্তরে প্রসিদ্ধ বল্লালদীঘি। এই দীঘির পাড়ে অনেকদিন আগে একটি ধ্বংসস্তূপ ছিল এবং বাঙলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলে পরিচিত ছিল।(২৬) বর্তমানে তার চিহ্ন কিছুমাত্র নেই, একমাত্র দীঘির অভ্যন্তর ভাগের শুষ্ক ভূমি ছাড়া। দীঘিটি বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এটি স্থানীয় মঠের সম্পত্তি। বামনপুকুর বাজার পেরিয়ে দক্ষিণপশ্চিমমুখে পাকারাস্তার কিছু দূরেই বিরাট দীঘিটির চিহ্ন চোখে পড়ে। মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে এই দীঘিতে স্নান করতেন বলে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস উল্লেখ করেছেন।

(গ) বামনপুকুর (নবদ্বীপ থানা): বল্লালঢিবি ও চাঁদকাজীর সমাধি: মায়াপুর থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তরে চাঁদকাজীর সমাধি ও বল্লালঢিবি নদীয়ার পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ। চাঁদকাজীর আসল নাম ছিল মৌলানা সিরাজুদ্দিন। শোনা যায়, তিনি গৌড়রাজ হুসেন সাহের শিক্ষক ছিলেন। এই চাঁদকাজীই মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন বন্ধের আদেশ দেন। সমাধি-স্থানটি বামনপুকুর বাজারের পাশে পাকা রাস্তার ধারে। এর চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত ও মধ্যে সমাধির ঠিক ওপরে বেশ প্রাচীন একটি গুলঞ্চ গাছ আছে। চাঁদকাজীর সমাধি রচনার সময় এই গাছটি লাগানো হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। একথা সত্য হলে গুলঞ্চ গাছটিও চারশ সাড়ে চারশ বছরের প্রাচীন হবে।

বামনপুকুর বাজারের অল্প উত্তরপশ্চিমে এই অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল ঢিবি অবস্থিত। পুরাকীর্তিসংরক্ষণ আইন অনুসারে এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি সংরক্ষিত স্থানরূপে পরিগণিত। সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিও পূর্বে এই ঢিবির পাশে টাঙানো ছিল। কিন্তু এখন সেটি লুপ্ত। বল্লাল ঢিবি লম্বায় প্রায় ৪০০ ফিট্ ও উচ্চতায় ২৫।৩০ ফিট্। দূর থেকে এটিকে ঠিক পাহাড়ের মতো দেখায়। এই ঢিবি উত্তরপূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, কিন্তু পশ্চিমে একেবারে খাড়াই। পশ্চিমের কিছুদূরে ভাগীরথী থাকলেও এই ঢিবির বহু অংশ ভাগীরথীর গর্ভসাৎ হয়েছে। পশ্চিমাংশে ইষ্টকপ্রাচীরের বহু প্রাচীন ইঁট এখনও দেখা যায়। ঢিবির ওপরে এখনও পাথরের ছোটবড় টুকরো ও খোলাভাঙার প্রাচীন খণ্ড দেখা যায়। পশ্চি-মাংশে গঙ্গার একটি প্রাচীন খাত দেখা যায়।

বল্লাল ঢিবি লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপ বলে পরিচিত। প্রায় কুড়ি বিঘা জমির ওপর এটি বিস্তৃত ছিল শোনা যায়। আজ থেকে দেড়শ বছরেরও বেশী আগে গঙ্গার ভাঙনে এর মধ্য থেকে একটি প্রকোষ্ঠ বেরিয়েছিল বলে কেউ কেউ বলেন।(২৭) প্রাচীন এই ঢিবির বহু অংশ গঙ্গার ভাঙনে লুপ্ত এবং আরও অনেক অংশ বহুলোকের দ্বারা নষ্ট হয়েছে। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' আছে, কৃষ্ণনগরের রাজগণ এইস্থান থেকে বহু প্রস্তরখণ্ড ও স্তম্ভ রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া স্থানীয় কাজীবংশের ও বামনপুকুরের জমিদার মোল্লাদিগের বহু প্রাচীন গৃহের উপাদান এই ঢিবি থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত চাঁদকাজী সাহেবের সমাধি অঙ্গনে হিন্দু-কারুকার্যশোভিত কিছু কিছু প্রস্তরখণ্ড দেখা যেত। সেগুলি যে বল্লাল ঢিবি থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ স্থানীয় এক মোল্লা সাহেবের খননের ফলে এই ঢিবি থেকে কয়েকটি বারকোষ, একটি বাক্সের মধ্যে শাল ও রেশমী কাপড়ের টুকরো এবং কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল।(২৮)

বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ জান্নগরের উত্তরে সামন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়ায় ছিল এবং তিনি তাঁর সভাসদ্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের নবদ্বীপে বাস করতে দিয়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঘটকপ্রবর নুলো পঞ্চানন তাঁর গোষ্ঠীকথায় একথা লিখেছেন:

মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগরোত্তরে করে যে বাসস্থান॥

বল্লালরচিত 'অদ্ভুতসাগরে' উল্লেখ আছে যে তিনি (বল্লাল সেন) গঙ্গাতীরে নির্জরপুরে বাস করা কালীন ১০৯০।৯১ শকাব্দে বা ১১৬৮।৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ['গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্যানুযাতো গতঃ'] অতএব বর্তমান বল্লাল ঢিবির প্রাচীনত্ব আজ থেকে আটশ বছরেরও বেশী। অবশ্য এটি বল্লালের প্রপিতামহ সামন্তসেনের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপও হতে পারে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সামন্ত সেনের প্রাসাদ এখানে বলেই মনে করেন।(২৯) বল্লাল ঢিবি যেস্থানে অবস্থিত সে স্থানটির নাম সামন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া। কথিত আছে, সামন্তসেনের নামেই এই স্থানের নাম সীমন্তদ্বীপ বা সামন্তদ্বীপ হয়েছে। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ বিজয় প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, সামন্তসেন শেষ বয়সে পবিত্র গঙ্গাপুলিনে সুপরিসর পুণ্যাশ্রম নিচয়ে বাস করেন। ['পণ্যোত্সঙ্গানিগঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি' (৩০)]। অতএব 'বল্লাল ঢিবি' নামে পরিচিত এই ঢিবিটি সামন্তসেনের কি বল্লাল সেনের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ বলা কঠিন। সামন্ত-সেনের পৌত্র বিজয় সেনের প্রাসাদও যে এই অঞ্চলে ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' বামনপুখরিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যে এক বেজপাড়ার নাম পাওয়া যায়। বিজয়-সেনের রাজপুরী যেস্থানে ছিল তাই বিজয়পুর এবং কালক্রমে বেজপাড়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। এই বেজপাড়াতেই চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ্ ও প্রসিদ্ধ কড়চা-লেখক মুরারি গুপ্তের বাড়ী ছিল। কালক্রমে সেই বেজপাড়াও গঙ্গাগর্ভে বিলীন। অতএব বামুনপুকুরের এই অঞ্চল বরাবর সেনরাজাদের যে অনেক প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথীর পলিমাটীর চরে হয়তো সেসব দুর্লভ পুরাকীর্তি আত্মগোপন করে আছে যার মধ্য থেকে ভবিষ্যতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর 'পবনদূতে' লক্ষ্মণসেনের দুটি রাজধানী বিজয়পুর ও লক্ষ্মণাবতীর উল্লেখ আছে—'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানী'(৩১) অর্থাৎ বিজয়পুরে উন্নত স্কন্ধাবারে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। বল্লাল ঢিবির উচ্চতা দেখে এটিকে লক্ষ্মণসেনের স্কন্ধাবার বা সেনানিবাস বলেও মনে হতে পারে।

(৪) মধ্যাঞ্চল:

কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত মধ্যাঞ্চলে পুরাবস্তুসমৃদ্ধ গ্রামগুলি হল, সুবর্ণবেহার, গঙ্গাবাস, পানশীলা-ভালুকা, মাজিদা, দেপাড়া, সদর কৃষ্ণনগর, দোগাছি এবং দিগনগর।

(ক) সুবর্ণবেহার: নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপের

অন্তর্ভুক্ত এই সুবর্ণবেহার প্রাচীনকালে যে এক সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল, এখানকার প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ (যা এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন) তা প্রমাণ করত। এখন থেকে অনেক আগে এখানকার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন অনেকেই দেখেছেন। বর্তমানে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন প্রাচীন ঢিবি বা ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে না। কৃষ্ণনগর থেকে স্বরূপগঞ্জ পর্যন্ত পশ্চিমমুখী যে পাকা রাস্তা আছে তার উত্তর ধারে আমঘাটা স্টেশনের কাছাকাছি প্রাচীন সুবর্ণবিহার গ্রাম। এখানের প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপ সম্পর্কে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় তাঁর 'নবদ্বীপ-মহিমায় (১২৯৮ সালে প্রকাশিত) বলেছেন:(৩১)

'ইহা একটি ধ্বংসীভূত স্তূপ। এই স্তূপ প্রায় ২ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং উচ্চতায় প্রায় ১০ হাত হইবে। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডময়। ইহার উত্তর দিকের ভূমি বহুদূর পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই স্তূপের মধ্যস্থানে পুষ্করিণীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। তাহার পরিমাণ প্রায় ৩ কাঠা হইবে ও গভীরতাও প্রায় ৮।৯ হাত হইবে।

এই গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রোথিত আছে। তাহার অল্পাংশই মাটীর উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার শিরোদেশ শিলকুটানোর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-বিশিষ্ট। সেইজন্য মনে হয় ইহার উপর অন্যপ্রস্তরখণ্ড স্থাপিত ছিল। একবার স্থানীয় এক ব্যক্তি এই প্রস্তরের মূলদেশ খনন করাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে তুলিতে পারেন নাই। -----প্রাচীনগণের মুখে শুনা যায় ঐ স্তূপের উপর ইষ্টকময় ভিত্তি ছিল ও ভিত্তির উপর খিলানের পরিবর্তে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত ছিল। স্তূপের উত্তরাংশে লাফালাফি করিলে 'গুম্‌গুম্‌' শব্দ পাওয়া যাইত --- এই শব্দে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রায় ৮০ বৎসর আগে কৃষকেরা লাঙ্গলফলকের দ্বারা ঐস্থান খনন করে ও উহার অভ্যন্তরে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠ দেখিতে পায় --- তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া বাহিরে আসে; কয়েকপাত্র চাউলও তাহার সঙ্গে ছিল। চাউলগুলির তখন প্রস্তরীভূত অবস্থা।'

এই বর্ণনানুসারে সুবর্ণবেহার যে এক অতিপ্রাচীন স্থান তাতে সন্দেহ নেই। এখানের এই স্তূপের ইঁট ও পাথর নিয়ে কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ির গোবিন্দসড়কের কিছু অংশ তৈরী হয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করেন পালরাজগণের আমলে বা তার আগেও এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল। 'বেহার' বা 'বিহার' কথাটি বৌদ্ধচৈত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহারাজ অশোকের সময় সুবর্ণদ্বীপ নামে এক বৌদ্ধধর্ম প্রচার-কেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান পরে এখানকার অধ্যক্ষরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। অবশ্য সুবর্ণবেহারের সঙ্গে প্রাচীন সুবর্ণদ্বীপের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। কোন বুদ্ধমূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা যায় নি, আবার কেউ কেউ বলেন অনেক আগে এখানে সুবর্ণসেন নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর নাম থেকে এই গ্রামের নাম সুবর্ণবিহার হয়েছে। বর্তমানে এখানে একটি গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায় কর্তৃক মন্দির নির্মিত হয়েছে।

(খ) পানশিলা ও ভালুকা: শহর-নবদ্বীপ থেকে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে ভাগীরথীর পূর্বতীরে ভালুকা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের উত্তরাংশে পানশিলা। একটি বিরাট বিলের ধারে এই দুটি গ্রাম। পানশিলায় উঁচু একটি ঢিবির কাছে একখণ্ড পাথরে খুব প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে একটি লিপি ছিল। প্রকাশিত পাঠটি এই :

খলেতা অয়গ্‌ শ্রীমতী সিব
খলেতা অয়গ্‌ শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ
খলেতা অয়গ্‌ শ্রীমতী যোগেশ।

এর অর্থ ঠিক বোঝা না গেলেও প্রতি ছত্রের শেষে একটি করে দেবতার নামের উল্লেখ আছে। শিব –মহাদেব, মঞ্জুঘোষ = বোধিসত্ব, যোগেশ – বুদ্ধ বা ধর্ম। কারও কারও ধারণা বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ যথাক্রমে শিব, মঞ্জুঘোষ ও যোগেশে পরিণত হয়েছে।(৩২) এ থেকে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবের কথা মনে হতে পারে। পালরাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রভাব ছিল। পরবর্তিকালে শূর ও সেন-বংশীয় রাজাদের আবির্ভাবে এই ধর্ম হ্রাস পেয়ে যায়। তখন বুদ্ধ, শিব বা ধর্মে পরিণত হন। 'ভালুকা' নামটি 'ধর্মমঙ্গলে' উল্লিখিত বল্লুকার রূপান্তর কিনা ভেবে দেখার বিষয়। এই বল্লুকানদীর তীর থেকেই ধর্মপূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। বল্লুকা নদী সম্ভবত বর্তমান ভালুকার বিলেরই পরিবর্তিত রূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। এর আরেকটি প্রমাণ হলো এই বিলটি আগে একটি নদী ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার মানচিত্রে গাদিগাছা, মাজিদহ থেকে আরম্ভ করে পানশিলা, ভালুকার ভেতর দিয়ে একটি নদী সাতকুলিয়ার দক্ষিণে গঙ্গায় পতিত হয়েছে দেখা যায়। বর্তমানে এটি বিলে পরিণত। 'পানশিলা' নামটির সঙ্গে বৌদ্ধকেন্দ্র তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পানশিলা থেকে প্রায় ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে মাজিদা গ্রামে (এখন এটি মাজদিয়া নামে পরিচিত) হংসবাহনের বিলে হংসবাহন নামে এক শিব আছেন। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে হংসবাহনকে বিল থেকে তুলে এনে এই গ্রামের মধ্যস্থলে নির্মিত একটি পূজাগৃহে পূজা করা হয় এবং ১লা বৈশাখে হংসবাহনকে আবার বিলের জলে রেখে আসতে হয়। মূর্তিটি প্রস্তরনির্মিত হংসের উপর পঞ্জরচিহ্নযুক্ত একটি বুদ্ধমূর্তি বলে কেউ কেউ মনে করেন। ফকিরতলা থেকে স্বরূপগঞ্জের যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তার পাশ দিয়ে একটি কাঁচা রাস্তায় মাজিদা পৌঁছানো যায়। হংসবাহন শিবকে সদাসর্বদাই জলে রাখতে হয়। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামের বুড়ো শিবতলায়ও এ ধরনের একটি শিবের পূজো হয় গাজনের সময়।

(গ) গঙ্গাবাস: কৃষ্ণনগর-স্বরূপগঞ্জ পাকা রাস্তার ধারে আমঘাটা। এটি একটি স্টেশন। এই স্টেশনের আধ মাইল দূরে 'গঙ্গাবাস' গ্রাম। শহর-কৃষ্ণনগর থেকে ৫ মাইল দূরে

এই গ্রাম। গ্রামটির নাম গঙ্গাবাস সম্ভবতঃ মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সময় থেকেই হয়, কেননা কৃষ্ণচন্দ্র পরিণত বয়সে নিজের বাসের জন্যে এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদের কোন চিহ্ন এখন আর নেই, কেবলমাত্র ভগ্ন প্রাচীরের কিছু ইষ্টকচিহ্ন ছাড়া। অবশ্য প্রাসাদটি খুব একটা বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয় না। এর ঠিক পশ্চিমদিক দিয়ে তখন প্রবাহিত হত অলকানন্দা। এই অলকানন্দাতীরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহরের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই নেই, আর ভাস্কর্য তো নেইই। মন্দিরটি একটি চাঁদনীর ওপর দুটি খাড়াই চারচালা শিখর বা রত্ন। হরি ও হরের অভেদ প্রতিপাদনের জন্যে কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন বলে শিলালিপিটি থেকে জানা যায়। এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং অবস্থা খুবই শোচনীয়। মন্দিরাভ্যন্তরে একই বিগ্রহে হরিহরের মূর্তি প্রকাশিত। মূর্তিটির একহাতে চক্র ও অন্যহাতে ত্রিশূল। এছাড়া আরও অনেক শিলাময় বিগ্রহ এই মন্দিরে আছে। শিলালিপিটি দক্ষিণদিকে মৃত্তিকাসংলগ্ন পাদপীঠে ন্যস্ত। লিপিটি উদ্ধৃত করা হল:

> গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকেঽস্মিন্
> শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিতমহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ।
> ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামক্তাতাং পামবাণাং
> অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়া স্থাপযোল্লনয়া চ॥

শ্লোকটির ভাবার্থ এই, 'যে সব অজ্ঞান শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক্ পৃথক মনে করে পরস্পরকে বিদ্বেষ করে, সে সকল ব্যক্তিদের ভ্রান্তি দূর করার জন্যে ভুবনবিখ্যাত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৯৮ শকে গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও সেখানে হরিহরের ব্রহ্মরূপ অদ্বৈতমূর্তি লক্ষ্মী ও উমার সঙ্গে স্থাপন করলেন।

হরিহরের মন্দিরটির পূর্বপাশে আর একটি ভগ্ন মন্দির। এটিতে বর্তমানে মহাবীর, গণেশ ও শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ঠিক পাশেই এই মন্দিরটির ভগ্ন অংশ দেখা যায়। এখানকার মন্দিরগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিত্যক্ত না হলেও অচিরে এই মন্দির দুটি ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী।

বর্তমান বিশ শতকের সুরুতে মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ে 'গঙ্গাবাসের' ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ থেকে ৪টি কামান পাওয়া গিয়েছিল বলে শোনা যায়। কামানগুলি কৃষ্ণনগরের রাজ-বাড়ীতে রক্ষিত আছে। গঙ্গাবাসের প্রাসাদ সুবর্ণবিহারের প্রাচীন ইঁট ও পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছিল বলে জানা যায়। এখানে কৃষ্ণচন্দ্রকর্তৃক আরও ৬টি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(গ) দেপাড়া: কৃষ্ণনগররোড্ স্টেশন থেকে তিন মাইল দক্ষিণপশ্চিমে দেপাড়া বা দেবপল্লী একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি বলতে নৃসিংহ-দেবের প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমান মন্দিরটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র সংস্কার করেন। নৃসিংহদেবের মূর্তিটি খুবই প্রাচীন বলে অনেকের ধারণা। একটি বৃহৎ কষ্টিপাথরে মূর্তিটি খোদিত। এটির উচ্চতা প্রায় ৪ ফিট্। পদতলে প্রহ্লাদ ও অঙ্কে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। মূর্তিটির বেশ কিছুস্থানে অঙ্গহানি হয়েছে। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুবধ দৃশ্য ভাস্কর বেশ ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ভক্তিমান প্রহ্লাদের অবনতমস্তক প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অঙ্গহানির কারণ হিসেবে একটি জনশ্রুতি হল, এই মূর্তিটির অঙ্গে একটি পরশপাথর ছিল, কোনসময় এক লোভী সন্ন্যাসী তা অপহরণের জন্যে অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। নৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত ছিল জঙ্গলাবৃত এক উচ্চ ভূখণ্ডের একাংশে। আগে এখানে কারুকার্যযুক্ত বহু প্রাচীন ইঁট ও পাথর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা যেত। কোন্ সময় বা কে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা জানা আজ আর সম্ভব নয়। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন, বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর যখন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হচ্ছিল শূর ও সেন রাজাদের আমলে, এবং বহু বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল সেই সময় সম্ভবতঃ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।(৩৩) নৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দিরটি সম্পর্কে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় তাঁর 'নবদ্বীপ-মহিমা'য় (১৯১৮) বলেছেন:

> পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই দেবতার বিশাল মন্দির ছিল, সেটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেবমন্দির বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রাঙ্গণটি প্রায় কুড়ি বিঘা পরিমিত হইবে। প্রাঙ্গণের সর্বত্র কুচা পাথর ও ভগ্ন ইটে পূর্ণ। - - - - ইষ্টকের যে বৃহৎ স্তূপ আছে, তাহার মধ্যে নানাজাতীয় ইষ্টক দেখা যায়। কতকগুলি অতি প্রাচীন ও কারুকার্যখচিত।

অবশ্য এসব ধ্বংসাবশেষ এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। প্রায় দুশ বছর আগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার ও বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বলে জানা যায়। কথিত আছে, মহাপ্রভু পরিক্রমায় বের হয়ে এখানে নৃসিংহমূর্তিদর্শনে এসেছিলেন। সেজন্যে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এখানে মহোৎসব হয়।

নৃসিংহদেবের মন্দিরটির পাশেই 'চামটার বিল'। এই বিলটি আগে বিরাট ছিল। বেশ কিছুকাল আগে বিলের মধ্য থেকে ব্রোঞ্জনির্মিত সুন্দর একটি উগ্রতারামূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি খুব ছোট হলেও এর শিল্পোৎকর্ষ অদ্ভুত বলে শোনা যায়। উগ্রতারা বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লিখিত এক দেবী এঁর অপর নাম চামুণ্ডা। এটিও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে সেনআমলে তৈরী বলে অনুমিত মূর্তিটি অবশ্য উত্তোলন করার দোষে একটু অঙ্গহীন। নৃসিংহ-দেবের মন্দিরটির দেওয়ালে নতুন লিপিটি হল:

> শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবো জয়তি।
> নাগেন্দুগজভূশাকে শ্রীনৃসিহপদাশ্রিতঃ।
> শ্রীক্ষিতীশো নৃসিংহস্য সংশ্চক্রে মন্দিরং নৃপঃ॥
> শকাব্দাঃ ১৮১৮ Repaired in 1896

শ্লোকটির অর্থ হ'ল, 'শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয় হ'ক। নৃসিংহ-দেবের পদাশ্রয়ী রাজা ক্ষিতীশ ১৮১৮ শকাব্দে নৃসিংহদেবের এই মন্দির সংস্কার করলেন।'

(খ) সদর কৃষ্ণনগর: নদীয়াজেলার সদর কৃষ্ণনগরের ইতিহাস সুরু হয়েছে রাঘবের রাজ্যকাল থেকে যখন তিনি মাটিয়ারী (কৃষ্ণগঞ্জথানা) থেকে তাঁর রাজধানী স্থনান্তরিত করেন রেউইএ। রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্র এই রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করে 'কৃষ্ণনগর' নাম রাখেন। রেউইয়ের চারদিক তিনি পরিখাবেষ্টিত করেন যা 'শহর পানাবগড়' নামে পরিচিত ছিল। এখানে তিনি বিরাট প্রাসাদ স্থাপন করেন। সে সময় নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও উলা পণ্ডিত ও জ্ঞানিগুণীর বাসস্থান ছিল। রাঘব এঁদের সঙ্গলাভের জন্য রেউইএ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর রাজ্যকাল ১৬১৮-১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাই কৃষ্ণনগরের অভ্যুদয় সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে ধরা যায়। রাঘব বা তৎপুত্র রুদ্রের কোন কীর্তি আজ আর এখানে চোখে পড়ে না। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত হলেও কালক্রমে এর ওপর অনেক হাত পড়েছে। রাজবাড়ীর বিরাট পূজামণ্ডপের কিছু অংশ কৃষ্ণচন্দ্র-নির্মিত বলে জানা যায়। অপর কিছু অংশে পরবর্তী রাজাদের হস্তক্ষেপও পড়েছে। রাজবাড়ীর এই বৃহৎ পূজামণ্ডপে পঙ্কের বিচিত্র কারুকার্যগুলি প্রশংসার দাবী রাখে। তাছাড়া মণ্ডপের খিলান, থাম প্রভৃতি সব কিছুতেই রাজকীয় ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মূল পূজার স্থানটি অনেকখানি প্রশস্ত এবং তার পেছনে ও সামনে পর পর কয়েকটি দেউড়ী বা অলিন্দ আছে। বিভিন্ন পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে যাত্রা, গান, কথকতা প্রভৃতির জন্যে মূল পূজাস্থানটির সম্মুখস্থ প্রশস্ত অঙ্গনটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এই বিরাট পূজামণ্ডপের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই ধরনের বৃহৎ মণ্ডপ পশ্চিমবাঙলায় খুব কমই আছে মনে হয়। রাজবাড়ীর প্রবেশ ও তোরণপথ দুটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় এগুলির আবার সংস্কার করা হয়েছিল। তোরণপথের স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য একটু অদ্ভুত রকমের। মুসলিম স্থাপত্যের সঙ্গে এর নৈকট্য খুবই বেশী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব ইমারতেই এই ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ যেন কৃষ্ণচন্দ্রেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জীবনরঙ্গমঞ্চে তিনি যেন দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করতেন। বাইরে তিনি ছিলেন অতিমাত্র উদার-দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। তাই রাজসভায় আগ্রা ও দিল্লীর মুসলমান ও রাজপুতদের আদবকায়দা ও কলার পৃষ্ঠ-পোষকতায় তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু ভেতরে তিনি ছিলেন অতিমাত্র গোঁড়া হিন্দু।(৩৪) রাজবাড়ীর কিছু কিছু স্থাপত্যে তাঁর এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাও যে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল, সে যুগের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের বিষয় চিন্তা করলে একথা সহজেই মনে হবে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি কৃষ্ণনগরে চোখে পড়ে না, অবশ্য প্রাচীন রাজবাড়ীর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর অঙ্গনে দুএকটি প্রাচীন কামান দেখা যায়। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত এই কামানগুলি লর্ড ক্লাইভের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন। ঐ কামানগুলি আজও কৃষ্ণনগররাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে।(৩৫) নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজরাজেন্দ্রবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম একজন বিখ্যাত ধনুর্ধর ছিলেন। তিনি সাধারণের কাছে 'রঘুবীর' নামে পরিচিত ছিলেন। বারাকোটীর যুদ্ধে মুর্শীদকুলী খাঁনের পক্ষ অবলম্বন করে রাজসাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি আলীমহম্মদকে তীর বিদ্ধকরে তিনি হত্যা করেন। তাঁর ব্যবহৃত কোন কোন কামানও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে থাকা সম্ভব। 'গঙ্গাবাস' থেকে অনেকগুলি কামান মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রাজবাড়ীতে এনেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র একজন তান্ত্রিকসাধক ছিলেন। রাজ্যলাভ করার কয়েকবছর পরেই তিনি কৃষ্ণনগরে (বর্তমানে 'আনন্দময়ীতলা' নামক স্থানে) বিশাল একটি মন্দির নির্মাণ করে (মন্দিরটি একরত্ন শ্রেণীর) আনন্দময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে আনন্দময় নামক শিবের একটি মন্দিরও তিনি এইসঙ্গে স্থাপন করেন। আনন্দময়ীর মন্দির দক্ষিণমুখী। একটি বৃহৎ চাঁদনীর ওপর শিখরটি চারচালা। মন্দিরটি ইঁটের তৈরী, তবে কোন টেরা-কোটা নেই। পঙ্কের কিছু কিছু কাজ অবশ্য আছে, লতাপাতার কাজই বেশী। মন্দিরের ভিতরে শয়ান মহাকালের ওপর আসীনা দেবী আনন্দময়ী, অবশ্য দেবী নবদ্বীপ-পোড়ামাতলার ভবতারিণীর ন্যায় ভৈরবীমূর্তি নন। দেবীর মুখ দক্ষিণদিকে। এখানে পাথরের আরও অনেক দেবদেবী মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি বোধ হয় একই সঙ্গে তৈরী হয়েছিল। মন্দিরটির পাদপীঠ-সংলগ্ন প্রস্তরখোদিত সংস্কৃত লিপিটি এখন বেশ অস্পষ্ট হয়ে ভবিষ্যতে এর আর পাঠোদ্ধার করা যাবে কিনা সন্দেহ। লিপিটি এই—

বেদাঙ্গেক্ষণগোত্রকৈরবকুলাধীপে শকে শ্রীযুতে
কৈলাসপ্রতিরূপকৃষ্ণনগরে শ্রীমদ্গিরীশোৎসবে।
নাম্নানন্দময়ী শুভেহহনি মহামায়া মহাকালভৃৎ
রাজ্ঞা শ্রীলগিরীশচন্দ্রধরণীপালেন সংস্থাপিতা॥

এ শ্লোকটির ভাবার্থ হল, 'কৈলাসতুল্য কৃষ্ণনগরে শ্রীমান্ গিরীশের শুভ উৎসব দিনে ১৭২৬ শকাব্দে মহাকালধারিণী আনন্দময়ী নামে দেবী মহামায়াকে রাজা গিরীশচন্দ্র স্থাপন করলেন'। এখানে 'গিরীশোৎসবে' কথাটির অর্থ মহারাজ গিরীশচন্দ্রের অভিষেকোৎসব বা অন্যকিছু বোঝা যায় না। ১৭২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্রের অভিষেকোৎসবও হতে পারে। এই মন্দিরটির ঠিক পূর্বপাশে ছোট ছোট দুটি চারচালা

মন্দির দেখা যায়। মন্দিরগুলির কোনখানেই অলঙ্করণ নেই। এই মন্দিরদুটির চাল খাড়াই পিরামিডাকৃতি। এই ধরণের মন্দির নদীয়ায় বেশ কিছু দেখা যায়। প্রতিটিতেই বিভিন্ন দেবদেবী আছেন। গিরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ পোড়ামাতলার দুটি মন্দিরের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই মন্দির-গুলি অবশ্য আনন্দময়ীর বেশ পরবর্তী।

আনন্দময়ীতলার অল্পদক্ষিণে পাকারাস্তার ঠিক ওপরেই একটি মন্দির দেখা যায়। এটি চারচালা। এই মন্দিরটিও একটি ঠাকুরবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। পূর্বমুখী মন্দিরটির ঠিক পাশেই একটি জীর্ণ দুর্গামণ্ডপ। মণ্ডপে এখনও দুর্গাপূজা হয়। চারচালা শিবমন্দিরে পোড়ামাটির দু-একটি ফুল ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। খিলানটি 'দরুন'শ্রেণীর। অবশ্য প্রবেশপথের খিলানের ওপরে কয়েকটি প্রতীক আটচালা-মন্দির অঙ্কিত। প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে মন্দিরটির যথাযথ প্রতিষ্ঠাকালে ও প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নি। শোনা যায়, আজ থেকে প্রায় দুশ-বছর আগে জহরলাল দত্ত নামে এক জমিদার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আকার ও গঠন দেখে অবশ্য এটিকে আঠারো শতকের শেষাশেষি ফেলা যেতে পারে। শক্তিনগরের চৌধুরীপাড়ায় অপূর্ব কারুকার্যযুক্ত একটি বিধ্বস্ত মন্দির দেখা যায়। এটি শিবের মন্দির ছিল। এই মন্দিরটির পোড়ামাটির মূর্তি ও নক্‌শাকাজের সঙ্গে দোগাছির বিধ্বস্ত মন্দিরটির সুন্দর মিল আছে।

ধর্মীয় প্রাচীন ইমারতের মধ্যে কয়েকটি মস্‌জিদ, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ ও পরবর্তিকালে প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক চার্চ উল্লেখ-যোগ্য। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও সাহিত্যিক জগদানন্দ রায়ের বাস্তুভিটা, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ (১৮৪৬ খ্রী.), সি. এম. এস্ স্কুল (১৮৪২ খ্রী.), এ. ভি. স্কুল (১৮৬৩ খ্রী.), দেবনাথ স্কুল (১৮৭৩ খ্রী.) সরকারী হাসপাতাল, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৬ খ্রী.) প্রভৃতিও প্রাচীন ইমারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যাণ্ড-এর দক্ষিণে খ্রীষ্টধর্মা-বলম্বীদের একটি প্রাচীন গোরস্থান ও বর্তমান কৃষ্ণনগরের নাজিরেপাড়ায় একটি সুদৃশ্য প্রাচীন মস্‌জিদ ও মতিলাল সরকার নামে এক সাব্‌জজপ্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয় আছে। দেবালয়টি অনেকটা আনন্দময়ী মন্দিরের মতো। এটি আনু-মানিক ১০০ বছর আগের।

(৩) দোগাছি: কৃষ্ণনগরের প্রায় দু-মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দোগাছিগ্রামটি যে একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ গ্রাম অনেকেরই হয়ত তা জানা নেই। কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এই গ্রামটি কৃষ্ণনগরের পাশে নিতান্ত অবহেলিত হয়ে আজও অনেকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। শক্তিনগর-হাসপাতালের চৌরাস্তা থেকে যে পথটি দক্ষিণদিকে গেছে সেই পথে প্রথমে বারুইহুদা গ্রাম পেরিয়ে আরও কিছু দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। বারুইহুদা গ্রামেও একটি অতি সাধারণ চারচালা মন্দির রাস্তার পাশেই দেখা যায়। দোগাছি গ্রামের কিছু প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করলে এই স্থানটির এককালে সমৃদ্ধির কথা বুঝতে পারা যায়। এস্থানের আকর্ষণীয় পুরাকীর্তিটি প্রচুর পোড়ামাটির কাজ করা একটি বিধ্বস্ত মন্দির। মন্দিরটি আর কিছুদিন পরেই ভূমিসাৎ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। পুরাকীর্তি বিভাগ এই মন্দিরটির কোন সন্ধান জানেন কিনা বলা কঠিন। অবশ্য এখন আর এটিকে রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। মন্দিরটির অগ্রভাগ বা শিখরদেশ ভগ্ন, তবে আকার দেখে এটিকে নদীয়াজেলার সেকালে বহুল প্রচলিত চারচালা শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। মন্দিরটির দেওয়ালগুলি এখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এটি যে এককালে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য মন্দির ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মন্দিরটির দুদিকে দুটি প্রবেশদ্বার। সামনের দিকে পোড়া-মাটির ফুল ও সূক্ষ্ম নক্‌শা কাজ প্রচুরপরিমাণে অঙ্কিত রয়েছে। এর অপর আর একদিকে এই ধরনের প্রচুর কাজের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। দু-একটি পোড়ামাটির মূর্তিও সেখানে আছে। এই দিকের (সম্ভবতঃ উত্তরদিক) খিলানের ঠিক উপরে চোদ্দটি প্রতীক আটচালামন্দির, মধ্যে শিবলিঙ্গ অঙ্কিত। খিলানটি 'দরুন'শ্রেণীর (গৌড়ের তাঁতিপাড়া মস্‌জিদের খিলানের অনুরূপ)। এ ধরনের খিলান নদীয়াজেলার প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরেই অনুকৃত হয়েছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন মন্দিরে এ ধরনের খিলান লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির সম্মুখদিকের বামে-ডাইনে উপরে নীচে খোপে খোপে স্থাপিত টালিসমূহে পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি দেখা যায়। পাদপীঠের ঠিক ওপরেই ভিত্তিগাত্রে হংসপংক্তি যা চিরাচরিত রীতিরূপে বাঙলার অনেক মন্দিরে অঙ্কিত দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহে পশুপক্ষী ও হংসপংক্তির সুদীর্ঘ প্যানেল ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরেই সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। দোগাছির এই মন্দিরটির বাম ও ডান দুপাশে ১২টি করে টেরাকোটা। কার্নিসের ঠিক নীচেও কয়েকটি টেরাকোটা আছে। বামদিকে একেবারে নীচের দুটি টালিতে মিথুনদৃশ্য (এর পারিভাষিক সংস্কৃত শব্দ হ'ল 'মণি')। তার কিছু ওপরে কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য। ডাইনে মৎস্যাবতারের একটি ক্ষুদ্র ভাস্কর্য আছে।

কিন্তু টেরাকোটাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল কয়েকটি যোদ্ধার মূর্তি। বেশভূষা লক্ষ্য করে এগুলিকে মোগলসেনা বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ ধরণের সবশুদ্ধ ১৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি এ মন্দিরে দেখা যায়। মূর্তিগুলির বেশভূষায় আলখাল্লা ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রুযুক্ত। এককালে এদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের প্রভাব বাঙলার অনেক মন্দিরভাস্কর্যে যে পড়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্ভবতঃ ঔরঙ্গজেব ভারতের সম্রাট থাকাকালে রাজা রাঘবের শাসনকালে মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। রাজা রাঘবই হয়ত এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দিগ্‌নগরের রাঘবেশ্বরমন্দিরের টেরাকোটা ও নক্‌শাকাজের সঙ্গে এই মন্দিরের কাজের বেশ মিল আছে, তাছাড়া মোগলযোদ্ধার মূর্তিও রাঘবেশ্বরমন্দিরে লক্ষ্য করা যায়—শেষেরটিতে আবার প্রতীক মন্দিরগুলিতে দণ্ডায়মান মোগলসেনার মূর্তি অঙ্কিত যা একদিক থেকে অভিনব। অবশ্য

এগুলি রথের ওপর মোগলসেনার অবস্থিতিও সূচিত করে। এই মন্দিরের স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য ও ইঁটের গঠনের সঙ্গে রাঘবেশ্বরমন্দিরের মিল আছে। দোগাছির এই মন্দিরের সঙ্গে শক্তিনগর-চৌধুরীপাড়ার একটি বিধ্বস্ত মন্দিরের অদ্ভুত মিল আছে।

দোগাছি গ্রামটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু আবিষ্কারের দ্বারা গৌরবান্বিত। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামের একটি গাছের তলভাগ খনন করে বিরাট একটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। খননের সময়ে হোক বা যেভাবেই হোক মূর্তিটি বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়মের' একতলায় রক্ষিত আছে। ব্ল্যাক বেসাল্টের সুচিক্কণ পাথরে খোদিত মূর্তিটিকে মিউজিয়মের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কপিল মুনির বলে অনুমান করেছিলেন। মূর্তিটির ধ্যানগম্ভীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব দিব্যানুভূতি ফুটে উঠেছে। গাল ও চিবুক শ্মশ্রুযুক্ত এবং মস্তক জটাজুটমণ্ডিত। মূর্তিটির দুপাশে দুটি দণ্ডায়মান পার্শ্বচর। এটি কৃষ্ণনগর পৌরসভার পূর্বতন সহ-সভাপতি শ্রীমোহনকালী বিশ্বাস আশুতোষ মিউজিয়মকে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

দোগাছি গ্রামে পূর্বোক্ত বিধ্বস্ত মন্দিরের অদূরে একটি প্রাচীন দালান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ এটি ঠাকুর বলরামদাসের শ্রীপাট ছিল। শোনা যায় নিত্যানন্দ এখানে এসেছিলেন। পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান হিসেবে তাই এই গ্রামটি চিহ্নিত হবার যোগ্য।

(চ) দিগ্‌নগর : কৃষ্ণনগর-কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এই গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল দীঘিকানগর। দিগনগর নাম এর থেকে হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাঘব মাটিয়ারী থেকে রেউইএ (বর্তমান নাম কৃষ্ণনগর) রাজধানী স্থাপন করার পর এই অঞ্চলের পথঘাট, জলাশয় প্রভৃতি পূর্তকর্মের খুব উন্নতি করেন। তিনিই কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরের সড়ক তৈরী করেছিলেন এবং এই সড়কের (যা এখন দিগ্‌নগর নামে চিহ্নিত) ধারে একটি বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি সে সময় কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে এই দীঘি কাটিয়েছিলেন। এই দীঘিটি লম্বায় ১৪৫২ হাত ও চওড়ায় ৪২০ হাত।(৩৬) রাজা রাঘব এই দীঘির পূর্বদিকে একটি সুন্দর আটুলিকা নির্মাণ করে কাছাকাছি দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দির দুটির মধ্যে একটি বর্তমানে প্রায় বিধ্বস্ত এবং অপরটি মোটামুটি এখনও ভালো অবস্থায় আছে। এই মন্দিরটি মন্দিরদেবতা রাঘবেশ্বরের নামে পরিচিত। বাংলা চারচালা পদ্ধতিতে গঠিত এবং দক্ষিণ-মুখী এই মন্দিরে ব্ল্যাক বেসাল্টের তৈরী রাঘবেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজিত হন। মন্দিরটির লিপি সৌভাগ্যের বিষয় এখনও বর্তমান আছে যা থেকে প্রতিষ্ঠাকাল ও দীঘিখননের বিষয় জানা যায়। এই লিপিফলকটি সামনের দিকে কার্নিসের নীচে স্থাপিত। নীচ থেকে এটির পাঠোদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব। ফলকটির চারপাশের চুণবালি বেশ আলগা হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট দৃষ্টি না দিলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পুরাতত্ত্ববিভাগ এ মন্দিরটিকে এখনও সংরক্ষিত পুরাকীর্তিরূপে ঘোষণা করেন নি বা মন্দিরসংস্কারের-ও কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কিন্তু এটি সতেরো শতকে নির্মিত উৎকৃষ্ট কারুকলার সমৃদ্ধ যে একটি পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে অনেক সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তির অঙ্গহানি ঘটেছে দেখা যায়। তার ফলে অনেক উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। লিপিটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল :

১৫৯১॥ শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক
রত্নাকরো ধীরশ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণি
ভূমীভুজামগ্রণীঃ॥ নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিমনির্ম্মল
জলপ্রদ্যোতিনীন্দীঘিকান্তত্তীরে
কৃতরম্যবেশ্মনি শিবন্দেবং সমস্থাপয়ত্॥

ঠিক এইভাবেই লিপিফলকে সারিগুলি সাজানো দেখা যায়। 'র' অক্ষরগুলি 'ব' এর মাঝখান কাটা অবস্থায় উৎকীর্ণ। সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত এই শ্লোকটির প্রতি চরণে উনিশটি অক্ষর আছে। শ্লোকটির অর্থ হল, '১৫৯১ শকে (=১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) পবিত্ররত্নাকরসদৃশ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভূমিপালদের প্রধান ও ধীরস্বভাব শ্রীযুত রাঘব স্বচ্ছতরঙ্গমালা ও নির্মল জলের দ্বারা সমুজ্জ্বল দীঘি খনন করে তার তীরে সুরম্য মন্দিরে শিবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির মূর্তির সূক্ষ্ম কাজ এ মন্দিরের বিশেষত্ব। উল্লেখযোগ্য টেরাকোটাগুলি হল, (১) পাদপীঠসংলগ্ন মন্দিরগাত্রের একটি প্যানেলে জমিদার বা রাজার শিবিকারোহণে যাত্রা এবং সামনে পিছনে ঘোড়সওয়ার ও লোকলস্কর, (২) একটি মিথুনদৃশ্য (মণি)—মন্দিরগাত্রে এ ধরণের সবশুদ্ধ তিনটি টালি দেখা যায় (৩) কদম্ববৃক্ষে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য—যা বহু মন্দিরেই আবশ্যিকভাবে স্থান পেয়েছে (৪) খোল-করতাল সহযোগে হরিনাম সঙ্কীর্তন (৫) রাধাকৃষ্ণের বহু মূর্তি (৬) হংসপংক্তি (৭) বাঈজীনাচ ও জমিদারকে মদ্য-পরিবেশন (৮) প্রবেশপথের খিলানের ওপরের চারপাশে চার-চালা প্রতীক শিবালয় ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ (৯) মন্দিরের দিকে একটি ফলকে ডান পায়ের উপর বাঁ পা রেখে বৃক্ষতলে দণ্ডায়-মানা এক নগ্ননারীমূর্তি, তার বাঁপাশে একটি হরিণ শিশু। এটি কোন গোপীর লীলাবিলাস মনে হয়। কিন্তু এ মন্দিরে টেরাকোটা-গুলির মধ্যে লক্ষণীয় হলো পুবদিকের দেওয়ালে রুদ্ধ দ্বার-পথের খিলানের ওপরে রথ বা প্রতীক মন্দিরের মধ্যে দণ্ডায়মান মুসলমান যোদ্ধা। ঠিক এধরণের ভাস্কর্য পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন মন্দিরে আছে কিনা জানা নেই। এই মন্দিরটির আরেকটি বিশেষত্ব হল, উৎকৃষ্ট প্রচুর নকাশি কাজ যা নদীয়ার খুব কম মন্দিরেই মেলে। পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সবই পাশ থেকে দেখানো হয়েছে এবং এগুলির গাত্রে রেখার সূক্ষ্ম কাজ এই শতকে নির্মিত ভাস্কর্যকলার বৈশিষ্ট্য বহন করে। একটি

ফলকে গোষ্ঠবিহারে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি সুন্দর-ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ছোট ছোট ফলক, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা যা শিল্পকলার উৎকর্ষ সূচিত করে এই মন্দিরে তার বহু নমুনা মেলে। মন্দিরটির দক্ষিণ ও পূর্ব-দিকে টেরাকোটাগুলি সন্নিবিষ্ট, উত্তর ও পশ্চিমাংশে কোন অলঙ্করণ নেই। এর কারণ কি জানা যায় না। বাঙলার মন্দিরগুলিতে সাধারণতঃ সামনের দিকে অথবা চারপাশেই টেরাকোটাবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় (অবশ্য মন্দিরের চারদিকে টেরাকোটাসজ্জা খুব কম মন্দিরেই আছে— বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া-জেলা) এ ধরনের মন্দিরই বেশী অর্থাৎ চারপাশেই অলঙ্করণ-যুক্ত)। কিন্তু এই মন্দিরের চারপাশে টেরাকোটাবিন্যাস ছিল কিনা জানা যায় না। সম্ভবত ছিল না বলেই মনে হয়।

রাঘবেশ্বরের এই মন্দিরটির ঠিক পূর্বদিকে আরেকটি পশ্চিম-মুখী ভগ্ন মন্দির দেখা যায় এবং এতে টেরাকোটার কাজও যে বেশ ছিল তা বোঝা যায়। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং কোন লিপিও এখানে নেই। এটি রাঘবের বা অন্য কারও প্রতিষ্ঠিত কিনা জানার উপায় নেই। রাঘবেশ্বর-মন্দিরে উক্ত লিপিফলকে রাঘবপ্রতিষ্ঠিত একটি মাত্র মন্দিরেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মহাকবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' রাঘবকর্তৃক দীঘিখনন ও শিবপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে এবং আরও বলা হয়েছে যে তিনি দেগাঁয়ের কুমার দেপালের রাজ্য ও ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন।(৩৭)

(৫) পূর্বাঞ্চল :

পুরাকীর্তির দিক দিয়ে নদীয়াজেলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলেও উল্লেখ করার মতো কয়েকটি পুরাকীর্তি এখনও বর্তমান আছে। এই পূর্বাঞ্চলটিকে কৃষ্ণগঞ্জ ও চাপড়া থানার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পূর্বাঞ্চলের পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান-গুলির সঙ্গে কৃষ্ণনগরের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা আছে। স্থানগুলির প্রায় সবই কৃষ্ণগঞ্জ থানার এক্তিয়ারভুক্ত মাটিয়ারী ও শিবনিবাস গ্রামে অবস্থিত। চাপড়া থানায় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি বলতে তেমন কিছু নেই, একমাত্র ওখানে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত গীর্জা ছাড়া।

(ক) মাটিয়ারী : কৃষ্ণনগর থেকে পূর্বে মাজদিয়া। মাজদিয়া রাণাঘাট-গেদে রেলপথের অন্যতম একটি স্টেশন। মাজদিয়া থেকে উত্তরপর্বে পাকারাস্তায় মাটিয়ারীতে পৌঁছানো যায়। এই গ্রামটি বানপুর স্টেশনের কিছু পূর্বদিকে অবস্থিত। অবশ্য রাণাঘাট-গেদে লাইন দিয়ে একেবারে বানপুর স্টেশনে নেমে ওখান থেকে মাটিয়ারী যাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর থেকে বাস-যোগেও এখানে আসা যায়।

মাটিয়ারী গ্রামটি বেশ প্রাচীন। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার বাগোয়ান থেকে এই গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। শূরবংশীয় রাজা আদিশূর কর্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষিতীশ ছিলেন অন্যতম। ভবানন্দ এই ক্ষিতীশেরই অধস্তন পুরুষ। যশোররাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে সাহায্য করায় মহারাজ মানসিংহ ভবানন্দের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরকে দিয়ে ভবানন্দকে ১০১৫ হিজরীতে (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ) নদীয়া, মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে সম্মানসূচক 'মজুমদার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ভবানন্দ এইভাবে সম্মানিত হয়ে মাটিয়ারীতে গড় ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সেই গড় ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজও ঐ গ্রামে লক্ষ্য করা যায়। রাজপুরীর চারপাশ যে এককালে গভীর পরিখাবেষ্টিত ছিল তা এখনও বোঝা যায়। রাজপুরী যে স্থানে ছিল সেই জায়গাটি এখন উঁচু ডাঙার মতো, অনেকখানি স্থান বিস্তৃত। এর উত্তরদিকে গভীর পরিখাচিহ্ন দেখা যায়। এখন সেটি রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এই পরিখাটি মিলিত হয়েছে পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি বিলের সঙ্গে। এটির নাম 'হাতিয়ারী বিল'। নদীয়া জেলার অন্যান্য বিলের মতো এই বিলটিও লম্বা ও অনেক দূর বিস্তৃত। গড়ের উত্তরদিকে পরিখাসংলগ্ন প্রাচীরের পুরানো ইঁট এখনও মৃত্তিকাপ্রোথিত দেখা যায়। তাছাড়া এখানে প্রাচীন একটি পাকা ঘাটের বা তোরণপথের মৃত্তিকাপ্রোথিত ইষ্টকচিহ্ন ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। গড়টির কোন কোন অংশ জঙ্গলাকীর্ণ, অবশ্য বেশীরভাগ অংশে কৃষিকার্যাদি হচ্ছে। বহু প্রাচীন ইঁটের ও পাথরের টুকরো এখানে ওখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। গড়ের পশ্চিমে হাতিয়ারী বিলের সন্নিহিত একটি পুরানো মজাপুকুর দেখা যায়। এটিও গড় নির্মাণকালের বলে অনেকের ধারণা। ভবানন্দের পুত্র গোপাল তস্য পুত্র রাঘব, রাঘবের পুত্র রুদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের রাজ্যকালে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-বরদা পরগণার রাজা শোভা সিংহের আক্রমণে (১৬৯৫ খ্রী:) বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র জগদ্রাম নারীবেশে কৃষ্ণনগরে রামকৃষ্ণের আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি (রামকৃষ্ণ) জগদ্রামকে মাটিয়ারীর প্রাসাদে লুকিয়ে রাখেন। পরে জগদ্রাম সেখান থেকে ঢাকায় যান।

ভবানন্দের গড়বাড়ীছাড়া মাটিয়ারীতে রুদ্ররায় প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন মন্দিরও হজরত সাউ মুলকে গৌজের একটি দরগা প্রাচীন ইমারতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি বাংলা চারচালা পদ্ধতিতে গঠিত। এটি রাজা রুদ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শোনা যায়। মন্দিরে রুদ্রেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ পূজিত হন। অবশ্য রুদ্র রায় এটি ঠিক প্রতিষ্ঠা করেন কিনা তা জানার জন্যে প্রমাণযোগ্য কোন লিপি এ মন্দিরে নেই। স্থানীয় এক বৃদ্ধ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ীতে এই মন্দিরের স্থানচ্যুত লিপিফলকটি ছিল বলে জানা যায় এবং তিনি বলেন, সেই লিপিফলকে রাজা রুদ্রপ্রতিষ্ঠিত ও শিবের নাম রুদ্রেশ্বর বলে উল্লেখ ছিল। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি দিগ্‌নগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। দক্ষিণ-দিকের দরজা ছাড়া আর কোন দরজা এখানে নেই। পর্বদিকে দেওয়ালের উর্ধ্বদিকে লিপিটি ছিল বলে জানা যায়, সম্ভবত কয়েক বছর আগে মন্দিরসংস্কারের সময় সেটি স্থানচ্যুত ও পরে বিনষ্ট হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। দিগ্‌নগরের

রাঘবেশ্বর মন্দিরের মতো অনেকটা হলেও এই মন্দিরের শিরোভাগে তিনটি চূড়া—বলাবাহুল্য এই চূড়াগুলি কোন রত্ন বা শিখর নয়, কলস-আমলক-ত্রিশূল-চক্রের সমষ্টি। মাঝের চূড়াটি পদ্মাকৃতি। মন্দিরের সামনের দিকে বামে ও ডাইনে ছোট ছোট কুলুঙ্গীতে সজ্জিত যথাক্রমে ৭টি ও ৬টি টালিতে উৎকীর্ণ মোগলমূর্তি। এদের সকলেরই পরনে আলখাল্লা। খিলানটি পূর্বকথিত দরুন শ্রেণীর এবং প্রবেশপথের দু-পাশে দুটি ছোট থাম, কতকটা মসজিদমিনারের মতো যা নদীয়ার প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রায় সবগুলিতেই দেখা যায়। প্রবেশপথের খিলানের ওপর ১২টি প্রতীক আটচালা মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ। এছাড়া লতাপাতার প্রচুর নক্শা এই মন্দিরে দেখা যায়। খিলানের উপরের প্রস্থে এই সুন্দর নক্শা কাজগুলি ছাড়া পোড়ামাটির কোন মূর্তি নেই। অবশ্য পাদপীঠের সংলগ্ন দেওয়ালের গায়ে পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, একটি প্যানেলে যুদ্ধদৃশ্য, যোদ্ধাদের হস্তে পতাকা, হস্তী ও অশ্বে আরোহণরত যোদ্ধা ; আরেকটি প্যানেলে গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য ও নৌকাবিলাস। লক্ষণীয়, এই প্যানেলগুলির ওপরে রয়েছে হংস-পংক্তির দৃশ্য (বীরনগরের জোড়বাংলা মন্দিরেও এই রীতি অনুসৃত)। ডাইনের দিকে পাদপীঠসংলগ্ন ভিত্তিতে কৃষ্ণলীলা, সাহেবের ব্যাঘ্রশিকার, হরিণশিকার এবং হরিণের প্রাণভয়ে পলায়ন প্রভৃতি দৃশ্য। এগুলি ছাড়া আর কোন টেরাকোটা এ মন্দিরে নেই। শিবলিঙ্গটি ব্ল্যাক মার্বেল নির্মিত। মন্দির-টির পশ্চিমে একটি নাটমন্দির বা ভোগশালা ছিল বলে অনুমান করা যায়। মন্দিরের পাদপীঠ ও কিছু কিছু অংশের সংস্কার কয়েক বৎসর আগে হয়েছে।

হজরত সাউ মুলুকে গোজ বা চলতি কথায় যা 'বুড়ো সাহেবে'র দরগা বলে এই গ্রামে পরিচিত সেটি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়। নদীয়া জেলায় মুসলমানদের যতগুলি দরগা আছে তাদের মধ্যে এই দরগাটি খুবই প্রসিদ্ধ। এর নামান্তর 'মল্লিক গসে'র দরগা। মল্লিক গস্ একটি উপাধি। "মলি-অল্-গস্' থেকে শব্দটির উৎপত্তি বলে কারও কারও ধারণা। গস্ শব্দের মানে ফকির, মলি-অল্ অর্থে বাদশা অর্থাৎ ফকিরের বাদশা। এই দরগাটি কতদিনের প্রাচীন বলা কঠিন। তবে শোনা যায় ,ভবানন্দ মজুমদারের সময় হজরত সাউ মুলুকে গৌজ নামে এক পীর ও তাঁর ভাই করিম দু-জন শিষ্যকে নিয়ে এই গ্রামে আসেন। করিমও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে এই দরগাতেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। দরগাটি পশ্চিমমুখী এবং এর পশ্চিমদিকে সংলগ্ন একটি পুকুর যা প্রায় সব পীরের আস্তানা ও মসজিদের সঙ্গে দেখা যায়। দরগার বারান্দায় থামগুলি পাথরের তৈরী। খিলান 'দরুন' শ্রেণীর। বারান্দা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে উক্ত পীরের সমাধি দেখা যায়। সমাধির শিরোভাগে অস্পষ্ট অক্ষরে কি যেন লেখা আছে মনে হয়। সমাধি-অঙ্গনটির চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মল্লিক গসের সমাধির ঠিক দক্ষিণপাশে আরও দুটি ক্ষুদ্র সমাধি দেখা যায়। সম্ভরত এর একটি মল্লিকগসের ভাই করিমের হতে পারে। দরগাটির দক্ষিণাংশের অনেকখানি বিধ্বস্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। একটি জায়গায় অনেকটা কামানের আকৃতির মতো পাথরের একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা এটিকে পীরের 'আশাবাড়ি' বলে থাকেন। কেউ এটিকে স্পর্শও করেন না। তবে মনে হয় এটি একটি থামের অংশবিশেষ। মাটিয়ারীগ্রামে রাস্তার গায়ে একটি মস্জিদও দেখা যায়।

(খ) শিবনিবাস: কৃষ্ণনগর মাজদিয়া রোডে 'মন্দিরঘাট' বাস স্টপেজের দক্ষিণে চূর্ণীখালের পাড়ে শিবনিবাসগ্রাম। প্রাসাদ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই গ্রামটির এই নাম দিয়েছিলেন। শোনা যায়, তিনি এই গ্রামে সবশুদ্ধ ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।(৩৮) সেগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি এখন অবশিষ্ট আছে। এই মন্দির তিনটির প্রতিটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফিট্ হবে বা তারও বেশী হতে পারে। এগুলির একটিতে রামসীতা ও বাকী দুটিতে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। শিবনিবাসের এই মন্দিরগুলির চূড়া দূরে বাসরাস্তা থেকেও লক্ষ্য করা যায়। চূর্ণীর খাল পেরিয়ে প্রথম মন্দিরটি রামসীতার। এটিকে পুরোপুরি একরত্নশ্রেণীর বলা যায় না। আংশিক দালান আকারের কোঠার ওপর একটি উচ্চ শিখর স্থাপিত যা কতকটা বর্গক্ষেত্রাকার। শিখরটির ছাদ পিরামিডের ন্যায়। শিখরটির সর্বমোট তিনটি খিলান গথিকস্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। নীচে দালানের পাঁচটি খিলানও এই শ্রেণীর। শিখরটির চারকোণে আরবীয় পদ্ধতিতে কাজ করা মন্দিরের ভেতরে কালো পাথরের তৈরী রামচন্দ্রের আসীন মূর্তি, সীতাদেবী পাশে দণ্ডায়মানা। রামচন্দ্রের মূর্তিটি গাম্ভীর্য উৎপাদক। এগুলি ছাড়া এখানে কৃষ্ণ ও একটি কালীমূর্তিও আছে। মন্দিরটি ১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দালানটির ওপরের দেওয়ালে প্রোথিত শিলালিপিটি এই—

দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকো ব্রহ্মরাজর্ষিবংশে
যোহসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতিবসুবসুধেশাংশকে তুল্যসংখ্যে।
প্রেয়স্যাস্তন্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকীলক্ষণাভ্যাং
প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদাধিপতি শ্রীযুতরামচন্দ্রঃ ॥

সংস্কৃত স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত এই শ্লোকটির প্রতিচরণে একুশটি অক্ষর আছে। শ্লোকটির ভাবার্থ হ'ল 'ব্রাহ্মণরাজর্ষিবংশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদেব নামে এক শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তাঁর প্রিয় মহিষীর এই সুন্দর সৌধে ১৬৮৪ শকাব্দে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত ত্রিভুবনাধিপতি রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন।' এই মন্দিরের একাংশে রক্ষিত একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি এখানকার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মূর্তিটি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়ঃ সম্ভবত এই মূর্তিটি অন্য কোন স্থান থেকে এনে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় মন্দিরটি রাজ্ঞীশ্বর নামক শিবের। এটি বাংলা চারচালা শ্রেণীর হলেও উচ্চতা ও গঠনে কৃষ্ণচন্দ্রীয় স্থাপত্যের পরিচয় বহন করে। শিবলিঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ৭½ ফিট।

বেদিতে বাঙলা হরফে খোদিত একটি লিপিও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠাকালের লিপিফলকটি প্রোথিত রয়েছে পাদপীঠের একেবারে নীচে মাটির কাছাকাছি। লিপিটি যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল :

১৬৮৪
যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈবমূর্তিবসুধেশানাংশকে সম্ভবাত্
সংখ্যাতঃ ক্ষিতিদেবরাজপদভাক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রভুঃ।
তস্য ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয়মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ স্বয়ং
প্রাসাদপ্রবরে প্রসাদসুমুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ত্॥

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষী স্বয়ং যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি এই উৎকৃষ্ট হর্ম্যে প্রসন্নবদন শিবকে ১৬৮৪ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শিবাংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর দেবরাজপদলাভ করেছিলেন।' শ্লোকটি সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। অতএব এটিও ১৬৮৪ শকাব্দ বা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

তৃতীয় মন্দিরটি এখানকার প্রসিদ্ধ বুড়োশিবের। এই শিবের প্রকৃত নাম রাজরাজেশ্বর। এখানকার তিনটি মন্দিরের মধ্যে এটি প্রাচীনতম। ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়। শিলালিপিটি দক্ষিণাংশের দেওয়ালের বেশ উচ্চে স্থাপিত। সংস্কৃত শ্লোকটি এই—

যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরুজৈষ্টাদিসী শাংশকে
সেনানীমুখবাজিরাজবিলসৎ সংখ্যাবতীদম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপালচূড়ামণিঃ
পৌত্রঃ শ্রীযুতকৃষ্ণচন্দ্রনৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ত্॥

'ইন্দুচুম্বিশিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ করে নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র এখানে শম্ভুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।' এই মন্দিরটি বাঙলায় প্রচলিত রীতির কোন শ্রেণীতে পড়ে না। শিখরটি ছত্রাকার ও নীচে দেওয়ালের আটকোণে আটটি মিনারের ধরনে আরবীয় অলঙ্করণ। একদা বাঙলায় বহুল প্রচলিত দেউল মন্দিরের মতো শিবনিবাসের এই মন্দিরগুলির শীর্ষদেশকে দেউল আকৃতি করার চেষ্টা করা যে হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। তাই এদের উচ্চতাটাই বেশী করে চোখে পড়ে। রাজরাজেশ্বর শিবলিঙ্গটি ব্ল্যাক মার্বেলে নির্মিত ও উচ্চতায় প্রায় ৯ ফিট্। এতবড় শিবলিঙ্গ পশ্চিমবাঙলায় খুব কমই দেখা যায়, কলকাতার ভূকৈলাস রাজবাড়ীর শিবলিঙ্গও উচ্চতায় এতখানি হবে কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য শিবনিবাসের এই মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির কারুকায বলতে কিছুমাত্র নেই। খিলানগুলি সবই গথিকস্থাপত্যের অনুকৃতি। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার তদানীন্তন বিশপ হেবার সাহেব জলপথে ঢাকা যাওয়ার সময় এখানে নেমে মন্দিরগুলি দেখে মুগ্ধ হন। এখানকার সৌধরাজির বিস্তৃত বিবরণী ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত জার্ণালে তিনি প্রকাশ করেন।

এই মন্দিরগুলির পশ্চিমদিকে জঙ্গলে ঢাকা রাজবাড়ীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। শোনা যায়, বর্গীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগর থেকে এখানে সরিয়ে আনেন এবং চূর্ণী থেকে বর্তমান খালটি খনন করেন। এইখানেই তিনি বৃহৎ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। শিবনিবাসের চারপাশ কঙ্কণার আকারে নদীবেষ্টিত। তাই সেগুলি শত্রুআক্রমণ প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য পরিখাস্বরূপ। প্রচলিত একটি ছড়ায় এই স্থানকে কাশীতুল্য বলা হয়েছে। ছড়াটি হ'ল :

শিবনিবাসী তুল্যকাশী ধন্য নদী কঙ্কণা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি নীচে বাজে ঠন্ঠনা॥

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও এই শিবনিবাসের উল্লেখ আছে। সেখানে 'মজুমদারের স্বর্গযাত্রা' অংশে অন্নপূর্ণা ভবানন্দকে বলছেন :

----কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সমান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥

'অন্নদামঙ্গলের' রচনাকাল ১১৫৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভবত তার আগে থেকেই শিবনিবাসের প্রাসাদ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। লক্ষণীয়, 'অন্নদামঙ্গলে' কিন্তু উক্ত তিনটি মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। কারণ এ কাব্যটি এখানকার প্রাচীনতম মন্দির নির্মিত হওয়ার আগেই রচিত হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই 'গঙ্গাবাস' বা সেখানকার মন্দিরাদিরও কোন উল্লেখ এই কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্র গঙ্গাবাস নির্মিত হওয়ার অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

(৬) দক্ষিণাঞ্চল :

পুরাকীর্তির দিক থেকে নদীয়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলকে শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ ও হরিণঘাটা থানায় বিভক্ত করা যেতে পারে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি থানায় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

(ক) বাগআঁচড়া (শান্তিপুর থানা): শান্তিপুর থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে বাগআঁচড়া গ্রাম। শান্তিপুর স্টেশন থেকে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়ে এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বাগআঁচড়া গ্রামটি ভাগীরথী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। এই গ্রামে প্রাচীন একটি ঠাকুরবাড়ী ছিল। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারদিকে চারটি মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে একটি শিবমন্দির ছিল বাংলা আটচালা রীতির। মন্দিরটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। পূর্ববেলওয়ে প্রচারিত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খণ্ডের ৯৯, ১০০ ও ১০১ পৃষ্ঠায়

মন্দিরটির কয়েকটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সেই আলোকচিত্র থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। সুন্দর সুন্দব নকশা ও পোড়ামাটির মূর্তির প্রাচুর্য সেই মন্দিরে যতখানি ছিল নদীয়াজেলার খুব কম মন্দিরেই তা বর্তমান আছে। মন্দিরটি চাঁদ রায় নামক এক ব্যক্তির কীর্তি। এই চাঁদ রায় কে তা সঠিক বলা যায় না। লিপিফলকে মন্দিরটি চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ আছে। সুখের বিষয় মন্দির নষ্ট হয়ে গেলেও লিপিফলকটি 'শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদে' রক্ষিত আছে। এই চাঁদ রায়কে কেউ কেউ রাজা রুদ্ররায়ের দেওয়ান বলে মনে করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তিনি প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায়—চাঁদ রায় বলে উল্লিখিত হয়েছেন। লিপি থেকে জানা যায় ১৫৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। লিপিটি উদ্ধৃত করা হল :

শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকরকরক্ষীরোদনীরোপমম্।
তস্মৈ সৌধমিদং মুদা সুজলদা নিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিতধীরধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ॥

'শিবপদে সতত নিমগ্ন ধীর স্থির চাঁদ রায় ১৫৮৭ শকে শঙ্করকে স্থাপনা করে চন্দ্রকিরণ ও দুগ্ধসমুদ্রতুল্য এই সৌধ সানন্দে তাঁকে দান করলেন। এই সৌধের শিরোভাগে স্থাপিত ধ্বজ সুনির্মল মেঘরাশিতে নিলীন হয়ে চঞ্চল হয়।' মন্দিরটি তখন ছিল দুগ্ধধবলবর্ণ এবং মন্দিরগাত্রে খচিত পোড়ামাটির মূর্তি ও অলঙ্করণ ছিল এর গৌরব।

বাগআঁচড়ায় প্রসিদ্ধ বাগ্‌দেবী মাতার মন্দির ও জনৈক সাধুর সমাধিমন্দির আছে। বাগ্‌দেবীর কোন মূর্তি নেই। ঘটেই পূজাদি হয়ে থাকে। বাগ্‌আঁচড়ার অপর নাম ব্রহ্ম-শাসন। কথিত আছে, রাজা রুদ্র একটি আদর্শ ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম স্থাপন করার মানসে এই গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করেন। সেইজন্যই এই গ্রামের নাম হয় ব্রহ্মশাসন। ষোল শতকের মাঝামাঝি রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সাধক বাগ্‌দেবী প্রতিষ্ঠা করেন।

(খ) শান্তিপুর : শান্তিপুর যে খুবই প্রাচীন স্থান বহুগ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণে সরাসরি বাসপথে এখানে পৌঁছানো যায়। তাছাড়া রাণাঘাটের পর কালীনারায়ণপুর জংশন থেকে শান্তিপুর লাইনের রেলপথেও এখানে আসা যায়। ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার এক প্রাচীন পীঠস্থান এই শান্তিপুর। পুরাকীর্তির দিক থেকেও এই স্থান যে উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্বের দাবী করে, তার প্রমাণ এখানকার প্রাচীন কয়েকটি মন্দির, মস্‌জিদ ইত্যাদি। এছাড়া বৈষ্ণব ধর্মাচার্য অদ্বৈতপ্রভু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বীর আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতি-পূতস্থানও এই শান্তিপুরে আছে।

(১) উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দিরসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে জলেশ্বর মন্দিরের। এই মন্দিরটি শান্তিপুরের মতিগঞ্জ-বেজপাড়ায় অবস্থিত। জলেশ্বর-শিবলিঙ্গ ব্ল্যাক্ মার্বেল পাথরে নির্মিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী হলেও এর পূর্বদিকে দরজা আছে। মন্দিরটি উচ্চ এবং বাংলা চারচালা-পদ্ধতিতে নির্মিত। এর কারুকার্যগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। কতকটা দিগ্‌নগরের মন্দিরের অনুরূপ হলেও এই মন্দিরের উচ্চতা দিগ্‌নগরমন্দির থেকেও বেশী। নক্‌শা ও পোড়ামাটির মূর্তির সঙ্গেও রাঘবেশ্বরমন্দিরের কিছু কিছু সাদৃশ্য এতে লক্ষ্য করা যায়, মাটিয়ারীর রুদ্রেশ্বরমন্দিরের সঙ্গেও এই মন্দিরের গঠন, আকৃতি ও কারুকার্যের অনেক মিল আছে—তবে সেটির থেকেও এ মন্দিরের উচ্চতা বেশী। প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে এই মন্দির কার বা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। কোথাও কোথাও এটি রাজা রুদ্রের কনিষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণের মাতার প্রতি-ষ্ঠিত বলে বলা হয়েছে।(৩৯) কিন্তু একথা ঠিক কিনা ভেবে দেখার বিষয়। মন্দিরের বর্তমান সেবায়েতের মতে এখানকার শিবের পূর্ব নাম ছিল রাঘবেশ্বর। রাজা রাঘব এঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইনি জলেশ্বর নামে পরিচিত হন। একসময় শান্তিপুর অঞ্চলে দারুণ অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃষ্টিপাতের জন্য সে সময় এই শিবের মাথায় জল ঢেলেছিলেন। তারপরই বেশ বৃষ্টিপাত হয়। আর সেই থেকেই এই শিবের নাম জলেশ্বর হয়।

মন্দিরটির পূর্ব ও দক্ষিণ দেওয়ালে বেশ কিছু টেরাকোটা ও নক্‌শা কাজ আছে। টেরাকোটাগুলি পৃথক্ পৃথক্ টালিতে সন্নিবিষ্ট। খিলান 'দরুন' শ্রেণীর এবং ওপরে শিবের প্রতীক আটচালা মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ। প্রবেশ পথের দু'পাশে দুটি থাম, কিন্তু গর্ভগৃহসংলগ্ন কোন অলিন্দ নেই। সম্ভবত পরবর্তিকালে নির্মিত একটি নাটমন্দির দক্ষিণদিকে আছে। উল্লেখ্য টেরাকোটাগুলির মধ্যে তীরন্দাজকর্তৃক অশ্বকন্যাকে তীর নিঃক্ষেপ। (এটি পূর্বদিকের দেওয়ালের বাঁ দিকে আছে)। এছাড়া আছে সাহেবদের কোন কোন মূর্তি। পৌরাণিক লীলাচিত্রের মধ্যে কালীয়দমন, গরুড়বাহন, বিষ্ণু, হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি। একটি ফলকে গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে জনৈক মুনির ধ্যানমগ্ন অবস্থাটি বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'মণি' বা মিথুনভাস্কর্যের কোন চিত্র এ মন্দিরে নেই।

মন্দিরের ভেতরের একটি কুলুঙ্গীতে রক্ষিত অভয়তারিণী দুর্গার একটি পিতলের মূর্তি আছে। প্রথম দর্শনে এটিকে বুদ্ধমূর্তি বলে ভুল হতে পারে। ঠিক বুদ্ধের ভঙ্গিমায় মূর্তিটি সমাসীন। দেবীর ডানহাতে বরাভয়মুদ্রা। মূর্তিটি খুব ছোট হলেও এতে নিখুঁত ভাস্কর্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) অদ্বৈতপ্রভু ও গোকুলচাঁদের মন্দির, হাটখোলাপাড়া : হাটখোলাপাড়ায় মধ্যমগোস্বামীর বাড়ীতে অদ্বৈতপ্রভু ও গোকুল-চাঁদের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে খুবই উল্লেখ-যোগ্য। দুটি মন্দিরই বাংলা আটচালা পদ্ধতিতে গঠিত। প্রতিষ্ঠা-কালের কোন লিপি পাওয়া না গেলেও গঠন ও আকারে এই দুটি মন্দির বেশ প্রাচীন মনে হয়। গোকুলচাঁদের মন্দিরটি

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। গোকুলচাঁদ ও অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে শেষোক্ততেই রয়েছে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য। প্রথমটিতে পোড়ামাটির কোন মূর্তিভাস্কর্য না থাকলেও পঙ্কের কিছু কিছু কাজ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যমগোস্বামীর এই ঠাকুরবাড়ীটি চারদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরটি পূর্বমুখী ও গোকুলচাঁদেরটি দক্ষিণমুখী। দুটি মন্দিরেই আবৃত অলিন্দ বা বারান্দা গর্ভগৃহ বা মূলমন্দির সংলগ্ন দেখা যায়। থামগুলি ইমারতি শ্রেণীর অর্থাৎ বত্রিশ থাক ইটের সমবায়ে গঠিত। এই ধরনের থাম বিষ্ণুপুরমন্দিরে খুব বেশী দেখা যায় এবং পশ্চিমবাঙলার অন্যান্যস্থানের অনেক মন্দিরেও আছে। খিলানগুলি 'দরুন'-শ্রেণীর। অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরে দুটি পূর্ণ ইমারতি ও দুটি অর্ধ ইমারতি থাম আছে। পাদপীঠসংলগ্ন ভিত্তিতে ভাস্কর্যগুলির বেশীর ভাগই সামাজিক চিত্রের, যেমন ঝাঁপানে করে রাজা বা জমিদারের স্থানান্তর গমন, শিকারদৃশ্য, ব্যাঘ্রের আক্রমণ, শিকারীকুকুর, হরিণশিকার, নিহত হরিণকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পৌরাণিক চিত্রের মধ্যে আছে—দশাবতার, দশভুজা মহিষমর্দিনী এবং দেবীর ডাইনে গণেশ ও লক্ষ্মী ও বামে কার্তিকেয় ও সরস্বতী। বিকৃতাশ্ব সিংহের (অর্থাৎ সিংহ অনেকটা অশ্বের মতো) একটি ভাস্কর্যফলকও এই মন্দিরে আছে। ঢাকা বারান্দা দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশপথ খুবই সঙ্কীর্ণ—এ ধরনের সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ প্রাক্‌চৈতন্যযুগের একটি স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য। গর্ভগৃহে অদ্বৈতপ্রভু ও তাঁর পত্নী সীতাদেবীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত। কোন লিপি না থাকায় বলা কঠিন মন্দিরটি ঠিক কোন্ সময়ের। তবে এটি যে বেশ প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরের ঠিক উত্তরপাশেই গোকুলচাঁদের আটচালা মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরে অদ্বৈতাচার্যের অভিষিক্ত বলে কথিত কষ্টিপাথরে নির্মিত রাধাবিনোদের মূর্তি ছাড়া গোকুল চাঁদের মূর্তি (কাষ্ঠনির্মিত), ধাতুময়ী কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা আছে। পোড়ামাটির কোন ভাস্কর্য এখানে নেই। মন্দিরের গঠন ও আকার অদ্বৈতমন্দিরের অনুরূপ। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৬২ শকাব্দ (= ১৭৪০ খ্রীঃ) বলে জানা যায়।(৪০) মধ্যমগোস্বামীবাড়ীর মধ্যস্থলে একটি নাটমন্দির ও পাশে একটি দালানে রামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

(৪) শ্যামচাঁদমন্দির: শান্তিপুরের শ্যামচাঁদপাড়ায় অবস্থিত এইটিই একমাত্র মন্দির যাতে শিলালিপিটি অক্ষত ও সুস্পষ্ট রয়েছে। এ মন্দিরটিও বাংলা আটচালা শ্রেণীর, উচ্চতা আন্দাজ ১১০ ফিট্ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৬৮ ফিট্। আটচালা শ্রেণীর মধ্যে এই মন্দিরটি পশ্চিম বাঙলায় এই রীতির সমস্ত মন্দিরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার যোগ্য (অবশ্য আয়তনের দিক থেকে)। প্রথম স্থানাধিকারী মন্দিরটি মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় অবস্থিত রঘুনাথবাড়ীর মন্দিরটি। শান্তিপুরের এই শ্যামচাঁদের মন্দিরটি গুপ্তিপাড়ার মন্দিরটির সঙ্গে একই রেখায় অবস্থিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। ('বাঙলার মন্দির': শ্রীপঞ্চানন রায়, 'অমৃত', ২১শে মাঘ, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ১৪)। শ্যামচাঁদের এই মন্দিরটির সঙ্গে নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লীতে অবস্থিত কৃষ্ণরায়ের আটচালা মন্দিরটির আকার ও আয়তনের দিক থেকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, যদিও সেটি শ্যামচাঁদের বেশ পরবর্তিসময়ে নির্মিত। দক্ষিণমুখী শ্যামচাঁদের এই মন্দিরটি একটি উচ্চ পাদপীঠের উপর অবস্থিত। লিপিফলকটি সামনের বাঁদিকে পঠনযোগ্য উচ্চতার মধ্যে প্রথম খিলানটির ঠিক নীচে স্থাপিত। লিপিটি প্রস্তর ক্ষোদিত। সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত লিপিটি এই—

শ্রীমতঃ শ্যামচন্দ্রস্য মন্দিরং পূর্ণতামিয়াত্।
বসু বেদর্তুশুভ্রাংশু সংখ্যয়া গণিতে শকে॥

অর্থাৎ '১৬৪৮ শকে (= ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে) শ্রীমান্ শ্যামচন্দ্রের মন্দির সম্পূর্ণ হল।' 'বসুবেদর্তুশুভ্রাংশু' এই অংশের মধ্যে শকাঙ্ক উল্লিখিত হয়েছে—বসু = ৮, বেদ = ৪, ঋতু = ৬, শুভ্রাংশু = ১। 'অঙ্কের বামদিকে গতি' এই নিয়মানুসারে ১৬৪৮ হয়। এটি শকাব্দ। এই মন্দিরটির পাঁচটি চূড়া বর্তমান। চূড়া অর্থে এখানে রত্ন বা শিখর নয়। কলস, আমলক ও চক্রের দ্বারা চূড়া নিরূপিত হয়েছে। মূলমন্দির বা গর্ভগৃহের সংলগ্ন একটি অলিন্দ। অলিন্দের ছাদ দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধ ইমারতি থামের ওপর স্থাপিত। খিলান 'দরুণ' শ্রেণীর। সর্বমোট পাঁচটি খিলান আছে। প্রতিটি খিলানের উপরেই আটচালা শ্রেণীর প্রতীক শিবালয় ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ। উপরের দিকে কার্ণিসের নীচে দুই প্রস্থে পোড়ামাটির ফুল এবং দু'পাশের উপরে নীচেও একই রকমের ফুল মন্দিরটির অঙ্গসজ্জারূপে বিন্যস্ত হয়েছে। খিলানগুলির উপরের প্রস্থে পঙ্কের কাজ ছাড়া কোন প্রকার মূর্তিভাস্কর্য নেই।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিপুরের তন্তুবায়বংশীয় এক ধনী ব্যক্তি, নাম রামগোপাল খাঁ চৌধুরী। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি বহু খরচ করে দেশদেশান্তর থেকে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত এখানে এনেছিলেন এবং সে সময় এক লক্ষ মুদ্রা নজরানা দিয়ে তদানীন্তন নদীয়ারাজকে (সম্ভবত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামকে) সভাগৃহের শিরোভাগে স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরনির্মাণে প্রায় দু'লক্ষ টাকা লেগেছিল বলে জানা যায়।(৪১) শ্যামচাঁদের বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত। বিগ্রহ প্রতিদিন পূজিত হন। মন্দিরটির অবস্থাও বর্তমানে বেশ ভালো। সামনে একটি প্রশস্ত নাটমন্দির আছে এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণ চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত।

শান্তিপুরে গোস্বামীদেরও একটি পঞ্চরত্নমন্দির আছে।

(৫) তোপখানা মস্‌জিদ: ধর্মীয় প্রাচীন ইমারতগুলির মধ্যে শান্তিপুরের বিখ্যাত তোপখানা মস্‌জিদটি অবশ্যই উল্লেখ্য। মুসলমান আমলেও শান্তিপুর একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। পাঠান আমলে এই স্থানে একজন কাজী থাকতেন। সে সময় সম্ভবত অনেকগুলি মুসলিম সৌধ নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে সেগুলি আজ প্রায় সবই লুপ্ত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ্যকালের শেষদিকে শান্তিপুরের তদানীন্তন ফৌজদার

মহম্মদ ইয়ার খাঁ তোপখানার এই সুদৃশ্য মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি ১১১৫ হিজরী বা ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটির একটি বৃহৎ গম্বুজ ৪টি বড় ও ৪টি ছোট মিনার আছে। পূর্বমুখী এই মসজিদটির সম্মুখের উচ্চভাগে আরবীহরফে একটি লিপিফলক প্রোথিত দেখা যায়।

(খ) ফুলিয়া (শান্তিপুর থানা): শান্তিপুর থেকে ৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে ও রাণাঘাট থেকে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত ভাগীরথীর সন্নিকটবর্তী ফুলিয়া একটি ছোট গ্রাম। এখন এটি একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়েছে। শান্তিপুর-রাণাঘাট পাকা রাস্তার কিছু দূরেই এই শহরটি অবস্থিত। রাণাঘাট-শান্তিপুর রেলপথেও ফুলিয়ায় যাওয়া যায়। প্রাচীন একটি স্থান হিসেবে ফুলিয়ার এক ঐতিহ্য আছে। বাঙলার আদি-কবি কৃত্তিবাস এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। কবি রামায়ণের একস্থান বলেছেন।

গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

কৃত্তিবাসের সময় গঙ্গা ফুলিয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। এখন গঙ্গা ফুলিয়া থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে। এ গ্রামে পুরাকীর্তির আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। 'কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ' নামে পরিচিত প্রাচীন একটি বটগাছের নীচে একটি ভাঙা ইটের স্তূপ আছে। কবির জন্মভিটা চারপাশের জমি থেকে অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত। এখানে সন ১৩২২ সালের ২৭শে চৈত্র একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। মহাকবি কৃত্তি-বাসের আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দ। তাহলে এই স্থানের প্রাচীনত্ব পাঁচশ বছরেরও বেশী। অবশ্য কৃত্তি-বাসের এই সময় বিচারসাপেক্ষ ও সর্ববাদিসম্মত নয়।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার কাছাকাছি হরিদাস ঠাকুরের 'ভজন-গোফা' নামে পরিচিত মৃত্তিকাগাত্রে নির্মিত একটি কুটীর উল্লেখ-যোগ্য। অবশ্য যে গোফায় বসে হরিদাস ঠাকুর নামজপ করতেন একটি বৃক্ষমূলে তার চিহ্ন আছে।

(গ) আনুলিয়া (রাণাঘাট থানা): রাণাঘাট স্টেশন থেকে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চূর্ণী নদীর তীরবর্তী আনুলিয়া একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ গ্রাম। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের একটি তাম্রশাসন এই গ্রাম থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে ইং ১৮৯৮ সালে। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রিরচিত 'চিন্ময়বঙ্গ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেন জনৈক বিপ্রদাসের প্রপৌত্র শঙ্করের পৌত্র ও দেবীদাসের পুত্র যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা-ধ্যায়ী রঘুদেব দেবশর্মাকে ভূমিদান করেছিলেন। এই তাম্র-শাসনটি বর্তমানে কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত আছে। তাম্রশাসনটির প্রথম বাক্যটি হল, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'। 'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'র ১৩০৭ সালের ৪র্থ সংখ্যার ২১৬ পৃষ্ঠায় আনুলিয়ায় প্রাপ্ত এই তাম্র-শাসনটির উল্লেখ আছে।

আনুলিয়ার উল্লেখযোগ্য আরেকটি পুরাবস্তু পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি। মূর্তিটির উচ্চতা ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪½ ফিট্ ও ২'৩½" ফিট্। চতুর্ভুজ মূর্তিটির দুই বাম হাতে শঙ্খ ও চক্র এবং দুই ডান হাতে গদা ও পদ্ম। মস্তকের দুইপাশে দুইটি উড্ডীয়মান গন্ধর্বের ক্ষুদ্র মূর্তি। পাদদেশের দুই পাশে চামর-ব্যজনরত দুইটি নারীমূর্তি। বিষ্ণুর এই ধরনের মূর্তি বাঙলার অনেক স্থানেই পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার কয়েকটি সংগ্রহ-শালায়ও এই ধরনের বেশ কিছু মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। আনু-লিয়ার এই মূর্তিটি স্থানীয় পাঠাগারের কাছাকাছি একটি উন্মুক্ত বটতলায় প্রত্যহ পূজিত হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, পুরোহিত এ মূর্তিকে শিবরূপে পূজা করে থাকেন। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় এঁর গাজন হয় প্রতি বছর। চূর্ণীনদীর চরে অনেক কাল আগে এটি পাওয়া গিয়েছিল বলে স্থানীয় কারও কারও বিশ্বাস। আনুলিয়ার 'সিংহীপোতা' নামক অংশে পূর্বে পাঠানদের একটি ধনাগার ছিল বলে শোনা যায়। চূর্ণীর তীরে একটি বিলীয়মান ঢিবিকে অনেকে সেই স্থান বলে নির্দেশ করে থাকেন। শোনা যায়, কোন সময় এই ঢিবি থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা নাকি পাওয়া গিয়েছিল। আনুলিয়া গ্রামটির প্রাচীনত্ব এখানকার বহু ভগ্ন প্রাচীন গৃহ সূচিত করে। কোন প্রাচীন দেবালয়ের অস্তিত্ব অবশ্য এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

(ঘ) রাণাঘাট: এখানকার সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ীর মন্দিরটি দালানশ্রেণীর। এটি রাণাঘাট শহরের সিদ্ধেশ্বরী পাড়ায় অবস্থিত। মূর্তিটি দক্ষিণাকালীর। সামনে একটি নাটমন্দির। এই কালী 'রাণাকালী' বা 'ডাকাতে কালী' নামে প্রসিদ্ধ। দালানশ্রেণীর এই মন্দিরটি ১০০ বছরের মতো পুরানো বলে অনুমান করা যায়।

চূর্ণীতীরে 'হরধাম' থেকে আনীত একটি কালী রাণাঘাটের কোন পাড়ায় পূজিতা হন। 'হরধামে' প্রাসাদের কোন চিহ্ন এখন আর নেই। তবে একটি জীর্ণ মন্দির আছে বলে জানা যায়। এছাড়া রাণাঘাটে একটি পঞ্চরত্নমন্দিরও আছে।

(ঙ) আড়ংঘাটা (রাণাঘাট থানা): কলকাতা থেকে ৫৬ মাইল দূরে চূর্ণীনদীর তীরবর্তী আড়ংঘাটা একটি স্টেশন। রাণাঘাট থেকে উত্তরপূর্বে রাণাঘাট-গেদে রেলপথে এই স্টেশনে পৌঁছানো যায়। আড়ংঘাটায় বর্তমানে যুগলকিশোর দেবের একটি দালান মন্দির বর্তমান। যুগলকিশোরের একটি প্রাচীন মন্দির ছিল বলে জানা যায়, সেই মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে। শ্রীকৃষ্ণের একটি কিশোরমূর্তি প্রথমে গঙ্গারাম দাস নামে এক ব্যক্তি নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন, পরে তিনি সেখান থেকে আড়ংঘাটায় এসে একটি মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্তিকাগর্ভ থেকে একটি রাধিকামূর্তি পেয়ে সেই রাধিকাকে ঐ কিশোরের সঙ্গে মিলিত করেন। সেই থেকে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। যুগলকিশোরের মন্দিরের দক্ষিণদিকে গোপীনাথ নামে একটি প্রাচীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে যুগলকিশোরের আগমনের পূর্বে জনৈক রামপ্রসাদ এই বিগ্রহটি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই রামপ্রসাদ ও গঙ্গারাম উভয়েই আবাঙলী ও একই স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

বীরনগর গ্রাম থেকে পূর্বদিকের একটি রাস্তা ধরেও আড়ং-ঘাটায় পৌঁছানো যায়।

(চ) দেবগ্রাম (রাণাঘাট থানা): দেবপাল নামক কুম্ভকার-জাতীয় এক রাজার স্মৃতি বিজড়িত রাণাঘাট থেকে পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই দেবগ্রামে একদা সুবিখ্যাত প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষের তেমন কোন চিহ্ন আজ আর চোখে পড়বে না। বেশ কিছুকাল আগে এখানে যে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ ছিল তা জানা যায়। (৪২) 'নদীয়া কাহিনী' ও অন্যান্য গ্রন্থে গড়ের রাজা দেবপালেরই উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' বলা হয়েছে যে, দেবী অন্নপূর্ণার রোষে দেবপালের পতন হয় এবং তাঁর রাজ্য ভবানন্দের পৌত্র রাজা রাঘবের হস্তগত হয়। কিংবদন্তী এই, রাজা দেবপাল এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটি মূল্যবান্ স্পর্শমণি অপহরণ করে রাজ্যসম্পদ্ লাভ করেছিলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর অভিশাপই তাঁর পতনের মূল। অপর আর একটি কিংবদন্তীতে একটি রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে। রাজা দেবপাল কোনসময় এক যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে একটি পায়রাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাবার সময় তিনি রাণীদের বলে যান, যদি তাঁর যুদ্ধে জয়লাভ না হয় তাহলে পায়রাটি রাজধানীতে ফিরে আসবে এবং অন্তঃপুরের রাণীরা যেন সম্মান রক্ষার জন্যে আত্মবিসর্জন দেন। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ পায়রাটি হারালেন। পায়রাটি পূর্বশিক্ষামত ফিরে এলে রাজার মৃত্যু বুঝতে পেরে রাণীরা পিছনের খিড়কিপুকুরে আত্মবিসর্জন দিলেন। এদিকে রাজা যথারীতি ফিরে এসে এই মর্মান্তিক সংবাদ জানতে পেরে নিজেও এই খিড়কিপুকুরের জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

দেবগ্রামের গড়ের বাইরে যে কতগুলি প্রাচীন বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' এ তার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only undoubtedly pre-Muhammadan ruins seen or heard of in the district,"

সেইসব ধ্বংসাবশেষ প্রাক্‌মুসলিম যুগের হলে এ স্থানটি কীরূপ প্রাচীন তা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমানে কিন্তু এ সবের কোন চিহ্ন নেই।

(ছ) উলা-বীরনগর: কৃষ্ণনগর থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে ও রাণাঘাট থেকে ৫ মাইল উত্তরে বীরনগর গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল উলা। বীরনগর স্টেশনটি কলকাতা থেকে ৫১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন ও বিখ্যাত দেবতা উলাইচণ্ডীর নামানুসারে গ্রামটির নাম হয় উলা। অবশ্য এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতান্তর আছে। সে যাই হক অনেক আগে এই গ্রামের পাশ দিয়ে যে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল তা এখানকার প্রাকৃতিক গঠন দেখলেই বোঝা যায়। 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'তে শ্রীমন্তসদাগরের সিংহলযাত্রাপথে উলার চণ্ডীর উল্লেখ আছে। উলার বহু পুরানো অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ (যা এখন বেশীর ভাগই জঙ্গলাকীর্ণ), প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি গ্রামটির প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করে। পূর্বে এখানে সুন্দর সুন্দর অনেক মন্দির ছিল। কালক্রমে সেগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়, দুএকটি প্রাচীন মন্দির এখনও ইতিহাসের সাক্ষীরূপে বর্তমান আছে।

উলার প্রাচীন জমিদার রামেশ্বর মিত্র প্রতিষ্ঠিত একটি কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির এখনও বর্তমান আছে। কথিত আছে, মুর্শীদকুলী খাঁর শাসনকালে সুবে বাঙলার মুস্তৌফী (= নায়েব কানুনগো) পদে রামেশ্বর মিত্র নিযুক্ত হন। সম্ভবত এই উচ্চপদে নিয়োগের আগে তিনি উলায় ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের একটি সুন্দর জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণ করেন। দুটি একবাংলা বা দোচালা যুক্ত হয়ে এই জোড়বাংলা মন্দিরটির সামনের দিকে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। লিপিটি যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল:

অঙ্গৈকঋকালেন্দুমিতে শকাব্দে ১৬১৬ কায়স্থ
কায়স্থহবেম ধৰ্ম্মঃ। যো নিৰ্ম্মমে শ্ৰীহরিযুগ্ম
ধাম শ্রীযুত রামেশ্বরমিত্রদাসঃ

লিপির একাংশে শকাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ভাবার্থ এই, '১৬১৬ শকাব্দে (= ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে) কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীরামেশ্বর মিত্র শ্রীহরির যুগমগৃহ নির্মাণ করলেন।' মন্দিরে বর্তমানে রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ পূজিত হন। উৎকৃষ্ট টেরাকোটাসজ্জায় এই মন্দিরটি অলঙ্কৃত। পাদপীঠসংলগ্ন ভিত্তি থেকে আরম্ভ করে সামনের দিকের প্রায় সব স্থানেই পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায়। পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে আছে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, কার্তিকেয় ও গণেশ সহ দশভুজা দুর্গা, কৃষ্ণের কদম্ববৃক্ষে আরোহণ ও গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, শিবদুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী। সামাজিক চিত্রের মধ্যে শিকারদৃশ্য, যুদ্ধদৃশ্য ও মোগল যোদ্ধা ইত্যাদি। প্রথম একবাংলাটি গর্ভগৃহ বা মূলমন্দিরের বহির্বাটীস্বরূপ যা চারটি থামের উপর অবস্থিত। প্রাচীন হলেও মন্দিরটির অবস্থা এখনও ভালো।

মুস্তৌফী পাড়ায় কাঠের তৈরী প্রাচীন দুর্গামণ্ডপটি উৎকৃষ্ট-কারুকার্যমণ্ডিত ছিল। বর্তমানে কাঠের ওপর খোদাই করা কয়েকটি মূর্তি ও সুন্দর সুন্দর কয়েকটি নক্‌শার অংশমাত্র দেখা যায়। কাষ্ঠমণ্ডপটি একপ্রকার বিনষ্ট এবং কারুকার্যমণ্ডিত অংশগুলি পৃথক্ পৃথক্ করে একটি স্থানে রাখা হয়েছে। দুর্গামণ্ডপটির আশপাশে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে মুস্তোফীদের প্রাচীন অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীর রয়েছে। মাটির নীচেও অনেক ইষ্টক প্রাচীরের অংশ রয়েছে মনে হয়। মুস্তোফীপাড়ায় একটি ভগ্ন দোলমঞ্চ এবং ১১৯৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত জোড়া আটচালা মন্দিরও দেখা যায়। উত্তরপাড়ায় ১৭৫৮ শকে নির্মিত শিবের একটি আটচালা মন্দির ও ঐ একই শকে নির্মিত বাজারের কাছাকাছি

একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরও আছে। উত্তরপাড়ায় শিলালিপিযুক্ত আরও দুএকটি মন্দির দেখা যায়। বীরনগরের মুখোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারদের বিস্তীর্ণ প্রাসাদেও আঠারো শতকের শেষাশেষি নির্মিত একটি ছোট আটচালা শিবালয় আছে। মুখোপাধ্যায় বাড়ীর অঙ্গনে রক্ষিত একটি পিতলের রথও আছে। দক্ষিণপাড়ায় ভক্তিবিনোদঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী ও ওখানে শিবের আটচালা দ্বাদশ মন্দির আছে। পূর্বোক্ত ইমারতগুলি ছাড়া উলায় প্রাচীন বেশ কিছু কিছু দীঘিও বর্তমান। এগুলির কোন কোনটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খনন করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। উলায় পলাশীর যুদ্ধের বীরনায়ক মীরমদনের জীর্ণ প্রাসাদটি বর্তমান ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিখ্যাত ওলাই-চণ্ডীর স্থানটি একটি উন্মুক্ত প্রান্তর ও সেখানে প্রাচীন কয়েকটি বটগাছ দণ্ডায়মান।

(জ) কামালপুর (চাকদহ থানা): চাকদহ স্টেশন থেকে প্রায় ৬ মাইল পূর্বমুখে বনগাঁ রোডের ধারে কামালপুর গ্রাম। বর্তমান বি, ডি, ও, অফিসের দক্ষিণপূর্বদিকে কাঁচা রাস্তায় এই গ্রামে পৌঁছানো যায়। এই গ্রামটি প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে সমৃদ্ধি-শালী ছিল। কিন্তু বর্তমানে এখানে সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। কামালপুর গ্রামটি পূর্বে 'ভট্টাচার্য-কামালপুর' নামে খ্যাত ছিল। পণ্ডিতপ্রধান এই গ্রামে প্রাচীন গাঙ্গুলী বংশের বিখ্যাত পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ রঘুদেব বাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের এককালের খ্যাতনামা অধ্যাপক ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের গুরু ছিলেন। রঘুদেব বাচস্পতি রাজা রাঘবের দানভাজন মধুসূদনের পৌত্র ছিলেন। নব্যন্যায়চর্চায় এই গ্রামটি এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বনমালী বিদ্যাসাগরেরও জন্মস্থান ছিল এই গ্রাম। রঘুদেব বাচস্পতি রাজা রঘুরাম ও তৎপুত্র কৃষ্ণ-চন্দ্রের দানভাজন ছিলেন।(৪৩) এইসব কারণে এই গ্রামে প্রাচীন মন্দিরাদির সংখ্যা যে বেশ কিছু ছিল তা অনুমান করা যায়। বর্তমান কামালপুর স্কুলের পাশেই বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন দুটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। এগুলি আটচালা শ্রেণীর মন্দির বলে মনে হয়—চূড়া ভগ্ন। একটি মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্য বর্তমান। এখানে বর্তমানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মন্দিরটি খুবই জরাজীর্ণ এবং শীঘ্র ভূপতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অপর মন্দিরটি পরিত্যক্ত ও অলঙ্করণবিহীন। এই মন্দির দুটির চতুষ্পার্শে বটগাছের শাখাপ্রশাখা বিস্তীর্ণ। পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। পোড়ামাটির দুটি দীর্ঘ লিপিফলকের ভগ্ন অংশ এখনও এর উত্তর ও দক্ষিণাংশের দেওয়ালের অনেক উঁচুতে স্থাপিত আছে, অবশ্য তার পাঠোদ্ধার করা একান্ত দুরূহ। মন্দিরের পৃথক্ পৃথক্ দিকে প্রতিষ্ঠিত এই দুটি লিপির ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের আর কোন মন্দিরে এধরণের লিপিবিন্যাস আর আছে কিনা জানা নেই। প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ সম্ভবত উত্তর-দিকের লিপিতে ছিল, তা একপ্রকার বিনষ্ট বলা যায়। এর একটু অংশ হল, - - - - - শশাঙ্কসংখ্যব্দর্ষে হরিসখ"- - -। এর থেকে অবশ্য শশাঙ্ক উদ্ধার করা যায় না, তবে বোঝা যায় যে মন্দিরটি কৃষ্ণের জন্য নির্মিত হয়েছিল ('হরিসখ')। দীর্ঘ লিপিফলক দুটির বাকী যে অংশ এখনও বর্তমান আছে তার থেকে হয়তো সেকালে এই অঞ্চলের অনেক কথা জানা যেতে পারে। কেউ কেউ এই মন্দিরটিকে আড়াইশ বছরের প্রাচীন বলে মনে করেন।(৪৪) মন্দিরটির সামনের অংশে পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে আছে, রাধাকৃষ্ণ, কালী ও অন্যান্য দেবদেবী। বামদিকের নীচের একটি অংশে মিথুন বা 'মণি' আছে। খিলানের উপরের প্রস্থে কোন কোন মূর্তি নেই, কিন্তু লতাপাতা ও বিচিত্র নক্শার সূক্ষ্ম কাজ বর্তমান। পোড়ামাটির মূর্তিসমূহে রেখার সূক্ষ্মকাজ লক্ষ্য করা যায়। এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক বা টালিতে উৎকীর্ণ। ভাস্কর্যের এইসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মন্দিরটি সতেরো শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়ে-ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই গ্রামের একটি স্থানে আরও একটি আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। তবে সেটী একশ বছরের বেশী প্রাচীন হবে বলে মনে হয় না। কামালপুর গ্রামের আরও কিছু পূর্বে সরাবপুর গ্রামের একস্থানে ধ্বংসাবশিষ্ট একটি প্রাচীন মন্দিরের উল্লেখ 'নদীয়াকাহিনী'তে পাওয়া যায়। এই গ্রামের কাছেই 'খলসিয়ার বিল' নামে পরিচিত একটি প্রাচীন বিল আছে। উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বহুকাল আগে এক সন্ন্যাসীর দ্বারা দগ্ধ হয়ে 'পোড়া-মহেশ্বর' নামে পরিচিত ছিলেন।

(ঝ) পালপাড়া (চাকদহ থানা): কৃষ্ণনগর থেকে প্রথমে চাকদহ স্টেশন পেরিয়ে পালপাড়া একটি ছোট্ট স্টেশন। এই স্টেশন থেকে পশ্চিমে মাত্র ৫ মিনিটের পথের ব্যবধানে একটি সউচ্চ প্রাচীন মন্দির আছে। এটি পালপাড়ার তথা সমগ্র নদীয়া জেলার একটি খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দিরটি বিশুদ্ধ চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। চালগুলি বাংলা খোড়ো চালের ন্যায় ঢালু ও প্রশস্ত। সম্পূর্ণরূপে ইষ্টকনির্মিত এই মন্দিরটির সঙ্গে পরবর্তিকালে নির্মিত নদীয়ার অন্যান্য চারচালা মন্দিরের এক সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতা, গাম্ভীর্য ও উৎকৃষ্ট অলঙ্করণের দিক থেকে নদীয়ার কোন মন্দিরের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। ইঁটগুলি খুবই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং দীর্ঘ হলেও চওড়ায় আনুপাতিকভাবে কম। বিভিন্ন আকারের বহু ইঁট এই মন্দিরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি একটি উচ্চ পাদপীঠের উপর অবস্থিত। সম্ভবত সামনের দিকের সব অংশেই—ডাইনে-বামে, ওপরে-নীচে সবস্থানেই পোড়ামাটির মূর্তি ছিল বলে মনে হয়। এখন শুধু প্রবেশদ্বারের খিলানের ওপরের প্রস্থে মূর্তিগুলি দেখা যায়। মন্দিরটির সংলগ্ন কোন আবৃত বারান্দা বা 'জগমোহন' নেই। প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি ছোট ছোট থাম ও একটি খিলান আছে। খিলানটি দরুনশ্রেণীর। এই খিলানের ঠিক উপরে পরিবেষ্টিত মোট ১৪টি আটচালা রীতির প্রতীক দেবালয় বা রথ, কিন্তু তন্মধ্যে শিবলিঙ্গের পরিবর্তে ছোট্ট ছোট্ট মূর্তি। এ ধরণের অলঙ্কৃতি খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। এরপর রামায়ণীয় লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য—রামচন্দ্র বামদিকে তীরধনু ধারণ করে তাঁর সম্মুখবর্তী ডান দিকে দশাননকে আক্রমণোদ্যত।

রামচন্দ্রের পশ্চাতে তিনজন যোদ্ধা ও রাবণের পশ্চাতে ভীষণাকৃতি এক রাক্ষস একজন বীরযোদ্ধার সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত। সম্মুখযুদ্ধের দৃশ্য এখানে অনেকগুলি আছে। লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ছাড়া আর কোন দৃশ্য এই অংশে চোখে পড়ে না। তোরণ-পথটির চারপাশে অভিনব ধরনের ৮টি দুমুখো সাপ—বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে (১৬৪৩ খ্রীঃ) এ ধরণের অনেকগুলি সাপ দেখা যায়। বাম ও ডান দিকের ওপরে-নীচে ও কার্নিসের নীচে সবশুদ্ধ ৩৫টি পোড়ামাটির বড় ফুল মন্দিরটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। এছাড়া প্রচুর নক্সা ও কল্পলতা সামনের দিককে অলঙ্কৃত করেছে। মন্দিরটির পশ্চাদ্‌ভাগেও পোড়ামাটির কিছু কিছু বড় ফুল আছে। সামনের বাম ও ডান দিকের অলঙ্করণ অপসারিত করে বর্তমানে মেরামতির কাজ চলছে বলে মনে হয়। তাই এই সব স্থানে কি ছিল আজ আর জানার উপায় নেই। মনে হয়, এই সব অংশে ইটের উপর সুন্দর সুন্দর খোদাইকাজ বা নক্‌শা ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় মন্দিরটির তৎকালীন মালিকরূপে পালপাড়ার বাবু কালীকুমার চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় এবং তার বহু পূর্ব থেকেই মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না বলে জানা যায়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর নদীয়ার তদানীন্তন কালেক্টর মন্দিরটি পরিদর্শন করে এটি সংরক্ষণের জন্যে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর এটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি-রূপে পরিগণিত হয়েছে।

এই মন্দিরের ভিতরের ছাদ গোলাকার এবং ছাদটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চারটি খিলানের উপর স্থাপিত হয়ে বহির্ভাগে চতুষ্কোণ প্রশস্ত চারচালের সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই শ্রেণীর একটি ছোট্টমন্দির মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরের প্রসিদ্ধ সিংহ-বাহিনীর মন্দির (১৪৯০ খ্রীঃ)। তবে পালপাড়ার মন্দিরটি আরও প্রাচীন মনে হয়। এই মন্দিরে দুটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ বেগলার এক সময় মন্দিরটির মাপ ও আলোকচিত্র নিয়েছিলেন। একসময় রাণা-ঘাটের মহকুমা শাসক রায় রামশঙ্কর সেন শিলালিপি দুটি নিয়ে গিয়েছিলেন, পরে সেগুলি প্রত্যার্পিত হলেও আর পাওয়া যায় নি।(৪৫) শিলালিপি দুটি যাঁরা সেই সময় পড়েছিলেন তাতে জানা যায় মন্দিরটি সে সময় থেকে ৫০০ বৎসরের পূর্ববর্তী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙলা পুরাকীর্তির তালিকা' গ্রন্থে একথা বলা হয়েছে। তাহলে এখন থেকে প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে মন্দিরটি নির্মিত ধরে নিলে এটি চোদ্দ শতকের শেষের দিকের বলা যায়। সে সময় মুসলমান শাসনকাল। একথা সত্য হলে মুসলমান যুগেও যে কিছু কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়।

পালপাড়ার এই মন্দিরটি জনৈক গন্ধর্ব রায়ের প্রতিষ্ঠিত বলে কেউ কেউ বলেন।(৪৬) কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির যে আত্মপরিচয় আছে তাতে বলা হয়েছে,

> গন্ধর্বরায় বসে গন্ধর্ব অবতার।
> রাজসভা পূজিত সে গৌরব অপার॥

এই গন্ধর্ব রায় গৌড়রাজের কোন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। কবি কৃত্তিবাস গৌড়রাজসভায় তাঁকে দেখেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রচনাকাল রাজনারায়ণ বসু ও রামগতি ন্যায়রত্নের মতে ১৪৬০ শক বা ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। অবশ্য এ বিষয়ে মতান্তর বা মতানৈক্য আছে। সে যাই হ'ক কেন, মন্দিরের গঠন ও কারুকার্য ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এটি পনের শতকের দিকে নির্মিত বলে মনে করা যেতে পারে।

এই মন্দিরটির অল্প পশ্চিমে একটি মজাখাল দেখা যায়। এই খালটি চাকদহ থেকে পালপাড়া বরাবর এবং তার পরেও বিস্তৃত। এটিকে কেউ কেউ 'প্রদ্যুম্নসরোবর' বলে থাকেন। চাকদহের প্রাচীন নাম ছিল 'প্রদ্যুম্ননগর'। স্মার্ত রঘুনন্দন মুক্তবেণীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের নামের সঙ্গে প্রদ্যুম্ননগরের নাম জড়িয়ে থাকলেও এটি সত্যিই প্রদ্যুম্নপ্রতিষ্ঠিত কিনা ভেবে দেখার বিষয়। প্রদ্যুম্ন নামে কোন রাজাও এই নগর পত্তন করে থাকবেন। প্রদ্যুম্নসরোবরটি সম্ভবত কোন সরোবর নয়। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এটি গঙ্গার প্রাচীন খাত বলেই মনে হয়। গঙ্গা বর্তমানে চাকদহ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। পালপাড়ার এই মন্দিরের মধ্যে এক সন্ন্যাসি প্রতিষ্ঠিত একটি মৃন্ময়ী দক্ষিণাকালী বর্তমানে পূজিতা হন। অঙ্গনের পশ্চিমধারে একটি আশ্রমও বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পালপাড়া গ্রামে স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির আছে। এগুলি আটচালা শ্রেণীর। পোড়া-মাটির কোন ভাস্কর্য এতে নেই। দুটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও প্রত্যহ পূজিত হন। একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকাল শকাব্দ ১৭৬০, বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সনের উল্লেখ আছে। একস্থানের একটু লিপি হ'ল, 'শ্রীযুত রামমোহন সাবর্ণ চৌধুরির', বাকী অংশ অস্পষ্ট। এই জোড়া মন্দির কাজীবাড়ীর একটু দক্ষিণে ও প্রাচীন মন্দিরটির অল্প উত্তরে অবস্থিত।

জোড়া মন্দিরের অল্প উত্তরে এই অঞ্চলের প্রাচীন 'কাজী-বাড়ী' অবস্থিত। এটি একটি বৃহৎ অট্টালিকা ও মধ্যে অনেক-গুলি 'মহলে' বিভক্ত। এই প্রাচীন অট্টালিকাটি চাকদহের কাজীপাড়ায় ও বর্তমান রেলপথের অদূরবর্তী। এই কাজী-পাড়ার প্রাচীন নাম 'পাজনৌর'। কাজীবংশীয় ব্যক্তিগণ বেশ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। এই বংশের মুনসী এতেমুদ্দিন মহম্মদ মরহুম নামে এক ব্যক্তি ক্লাইভের মীর মুন্সীপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বর্তমানে কাজীবাড়ীতে বাইরের কিছু কিছু লোক বাস করলেও অট্টালিকা ও মহলগুলি বেশ জরাজীর্ণ। এই মহলগুলিতে যাওয়ার নানা পথ ও উপপথ ছিল। এককালে এই বাড়ী যে জমজমাট ছিল এখানকার বহু কক্ষ, হলঘর, নাচঘর প্রভৃতি দেখলেই তা বোঝা যায়। কাজীবাড়ীর পাশেই এক ক্ষুদ্র মস্‌জিদ।

জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট (চাকদহ): চাকদহ স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে যশোড়া গ্রামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের পাটবাড়ী অবস্থিত। যশোড়া গ্রামের সঙ্গে

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের স্মৃতি জড়িত। এই গ্রামে একদা মহাপ্রভু এসেছিলেন। কথিত আছে, জগদীশ পণ্ডিত পুরীধাম থেকে জগন্নাথের নবকলেবর ধারণের সময় তাঁর পরিত্যক্ত বিগ্রহটি এখানে স্থাপন করেন। এই গ্রামে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির ও দোলমঞ্চ আছে।

মহেশপণ্ডিতের শ্রীপাট: জগদীশ পণ্ডিতের ভ্রাতা দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম মহেশপণ্ডিতের ফুলসমাজ, বেদি ও একটি মন্দির চাকদহ স্টেশন থেকে ৭।৮ মিনিটের পথ কাঁঠালপুলি নামক গ্রামে স্থাপিত। মহেশ পণ্ডিতের সমাধি পালপাড়ার উক্ত প্রাচীন মন্দিরটির পাশে অবস্থিত বলে জানা যায়।

পালপাড়ার মন্দিরটির উত্তরপূর্বদিকে ভগ্ন বেশ প্রাচীন একটি মন্দির আছে। মন্দিরটির পাশেই একটি প্রাচীন পুষ্করিণী। এর ভগ্ন ঘাট দেখা যায়। মন্দিরটিকে একরত্ন শ্রেণীর বলা যেতে পারে, তবে শিখরটি ছত্রাকৃতি ও কোণযুক্ত। এই মন্দিরটি পালপাড়া স্টেশনের খুব কাছেই পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কোন লিপি বা ভাস্কর্য নেই। চাকদহ, পালপাড়া ও শিমুরালি সন্নিহিত অঞ্চলে আরও অনেক প্রাচীন ইমারত যে ছিল, এখানকার বহু ভগ্ন গৃহ, দেবালয় প্রভৃতি দেখে তা অনুমান করা যায়। এ অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। খননকার্যের দ্বারা এসব স্থানে হয়তো অনেক দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

(ঝ) ঘোষপাড়া (কল্যাণী থানা): চাকদহ থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামটি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি পীঠস্থান। নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণী। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রামটি বর্তমান। কল্যাণী স্টেশনে নেমেও বাসে ঘোষপাড়া গ্রামে যাওয়া যায়। ঘোষপাড়ায় 'সতীমায়ের' সমাধিস্থান আছে। কর্তাভজা সাম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের প্রধান ও প্রথম শিষ্য রামশরণ পালের বাস্তুভিটায় একটি প্রাচীন ডালিম গাছের তলায় রামশরণের পত্নী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। পরে তিনি ভক্তদের কাছে 'সতীমা' নামে পরিচিতা হন। ডালিমতলায় এই স্থানটি শানবাঁধানো ও রেলিং দিয়ে ঘেরা। ঐ ডালিমগাছটি নাকি সতীমার সময় থেকে আছে। পরে ক্ষয় ও বৃদ্ধির মধ্যে বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আউলচাঁদের জন্ম ১৬১৬ শক বা ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রামশরণ পাল গুরুপদ লাভ করেন। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর তিরোভাবের বহুকাল পরে আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন। উলা-বীরনগরের অধিবাসী মহাদেব নামে জনৈক বারুজীবি তাঁকে শিশু অবস্থায় পানের বোরোজে কুড়িয়ে পান এবং নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র ফুলিয়ায় এক গুরুর কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং 'গুরু সত্য' এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। সেই থেকেই এই নবধর্মের প্রচার হয়। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এই ধর্মে দীক্ষিত হতে পারেন। সতীমার ভিটার পিছনে 'হিমসাগর' নামে একটি বড় দীঘি আছে। এই দীঘির জল পবিত্র বলে ভক্তদের ধারণা। ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার সময় এই দীঘির তীরবর্তী আম্রকাননে এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা হয়।

(ট) কুলিয়াপাটের মন্দির: কাঁচড়াপাড়া বা কল্যাণী স্টেশন থেকে শ্রীপাট কুলিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামটি কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে প্রায় ৩ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে 'অপরাধভঞ্জন' বা কুলিয়ার পাট আছে। একটি সুন্দর মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। মন্দিরটি একরত্ন-শ্রেণীর—একটি চাঁদনীর উপর দেউল শিখর স্থাপিত। কথিত আছে, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণবনিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ ক্ষমা করেন। সেইজন্য কুলিয়ার এই পাট 'অপরাধভঞ্জনের পাট' নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার 'দ্বাদশবকুলকুঞ্জ' বৈষ্ণবগণের নিকট অতিপ্রিয়।

(ঠ) কাঞ্চনপল্লী: কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় ২ মাইল দূরে কাঞ্চনপল্লী গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়ের একটি বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরটি আটচালা শ্রেণীর। উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনেকটা শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দিরের অনুরূপ। তবে কৃষ্ণরায়ের এই মন্দির শ্যামচাঁদের অনেক পরবর্তী। লিপিফলকটি দক্ষিণমুখী মন্দিরের সামনের উচ্চভাগে স্থাপিত। সম্পূর্ণ অংশটি নীচু থেকে উদ্ধার করা কঠিন। ১৭০৮ শকাব্দ বা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক নামে দুই ব্যক্তি এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে লিপি থেকে জানা যায়। লিপিফলকে হরফগুলি কয়েকটি সারিতে বিভক্ত। এই মন্দিরের কৃষ্ণরায় বিগ্রহটি পূর্বে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দ সেনের ছিল। শ্রীচৈতন্য এই শিবানন্দের বাড়ীতে এসেছিলেন। সেই সময়ে সম্ভবত এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। পরে সতেরো শতকের গোড়ার দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র কচু রায় গঙ্গাতীরে কৃষ্ণরায়ের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেই প্রাচীন মন্দিরটি কালক্রমে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। তখন কলকাতার পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মন্দিরটি তৈরী করেন।

পোড়ামাটির অনেকগুলি ফুল ছাড়া এই মন্দিরে কারুকার্য বা পোড়ামাটির মূর্তি কিছুই নেই। মন্দিরটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণযুক্ত একটি ঠাকুরবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ সিংদরজা ও নহবৎখানা পেরিয়ে মন্দিরাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রাচীরের বাইরে একটি আটচালা দোলমঞ্চ আছে।

একটি উচ্চ পাদপীঠের উপর অবস্থিত এই মন্দিরটি অলিন্দযুক্ত। থামগুলি ইমারতি ও খিলান 'দরুন'শ্রেণীর। গর্ভগৃহে কৃষ্ণরায়ের বিগ্রহ একটি সিংহাসনে আসীন। বিগ্রহের পদ্মাসনে উৎকীর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক এই—

স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ প্রিয়ঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ॥

বর্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল নবহট্ট।

(ড) বিরহী (হরিণঘাটা থানা): মদনপুর স্টেশনের নিকটবর্তী এই বিরহী গ্রাম। মদনপুর থেকে বিরহী পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। এই গ্রামে মদনগোপালের একটি মন্দির আছে। মদনগোপাল বিগ্রহ বেশ প্রাচীন। বহুকাল আগে এক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব এই মদনগোপালের উপাসনা করতেন। পরে কোন একসময় নদীয়ারাজ এই বিগ্রহের একটি মন্দির করে দেন। প্রথমে বিগ্রহ একাই ছিলেন, পরে স্থানীয় যমুনা খালের ধারে রাধিকার একটি মূর্তি পাওয়া গেলে, সেই মূর্তিটি মদনগোপালের সঙ্গে যুক্ত হন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মদনগোপালের বিশেষ পূজা হয় এবং ঐদিন এখানে এক বিরাট মেলা হয়।

পরিশিষ্ট

(১) কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত সদাশিবের একটি প্রাচীন মূর্তি: খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত সদাশিবের একটি মূর্তি কৃষ্ণনগরের অধিবাসী স্বর্গত রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুরকর্তৃক বেশ কিছুকাল আগে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালায় প্রদত্ত হয়েছিল। মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩'৮'' এবং ১'১১''। বর্তমানে এটি পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ব্ল্যাক বেসাল্ট পাথরে খোদিত এই মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ত্রিমুখ ও দশহস্ত। ডাইনের পাঁচটি হাতে অঙ্কুশ, ত্রিশূল, দণ্ড, বরাভয়মুদ্রা ও বরদামুদ্রা। বামের হাতগুলিতে সর্প, ডমরু, পদ্ম, অক্ষমালা ও পাত্র পঞ্চরথশ্রেণীর পীঠের উপর স্থাপিত মহাম্বুজের উপর সদাশিবের মূর্তিটি আসীন। হস্তের বরদামুদ্রায় শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত। বাম ও দক্ষিণহস্তের অলঙ্কারগুলি পরস্পর পৃথক্। এই মূর্তির ডাইনের শেষ মস্তকে শিবের প্রলয়ঙ্কর ভঙ্গীটি প্রকটিত। উর্ধ্বভাগের দুপাশে দুটি উদীয়মান গন্ধর্ব দেখা যায়। পাদপীঠে পিছন ফিরে তাকানো অবস্থায় একটি ষণ্ড উৎকীর্ণ হয়েছে। এছাড়া দুজন ভক্তের ক্ষুদ্র মূর্তিও আছে। মূর্তিটির পশ্চাদ্‌ভাগে একটি পর্ণাকৃতি জ্যোতির্বলয় আছে।

(২) কয়েকটি পুরাকীর্তির সংগ্রহশালা: সুসজ্জিত কক্ষে কৌতূহলী দর্শকদের আকর্ষণ করার মতো কোন পুরাকীর্তিশালা এই জেলায় না থাকলেও বহু পুরাতত্ত্বপ্রেমী ব্যক্তি এখানে আছেন। পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে তাঁরা সাজিয়ে রাখেন তাঁদেরই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। অবশ্য 'শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের' কথা স্বতন্ত্র। সেখানে বহু প্রাচীন টেরাকোটার নিদর্শন (বেশীর ভাগই বাগআঁচড়া থেকে সংগৃহীত) ও অন্যান্য প্রাচীন শিল্পকৃতি ও পুথিপত্র আছে। কৃষ্ণনগরের অধিবাসী শ্রীমোহিত রায় (স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক) ও শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহরায় (জেলাবোর্ডের পূর্বতন সভাপতি) মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সংগ্রহ আছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। নবদ্বীপমহিমা, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-প্রণীত, জিতেন্দ্রিয় দত্ত ও ফণিভূষণ দত্ত সম্পাদিত, ১৩৪৪ সং, পৃ: ৪৫
২। Ayeen-i-Akbery, Part I (The soobah of Bengal), Page 310
৩। A School History of India, P.34 : H. P. Sastri
৪। নবদ্বীপমহিমা, পৃ: ৪৭-৪৮
৫। বাঙলার তীর্থ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
৬। Raverty's Tabakat-i-nasiri, P.74
৭। নদীয়াকাহিনী (২য় সং ১৩১৯, পৃ: ২৯৩-২৯৪), কুমুদনাথ মল্লিক
৮। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত (৭ম পরিচ্ছেদ)
৯। 'বাঙলার মন্দির' ('অমৃত' ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সংখ্যা), শ্রীপঞ্চানন রায়
'বাঙলার মন্দির স্থাপত্যভাস্কর্যে অনুসৃত কয়েকটি রীতি' ('বিশ্ববাসী', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৯), প্রণব রায়
১০। 'বাঙলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ' ('পশ্চিমবঙ্গ', ৭ই জুলাই, ১৯৭২ সংখ্যা), ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চন
১১। Hebber's Journal, vol. I, P.120
১২। নদীয়াকাহিনী পৃ: ২৬১
১৩। ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৫৭ সং, পৃ: ৩৯৫

১৪। সাহিত্যপবিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২১৬; তাম্রশাসনের একটি আলোকচিত্র কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়াকাহিনীর' (১ম সং ১৩১৭) ২৭৬ পৃষ্ঠার পরে মুদ্রিত হয়েছে।
১৫। District Census Handbooks, Nadia, 1951, P.169/A. Mitra
১৬। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১৩৫৭ সং) পৃঃ ১৮-১৯
১৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (১৯৬৮ ২য় খণ্ড) পৃঃ ৩০৬
১৮। বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পূর্ব রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে ১৯৪০ সনে প্রকাশিত) পৃঃ ২৬০-২৬২
১৯। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৭৮
২০। District Census Handbooks, Nadia 1951, P.XLVIII.
২১। নবদ্বীপমহিমা (১৩৪৪ সং) পৃঃ ৪৫, রাঢ়ী
২২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (১৯৬৮, ২য় খণ্ড) পৃঃ ২৪৮
২৩। নবদ্বীপমহিমা, রাঢ়ী
২৪। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, পৃঃ ১৮০
২৫। নবদ্বীপমহিমা, পৃঃ ৩১১-৩০৩
২৬। Statistical Account of Bengal, Nadia, P.142-143, Hunter
২৭। নবদ্বীপমহিমা, পৃঃ ৫৪-৫৫, রাঢ়ী
২৮। Statistical Account of Bengal, Nadia, P.142-143, Hunter
২৯। A School History of India, P.34, H. P.Sastri
৩০। Epigraphica Indica vol. I, P. 308
৩১। নবদ্বীপমহিমা, পৃঃ ৭৩-৭৫
৩২। ঐ
৩৩। ঐ পৃঃ ৮৩-৮৫
৩৪। The Court of Raja Krishnachanpra of Krishnagar (Krishnagar College Centenary Volume, P 149),—Suniti Kumar Chatterjee
৩৫। বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, ১৯৪০, পৃঃ ২৪৯-২৫০
৩৬। নদীয়াকাহিনী (২য় সং, ১৩১৯) পৃঃ ২৯৩-২৯৪, কুমুদনাথ মল্লিক
৩৭। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৯৫
৩৮। District Handbook, Nadia 1951, P.Li-Lii, A. Mitra
৩৯। বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, ১৯৪০, পৃঃ ৯৬
৪০। বাঙলার তীর্থ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
৪১। নদীয়াকাহিনী, পৃঃ ৩২০-৩২১, কুমুদনাথ মল্লিক
৪২। List of Ancient Monuments in Bengal (Published in 1896), P. 116-118
৪৩। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা (১ম ভাগ, বাঙ্গালীব সারস্বত অবদান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৩৫৮ সং), পৃঃ ২৮৮-২৮৯, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪৪। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩৩৫
৪৫। List of Ancient Monuments in Bengal (1896), P. 116
৪৬। 'বাঙলার মন্দির', 'অমৃত', ৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৮ সংখ্যা, শ্রীপঞ্চানন রায়

পূজা, মেলা পাল-পার্বণ

কথাতেই আছে বারমাসে তের পার্বণ। এ কেবল কথার কথাই নয়---এমন দিন খুব কমই আছে যে দিন কোন উৎসব, পূজা বা পার্বণ বাঙ্গালীর নেই। প্রাচীনকাল থেকে এই সব উৎসবগুলির মধ্য দিয়েই হিন্দুজাতি নিজেদের একসূত্রে আবদ্ধ করে আসছে। আমাদের দেশে নানা উৎসব, পূজা-পার্বণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই উৎসবগুলি যে দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল তা নয়, সকল উৎসব প্রাচীনত্বেরও দাবি রাখেনা, আবার অনেক উৎসব লোপ পেয়ে গিয়েছে। তবে স্থানকাল হিসেবে বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য নিয়ে আজও চলে আসছে। অনেক স্থানে হয়ত পরিবর্তিত হয়েছে পদ্ধতির, মিশ্রিত হয়েছে লোকাচার---সব কিছু মিলেমিশে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধরনের পূজা, পাল-পার্বণ, উৎসব প্রচলিত। হয়তো শাস্ত্রীয় মর্যাদা অনেকগুলির নেই, নেই কোন পুঁথি বা গ্রন্থ। তবুও বংশপরম্পরায় চলে আসছে অনেক উৎসবের ঐতিহ্য। কতকগুলি উৎসব প্রায় সব জেলাতেই প্রচলিত আছে। আবার কোন কোন জেলায় অন্য নামে নিজস্ব এলাকার বিশেষত্ব নিয়ে অন্যরূপে চলে আসছে।

নদীয়া জেলা একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা। এজেলার ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য একদিন সারাদেশকে পথ-নির্দেশ দিয়েছিল এই স্বল্প পবিসবে নদীয়ার পূজা, পাল-পার্বণ ও উৎসবের বিষয়ে কিছু তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই প্রাচীন উৎসবগুলিব কথাতেই আসা যাক---ঋতু উৎসব, শস্যোৎসব, সন্তানোৎসব, স্বজনোৎসব, সমাজকল্যাণমূলক উৎসবগুলিব কথা সংক্ষেপে আলোচনা কবা হচ্ছে। এক সময়ে নদীয়াতেও এক এক ঋতুতে এক একটি উৎসব হতো। বর্তমানে এর মধ্যে অনেকগুলি লোপ পেয়েছে বটে, তবে, বিশেষ বিশেষ ঋতুতে আজও কয়েকটি উৎসব এখানে হয়ে আসছে। ঋতু-উৎসবের শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে শারদোৎসব বা দুর্গাপূজা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হচ্ছে। এর পর ঋতু উৎসবের মধ্যে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা ও দোল উৎসব বসন্ত উৎসবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নদীয়ার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে স্কুলে, কলেজে, বাড়ীতে, পাড়ায় পাড়ায় সর্বত্র সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে। অনেক বাড়ীতে প্রতিমার পরিবর্তে ঘটস্থাপনা করে বই খাতা দোয়াত কলম রেখে পূজা করা হয়। পূর্বে আমাদের দেশে শস্যোৎসবের প্রচলন ছিল। আজকাল যদিও সেসব লোপ পেয়েছে, তবুও নবান্নউৎসব শস্যোৎসবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে এক একটি ধান, রবিশস্য ঘরে তোলবার সময় এক একটি উৎসব হত। আর একটি উৎসব বৈদিক যুগ হতে সুরু করে আজ পর্যন্ত দেশের প্রায় সর্বত্র চলে আসছে। যাকে শাস্ত্রানুসারে সন্তানোৎসব বলা হয়। অর্থাৎ সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থেকে সুরু করে জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ পর্যন্ত নানা উৎসব হয়ে থাকে। আর একটি শাস্ত্রীয় উৎসবের নাম স্বজনোৎসব---ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি। এইভাবে মেয়েরা স্বামী, পুত্র, ভাই, আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে কত যে উৎসব, কত যে ব্রতপালন, কত যে পূজাপার্বণ করে থাকেন তার ঠিক নেই। সমাজ-সেবামূলক উৎসবের রেওয়াজ পূর্বে ধনীব্যক্তিদের মধ্যে ছিল---যেমন কূপখনন, পুকুর প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, নূতন মন্দির স্থাপন, জীর্ণ মন্দির সংস্কার, ভূমিদান প্রভৃতি জনসমাজের মঙ্গলের জন্যই করা হত। আজ-কাল এই উৎসবগুলি একপ্রকার লোপ পেয়েছে বলা যেতে পারে।

এবার কয়েকটি ছোট খাট পূজার কথায় আসা যাক। নদীয়া জেলাতে যেগুলি আজও প্রচলিত আছে: তার মধ্যেই কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইতুপূজা :

মেয়েদের একটি প্রাচীন পূজা বা ব্রত বলা যেতে পারে। কাতিক মাসেব সংক্রান্তিতে ইতুপূজার ঘট স্থাপন করে সুরু হয়। এর অপর নাম মিত্রপূজা। এক মাসব্যাপী পূজার পর ৩০শে অগ্রহায়ণ সমাপ্তি বা বিসর্জন। কাতিক মাসে প্রতি ববিবার ইতুঘট পূজা হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে পূজা করে, ইতুর কথা পড়ে সকলে প্রণাম করে ঘট বিসর্জন দেয়; আজও নদীয়ার গ্রামে, শহরে অনেক মেয়েরা ইতুপূজা যথানিয়মে করে থাকেন। আজও অগ্রহায়ণের শেষে গ্রামের পথ দিয়ে গেলে শোনা যায়---

> অষ্টচাল, অষ্টদূর্বা কলস পাত্রে থুয়ে
> শোনরে ইতুর কথা একমন প্রাণ হয়ে।
> ইতু দেন বর---
> ধন-ধান্যে দৌত্রে-পৌত্রে বাড়ুক তার ঘর।

হরিষষ্ঠীপূজা :

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে আজও নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে হরিষষ্ঠীর পূজা হয়ে থাকে। এর অপর নাম কাঁচাঘট পূজা। এর প্রচলন আজকাল কমে গেলেও অনেক প্রাচীন বাড়ীতে হরিষষ্ঠীর পূজা হয়ে থাকে। দু-দিন ধরে পূজা হয়---প্রথমদিন ঘরে পূজা, পরের দিন হয় ঘাটে পূজা, তার পরই হয় বিসর্জন, কয়েকটি কাঁচামাটির ঘটের গায়ে মাটিরই পটি সরু করে লাগান থাকে। প্রতিটি পটিকে 'বাড়ী' বলে। এক একজনের ৫ বাড়ী, ৭ বাড়ী, ৯ বাড়ী, ২১ বাড়ী থাকে। মানে যত বাড়ী হবে ঘটের গায়ে তত মাটির পটি

থাকবে। এই পূজা মেয়েদের পূজা। ঘটের মালিকের মৃত্যু হলেও তার বৌয়েরা এই ঘটপূজা করে যাবেন প্রতি-বৎসর।

অবশ্য কোন মালিকের সন্তানাদি না থাকলে তার মৃত্যু হলে তার ঘটপূজা বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েরা পালন করলেও পুরোহিত দিয়ে পূজা হয়ে থাকে বাড়ীর যিনি গিন্নী তিনি উপবাসী থেকে প্রথমদিন পূজার পর হরিষষ্ঠীর কথা বলে বা শুনে জল খাবেন। হরিষষ্ঠীর কথা বা কাহিনী কোন পুস্তকে বিশেষ পাওয়া যায় না। এই কথা বংশপরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসছে।

শীতলাপূজা :

কেবল নদীয়ার গ্রামেই নয়, শহরেও শীতলার পূজা হয়ে থাকে। শীতলা দেবীকে সকলেই ভয় করে থাকে। হিন্দু, মুসলমান সকলেই এই পূজা করেন। গ্রামে বা শহরে শীতলা-তলা বা শীতলার থান আছে। বার মাসেই এই সব জায়গায় পূজা হয়ে থাকে। কলেরা, বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে বা এইসব রোগের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যে শীতলাদেবীর পূজা করা হয়। তাই যখন কোন লোক একটা মূর্তি বা পাথরে সিঁদুর মাখিয়ে দ্বারে দ্বারে শীতলার পূজা দেবে বলে দাঁড়ায় তখন সকলেই কিছু না কিছু পয়সা, চাল ডাল ইত্যাদি দিয়ে দেয়। নদীয়ার অনেক জায়গায় শীতলার মন্দির বা থান আছে। এইসব মন্দিরে বা স্থানে কোথাও কোথাও দৈনিক পূজা হয়ে থাকে, আবার কোথাও বা বৎসরান্তে একবার ধূম-ধাম করে পূজা হয়ে থাকে। সেই উপলক্ষে মেলা বসে কোথাও কোথাও। এই দেবীর বাহন গর্দভ এবং দেবীর এক হস্তে সম্মার্জনী।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা :

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পরই শারদ পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। নদীয়াতেও গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে ঐ দিন পূজা হয়ে থাকে। তবে মূর্তি গড়িয়ে নয়। কাঠায় কনকচূর ধান্য রেখে আল্পনা দেওয়া পিঁড়িতে বসিয়ে পূজা হয়। গ্রামে কনকচূড় ধান দিয়ে এই পূজার প্রথা বহুদিনের, গ্রামাঞ্চলে, খুব কম বাড়ীতেই মূর্তি গড়িয়ে পূজা হয়। আজকাল, সহরাঞ্চলে, মূর্তি গড়িয়ে বাড়ী ছাড়াও সর্বজনীন পূজা হতে সুরু করেছে। পূর্বে এইভাবে ধান্য পূজার প্রথাকেই শস্যোৎসব বলা হত। আজও এই পূজায় কাঁসর-ঘন্টা, কাঁসী বাজান নিষিদ্ধ, ঢোল বাজিয়ে পূজা হয়ে থাকে। অনেক বাড়িতে পূজার পর চালকুমড়া, আখ, কলা প্রভৃতি বলিদানের নিয়ম আজও চলে আসছে। পূজান্তে চিঁড়া মুড়ি, মুড়কী নাড়ু, ভাজা-ভুজি প্রসাদ হিসাবে বিলি করা হয়। ঐ রাতে পূজার পর কোজাগরী-ব্রতকথা পাঠ করে বা শুনে প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে নারিকেলের জলে ভেজান চিঁড়ে নারকেল ভক্ষনের নিয়ম আছে। এই প্রথা আজও বহুবাড়ীতে চালু আছে। তা ছাড়া রাত্রি জাগরণ প্রভৃতির নিয়মও চলে আসছে।

'রাত্রৌ কোজাগরী কৃত্যম্, নারিকেল সহিত চিপিটক ভক্ষণম্, নারকেল জল পানস্ অক্ষক্রীড়য়া রাত্রিজাগরণেন ধনবৃদ্ধি।' 'কে জাগরিত এবং অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত আছে? তাহাকে আমি ধন দান করিব' --এই কথা বলে লক্ষ্মীদেবী ঐ দিন রাত্রিকালে ভ্রমণ করেন। তাই রাত্রি জাগরন প্রথা চালু আছে এবং এই দিনের নাম কোজাগর হয়েছে। পূর্বে লক্ষ্মী বিসর্জন দেওয়ার প্রথা ছিল না। পূজার পরদিন অতি প্রত্যুষে কাঠার কনকচূড় ধান বাড়ীর মালিক মাথায় তুলে নিয়ে ঘরে তুলে রাখবেন এবং ঘট পূজার ফুল ইত্যাদি বিসর্জন দেওয়া হবে। বর্তমানে প্রতিমাসহ সব কিছু বিসর্জন দেওয়া হয়।

মনসা পূজা :

বহুদিন থেকে মনসা পূজার প্রচলন এদেশে চলে আসছে। নদীয়াতে বহুস্থানে মনসা পূজা হয়ে থাকে এবং এই উপলক্ষে মেলাও বসে। অনেক জায়গায় মূর্তি নির্মাণ করে পূজা হয়। অনেক জায়গায় ঘট স্থাপন করে পূজা হয়ে থাকে। অনেক জায়গায় মনসার মন্দির ও মনসার থান আছে। বৎসরান্তে ঐ সব জায়গায় ধূমধাম করে পূজা হয়ে থাকে। মনসার অপর নাম ব্রহ্মাণী, এজন্য নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ব্রহ্মাণীতলা আজও বিদ্যমান। পুরাতন বট, অশ্বত্থ গাছের গোড়া বাঁধিয়ে ঘট বসিয়ে এই পূজা হ'য়ে আসছে। ঘটের গায়ে মাটীর সাপ জড়িয়েও অনেক জায়গায় পূজা হয়। অন্যান্য সময় ছাড়া শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন ব্রহ্মাণী পূজা নদীয়ার অনেক জায়গায় হয়। সাপের ওঝারা ধূমধাম করে পূজা করে থাকে। পূজার দিন সাপখেলার রীতিও অনেক জায়গায় দেখা যায়। নদীয়ার অনেক জায়গায় প্রাচীন ব্রহ্মাণীতলা বা থান আছে, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে। এগুলি কেবল প্রাচীনত্বই দাবি করে না--পূজা উপলক্ষে প্রচুর লোক সমাগম হয়, মেলা বসে। নবদ্বীপের ব্রহ্মাণীতলা ছাড়াও ব্রহ্মাণীর নামানুসারে গড়ে উঠেছে ছোটপল্লী ব্রহ্মাণীতলা নাকাশীপাড়ার কাছে ব্রহ্মাণীতলাটীও প্রাচীন।

চাপড়াষষ্ঠীপূজা :

নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের একটি পূজা এই চাপড়াষষ্ঠী। বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে মেয়েরা এই পূজা পুরোহিত দিয়ে করে থাকেন। ষষ্ঠী ষোড়শমাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। ইনি শিশুদের প্রতিপালনকারিণী এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশস্বরূপিণী বলে এর নাম ষষ্ঠী। বৎসরের বার মাসে বার নামে এর পূজা হয়ে থাকে এবং শুক্লাষষ্ঠীতে পূজা হয়ে থাকে। স্কন্দপুরাণে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটি ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ আছে। নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে এই দ্বাদশটি ষষ্ঠী পূজা বারমাসে হয়ে থাকে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য--অরণ্যষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী, চপেটাষষ্ঠী, দুর্গা-ষষ্ঠী, শীতলাষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী, হরিষষ্ঠী প্রভৃতি। প্রতিমাসে এইসব ষষ্ঠীর পূজা বিধিমত করে, ষষ্ঠীর কথা শ্রবণ করে মেয়েরা ব্রত পালন করে থাকেন। সরস্বতী পূজার পরদিন শীতলাষষ্ঠী পূজায় কেবল অরন্ধনই হয় না, আগের দিন রান্না

করে ভাত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। একটি হলুদে ছোপান কাপড় দিয়ে শীল-নোড়া ঢাকা দিয়ে বাঁশ পাতা পাশে রাখা হয়। পরদিন পুরোহিত এসে পূজা করে দৈ-কলা হলদে কাপড়ের ওপর শীলের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে বলেন, সব শীতল হোক। পূজান্তে শীতলাষষ্ঠীর কথা শুনে মেয়েরা জল খান। এই প্রথা নদীয়ার গ্রামে ও শহরের অনেক বাড়ীতে আজও চলে আসছে। মধ্যাহ্নে বাড়ীর সকলে আগের দিনের ভিজে ভাত ও তরকারী (নিরামিষ) আহার করেন। কারণ সেদিন রান্না বন্ধ থাকে।

দুর্গাপূজা :

কেবল নদীয়ার নয়, সারা বাংলা এই পূজায় মেতে ওঠে। এক কথায় একে জাতীয় উৎসব বলা হয়ে থাকে। শরৎকালে এই পূজা হয় বলে একে শারদোৎসব বলা হয়ে থাকে। বহুকাল হতে এই শারদোৎসব বা দুর্গাপূজা এদেশে হয়ে আসছে। এর ইতিহাস এর তত্ত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা না করে নদীয়ার দুর্গাপূজা বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। নদীয়ার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণনগরে ১৬৪৮ খ্রীঃ প্রথম দুর্গাপূজা সুরু হয়। তার পর ধীরে ধীরে জেলার সর্বত্র দুর্গাপূজা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে এই পূজা ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীতে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হত। এই পূজায় ছাগ বলিদান অপরিহার্য ছিল। বাড়ীর পূজাগুলিতে ছাগ বলিদান ছাড়াও আখ কলা কুমড়া বলিদানের প্রথা ছিল। অনেক বাড়ীতে মহিষ বলিদান দেওয়া হত। নদীয়ার রাজবাড়ী ছাড়াও কয়েকটি বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে পূজা, বলিদান হয়ে আসছে তার মধ্যে বেথুয়াডহরীর পালচৌধুরী জমিদারবাড়ী, কৃষ্ণনগর রায় পাড়ায় রায়বাড়ীর পূজা উল্লেখযোগ্য। আর একটি প্রাচীন দুর্গাপূজা, নাকাশীপাড়ার জমিদারবাড়ীর পূজা সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে। পূজাটি বন্ধ হয়ে গেলেও উল্লেখযোগ্য এই যে এই পূজায় মহিষ বলিদান হতো, বলিদানের খাঁড়াটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। পূর্বে বারোয়ারী বা সার্বজনীন পূজার খুব একটা রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে অর্থনৈতিক চাপে পড়ে বাড়ীর পূজাগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই স্থান অধিকার করছে সার্বজনীন পূজা। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, বাড়ীর পূজাগুলিতে যে নিয়ম, নিষ্ঠা, প্রাণ ছিল এই সব সার্বজনীন পূজাগুলিতে সেইভাবে পূজার দিকটা দেখা হয় না। ধুমধাম, হৈ,-হুল্লোড়, বাজী-বাজনা, মণ্ডপসজ্জাই বেশী হয়। সে কালে দুর্গাপূজা উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা হতো এবং কদিন ধরে ছোট বড়, ধনীদরিদ্র সকলেই আনন্দে মেতে উঠত। অনেক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে বাঁধা কবিয়াল, বাঁধা থিয়েটার বা যাত্রার দল থাকত। বৎসরান্তে তাঁরা দুর্গাপূজার সময় এসে গান গেয়ে যেতেন। এই রকম একটি প্রাচীন জমিদার বাড়ীর কথা এখানে উল্লেখ করছি। নদীয়ার একটি প্রাচীন গ্রাম নাকাশীপাড়া, নাকাশীপাড়ার প্রাচীন জমিদারবাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময়ে বা পরেই পাঁচালী গান হত এবং পাঁচালীগায়ক একশত টাকা করে পেতেন। একবার খরচ কমাবার জন্য পূর্বেই গায়ক দাশরথী রায়কে জানান হয়েছিল আশীটাকা দেওয়া হবে। গায়ক তখন কিছু না বলে প্রতিবৎসরের ন্যায় সে বারেও নাকাশীপাড়ায় এসে গান গেয়ে শেষদিন পাঁচালী কাটলেন :

> গ্রামের নাম নাকাশী
> ডাকলেও আসি, না ডাকলেও আসি।
> ছিল একশত হলো আশী
> (এবারও গান গেয়ে গেলাম)
> আসছে বার আসি কি না আসি।

সেই প্রাচীনকাল হতে আজও নদীয়ার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণনগরে প্রাচীন দুর্গাদালান পুরাতন ঐতিহ্যময়ী দুর্গাপ্রতিমা রাজ-রাজেশ্বরীর পূজা হয়ে আসছে। আজ যদিও একশ ঢাক বাজিয়ে আর পূজা হয় না, তবুও প্রাচীনত্ব বজায় রেখে কোন রকমে পূজা হয়ে আসছে।

কালীপূজা :

দুর্গা পূজার পরই নদীয়াতে কালীপূজার প্রচলন বেশী দেখা যায়। নদীয়ার প্রায় প্রত্যেকটী গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে, সহরে সহরে, সর্বত্র কালীপূজার প্রচলন দেখা যায়। নদীয়ার এমন গ্রাম নেই, এমন শহর নেই যেখানে কালীপূজা হয় না। প্রতিটি পল্লীতে কালীতলা, কালীর স্থান আছে। তাছাড়া বর্ধিষ্ণু গ্রামে কালীমন্দিরও প্রচুর দেখা যায়। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। রূপদহে রূপালী কালীর-স্থান, কৃষ্ণনগরে সিদ্ধেশ্বরী, আনন্দময়ী, নবদ্বীপে ভবতারিণী ও আগমেশ্বরীতলায় আগমবাগীশ প্রতিষ্ঠিত কালীর স্থান। নাকাশীপাড়া থানার মাঝেরগ্রামে কালীর স্থান, কালীগঞ্জ থানায় নোয়াসা ও হবিবপুর গ্রামে কালীর স্থান, তেহট্ট থানার চাঁদের ঘাট গ্রামের উত্তর পাড়ায় বাস্তুকালী ও মধ্যপাড়ায় রক্ষাকালীর স্থান, করিমপুর থানায় নতিডাঙ্গা গ্রামে কালীর স্থান, চাকদা থানায় যশড়া গ্রামে বুড়োমাতলা, হাঁসখালি থানার পাটুলীও রাণাঘাটে সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি কালীর মন্দির আছে। রূপদহগ্রামে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে কোন এক মঙ্গলবারে নির্দিষ্ট স্থানে কালীর পূজা হয়। কোন মূর্তি নেই, নির্দিষ্ট স্থানে একটি শীলাস্তম্ভকে দক্ষিণা কালীর ধ্যানে পূজা করা হয়। পূজার পর বলিদানও হয়। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে কোন এক মঙ্গলবারে গ্রামের ছোট বড় মেয়েরা সকলে একত্রিত হয়ে ফলাহার করে পবিত্র চিত্তে এই উৎসব পালন করে থাকেন।

সিদ্ধেশ্বরী (কৃষ্ণনগর):

ঘূর্ণীর কাছে বর্তমানে খড়ে নদীর যে বাঁক আছে তারই অপর পারে তারানাথ তান্ত্রিক কালী সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন বলেই এর নাম সিদ্ধেশ্বরী। খড়ে নদীর ভাঙনে পুরানো মন্দির ভেঙে যায় ও নদী শহরের দিকে এগিয়ে আসে। মন্দির

ভেঙে গেলে সেখানকার ঘট নিয়ে এসে বর্তমান স্থানে একটি চালা ঘরে প্রতিষ্ঠা করে মূর্তি নির্মাণ করে পূজা সুরু হয়। তখন এই জায়গাটি বাগান ও জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সেই সময় নদীয়ার অন্তর্গত জুনিয়াদহর (বর্তমান বাংলাদেশ) জমিদারের সম্পত্তি ছিল এই স্থানে। ডাঃ চন্দ্রনাথ ঘোষ উক্ত জমিদারের মাধ্যমে এই জমি দানস্বরূপ গ্রহন করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পাকাপাকিভাবে পূজা সুরু হয়। তখন এর সেবাইত শ্রীদীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় ও সকলের সহযোগিতায় এই মন্দির ও মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপিত হয় আজ হতে প্রায় ১০০ বছর আগে।

আনন্দময়ী :

কৃষ্ণনগর রাজবাটির সন্নিকটে আনন্দময়ীতলায় মা আনন্দময়ীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তদানীন্তন মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় ১৮২০ সনে। শায়িত শিবের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসা কালী মূর্তি খুব কমই দেখা যায়। এই অদ্ভুত মূর্তি দেখতে ও পূজা দিতে বহু স্থান হতে ভক্তরা আসেন। নবদ্বীপে ভবতারিণী মূর্তিটিও একইরূপ। মনে হয় একই সময়ে একই রাজার আমলে নবদ্বীপে ঐ মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী ও নবদ্বীপের ভবতারিণী খুব জাগ্রত্তা দেবী বলে লোকের বিশ্বাস।

আগমবাগীশতলা :

নবদ্বীপে আগমবাগীশ তলা একটি প্রাচীন স্থান। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তখন প্রতিমা বা মূর্তি ছিল না। ঘট স্থাপন করে পূজা করার নিয়ম ছিল। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যে ঘট স্থাপন করে পূজা করেন তা আজও সেখানে আছে এবং নিত্য পুজিত হয়ে আসছে। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমানে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় যে শ্যামা পূজা হয়ে থাকে সেই মূর্তি ও পূজা পদ্ধতি আগমবাগীশেরই প্রবর্তিত এবং তিনি এই মূর্তি প্রথম গড়িয়ে পূজা করেন। তাঁর সময় হতেই এক বিরাট কালীমূর্তি কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার সময় পূজিত হয়ে আসছেন এবং আগমেশ্বরী নামে খ্যাত। কেউ কেউ বলেন তারপর নদীয়ার রাজবংশ হতে বংশপরম্পরায় এই শ্যামা পূজা ও দীপান্বিতার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টার ফলেই নদীয়া জেলায় দিন দিন এই কালীপূজা বৃদ্ধি পায়।

মাঝেরগ্রাম কালীর স্থান :

নাকাশীপাড়া থানার মাঝের গ্রামে প্রাচীন কালীব স্থানে প্রতি বছর পৌষমাসে বিরাট ধূমধাম করে কালী পূজা হয়ে থাকে। চারি ধারে গাছে ঘেরা একটি প্রাচীন গাছের তলায় নির্দিষ্ট স্থানে এই পূজাও ঐ সময় হয়। কালীগঞ্জ থানার নোয়াসার কালীতলায় নিত্যসেবিতা কালীর স্থান আছে। বৎসরান্তে সেখানে ধূমধাম করে কালী পূজা হয়। হরিপুর গ্রামে কালীর পাকামন্দির নাটমণ্ডপ আছে। সেখানে কোন মূর্তি নেই তবে নিত্য ফুল গঙ্গাজল দেওয়া হয়। কালী পূজার সময় মূর্তি গড়িয়ে বিরাট ধূমধাম করে পূজা হয় ও অজস্র বলিদান হয়। ঐ অঞ্চলে এই দেবীর বুড়ো মা বলে খ্যাতি আছে ও খুবই জাগ্রতা তেহট্ট থানার চান্দের ঘাট গ্রামের উত্তর ও মধ্য পাড়া দুটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বেদী নির্মাণ করে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যথাক্রমে বাস্তুকালী ও রক্ষাকালী পূজা হয়। ঐ দুইস্থানে দুজন ভৈরবী আছেন। প্রতি মঙ্গলবারে তাঁরা ঐ বেদীতে পূজা করেন। পূজার পর তাঁদের প্রায়ই ভর হয় এবং সেই সময় নানা রোগের ঔষধ দিয়ে থাকেন। এই পূজা সার্বজনীন। কালী পূজার পর দিন ব্রহ্মাণী পূজা হয়। করিমপুর থানায় নতিডাঙ্গা গ্রামে কালী পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান ও বেদী আছে। এই বেদিটি নাকি রাণী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে এখানে কালী পূজা হয়। চাকদা থানার যশড়া একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন গ্রাম। এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় বুড়োমার পূজা ও পালুনী উৎসবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মা আসলে কালী দেবী। এই পূজা ও পালুনী কেবল মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের বিশ্বাস বুড়োমার পূজা ও পালুনী করলে ইহজন্মে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন স্থানে বুড়ো মায়ের নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেখানেই কালীর ধ্যানে বুড়ো মায়ের পূজা হয়। বাৎসরিক পূজার সময় মৃন্ময় মূর্তি গড়িয়ে পূজা হয়। মানত হিসাবে কাঁচাদুধ ও বাতাসা নিবেদন করা হয়। হাঁসখালি থানার পাটুলীগ্রামে প্রতি বৎসর মাঘমাসের অমাবস্যায় বুড়ীকালীর পূজা হয়। অঞ্জনা নদীর উত্তর পারে এই সময় মেলা হয়। কালীমূর্তিটি ১৭ হাত উঁচু। এই বুড়ী কালীর পূজা ছাড়াও গ্রামে ভগ্নপ্রায় মন্দিরে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় মূর্তি তৈরী করে কালী পূজা হয়। মন্দিরটি ডাকাতে কালীর মন্দির বলে পরিচিত। রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী কালীও প্রাচীন ও জাগ্রতা। এই সব কালীতলায় ও মন্দিরে বারমাসে পূজা হলেও বছরে একবার ধূমধাম করে পূজা হয় এবং সে সময় অনেক জায়গায় মেলা বসে। নদীয়া জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে কালীর থান মন্দির একটা না একটা আছেই। প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, ডালিম গাছের গোড়া বাঁধিয়ে রাখা আছে, সেখানেই পূজা হয়। বৎসরান্তে একবার অথবা বিশেষ মানত থাকলে মাসে মাসে কালী পূজা হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা :

কালীপূজার পর আসে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা। যদিও কৃষ্ণনগর থেকে দেশের সর্বত্র জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন নতুন ভাবে সুরু হয় তবুও কৃষ্ণনগরের বাইরে সারা নদীয়াতেই এই পূজার খুব একটা প্রচলন হয়নি। বহুপূর্বে দু'একটি বাড়ীতে, পূজা হত। কৃষ্ণনগরের পাড়ায় পাড়ায় অনেক বাড়ীতে সর্বজনীন ও ব্যক্তিগতভাবে পূজা সেকাল থেকে আজও হয়ে আসছে। কয়েকটি বাড়ীর পূজা, সর্বজনীন জগদ্ধাত্রীপূজা প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। এই জগদ্ধাত্রী পূজা প্রাচীন পূজা।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে দেখতে পাওয়া যায়---মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্তিত করেন। কিন্তু বহু পুরাকাল থেকে এর প্রচলন দেখা যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭২৮-৮২ সাল। তারও ২০০ বছর আগে সমগ্র বাংলার ধর্মব্যবস্থাপক ছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দন ভটাচার্য। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই রঘুনন্দনের 'একাদশী-তত্ত্বের' কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। রঘুনন্দনেরও পূর্বে যাঁর গ্রন্থ পড়ে 'স্মার্ত' হতে হত তারও অনেক আগে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির 'ব্রতকাল বিবেক' গ্রন্থে আমরা জগদ্ধাত্রীদেবীর উল্লেখ দেখতে পাই। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ---কাত্যায়নীতন্ত্র। এই গ্রন্থে জগদ্ধাত্রী দেবীর উৎপত্তির বিবরণ আছে। স্তব, ধ্যান, প্রভৃতির উল্লেখও এতে আছে। কাজেই জগদ্ধাত্রীপূজা বহু প্রাচীন, হয়ত কালক্রমে এই পূজা লুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এর পুনঃ প্রচলন সুরু হয়। সেজন্য আমরা জানি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেন।

নবাব মীরকাশিম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি মহারাজকে মুঙ্গেরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেন। সেই সঙ্গে রাজপুত্র শিবচন্দ্রকেও। মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ হতে লাগল নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে নবাব মীরকাশীম ইংরেজদের ভয়ে মুঙ্গের ছেড়ে চলে যান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও রক্ষা পেয়ে যান। নচেৎ তাঁর অদৃষ্ট কি ঘটত বলা শক্ত। তখন আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার সময়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তখনকার দিনের দ্রুতগামী 'ছিপ' নৌকায় স্বপুত্র কৃষ্ণনগর অভিমুখে রওনা হলেন। দীর্ঘ পথ, তবুও যতদূর সম্ভব মহারাজ এগিয়ে চলেছেন। নাকাশীপাড়ার রুকুনপুরের ঘাটের কাছে তখন ঢাকে বিজয়ার বাজনা শুনে বুঝলেন যে দুর্গাপূজা হয়ে গেল। নৈরাশ্যে, ক্ষোভে, দুর্বল শরীরে মহারাজ হতাশ হয়ে নৌকায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহারাজ স্বপ্নে দেখলেন---'সিংহারূঢ়া চতুর্ভুজা, রক্তাম্বুজা, এক মহাদেবী বলছেন "আমাকে যে মূর্তিতে দেখছ সেই মূর্তি গড়ে আগামী শুক্লা নবমীতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই দুর্গাপূজা করা হবে।" মহারাজার জ্ঞান ফিরে এল, গঙ্গাজল পান করে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তাড়াতাড়ি কৃষ্ণনগর পৌঁছাবার জন্য। কৃষ্ণনগরে পৌঁছেই পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহবান করে স্বপ্নের কথা বললেন। অনেক আলোচনার পর একজন পণ্ডিত বললেন যে, প্রাচীন কালে এই পূজার প্রচলন ছিল, এখন অবলুপ্ত। এর নাম জগদ্ধাত্রী দেবী। তারপর মহারাজার আদেশে মৃৎশিল্পীরা পণ্ডিতদের নির্দেশে জগদ্ধাত্রী মূর্তি নির্মান করেন। পরের শুক্লা একাদশীতে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে নতুন ভাবে জগদ্ধাত্রী পূজা পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে, শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে প্রথম অনুষ্ঠিত হল। তারপর ধীরে ধীরে সারা কৃষ্ণনগরে, নদীয়ায় ও দেশের সর্বত্র জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন সুরু হলো, কৃষ্ণনগরে পাড়ায় পাড়ায় অনেক বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হতে লাগল। ক্রমশঃ বাড়ীর পূজাগুলি কমে যেতে লাগল, সেই স্থানে অধিকার করল সার্বজনীন পূজাগুলি। বাড়ীর পূজার মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজ-বাড়ীর পূজা কেবল প্রাচীনই নয় মূর্তিটীও অন্য ধরনের, জগদ্ধাত্রীর ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে এই মূর্তি প্রথম নির্মিত হয় এবং সেই সময় হতে আজও পূজিত হয়ে আসছে। এধরনের মূর্তি কৃষ্ণনগরে দু'একটি বাড়ী ছাড়া খুব কমই দেখা যায়। কৃষ্ণনগরে সার্বজনীন পূজাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পূজা চাষাপাড়া। চাষাপাড়ার জগদ্ধাত্রী মূর্তিটি যেমন বিরাট তেমনি প্রাচীনত্বেরও দাবী রাখে। চাষাপাড়ার জগদ্ধাত্রী পূজার নিজস্ব পাকামণ্ডপ আছে। কৃষ্ণনগরে আরও কয়েকটি সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা-প্রীতিসম্মিলনী, বালকেশ্বরী, গোলাপটী, মালোপাড়া, হাতার পাড়া, উকিল পাড়া, ষষ্ঠীতলা, চকের পাড়া, আনন্দময়ী-তলা, পাত্রবাজার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জগদ্ধাত্রী পূজা কৃষ্ণনগরের নিজস্ব পূজা ও উৎসব। বর্তমানে বাড়ীর ও সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজার সংখ্যা প্রচুর। পূর্বাপেক্ষা মণ্ডপ-সজ্জা, আলোকসজ্জা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বৈচিত্র্যহীন জীবনে এইসব পূজা উৎসবের বিশেষ প্রয়োজন আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

নদীয়ার কি গ্রামে কি সহরে সর্বত্র নানা দেবস্থান, মনসা, কালী, শীতলা, পীড়ের থান, দরগা প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে। বছরের প্রায় বারমাসেই একটা না একটা উৎসব লেগে আছে এইসব স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে। সেই উপলক্ষে অনেক জায়গায় মেলা বসে। আর সেই সব মেলায় জনসমাবেশ, কেনাবেচায়, যাত্রা, কবিগান সিনেমা, ম্যাজিক প্রভৃতি নানা উৎসবে মানুষ মেতে উঠে। বিশেষ করে পল্লীঅঞ্চলের প্রাণ হচ্ছে এই সব মেলা। সেকালে গ্রামাঞ্চলে এইসব মেলার মাধ্যমেই পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা আদানপ্রদান ব্যবসা-বাণিজ্য হত। এক একটি মেলা এক এক অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। এই সব মেলা দূরকে করত নিকট বিভিন্ন পূজা, পার্বণ, ব্রত উৎসবকে কেন্দ্র করেই এইসব মেলার সৃষ্টি। এক একটি মেলায় নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব কাহিনী অতীতের নানান কথা, সমাজব্যবস্থার কথা, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা নানাভাবে জড়িয়ে আজও মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। এই ধরনের বহু ছোট বড় নানা ধরনের মেলা নদীয়ায় দীর্ঘ দিন ধরে হয়। কেবল হিন্দুদের পাল পার্বণকে কেন্দ্র করেই নয়, মুসলমানদের কয়েকটি উৎসব ও পীড়স্থানেও মেলা হয়। খ্রীস্টানদের উৎসবে নদীয়ায় যে মেলা হয় তা উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে অনেক পুরাতন মেলার অবলুপ্তি ঘটেছে অন্যদিকে নতুন নতুন মেলার সৃষ্টিও হয়েছে। তার মধ্যে যেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রাচীনত্ব এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে।

বারদোলের মেলা :

নদীয়ার সর্বাপেক্ষা বড় মেলা। কৃষ্ণনগরে নদীয়ার রাজবাড়ীর বিস্তৃত ময়দানে এই মেলা দীর্ঘ দিন ধরে হয়ে আসছে। নদীয়ার রাজারাই বিভিন্ন দেববিগ্রহ বিভিন্ন স্থানে সেবিত।

সেই সব বিগ্রহ বারদোলেরে সময় নদীয়ার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণনগরে বিরাট পূজামণ্ডপে আনা হয়। কৃষ্ণনগরের এটি নিজস্ব উৎসব। শুধু কৃষ্ণনগর বা নদীয়ারই নয়, বাংলার বিভিন্ন স্থান হতে বহু জন সমাগম এই মেলায় হয়। মেলার মধ্যে মাটীর পুতুলের পটিটাই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। এক একটি প্রানবন্ত-জীবন্ত মৃৎশিল্পের নমুনা সকলকেই মোহিত করে দেয়। চৈত্রমাসে এই দোল উৎসব শাস্ত্রীয়। অনেকের মনে এই দোল শাস্ত্র-সম্মত কিনা এরূপ সংশয় জাগলেও হরিভক্তিবিলাসঃ নামক গ্রন্থে ঐ দোলের কথা জানতে পারা যায়। দোল পূর্ণিমার পর শুক্লা একাদশীতে এই উৎসব সুরু এবং তিন দিন ব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উৎসবটি রাজপরিবারের প্রবর্তিত নিজস্ব উৎসব হলেও বর্তমানে এটি সার্বজনীন বলা যেতে পারে। তখনকার দিনে যে কোন উৎসবই করা হোক না কেন শাস্ত্রসম্মত উপায়ে করা হত। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়ঃ

চৈত্র সিতেকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিনাভিমুখং প্রভুম।
দোলয়া দোলং কুর্য্যদ্যীত নৃত্যাদিমাৎসবম॥
তথাচ গরুড়ে—
চৈত্রমাসি সিতে পক্ষে দক্ষিনাভিমুখম হরিম।
দোলারূঢ়ং সমভ্যচ্য মাসমালোলায়েৎ কলৌ॥

অর্থাৎ চৈত্র মাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে গীত নৃত্যাদি উৎসব সহকারে দেব দেবীকে দক্ষিণ মুখ করে দোলদ্বারা দোলাতে হয়। গরুড় পুরাণেও ঐ বিষয়ে লিখিত আছে যে কলিকালে চৈত্র শুক্লপক্ষে দক্ষিনাস্য জনার্দ্দনকে পূজা করে একমাস দোলনে দোলাতে হয়। কাজেই এই দোল উৎসব শাস্ত্রসম্মত সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

নদীয়ার রাজবাড়ীর এই প্রাচীন উৎসব ও মেলাটি প্রায় ২০০ বছরের। পূর্বে খুব ধুমধাম করে এই উৎসব হত। দেশ-দেশান্তর হতে লোক সমাগম হত এই মেলায়। উৎসবের প্রথমদিনে বিগ্রহগুলিকে মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা রাজবেশে, দ্বিতীয়দিনে সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা রাজবেশে, এবং তৃতীয়দিনে দরিদ্র রাখালবেশে সজ্জিত করা হত। বারদোলে নদীয়া মহারাজার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দির হতে বিগ্রহগুলি রাজ-বাড়ীতে আনা হয় এবং তিনদিন উৎসব প্রাঙ্গনে দোলায় উঠিয়ে দোল দেওয়া হয় ও পূজা করা হয়। তিনদিনপর ঐ সব বিগ্রহগুলিকে রাজার ঠাকুরবাড়ীতে একমাস রাখা হয় ও নিত্য পূজাদি হয়। বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে এই মেলা বসে জেলার ও বাহিরের বহু লোক সমাবেশে মাসাধিক কাল এই মেলা চলে। নদীয়ার মহারাজার তত্ত্বাবধানে এবং জন-সাধারণের সমবেত চেষ্টায় মেলার সুব্যবস্থা করা হয়।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গগত বিধুভূষন সেনগুপ্ত মহাশয় বারদোলে তের বিগ্রহের আগমন সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ কবিতাটি লিখেছিলেন এখানে উদ্ধৃত করা হল। কোন্ কোন্ স্থান হতে কোন্ কোন্ বিগ্রহ আসেন পরিষ্কার বোঝা যাবে ঃ

বিরহীর বলরাম, শ্রীগোপীমোহন।
লক্ষ্মীকান্ত বহিরগাছি শুরুর ভবন॥
নারায়ণচন্দ্র ছোট ব্রহ্মণ্যদেব সহ।
আর বড় নারায়ণ রাজার বিগ্রহ॥
গড়ের গোপাল পেয়ে স্থান শান্তিপুর।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ স্থানে ঘোষঠাকুর॥
নদীয়ার গোপাল তরে নবদ্বীপে স্থান।
ত্রিহট্টের কৃষ্ণরায়—অগ্রফল পান॥
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, গোবিন্দ দেব আর।
উভয় বিগ্রহ স্থান—আবাস রাজার॥
মদন গোপাল শেষে—বিরোহীতে স্থিতি।
বার দোলে তের দেব—আবির্ভূত ইতি॥
হেরিলে দেবেরে হরে আধি, ব্যাধি-ক্লেশ।
রাজবেশ, ফুলবেশ, রাখালের বেশ॥
ভক্তিভরে দেব নাম করিলে কীর্ত্তন।
সকল পাতক নাশে শান্তি লাভে মন॥
ইতি চৈত্র শুক্ল পক্ষে শ্রীমন নদীয়াধীপস্য
প্রাসাদোদ্যানে বার দোলা বির্ভ্তনাং দেব বিগ্রহানাং॥

নদীয়ার গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিব, শিবমন্দির প্রচুর আছে। এই সব মন্দির প্রাঙ্গণে বৎসরান্তে পূজা উৎসব হয়ে থাকে। বিশেষ করে চৈত্র মাসে গাজনের সময় অনেক জায়গায় ধুম-ধাম করে পূজা হয়, মেলা হয়, সংবার হয়। তার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

কৃষ্ণনগর থানার রূপদহ একটি প্রাচীন গ্রাম। রূপাই-বিলের পাশে অবস্থিত বলে গ্রামের নাম রূপদহ হয়েছে। এই গ্রামে রূপাই কালীপূজার মেলা ছাড়াও চৈত্রমাসে গাজনের মেলাটি প্রাচীন। সংক্রান্তির দুদিন আগে থেকে উৎসব সুরু হয়। একটি শিবলিঙ্গ আছে, তাছাড়া উৎসবের সময় শিবের মাটীর-মূর্তি করে যথানিয়মে পূজা হয়। গ্রামেরই কয়েকজন সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে কদিন ধরে পূজা ও সংযম পালন করেন। মাথায় শিবলিঙ্গ নিয়ে গ্রামের বাড়ী বাড়ী ও আশে-পাশের গ্রামে নৃত্য-গীত সহকারে প্রদক্ষিণ করেন। দ্বিতীয় দিনে গাজনতলায় শিবের পূজা, নীল পূজা হয়, এবং ভক্তরা আগুনে ঝাঁপ, বাবলা কুলকাঁটার উপর হাঁটা, শরীরের বিভিন্ন অংশ লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করে, নানান কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকেন। শেষদিন হয় চড়কপূজা ও উৎসব। মেলা বসে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। এই মেলাটীও প্রাচীন, এইরূপ মেলার মত চুয়াখালী, সুবর্ণবিহার, ঘূর্ণী, কল্যাণদহ, টুঙ্গী, নাকাশীপাড়া, দোগাছি, হাটগাছা, চান্দেরঘাট, শ্রীরামপুর, মামজোয়ান, বাদকুল্লা, শান্তি-পুর প্রভৃতি স্থানে শিবের গাজন ও মেলা হয়ে থাকে। অনেক গ্রামে নীলপূজা ও শিবপূজায় ছাগবল্লির প্রথাও আছে।

বারদোলের পরেই নবদ্বীপ ও শান্তিপুর রাস উৎসব ও মেলা প্রাচীন। প্রচুর লোক-সমাগম হয় এই উৎসব দুটীতে। নবদ্বীপের রাস উৎসব কেবল নদীয়ার নয়, সারা পশ্চিম-বাংলার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উৎসব। বিরাট বিরাট প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা হয়। একটি প্রতিমা ২০ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত হয়। রাস উৎসব যদিও বৈষ্ণবদের উৎসব কিন্তু নবদ্বীপে তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যতদূর উৎসবে বিরাট বিরাট কালী, ভদ্রকালী, কৃষ্ণকালী, রণচণ্ডী, বড়শ্যামা প্রভৃতি দেবীর এত আবির্ভাব খুব কমই দেখা যায়। যতদূর মনে হয় দেশের বৈষ্ণব প্রভাবকে খর্ব করার জন্যই তখনকার রাজশক্তির চেষ্টায় এই শাক্ত দেবীদের পূজা ও উৎসবের ব্যবস্থা হয়। নবদ্বীপের বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন মূর্তিতে মহাধুমধামে রাস-উৎসব পালিত হয়।

নবদ্বীপের পরই শান্তিপুরের ভাঙ্গা-রাস বিখ্যাত। রাস পূর্ণিমার সময় এই উৎসব মহাধুমধামে শান্তিপুরে হয়ে থাকে। এর খ্যাতি সারা বাংলায়। যতদূর জানা যায় প্রায় ২৫০ বছর আগে তৎকালীন বিখ্যাত খাঁচৌধুরীরা শান্তিপুরে রাস-উৎসবের প্রচলন করেন। তাঁদের কুলগুরু শান্তিপুরের বড় গোস্বামীদের গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই এই উৎসবের সুরু ও প্রচলন। পরে স্থানীয় গোস্বামীদের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তিগুলিকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথকভাবে উৎসবের আয়োজন হয় ও রাস উৎসব শান্তিপুরে সুরু হয়। সেই হতে আজও প্রতিবৎসর মহাধুমধামে এই উৎসব হয়ে আসছে এবং মেলাও বসে থাকে। চারদিন ধরে এই উৎসব চললেও প্রস্তুতি চলে অনেক আগে থেকে। শেষদিন বিখ্যাত ভাঙ্গা রাসের মিছিল দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে বহুলোক সমাগম হয়। প্রকাশ্য রাসমিছিল শান্তিপুরেই প্রথম সূত্রপাত।

নবদ্বীপের রাসযাত্রা :

মুখ্যতঃ এটা শক্তিপূজারই আয়োজন। সেখানে গোস্বামী-দের নিজস্ব গৃহমন্দিরে রাসযাত্রার আয়োজন থাকলেও বারোয়ারী শক্তিপূজার তুলনায় নিষ্প্রভ। শান্তিপুরের রাসযাত্রার উৎসবের চেহারা সম্পূর্ণ বৈষ্ণবমতে—কারণ রাধাকৃষ্ণকে নিয়েই সে আয়োজন। প্রাচীনকাল থেকে শান্তিপুরেও কয়েকখানি কালীমূর্তি পূজা ঐ সময় থেকে হয়ে আসছে—পটেশ্বরী নামে পটে আঁকা একখানি কালীমূর্তিপূজায় পট-পূজার ঐতিহ্য শান্তিপুর আজও বজায় রেখেছে। ভাঙ্গা রাসের মিছিলের দিনই ঐ সব কালীমূর্তিগুলির বিসর্জন হয়। শান্তিপুরের শেষের দিনে দেববিগ্রহদের নিয়ে মিছিল বাহির হয়—এই মিছিলে ময়ূরপঙ্খী নৌকা, বালকনৃত্য, রাসনৃত্যের হাওদা 'সমসাময়িক' সমস্যা বিষয়ক নৃত্যগীত, পৌরানিক ও আধুনিক কাহিনী মাটির পুতুল, বালকবালিকাদের রাইবেশী, গোস্বামীবাটীর সুন্দরী ছোট মেয়েদের শ্রীরাধা ও গোপিনীবেশে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে রাই রাজার হাওদায় বহির করা হয়। মিছিলের প্রথমেই থাকে খাঁচৌধুরীদের শ্যামচাঁদ বিগ্রহ, মধ্যে থাকে বড় গোঁসাইদের রাধারমণ বিগ্রহ আর সব শেষে থাকে হাটখোলার গোস্বামীদের গোকুলচাঁদ বিগ্রহ। প্রায় সারারাত ধরে সহর পরিক্রমার পর শেষরাতে স্ব স্ব মন্দিরে বিগ্রহগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন কুঞ্জভঙ্গের পর 'ঠাকুর তোলা' উৎসব হয়, ও বিগ্রহগুলিকে পুষ্পমাল্যদ্বারা সাজান হয়। এই অনুষ্ঠানকে পুষ্পরাগ বলা হয়। চাপড়া থানার হাতী-শালা গ্রামেও রাসযাত্রা উৎসব মেলা হয়। ধর্ম্মদা গ্রামেও রাস উৎসব হয়।

নবদ্বীপে রাসযাত্রা ছাড়াও আর একটি প্রাচীন গাজন উৎসব হয়। চৈত্রসংক্রান্তির পাঁচদিন আগে থেকে সুরু হয় এই উৎসব। পাঁচদিনের পাঁচটী উৎসবের নাম—সাতগাজন, ফুল, ফল, নীল, চড়ক। নবদ্বীপেও গাজন উৎসব হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিশীথরাত্রে বিভিন্ন শিবমন্দিরে নানা বাজনা বাজিয়ে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে নাচ ও মিছিল। নবদ্বীপের লোকে বলে—'এ নাচ মানুষের নয়, শিবের নাচ'। নবদ্বীপ বৈষ্ণব তীর্থ হলেও শিবের সংখ্যা অনেক, যেমন বুড়োশিব, যোগনাথশিব, পাড়ভাঙ্গার শিব, মালোদের শিব, দণ্ডপাণি, বালকনাথ, প্রভৃতি। এসব ছাড়াও কালীগঞ্জ থানার বড়-চাদঘর গ্রামে চৈত্র মাসে বারুণী তিথিতে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি বৈশাখ-মাসে মঙ্গলবারে যমদায়িণীদেবীর বার্ষিক পূজা ও মেলা হয়। কালীগঞ্জ থানার মাটীয়ারীতে ও করিমপুর থানার ধোড়াদহ গ্রামে চৈত্রমাসে রামনবমীতে উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। চাকদহে মাঘী পূর্ণিমায় গনেশজননী উৎসবপূজা ও মেলা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। চাকদহের কাছে শ্রীপাটকুলিয়াতে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে দেবানন্দ ঠাকুরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। হরিণঘাটা থানার বিরহী গ্রামে কার্ত্তিক মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব কেবল প্রাচীন নয় একটী বিরল দৃষ্টান্তের উৎসব। প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে এক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণবসাধক একটি বটগাছতলায় মদনগোপালের উপাসনা করতেন। তিনি দেহরক্ষা করার পর মদনগোপালের বিগ্রহ ভক্তরা গ্রামে স্থাপন করেন। গ্রামের নীচদিয়েই যমুনানদী প্রবাহিত, তারই তীরে খানিকটা খোলা জায়গা। ঘাটথেকে বাঁধান সিঁড়ি ওপর পর্যন্ত উঠেছে তার পরই মন্দির। ঘাটের ধারে প্রাচীন বটগাছ। এখন যমুনা নদী মজে গিয়েছে, ঘাট ভেঙ্গে পড়েছে। ঘাটের পাতলা ইট দেখলে মনে হয় প্রায় দুশো-বছরেরও প্রাচীন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ঘাট-মন্দির করে দেন। মদনগোপাল একাই ছিলেন প্রথমে, পরে রাধার বিরহে তিনি এতই কাতর হন যে স্বপ্নাদেশে সামনে যমুনা নদীর ধারে রাধিকার এক মূর্তি পাওয়া গেলে সেটী মন্দিরে মদন-গোপালের পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীরাধিকার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই বিরহের কাহিনীকে অবলম্বন করেই এর নাম হয় বিরহী। যেসব বোনদের ভাই নেই তারা মদন-মোহনের কপালে ফোঁটা দেয়। অবশ্য সব মহিলা বা বোনদের ফোঁটা দেবার অধিকার নেই হিন্দুর মন্দিরে প্রথাগত বিধিনিষেধ অনুযায়ী। অব্রাহ্মণ মহিলারা, বোনেরা তেল, হলুদ ও সিঁদুর মেশানো ফোঁটা দেন ঠাকুর মন্দিরের প্রবেশ পথে দুপাশের

দেওয়ালে। কৃষ্ণকে এমন আপনজন হিসাবে ভাই করে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের আর কোথাও ভাইফোটার মেলা হয় কি না সন্দেহ। এই প্রাচীন মেলাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে।

নদীয়ার কয়েকটি গ্রামে খেদাই ঠাকুরের পূজা ও মেলা হয়। এর মধ্যে চাকদহ থানার মথুরাগাছি গ্রামে খেদাই ঠাকুরের পূজা উল্লেখযোগ্য। গ্রামের একটি প্রাচীন নিম-গাছের নীচে মাটী দিয়ে বাঁধান নির্দিষ্ট স্থানে খেদাই ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে সাধারণ ভাবে পূজা হয়ে থাকে। বৎসরান্তে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ধূম-ধাম করে পূজা ও উৎসবাদি হয়। ঐ সময় ছাগ, মেষ, পশুপক্ষী বলি হয় ও সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পূজা চলে। খেদাই ঠাকুর আসলে সর্পদেবতা বা মনসা। সর্পভীতির জন্যই মূলতঃ এই পূজা করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম নেউলিয়া বিষ্ণুপুর, নিবাসী আদি-সেবাইতের বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে খেদাই ঠাকুরের পূজা করে আসছেন। খেদাই ঠাকুর সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পূজার পদ্ধতি দেখে মনে হয় খেদাই ঠাকুর সর্পদেবতা বা মনসা ছাড়া আর কেহ নয়। অহিন্দুরাও এখানে পূজা দিয়ে থাকেন।

মথুরাগাছি ছাড়াও নদীয়ার চাকুডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, সাতবাই, মহিষপুর প্রভৃতি গ্রামে খেদাইতলার স্থানে খেদাই ঠাকুর আছেন। খেদাই ঠাকুরের মেলাটি প্রায় দুশ বছরের প্রাচীন। এইভাবে নদীয়ায় অনেক গ্রামে ব্রহ্মাণী, মনসা, খেদাইঠাকুরের নামে গাছপূজা হয়ে আসছে। স্নানযাত্রা উপলক্ষে নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামে উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। যেমন গোটপাড়ার গোপী-নাথ দেবের স্নানযাত্রা, যশড়ার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত গোটপাড়া গ্রামে বহু প্রাচীনকাল থেকে শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়ে আসছে; এই উপলক্ষে মেলা বসে। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্তি গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা ধূমধামে হয়ে থাকে। এই বিগ্রহ বর্তমানে কৃষ্ণনগর রাজার। নদীয়ার রাজার বিগ্রহ হলেও কিছুদিনের জন্য অগ্রদ্বীপে এই বিগ্রহ থাকেন এবং বারুণী উপলক্ষে সেখানে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধাদি করে পরে কৃষ্ণনগরে আসেন; সে সময়ে অগ্রদ্বীপে মেলা হয়। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার আগে কৃষ্ণনগর থেকে নৌকাযোগে গোপীনাথ দেব শ্রীরাধাসহ গোটপাড়ায় যান এবং কয়েকদিন এখানে থেকে পূজাদির পর ও স্নানযাত্রার পর কৃষ্ণনগর ফিরে আসেন। গোপীনাথদেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কাহিনীটী এইরূপ, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভক্তগণসহ পরিক্রমায় যখন বের হন তখন একদিন তাঁর অন্যতম ভক্ত গোবিন্দ ঘোষ আগের দিনের সঞ্চিত হরিতকী মহাপ্রভুকে দিলে তিনি রুষ্ট হয়ে বলেন যে এখনও তোমার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি যায় নি, তুমি এখানেই থাক। গোবিন্দ ঘোষের অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শ্রীচৈতন্যদেব আদেশ দেন যে গঙ্গাতীরে থেকে ভগবৎ সাধনা কর। গঙ্গা দিয়ে কোন আশ্চর্য জিনিষ ভেসে যেতে দেখলে তুলে রেখ। তাহলে পরে আমার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর কেটে যায় দিন। দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর গোবিন্দ ঘোষ দেখতে পান যে গঙ্গা দিয়ে একটি পাথর ভেসে যাচ্ছে। জলে শীলা ভাসছে এর চেয়ে আর আশ্চর্য কি হতে পারে? পাথরটি তুলে রেখে তিনি চৈতন্যদেবের দর্শন আশায় থাকলেন। কিছু দিন পর নানা তীর্থ পর্যটনের শেষে শ্রীচৈতন্যদেব অগ্রদ্বীপে এলে দাঁইহাটের জনৈক ভাস্কর দিয়ে ঐ পাথরখণ্ডের দ্বারা দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নির্মাণ করে মহা-সমারোহে অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং গোবিন্দ ঘোষের উপর সেবা পূজাদির ভার দেন। সেইমত এই বিগ্রহ অগ্রদ্বীপের শ্রীগোপী-নাথ নামে খ্যাত হয়ে আজও পূজিত হয়ে আসছেন। শ্রীগোপীনাথ বৎসরান্তে গোটপাড়ায় স্নানযাত্রা উপলক্ষে আসেন এবং পূজা ও মেলার পর কৃষ্ণনগরে ফিরে যান।

যশড়া :

নদীয়ার একটী প্রাচীন গ্রাম। এটি শ্রীপাটযশড়া ধাম নামে খ্যাত। এখানে পরম বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে মহাতীর্থস্থান। জগদীশ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ আজও নিত্যসেবিত, পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় যশড়ায় শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা মহাধূমধামে হয়ে থাকে ও মেলা বসে। খুব সম্ভব মন্দিরটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এই মন্দিরনির্মাণ ও শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় ও নির্দেশে জগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার ও পূজা ধ্যানে নিমগ্ন থাকার সময় শ্রীভগবান তাঁকে দর্শন দিলে তিনি বর প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবান তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করে বলেন, 'আমার পূর্ণ কলেবর তোমার মনোনীত স্থানে গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠা কর, কিন্তু মনে রেখ পথিমধ্যে আমাকে নামাতে পারবে না।' তারপর পণ্ডিত প্রবর মহানন্দে জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে দেশাভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে উক্ত যশড়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এসে পণ্ডিত মশায় অন্য এক ব্রাহ্মণের হাতে বোঝাটি দিয়ে মাটিতে নামাতে নিষেধ করে কার্যান্তরে যান। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ উক্ত বোঝাভার সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাতীরে একটি বটবৃক্ষতলে রাখেন ও দেখেন যে এক বিরাট জগন্নাথদেবের মূর্তি হয়ে গেছে। পণ্ডিত মশায় ফিরে এসে দেখেন প্রভু নিজমূর্তি ধারণ করেছেন। অনেক চেষ্টা করেও কেহ তাঁকে সরাতে পারে না তখন অগত্যা পণ্ডিত জগদীশ সেই গাছতলায় একটি চালা করে পূজা ও সেবা করতে লাগলেন। পরে এখানে মন্দির নির্মিত হয়। আজও জগদীশ পণ্ডিতের লাঠিটি মন্দিরে আছে। আছে সেই প্রাচীন বটবৃক্ষটি। শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তির পাশে শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশে শচীমাতা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌরাঙ্গের গৌরগোপাল মূর্তিটী আজও সেবিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছর স্নান-

যাত্রা উপলক্ষে মেলা বহু দিন হতে এই মশড়া গ্রামে হয়ে আসছে।

দোলযাত্রা উপলক্ষে নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে নানা উৎসব ওমেলা হয়ে থাকে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মেলা হচ্ছে ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলা। চাকদহ থানার ঘোষপাড়ায় এই উৎসব ও মেলা দীর্ঘদিন হয়ে আসছে। (District Hand book, Nadia, 1951, P.XVII). নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্তে ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। ১৭৬৯ খ্রীঃ আউলচাঁদ দেহরক্ষা করার পর তাঁর 'বাইশ' জন শিষ্যের মধ্যে ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল গুরু পদ পান। গুরু রামশরণের সহধর্ম্মিণী কর্তাভজাদের কাছে 'সতীমা' নামে খ্যাত। ভক্তদের বিশ্বাস 'সতীমা' পরমা প্রকৃতি যোগমায়া। তাই প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমায় 'সতীমা'র উৎসব ও মেলা ঘোষপাড়ায় হয়ে থাকে। উৎসবের দিন সকালে আরম্ভ হয় 'দেবদোল', তারপর ভক্ত ও দর্শকদের মধ্যে আবির খেলা। এখানে গোলা রং ব্যবহার হয় না। হিন্দুমুসলমান, ছোট বড় সকলে মেতে ওঠেন এই উৎসবে। এখানে কোন মন্দির বা মূর্তি নেই। আছে কেবল রামশরণের আদিভিটা আর একটি ডালিম গাছ। ঐ ডালিম গাছের গোড়াতেই সতীমা নাকি সিদ্ধিলাভ করেন। তাই ঐখানেই সকলে পূজা দেয়, মনের কামনা করে গাছে ঢিল বাঁধে। তারপর মনস্কমনা পূর্ণ হলে ঢিল খুলে পূজা দিয়ে যায় ভক্তরা। ডালিম গাছটিতে অসংখ্য ঢিল বাঁধা দেখা যায়। সতীমায়ের ঘরটিতে তাঁর সমাধি আর একপাশে তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র সাজানো আছে। প্রাচীন এই ভিটার পিছনে একটি 'হিমসাগর' বলে দীঘি আছে, পূর্বে খুব বড় ছিল এখন ছোট হয়ে জল কমে গেলেও ভক্তদের কাছে এর জল গঙ্গাজলের মতই পবিত্র। বিরাট আমবাগানে প্রতি বছর মেলা বসে। দেশদেশান্তর থেকে ভক্তরা আসেন, নির্দিষ্ট নিজ নিজ গাছের তলায় বসেন, অনেকে বংশ-পরম্পরায় আসছেন। ঐ গাছতলাতেই রান্না-বান্না করে খাওয়া দাওয়া করে রাত দিন কাটিয়ে পূজা উৎসবের পর ফিরে যান। শ্রীমৎ আউলচাঁদই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সবাই হলেন 'মনের মানুষ' 'সহজ মানুষ'। তাই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় হিন্দু-গুরুর মুসলমান শিষ্য, আবার মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য। গুরুই হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তাই আউলচাঁদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম সম্প্রদায় গুরুভজা বা কর্তাভজা সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এই উৎসবে কেবল বৈষ্ণবরাই নয়—আউল, বাউল, ফকিররাও আসেন; আসেন ত্রিশূলধারী ভৈরব ভৈরবীরাও। ক'দিন ধরে এইসব ভক্তদল দেহতত্ত্ব, ভজন, কীর্তন, বাউল সঙ্গীত করেন। গানের পদগুলি মনে রাখার মত। মুখে মুখে দীর্ঘ দিন ধরেই এইসব গান চলে আসছে। এখানে কিছু উদ্ধৃত করা হল:

কামিনী কালনাগিণী ফণিনীর বিষম বিষ
যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড শোষে না জেনে কেন হস্ত দিস।

বাবা আউলচাঁদ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের একটি চলতি গান বহুদিন ধরে চলে আসছে:

এ ভবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ,
মুখে বলে সত্য বল॥
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একমন।
জয় কর্তা বলি,
বাহু তুলি করলে প্রেম চল চল।
এযে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়।
এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।

দোলপূর্ণিমা ছাড়াও রথযাত্রার সময়েও এখানে খুব ধুমধাম হয়। তবে দোলপূর্ণিমার মেলাই বড় এবং প্রসিদ্ধ। তাছাড়া কৃষ্ণগঞ্জ থানার দিগম্বরপুর গ্রামে রাধাবল্লভজীউ, কালীগঞ্জ থানার পলাশী গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ, তেহট্টের কৃষ্ণরায় জীউ, করিমপুর থানার সুন্দলপুর গ্রামে বৃন্দাবনবিহারী জিউ, রাণাঘাট থানার হবিবপুর গ্রামে মদনগোপাল, চাকদা থানার মশড়ায় রাধাগোবিন্দ, শান্তিপুরে শ্যামচাঁদ প্রভৃতির দোল উৎসব ফাল্গুন পূর্ণিমায় হয়ে থাকে। এছাড়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বিভিন্ন গোস্বামীদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-গুলির দোল উৎসব প্রতি বছর দোলপূর্ণিমায় হয়ে থাকে। দোল উৎসব ছাড়াও নদীয়ায় রথযাত্রার মেলা—ভালুকা, কৃষ্ণনগর, চাকদহ থানার নেউলিয়া, শান্তিপুরের বড়গোস্বামী ও হাট-খোলার গোস্বামীদের রথযাত্রা উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। নেউলিয়া গ্রামের রথযাত্রার উৎসব ও মেলাটি প্রাচীন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উৎসবের জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জমি দান করেন। সেই দেবোত্তর সম্পত্তি হতে আজও উৎসব ও মেলা হয়ে আসছে।

রথযাত্রা ছাড়াও দশহরা, বারুণী, রামনবমী, অম্বুবাচী পৌষ-সংক্রান্তি,মাঘীপূর্ণিমা ইত্যাদিতে নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। তাছাড়া দুর্গা, বাসন্তী, কালীপূজার সময়েও কয়েকটি স্থানে মেলা বসে। দে-পাড়া গ্রামে নৃসিংহদেবের নিত্যপূজা ছাড়াও বৈশাখ মাসে শুক্লাচতুর্দশীতে এখানে উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। মুড়াগাছা গ্রামে (নাকাশীপাড়া থানায়) প্রতিবৎসর বৈশাখী সংক্রান্তিতে সর্বমঙ্গলাদেবীর বার্ষিক অভিষেক উপলক্ষে উৎসব ও মেলা হয়। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তী, স্থানীয় গুড়গুড়িয়া নদীর নাপিতঘাটের শিলাখণ্ডটি, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্বর্গীয় দেবীদাস মুখোপাধ্যায় প্রথমে বাজারের কাছে মনসাতলায়, পরে ১২৯৭ খ্রীঃ বৈশাখ সংক্রান্তির দিন নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেন ও একটি মৃন্ময়ী চণ্ডীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে আজও নিত্যপূজা ও বৎসরান্তে ঐ উৎসব হয়ে আসছে। উলা বীরনগর গ্রামে উলাইচণ্ডীর মেলা ও উৎসব প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়ে থাকে। গ্রামের পূর্ব-প্রান্তে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে ইঁট দিয়ে বাঁধান বেদীর উপর রক্ষিত সিঁদুর মাখান একটি পাথর-খণ্ডকে চণ্ডীর ধ্যানে

পূজা করা হয়। পাথরগুটিই উলাই-চণ্ডী দেবীর প্রতীক। এই পূজার বিষয়ে প্রবাদ, কবিকঙ্কন চণ্ডীখ্যাত শ্রীমন্ত সদাগর গঙ্গাপথে সিংহল যাত্রার সময়ে প্রবল ঝড় জলে বিপদগ্রস্ত হয়ে এইস্থানে চণ্ডীর পূজা করে সে যাত্রা রক্ষা পান। মতান্তরে শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাওয়ার সময় তাঁর নৌকায় একটি পাথরখণ্ড এসে ঠেকে এবং চণ্ডী কর্তৃক আদিশ্ট হয়ে তিনি তাঁর পূজা করেন। প্রবাদ যাই হোক উৎসবটি প্রাচীন। এ বিষয়ে ঐ গ্রামেরই কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রায় দেড়শত বছরেরও আগে তাঁর 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' গ্রন্থে এই উলাইচণ্ডীর পূজা ও মেলা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। উলাইচণ্ডীর পূজা উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমাতে এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দিনী এবং উত্তর পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা হয়ে থাকে। এইসব পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে সমগ্র গ্রাম এলাকায় (বর্তমানে পৌর এলাকা) বীরনগরে নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও মেলা বসে। পূর্বে উলাই চণ্ডীর বাৎসরিক পূজার দিন ভোরে প্রথমে হাড়ী সম্প্রদায়ের পূজা, পরে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর পূজা তারপর মুস্তৌফি পরিবারের পূজার পর সর্ব-সাধারণের পূজা হত। আজকাল অবশ্য এসব আর মানা হয় না।

যুগল কিশোরের উৎসব :

আড়ংঘাটা গ্রামে (রাণাঘাট থেকে বাণপুর লাইনে) যুগল-কিশোর দেবের উৎসবটি প্রাচীন উৎসব। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা হতে সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস ব্যাপী যুগলকিশোর দেবের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায় গঙ্গারাম দাস নামে জনৈক মোহান্ত বৃন্দাবন হতে শ্রীকৃষ্ণের একটি কিশোর মূর্তি নিয়ে এসে নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে স্থাপত করে পূজা-অর্চ্চনা করছিলেন, পরে বর্গীর হাঙ্গামার সময় উক্ত বিগ্রহসহ আড়ংঘাটায় তাঁর পরিচিত রামপ্রসাদ পাঁড়ের বাড়ীতে আসেন ও উক্ত কিশোর বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা-অর্চ্চনা শুরু করেন। রামপ্রসাদের নিজস্ব বিগ্রহ গোপী-নাথদেব ছিলেন এবং নিত্যপূজিত হতেন। আজও যুগোল কিশোর মন্দিরে উক্ত গোপীনাথদেব আছেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদিশ্ট হয়ে ভূগর্ভ হতে একটি রাধিকা মূর্তি পান এবং আড়ংঘাটায় উক্ত কিশোর মূর্তির পাশে স্থাপন করে পূজাদির জন্য ১২৫ বিঘা জমি দান করেন। সেই হতে যুগলকিশোর নামে খ্যাত মূর্তি আজও নিত্যপূজিত হয়ে আসছেন। যতদুর জানা যায়, ১৭২৮ খ্রীঃ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাদ যে জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোর দর্শন করলে স্ত্রীলোকদের ইহজন্মে বা পরজন্মে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। সেজন্য জ্যৈষ্ঠ মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় এখানে মহিলাদের ভীড় বেশী হয়। মেলাটি প্রাচীন এবং নদীয়ার ইহা একটি বিশেষ উৎসব। এইভাবে নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের নানা দেবদেবীর পূজা, উৎসবকে কেন্দ্র করে সারাবৎসর ব্যাপী একটা না একটা স্থানে মেলা বসে। হিন্দুদের নানা উৎসব, পার্বণ, মেলা ছাড়াও নদীয়াতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কতকগুলি উৎসব, মেলা হয়ে থাকে। যেমন—কৃষ্ণনগর থানার সোনডাঙ্গা, নাকাশীপাড়া থানার আকন্দ-ডাঙ্গা, ধনঞ্জয়পুর, কালীগঞ্জ থানার হাটগাছা প্রভৃতি গ্রামে মহাসমারোহে মহরম উপলক্ষে মেলা বসে। নানান উৎসব হয়, এমন কি অনেক জায়গায় ভেড়া, মোরগ বলিও হয়; সোনডাঙ্গা গ্রামে মাণিকপীর তলায় মেলা বসে। মেলার প্রধান আকর্ষণ লাঠি খেলা। মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বজনীন উৎসব এটি। আকন্দডাঙ্গায় মহরম উপলক্ষে লাঠিখেলা, শোকনামা, জারিগান হয়। আশ-পাশের গ্রাম হতে প্রচুর লোকসমাগম হয়। ধনঞ্জয়পুর গ্রামেও হাটতলায় মহরম উপলক্ষে লাঠিখেলা ও জারিগান হয়। মেলা বসে। হাটগাছা গ্রামের দক্ষিণে এক বিরাট পুকুরপাড়ে মহরম উপলক্ষে মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই মেলায় আসেন ও আনন্দ উপভোগ করেন। লাঠিখেলা তো হয়ই তাছাড়া পাঁচালী গান হয়। উৎসবের শেষ দিনে ফরিদতলা ময়দানে মুসলমানরা সমবেত হয়ে নামাজ পড়েন। এই মহরম উৎসব উপলক্ষে তাজিয়া বার করে গ্রাম পরিক্রমার প্রথা আজও চলে আসছে। মহরম ছাড়াও পীরের স্থান, দরগা তলায় নিয়মিত ভাবে মানত পূজা হয়—হয় উৎসব মেলা।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কাটাপীর :

নাকাশীপাড়া থানার নাঙ্গলা গ্রামে উক্ত সম্প্রদায়ের 'কাটাপীর' সাহেবের নামে একটি আস্তানা আছে। প্রতি বৎসর অম্বুবাচী তিথিতে ঐ সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব মহাধুমধামে হয়ে থাকে। দুদিন ধরে উৎসব চলে, শেষের দিন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই পীরের সিন্নি গ্রহণ করেন ও মনস্কামনা জানিয়ে মানত করেন। একটি পুরাতন গাছের নীচে মাটির ঘোড়া, পুতুল, দুধ, সিন্নি মানত করা হয়। এখানে কেবল মানুষের জন্যই নয়—পশুপক্ষীর ব্যাধি নিরাময়ের জন্যও মানত করা হয়। মাঘী পূর্ণিমাতেও এখানে একটি উৎসব হয়।

জঙ্গলীপীর :

করিমপুর থানার থানাপাড়া গ্রামে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিন জঙ্গলীপীরের উপলক্ষে পীরের দরগার আশেপাশে মেলা বসে। বহুকাল আগে এক মুসলমান ফকির উক্ত গ্রামের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে এক গাছতলায় বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর নাম জানা যায় না। জঙ্গলে বসে সাধনা করতেন বলে 'জঙ্গলীপীর' নাম হয়ে যায়। এখানে প্রধানতঃ বাতের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য পীরের নিকট সিন্নি, খিচুড়ী, মোরগ ও মাটির ঘোড়া মানত করা হয়। বহু দোকানপাট মেলায় আসে। রাণাঘাট থানার মাজদিয়ায় গোরা শহীদ পীরের উৎসব মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে ,কামারগাড়িয়া গ্রামে প্রতি-বছর ১৩ই শ্রাবণ জনৈক পীরের স্মরণে এবং হবিবপুরে মীর মহম্মদ ফকিরের স্মরনোৎসব হয় মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীতে।

মাজদিয়ায় একটি বটগাছের নীচে পীরের স্থান আছে। গোরা শহীদ পীরকে কেহ কেহ ঘোড়াষষ্ঠী বা ষষ্ঠী-সাহেবপীর বলেন।

হবিবপুরে মীর মহম্মদ ফকিরের তিরোভাব উৎসবটিকে 'এ্যালা' উৎসব বলে। প্রবাদ তাঁর নানা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীতে তিনি দেহরক্ষা করেন বলে ঐ দিনে আজও উৎসব হয়ে আসছে। এই সব পীরের স্থানে হিন্দুমুসলমান সকলেই যান, মানত করেন। চাকদা থানার শ্রীনগর গ্রামে গাজী সাহেবের স্থান আছে। প্রতি বৎর মাঘী পূর্ণিমায় এখানে উৎসব মেলা হয়ে থাকে। সেখানে গাজী সাহেবের কবরস্থানের উপর কাঁচাদুধ, মাটির ঘোড়া, সিন্নি দিয়ে মানত শোধ করেন ভক্তরা। প্রধানতঃ ব্যাঘ্রভীতি নিবারণের জন্যই গাজী সাহেবের কাছে মানত করা হয়। তাছাড়া কুমারপুর গ্রামে সত্যপীর ও মাণিকপীরের স্থান আছে। প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন সত্যপীরের এবং প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে মাণিক পীরের উৎসব হয়ে থাকে। দুরারোগ্য অসুখ বিসুখ হতে আরোগ্য লাভের জন্য সত্যপীরের কাছে মানত করে পরদিন অর্থাৎ ১৪ই ফাল্গুন মানতের পশুপক্ষীগুলি রান্না করে সর্বজনীন ভোজ দেওয়া হয়।

মাণিক পীরের স্থানে প্রধানতঃ গোমড়ক ও গো-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বাতাসা ও গরুর দুধ মানত করা হয়। বড় পীরেব উরস উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। মেয়েদের ভীড়ই বেশী হয়। হরিণঘাটা থানার উত্তরে রাজাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখ হতে তিনদিন ফতেমার উৎসব হয়, ফতেমার স্থানে। প্রতিদিন সেই নির্দিষ্ট স্থানে ধূপদীপ দেওয়া হয়। সাধারনতঃ সিন্নি, বাতাসা, দুধ ফল মানত করা হয়। উৎসবের সময় নানাবিধ ছড়া কাটা হয়—যেমন:

ইয়া বরকুল, বরকুল,
জননী ফতেমা জিন্দ।
ওমা তাই তোমারে ডাকিলে।
ইয়া বরকুল, ববকুল।—ইত্যাদি

বৈশাখ মাস ছাড়াও মাঘ মাসে ফতেমার স্থানে দুধ দেওয়া হয়। এই থানারই কাষ্ঠডাঙ্গা গ্রামে মাণিক পীরের স্থান আছে। প্রতিবৎসর ১লা মাঘ মাণিক পীর সাহেবের দরগায় উৎসব হয়। দুধ, বাতাসা, পয়সা মানত করা হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভক্তিভরে এখানে পূজা দেন ও মানত করেন। হিন্দুরা নাম কীর্তন, মুসলমানরা মাণিকপীরের গান করেন। শান্তিপুর থানার মালঞ্চ পল্লীতে গাজী মিঞার বিবাহ নামে একটি উৎসব হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে উৎসবের দিন রঙ্গীন কাপড়ে মোড়া চারটি বাঁশ পুঁতে মুসলমানরা নানারূপ বাজনা বাজিয়ে সারারাত উৎসব করেন। পরের দিন দুপুরে গ্রামের একজন বৃদ্ধা মুসলমান রমণী জহরা বিবি সেজে পাল্কী করে ঐখানে আসেন, বাঁশগুলি প্রদক্ষিণ করে চলে গেলে উৎসব শেষ হয়। কৃষ্ণনগরে কয়েকটি প্রাচীন মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য, চাঁদসড়ক, কুবরীপোতা, বড় মসজিদ (হাইস্ট্রীট), লিচুতলা, রথতলা প্রভৃতি। এছাড়াও শান্তিপুরে প্রাচীন ও বিখ্যাত মসজিদ তোপখানা পাড়ায় ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক ১৭০২ বা ১৭০৫ ইং নির্মিত। এছাড়াও কয়েকটি মসজিদ আছে। মুসলমানদের মেলা উৎসব ছাড়াও নদীয়ায় খৃষ্টানদের কিছু উৎসব ও মেলা আছে। তারমধ্যে চাপড়া মেলা এবং কৃষ্ণনগরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ প্রাঙ্গণে বড়দিনের উৎসব দুটিই প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগর রোমান ক্যাথলিক চার্চে লক্ষাধিক লোক সমাগম হয়। এই চার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম চার্চ্চ। নদীয়ামণ্ডলীর মিঃ ডিয়ার কালনা হতে কৃষ্ণনগরে প্রথম আসেন ১৮৩২ খ্রীঃ এবং একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর তালিকা হতে জানা যায় ১৮৩২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে কৃষ্ণনগরে—'বয়ঃপ্রাপ্ত ৫ জন পুরুষ ব্যাপটাইজড হইল।' তারপর নদীয়ামণ্ডলীর চেষ্টায় কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হতে লাগল অনেকেই। তারপর ধীরে ধীরে চার্চ্চ (প্রটেষ্টান্টদের) তৈরী হতে লাগল, হতে লাগল খ্রীষ্টীয় নানাবিধ উৎসব। বড়দিন উপলক্ষে চাপড়াতে বিরাট খ্রীষ্টীয় প্রদর্শনী ও মেলা হয়ে থাকে। বিগত ১৯৬৪ সালে ৫০তম উৎসব উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী হয়ে গেছে। এই উৎসব ও মেলাটি পরিচালনা করেন 'নদীয়ামণ্ডলী'। এই মেলাতে গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রদর্শনী, কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী, ফুল, ফল, শষ্যাদি, শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী ছাড়াও, নানারকমের খেলাধূলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। নানারূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। বাইবেল প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতাও এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। বহু ধরণের দোকান পাট বসে। ১৮৯৩ সালে আচার্য্য চার্লটন সাহেব বড়দিনের সময় চাপড়ায় এই মেলা অরম্ভ করেন। সেই সময় হতে এই উৎসব ও মেলা চলে আসছে। মাঝে কয়েক বছর বন্ধ থাকলেও এই মেলা প্রাচীনত্ব দাবী রেখে আজও চলছে এবং ক্রমশঃ জাঁকজমক বেড়েই চলেছে। ২৫শে ডিসেম্বর হতে ৩১শে ডিসেম্বর এই মেলা চলে। এই মেলা ও উৎসবটি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হলেও সকল সম্প্রদায়ই যোগদান করেন ও আনন্দ উপভোগ করেন।

কৃষ্ণনগরে রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ প্রাঙ্গণে বড়দিনের সময় প্রচুর লোক সমাগম হয়। চার্চের ভিতরে বাইরে তিল ধারণের স্থান থাকে না। এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে, ছোটখাট দোকান-পাটও বসে।

নদীয়া জেলাব বিভিন্ন ব্লক হতে বি, ডি, ওরা (উন্নয়নাধিকারিক) মেলা সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাঠিয়েছেন তার মধ্যে পূর্বে যেগুলি আলোচিত হয়নি এখানে সেগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে। তেহট্ট থানার নাটনার মোড়ে (গরীবপুরে) ছিন্নমস্তার মেলা—প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ষষ্ঠী তিথিতে গরীবপুরে দেবী ছিন্নমস্তার পূজা আরম্ভ হয়। তার ৭ দিন পর এই উৎসব ও মেলা সুরু হয়, প্রায় ২৫ দিন থাকে।

নাকাশীপাড়া থানার অধীন ৮টি ছোট বড় মেলা হয়। ধর্মদা অঞ্চলে ভেবোডাঙ্গা গ্রামে দশহরার দিন গঙ্গাপূজার মেলা, করকরিয়া গ্রামে ১লা মাঘ উত্তরায়ণের মেলা হয়, পৌষ সংক্রান্তির দিন লোকজমতে সুরু করে। কাঁদোয়া ও তেঁতুলবেড়ের

সংযোগস্থলে চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের মেলা হয়। দোগাছি অঞ্চলে সাহেবতলায় অম্বুবাচীর দিন ও মাঘী পূর্ণিমার দিন মেলা হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লোকজন ও ভক্তের দল জমায়েত হয়। বহুকাল পূর্বে এক ফকীর সাহেব এখানে আসেন ও উৎসব সুরু করেন। তিনি কেবল মানুষকেই নয় পশু-পক্ষীদেরও রোগ নিরাময় করতেন। এখানে গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতির রোগ নিরাময়ের জন্যই বেশীরভাগ মানত করা হয়। সেরে গেলে লাল ও কালো রংএর মাটির ঘোড়া দিয়ে পূজা দিতে হয়। অনেকে গরুর প্রথম দুধ এই সাহেবতলায় পীরের স্থানে দিয়ে যান। এখানকার মাটী অনেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে রাখেন। হাঁসখালি থানায় দুটি নামকরা মেলা হয়। হাঁসখালিতে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন গাজনের মেলা বসে ও ময়রহাটে পীরের মেলা বিখ্যাত। এই মেলা দুটি প্রাচীন।

কোতয়ালী থানার সাধনপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল একটী প্রাচীন উৎসব। প্রায় ৮।৯ দিন মেলাটী থাকে। এই মেলাকে একটী মৃৎশিল্পের প্রদর্শনীও বলা যেতে পারে। যাত্রা-গান, তর্জা, সার্কাস, পুতুলনাচ ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেলাটি কদিন মুখরিত হয়ে ওঠে ও প্রচুর লোকসমাগম হয়।

হরিণঘাটা থানায় ৭টি মেলা হয় যেমন হরিণঘাটায় রথের মেলা, নগরউখড়া বাজারে মেলা (কালীপূজা), নিমতলা নবগ্রহ-মেলা, মহাদেবপুর রথের মেলা, হরিপুকুরিয়া দোলের মেলা, কুরুমবলিয়ায় খোদার মেলা এবং বিরহীতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া মেলা।

নবদ্বীপ—বিখ্যাত রাসমেলা ছাড়াও দশহরা, গঙ্গাপূজার সময় নবদ্বীপে প্রচুর লোক সমাগম হয় ও মেলাও বসে।

করিমপুর—বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটবড়তে বিভিন্ন সময়ে মোট ১০টী মেলা হয়। নতিডাঙ্গা অঞ্চলে পীরতলার মেলাটী প্রাচীন, ধোরাদহ অঞ্চলে রামনবমীর মেলাটীও প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। প্রায় সপ্তাহখানেক চলে এবং প্রচুর লোক সমাগম হয়। (শ্রীরামচন্দ্রের রাজবেশ ধারণের দিন এবং বনবাসের প্রাক্কালে প্রচুর ভক্ত দর্শনার্থীর ভীড় হয়)। মরুটীয়া অঞ্চলে তিনটি মেলা হয়—মুরুটীয়া গ্রামে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার মেলা প্রায় ২ শত বছরের প্রাচীন। বাংলাদেশের মেহেরপুর গ্রামের সন্নিকট কোলাগ্রামের জমিদার স্বর্গগত ভূপতিভূষণ চৌধুরীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল এই মুরুটীয়া গ্রাম। উক্ত বিগ্রহ তাঁরই দ্বারা স্থাপিত। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে। এই থানারই প্রাচীন গ্রাম ও প্রাচীন বন্দর হোগলবেড়িয়ার নস্করীতলার মেলাটী প্রাচীন। দুর্গাবোধনের দিন নিমগাছতলায় বোধন ও তিনদিন ব্যাপী মহাধুমধামে মা নস্করীর পূজা ও মেলা হয়ে থাকে। বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে প্রতিবৎসর অমাবস্যায় কালীপূজার পরের মঙ্গলবারে গাছতলায় কালীপূজা হয় ও মেলা বসে। স্থানীয় জমিদার স্বর্গগত নগেন্দ্র নাথ রায় এই মেলাটী প্রায় ২৫।৩০ বছর পূর্বে সুরু করেন কিন্তু পূজাটী প্রাচীন।

প্রতি শনি মঙ্গল বার কালীতলায় দুধ চিনি দেয় ভক্তরা। এই গ্রামেই রাস পূর্ণিমার দিনও একটী মেলা বসে। মেলাটী বেশী দিনের নয়। চেঁচানিয়ায় রথের মেলা ও চামনায় বাসন্তী পূজার মেলা হয়। জামসেদপুর অঞ্চলে একটী দোলের মেলা হয়। দীঘলকান্দী অঞ্চলে গুয়াবাড়ী ও তারকগঞ্জে রাসের মেলা প্রতি বৎসরই হয়। কালীগঞ্জ ব্লকের ছোট বড় মোট মেলার সংখ্যা ১৬টি। জুড়ানপুরে মাঘী পূর্ণিমায় দিন পূজা ও মেলা হয়। এখানকার কালীবিগ্রহ জাগ্রতা। মাটীয়ারিতে রাম নবমীর মেলা প্রায় সপ্তাহখানেক চলে, রামসীতা বিগ্রহ নিত্য সেবিত হন। ফরিদপুরে চৈত্রসংক্রান্তির দিন বুড়োশিবের মেলা বসে।

ব্রহ্মাণীতলায় ব্রহ্মাণী পূজা ও মেলা হয়। রাজারামপুর চাকুন্দিতে গঙ্গাসাগরের মেলা পৌষসংক্রান্তির দিন। ঘোড়াইক্ষেত্রে মহরম উপলক্ষে মেলা হয় (ফরিদতলায়), পলাশীতে কারবালার মহরম এবং গঙ্গার ঘাটে পৌষসংক্রান্তির মেলা ও দশহারা মেলা বসে। বড় চাঁদঘরে কুলুইতলায় বৈশাখের শেষ মঙ্গলবারে একটী মেলা বসে। হাটগাছায় মহরমের মেলা। কালীগঞ্জের হরিনাথপুরে (বুড়োমা) কালীপূজায় বহু লোক সমাগম হয় ও অজস্র বলি হয়। বড়কুলগাছিতে মাঘী পূর্ণিমার মেলা, মীরা-গোবিন্দ-পুরে পীরের মেলা, দেবগ্রাম কুলুইচণ্ডীতলায় কুলুইচণ্ডীর মেলা এবং পাগলাচণ্ডীতে পাগলাচণ্ডীর মেলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাপড়া ব্লকে ৯টি মেলা হয়। তারমধ্যে খ্রীস্টীয় মেলার কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। গাঁটরায় "নিত্যানন্দ প্রভুর মেলা। ভাতজাংলাতে অম্বুবাচীর মেলা, মহেশপুরে রাস-মেলা, লক্ষ্মীপুরে অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার ধোবার পীরের মেলা, বাহিরগাছিতে অম্বুবাচীর মেলা, ইটেবেরিয়া পবীক্ষিততলার মেলা, বড় আন্দুলিয়ায় গদাধরের মেলা, পিপ্‌ড়া-গাছিতে রথযাত্রার মেলা হয়। গদাধরের মেলাটী খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এই মেলাটী সুরু করেন নদীয়ার বিখ্যাত কবি বিজয়-লাল চট্টোপাধ্যায়।

শান্তিপুর সহরে রাস মেলা বিখ্যাত, এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও ঐ ব্লকে ৪টী বিখ্যাত মেলা হয়। ফুলিয়া দশমীর মেলা, বাগদেবীর মেলা, বাগআঁচড়ার উত্তরায়-ণের মেলা, বাবলায় অদ্বৈত পাটের মেলায় বহু ভক্তেরা সমাবেশ হয়। বাবলার মেলাটী প্রাচীন। ১২৮৩ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বহুপূর্ব হতেই মেলাটী হয়ে আসছে। চাকদার পৌর এলাকায় ৬টী মেলা হয়। তারমধ্যে যশড়ার জগন্নাথ দেবের মেলার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। গণেশ-জননী মেলা (পুরাতন বাজার), চাকদা বাজারে রাসযাত্রার মেলা, লালপুর পুরাতন বাজারে রথযাত্রার মেলা, গোড়পাড়ায় শিবরাত্রি মেলা খোসবাস মহল্লায় চৈত্র সংক্রান্তির মেলা হয়।

গণেশ জমনী মেলাটী প্রাচীন।

কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে ৩টী মেলা উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন মেলা—শিবনিবাসের মেলা, দুটি শিবমন্দির আর রামসীতার মন্দির প্রাঙ্গনে হৈমী একাদশীতে এই মেলা বসে। নিত্য পূজা হয়। মাটীয়ারিতে বুড়োসাহেব নামে এক পীর

প্রায় ১০০ বছর আগে একটি মেলা প্রবর্তন করেন। সেই হতে আজও প্রতি বছর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উপলক্ষে বুড়োসাহেবের মেলা হয়ে আসছে। ভাজনঘাটে দোলউৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণনগর ২নং ব্লকের অধীন বেলপুকুর একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু পণ্ডিতপ্রধান প্রাচীন গ্রাম। বেলপুকুর নাট্য মন্দির প্রাঙ্গণে আনন্দ মেলার প্রবর্তন হয় ১৩৫২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে (১৯৪৫ খ্রীঃ)। সেই হতে আজও মেলাটী হয়ে আসছে।

তেহট্ট ২নং ব্লকে—মোট মেলা হয় ১০টী। পলাশীপাড়ায় কার্তিকের লড়াই নামে ১লা অগ্রহায়ণ কার্তিক পূজার বিসর্জনের দিন একটী উৎসব এবং মেলা হয়। বাড়ী ও বারোয়ারী নিয়ে ৬০।৬৫ খানি কার্তিক পূজা হয়। মেলাটী প্রাচীন। বিজয়নগর, গোপীনাথপুর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে কুলুইচণ্ডীর মেলা হয়ে আসছে। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে খুব ধূমধাম করে পূজা ও মেলা হয়, কৃষ্ণনগর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী তলায় বৈশাখের তৃতীয় মঙ্গলবারে পূজা ও মেলা হয়। বিজয়নগর, পলশুণ্ডা, হাঁসপুকুরিয়া গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে এলার মেলা হয়। দর্শনার্থীদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয় এই মেলায়। পূর্বাপেক্ষা অনেক কম ব্যবস্থা হলেও রেওয়াজ আজও চলে আসছে। বারুইপাড়ায় মহিষমর্দিনীর পূজা ও মেলা খুব ধূমধাম করে হত। বর্তমানে সে জাঁকজমক আর নেই। বাণিয়ায় বামাক্ষ্যাপার মেলা মাঘ মাসে হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। বাংলার পূজা-পার্বণ—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত।
২। বারমাসে তের পার্বণ—নির্মলানন্দস্বামী।
৩। বাংলার পাল-পার্বণ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।
৪। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত—কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত।
৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
৬। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (২য় খণ্ড)—সম্পাদক অশোক মিত্র।
৭। আমাদের গ্রাম—সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়।
৮। নবদ্বীপ মহিমা—কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী।

লোকগীতি

'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥'
—ভারতচন্দ্র রায়

একদা নদীয়ায় লোকগীতি খেউড়গান সুপ্রচলিত ছিল। নদীয়ায় অসংখ্য বৈষ্ণব আখড়ায় সৃষ্টি হয়েছিল আখড়াই গানের। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখেছেন (১৬ই আগস্ট ১৮৫৪): 'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি কবেন। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে,----এই মহাশয়দের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই আখড়াই নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।' এই লোকগীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। যাঁদের সুর ও গাওয়া সকলের ভাল লাগত, তাঁরাই জয়ী হতেন। গায়কেরা দুটি দলে ভাগ হয়ে খেউড় ও প্রভাতী নামে দুটি করে দীর্ঘ গান গাইতেন। অনেক সময় তিন দলেও বিভক্ত হতেন। আখড়াই গানের ছন্দপ্রকরণ পয়ার। গানের মহড়া, চিতেন ও পাড়ংগ (অন্তরা)-এর বাক্যে ১৪ অক্ষর থাকত। শুধু সাহিত্যমূল্য নয়, আখড়াই গানের সংগীতমূল্য উল্লেখ্য। নদীয়ায় সুপ্রচলিত একটি বিখ্যাত আখড়াই গান: 'না হোতে সুখের শেষ প্রভাত হইল।' শ্রীচৈতন্যগত প্রাণ হরিদাস ঠাকুরের ফুলিয়ার পাটে হাফ-আখড়াই গান হত। কালক্রমে আখড়াই-গানই কবিগানে রূপ নেয়। সুকুমার সেন লিখেছেন: 'কবি-গানের আদি রসাত্মক পূর্বরূপই হল আখড়াই গান'। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড)।

কবিয়াল ভোলা ময়রার দল নদীয়ায় নিয়মিত আসতেন। ভোলা ময়রার গানে আছে: 'কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল',--- 'নদীয়ার নবীন সাগর' ----ইত্যাদি।

বিখ্যাত কবিওয়ালা সাতু রায় (সাতকড়ি রায়) ছিলেন নদীয়ার মানুষ। সাতু রায়ের লেখা গান ভোলা ময়রা গাইতেন। সাতু রায়ের বাড়ি ছিল শান্তিপুরের অদূরে বৈঁচি গ্রামে। সাতু রায়ের একটি মাথুর পর্যায়ের সখীসংবাদ:

'এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই?
যদি ত্যজি গো কুল তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল তবে কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।'

এছাড়া, নদীয়ার অন্যান্য কবিয়ালদের মধ্যে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, কালি মির্জা (নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ বানেশ্বর শর্মার শিষ্য) ও মধুসূদন কিন্নর (মধু কান) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক সময় নদীয়ায় কতকগুলি শাক্তসংগীতও লোকমুখে বহুল প্রচারিত ছিল। নদীয়ারাজ পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি শাক্তসংগীত রচনা করেছেন।

লোকগীতি প্রচারে নদীয়ারাজের অবদান অনস্বীকার্য। তখন নদীয়া রাজবাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠানে লোকগীতির আসর বসত।

বটতলা থেকে প্রকাশিত 'সংগীত রত্নাকর' পুস্তকে আছে: 'কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার কালে কত জারি গীতির প্রচলন ছিল। সেই আমোদেতে পূজার দিনে রামযাত্রা, চণ্ডীগীতি, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, পুতুল নাচ---হইয়া রাজবাড়ীর মান রাখিত।'

বৈষ্ণবতীর্থ নদীয়া আউলবাউলের দেশ। ঘোষপাড়ায় রংদোলের রাতে সতীমাব থানে কর্তাভজাদের মেলায় বাউলেরা সমবেত হন। এখানে একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে উদার উদাত্ত গলায় গান গেয়ে থাকেন আলখেল্লা পরে বাউলেরা। এখানে সংগৃহীত একটি আধ্যাত্মিকতত্ত্ব-সমন্বিত গানের পংক্তি:

'এসো গুরু গৌরাঙ্গচাঁদ
তুমি আমার অঙ্গের অবতাব।
অঙ্গে অঙ্গে আছে মেয়ে
নৃত্য করো তাদের লয়ে—
এই দেহ সব পঞ্চভূতি
তারা সবে মেয়ে জাতি—
মজিয়ে আছে সেই পিবিতি
ওরে সুজন-রসিক,
ভবপারের কর্ণধার॥'

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকগীতি:

'—এ ভবের মানুষ
কোথা হইতে এলো।
এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ,
মুখে বলে সত্য বল।
এই সঙ্গে বাইশ জন, সবার একমন
জয় কর্তা বলি
বাহু তুলি করলে প্রেমে ঢল ঢল।
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়
এর হুকুমে গঙ্গা শুকাল॥'

বাউল লালন ফকিরের দেশ নদীয়া। বিচিত্র তাঁর জীবন-কাহিনী। অবিভক্ত নদীয়ার ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম।

তাঁর মৃত্যুস্থান ও সাধনপীঠ হল কুষ্টিয়া শহরের অদূরে ছেঁউ-ড়িয়া গ্রামে। একটি লালনগীতির অংশ:

'আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর,
এক পড়শী বসত করে
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম যাতনা সকল যেত দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।'

লালনের আর একটি বিখ্যাত গান: 'আমার আপন খবর আপনার হয় না।' লালন কোনরকম ভেদাভেদ মানতেন না। তাঁব গানেও এই কথা বারবার অনুবর্ণিত হয়েছে। তাঁর শিষ্যেরা আজ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুবে লালনগীতি গেয়ে থাকেন।

সিবাজ সাঁই, পাঁচু ফকিব, গোঁসাই গোপাল, আউলচাঁদ, ফিকিরচাঁদ ও দীনবাউলের নাম নদীয়ার বাউলদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কাঙাল হবিনাথও বাউল গান লিখে প্রসিদ্ধ হন।

রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের গান সংগ্রহ করেন। শিলাই-দহের গগন ডাকহরকরা বাউল ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁরও গান সংগ্রহ করেন।

কুবিব সবকাব নদীয়ার একজন বিখ্যাত লোকগীতিকার। তাঁর ভক্তপ্রাণ থেকে উৎসারিত সঙ্গীত কণিকা:

'যার যেমন মন, ধন উপার্জন কবে হাটে,
কেউবা কেনে জহর মোহর, কেউবা শুধু বেগার খাটে।'

কুবিরের গুরু সাধক শ্রীচরণ পালের নিবাস ছিল নদীয়ার বৃত্তিহুদা গ্রামে। এই গ্রামকে কুবিব বৃন্দাবনের সঙ্গে তুলনা করে গেয়েছেন:

'ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদা গ্রাম
যেথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম।'

হাতেম আলি মোল্লাহ্ কুবির সরকারের গান সংগ্রহ কবে প্রকাশ করেছেন।

ভাজনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামীর লেখা গান কৃষ্ণযাত্রায় গীত হত। এছাড়া, নদীয়ায় কালীয়দমন, চণ্ডীযাত্রা ও রাম-যাত্রা হত। ঝকমারি, গুখুরি, সবলোট ও নবলোটদল নদীয়ায় লোকযাত্রা ও অনুষ্ঠান করে বেড়াতেন বলে জানা যায়।

১৭৫৭-এর ২৩ জুন বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়। গ্রাম্যকবিরা পলাশী যুদ্ধের করুণ কাহিনী লোকগানে রূপ দিয়েছেন। অধিকাংশ গানের সুরু হল: 'ওরে আয়, পলাশীর প্রান্তরে যাই - - - -'।

পাঁচালীকার দাশরথি রায় নাকাশীপাড়ায় মামাবাড়িতে মানুষ। তিনি নদীয়ায় পাঁচালী গেয়ে বেড়াতেন। নাকাশী-পাড়ার জমিদারবাড়িতে দাশরথি রায় পুজোর সময় এসে পাঁচালী গাইতেন। একবার পারিশ্রমিকের কিছু টাকা কম পান। তখন তিনি নাকি পাঁচালী গেয়ে উঠেছিলেন:

'গ্রামের নাম নাকাশি,
আগে পেতাম একশো আশি।
এবার পেলাম শুধু আশি
আসছেবার আসি কি না আসি॥'

কৃষ্ণনগরের বেণী মল্লিকও ছিলেন একজন জনপ্রিয় পাঁচালী-গায়ক।

কৃষ্ণনগবে জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের ও শান্তিপুরের ভাঙা রাসের রাতে সং বেব হত। এই সং-এ ময়ূরপঙ্খীর গান গাওয়া হত। কৃষ্ণনগরে জন্মাষ্টমীব মিছিলেও ময়ূরপঙ্খীর গান গাওয়া হত। বন্যাপ্লাবিত নগেন্দ্রনগরের কথা একবার গাওয়া হয়েছিল:

'ঐ নগেন্দ্রনগর রসের সাগর
হাবুডুবু খায়।'

সুদূর মণিপুরের রাসনৃত্যগীতের পিছনে আছে নদীয়ার বৈষ্ণবীয় রসধারাব প্রেরণা।

নাকাশীপাড়ায় ঢেঁকি ও গরুর গাড়ির চাকা নিয়ে পেশী সঞ্চালন করে রায়বেঁশে নৃত্য বিখ্যাত।

ইংরেজ শাসনকালে নদীয়ায় শোষিত নিপীড়িত কৃষকদের সংঘবদ্ধ কবে বিদ্রোহের রূপ দেন কৃষকনেতা বীর তিতুমীর। নীলকর সাহেবদেব বিরুদ্ধেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন নদীয়ার বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ আর মেঘাই সর্দার। সমসাময়িক ইতিহাস-কাররা এঁদের প্রতি অবিচার করে 'সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা' ও 'ডাকাত' ইত্যাদি নামে ভূষিত করলেও, এই সব কৃষকদরদীদের শৌর্যবীর্যের কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন গ্রাম্যকবিরা পল্লীগীতির মাধ্যমে।

নদীয়ায় দীর্ঘদিন ধরে অনেক ছড়া ও প্রবাদ সুপ্রচলিত। যেমন:

'বৃষ্টি পড়ে টাপুব টুপুর নদেয় এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।'

বা

কাঙাল বাঙাল খদ্যে
তিন নিয়ে নদ্যে

বা

বাঁশ বাকস ডোবা
তিন নদের শোভা

ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর 'বাংলাপ্রবাদ' আকরগ্রন্থে নদীয়া প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি ছড়া আছে। নমুনা :

৮৪৭ : উলোর মেয়ে কুলুজি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।

পাঠান্তর

উলোর মেয়ের কুলোবাজান, শান্তিপুরের খোঁপা,
নদের মেয়ের হাতনাড়া, কালীঘাটের চোপা।

পাঠান্তর

উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, বামনপাড়ার খোঁপা।

৭৫৪৪ : 'রাঘব রায়ের কাল'

'কৃষ্ণনগরের রাজা রাঘব রায় বহুকাল পূর্বে রাজত্ব পান, এজন্য সংকেতে বলে রাঘব রায়ের কাল পড়ে আছে অর্থাৎ বহুকাল আছে'—রেভা : জেমস লঙের ব্যাখ্যা।

৮৪৩২ : সেই মাটিতে মৃদঙ্গ।

বোলান নদীয়ার উল্লেখ্য লোকগীতি। কৃষিপ্রধান নদীয়ার অন্যতম প্রধান উৎসব গাজন বা চড়ক। চৈত্রমাসে চড়কের সময় গাজনে সন্ন্যাসীদের গাওয়া গান হল বোলান। গাজনে সন্ন্যাসীদের প্রধানকে বলা হয় বালা। বালার গান—বোলান। আবার বোলান অর্থে বোঝায় জবাব। গানের মধ্য দিয়েই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে। বোলান গান সংগ্রাহক ও ব্যাখ্যাকার শ্রীহারাধন দত্ত দেখিয়েছেন যে বোলান নদীয়াতেই সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষ্ণগঞ্জ থানার শিবনিবাস, কৃষ্ণপুর, হাঁসখালী থানার হাঁসখালী, গাজনা ও তেহট্ট-চাপড়া-কোতোয়ালী থানার গ্রামে চৈত্রমাসে বোলান গান শুনতে পাওয়া যায়। হাঁসখালীতে আছে হাজরাতলা। শিবের লোকায়ত একটি নাম হাজরা। গাজনা গ্রামের নাম হয়েছে গাজন থেকেই। নদীয়ার এইসব অঞ্চলের গাজন অনুষ্ঠানের উল্লেখ্য অংশ হল গাজনে সন্ন্যাসীদের আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদন। বাণফোঁড়া, ঝাঁপান, ভর, পাট-ভাঙা, মশান, শবনৃত্য, কাঁটাঝাঁপ ও জিবফোঁড়া প্রভৃতি নিষ্ঠুর কাজ সন্ন্যাসীরা গাজনের সময় করেন। বাংলার লাটসাহেব হ্যালিডে নদীয়ার গাজনে সন্ন্যাসীদের এইসব কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে আইনের আশ্রয় নিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। গাজন অনুষ্ঠানের সময় বোলান লোক মুখে মুখে রচিত হয়। এই আনুষ্ঠানিক লোকগীতি ভাবমূলক নয়, আখ্যানমূলক। ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর পরে সন্ন্যাসীরা বোলান গান গেয়ে থাকে।

বোলান গানে শুধু শিবের কথাই নেই, আছে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কথা, কৃষ্ণলীলা—শচী—নিমাই-এর কথা এবং সমাজের কথা। বোলান গানেও বৈষ্ণবরস ও হরিভক্তি প্রবেশ করেছে। বোলান গানের ভণিতায় প্রহলাদ, হেমন্ত, দ্বিজ, নগেন্দ্র, হরিদাস, কেশবদাস ও অর্জুনদাস প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বোলান গানের অংশবিশেষের নমুনা :

এক

'এসো গো সরস্বতী বসগো মা রথে,
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে।
যে বুলান বলিবা মাগো তাই বলিব আমি,
দশের মাঝে ভাঙলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি।'

দুই

'রামলীলা মধুর কথা মধুর ভারতী।
সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥'

তিন

'খরা দিনে মরা গাঙ
শিব খায় গাঁজা ভাঙ
শিবের জল গাঙে পড়ুক
গাঙে গাঙে বান ডাকুক।'

চার

'পার্বতী বলে, ঠাকুর বলি যে তোমারে,
নগরে এসেছে শঙ্খ কিনে দাও আমারে।'

প্রাকৃতিক দুর্বিপাক

প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মধ্যে বন্যাই নদীয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা। জেলার প্রধান নদীগুলির বিশেষতঃ ভাগীরথী ও জলঙ্গীর বুক পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাওয়ায় এই নদীগুলি আর অতিবর্ষণজনিত বাড়তি জল বহন করতে পারে না, ফলে নদীকূল প্লাবিত হয়ে বন্যা দেখা দেয়। ভাগীরথীর পাড় দিয়ে যে সব পুরানো মাটির বাঁধ আছে, বন্যার স্রোতে অনেক সময় সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েও বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। পূর্বে বিলগুলির সঙ্গে নদীর যোগাযোগ ভাল ছিল, ফলে জলনিকাশের খুব অসুবিধা হত না, কিন্তু এখন বিলের জমিতে বহু জায়গায় চাষ ও বসবাস সুরু হওয়ায় জল নিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বিলগুলিও ভরাট হয়ে যাওয়ায় বেশী জল ধরে রাখতে পারে না—কাজেই বেশী বৃষ্টি হলে আশে-পাশের অঞ্চল সহজেই প্লাবিত হয়।

১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ১৯৩৮ সালের বন্যা। এই বন্যায় অবিভক্ত নদীয়া জেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এই বন্যার প্রত্যক্ষদর্শীরা এখনও বলেন যে, ১৯৭১ সালের আগে এতবড় বন্যা এই শতাব্দীতে আর হয় নি।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৬ সালে, ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৭১ সালে বড় বন্যা হয়েছে। এরমধ্যে ১৯৭১ সালের বন্যা সবচেয়ে ব্যাপক হলেও প্রতিটি বন্যাতেই প্রাণহানিসহ যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

১৯৫৬ সালের বন্যা :

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রায় সপ্তাহ-ব্যাপী অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও চূর্ণী নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেয় এবং জলের উচ্চতা বিপদসঙ্কেত মাপের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

এই বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সদর মহকুমার নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া ও চাপড়া থানা এবং রাণাঘাট মহকুমার শান্তিপুর, চাকদহ ও রাণাঘাট থানা। জেলার ৯৪ ইউনিয়নের মোট ৮৩০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সরকারী হিসেবে এইসব গ্রামের ২১,৪৯৬টি গৃহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৩৩,৫০২টি গৃহ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদ্বাস্তুরা সাধারণতঃ নিচু জায়গায় বাড়ীঘর করেছিলেন বলে তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩৪,০৫২। এই বন্যায় ৫১৫৮টি তন্তবায় পরিবার এবং ৯৪৭টি কুম্ভকার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গরুবাছুর মারা গিয়েছিল ২৬৭টি। প্রায় ২ লক্ষ একরের ওপর চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকার থেকে বন্যাক্লিষ্টদের জন্য বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয়-শিবির খোলা ছাড়াও ব্যাপকভাবে দুর্গতদের চাল, গম এবং মাথাপিছু নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। ২০৩টি নলকূপ বন্যার্ত অঞ্চলে বসানো হয়। কৃষিজীবীদের বীজধান ও গরু কেনার টাকা এবং তন্তবায়দের উপকরণ কেনার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এই বন্যার পর নদীয়া জেলায় ২০৫টি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচী নেওয়া হয়। "নিজের বাড়ী নিজে করুন" প্রকল্পে সরকারের দেওয়া কয়লা নিয়ে স্থানীয়ভাবে ইঁট পুড়িয়ে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামবাসীদের নিজের চেষ্টায় ছোট ছোট পাকা বাড়ী তৈরী করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী বন্যায় যাতে বাড়ীগুলি নষ্ট না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই বন্যায় নবদ্বীপের অবস্থা এত শোচনীয় হয়েছিল যে, ১৫ দিনের জন্য সারা নবদ্বীপের লোককে বিনামূল্যে রেশন দেবার ব্যবস্থা হয়। প্রাণহানি বেশী হয়নি, ধর্মদা ইউনিয়ন থেকে একটি মাত্র প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়।

১৯৫৯ সালের বন্যা :

১৯৫৯ সালের বন্যাও ঐ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে একটানা কয়দিনের প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে ঘটে। এই বন্যাতে নাকাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, চাপড়া, তেহট্ট, করিমপুর, হাসখালি, চাকদহ থানা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবারের বন্যায় যদিও জলের উচ্চতা ১৯৫৬ সালের বন্যার চেয়ে কিছু কম ছিল, কিন্তু স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতার দিক এই বন্যা বেশী ক্ষতিকর হয়েছিল। এই বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি এবং ৬ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবারও উদ্বাস্তুরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ২৫ হাজার ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফসলের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকার। সরকারী সমর্থিত প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ৩১ জন।

ফসল বোনার বীজ ৫৫ হাজার মণ এবং গরুর খাবার ৪০ হাজার মণ বন্যার্তদের মধ্যে বিলি করা হয়। বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৫ হাজার মণ গম ও চাল বিলি করা হয়। এছাড়া ২৫০০ মণ ভুট্টা, ২০০ মণ চিঁড়া এবং অনেক কাপড়ও দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কালীগঞ্জ থানার জগৎখালি বাঁধ এবং চাপড়ার চুলকুনি বাঁধ ভেঙ্গে এই বন্যায় বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল।

এ বারের বন্যায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বয়ং বন্যাদুর্গত অঞ্চল পরি-দর্শনের জন্য হেলিকপ্টার যোগে কালীগঞ্জ থানার বল্লভপুরে আসেন। এই গ্রামটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৯৬৭ সালের খাদ্যাভাব:

১৯৬৭ সালের অনাবৃষ্টির জন্য আউশ ও আমনের খুব ক্ষতি হয়। এ বছর আউশ চালের দাম খোলা বাজারে কিলোপ্রতি ২.৫০ টাকা এবং আমন চালের দাম কিলোপ্রতি ৩.৫০ টাকা হয়। জনসাধারণের দুর্গতি চরমে উঠে। তৎকালীন যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সারা জেলায় ৭৫টি লঙ্গরখানা খোলেন, সেখানে বিনামূল্যে দুর্গতদের রাঁধা খাদ্য সরবরাহ করা হয়। প্রথম লঙ্গরখানাটি ২২শে আগস্ট নবদ্বীপে খোলা হয়।

১৯৭১ সালের বন্যা:

বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বন্যা হিসেবে এ জেলায় ১৯৭১ সালের বন্যাকে গণ্য করা যেতে পারে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে অতিবৃষ্টির ফলে এই বন্যা সুরু হয় কিন্তু স্থায়ী হয় সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। ব্যাপকতার দিক দিয়ে এত দীর্ঘস্থায়ী বন্যা নদীয়ায় স্মরণকালের মধ্যে হয় নি। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর জলস্ফীতি হয়ে প্রথমে চরম বিপদসীমা ৯'০৫ মিটারেরও ১'১৫ মিটার বেশী উঠে জল কমতে থাকে। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম না থাকায় আবার বেড়ে চরম বিপদসীমার ১'৫৬ মিটার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। এবারের বন্যায় ইছামতী ও চূর্ণীতেও প্রচণ্ড জলস্ফীতি দেখা দেয় এবং চূর্ণীতে প্লাবনের স্থায়িত্ব জলঙ্গী ও ভাগীরথীর চেয়েও বেশীদিন থাকে।

এবারের বন্যায় কালীগঞ্জ, চাপড়া ও নবদ্বীপের কাছে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। কৃষ্ণনগর শহরের বিরাট অংশ বিশেষতঃ নগেন্দ্রনগর অনেক দিন জলঙ্গীর জলের তলায় ছিল।

এই বন্যায় জেলার ১৪টি থানার প্রায় সব এলাকাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সরকারী হিসেবে জেলার ১৫০৭ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে ১৩০০ বর্গমাইল এবং ১২৮২ গ্রামের মধ্যে ১২০০ গ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জেলার ২২ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৪ লক্ষ লোকই বন্যার কবলে পড়েছিল। নবদ্বীপ শহরের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে শোচনীয়। গোটা শহরটি প্রায় ছয় সপ্তাহ জলের তলায় ছিল। জেলার প্রায় ৮০ হাজার বাড়ী এই বন্যায় ভেঙ্গে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গরু বাছুর মারা যায় ৭০০ আর সরকারী সমর্থিত হিসেবে মানুষের জীবন হানি হয় ৩৬।

চাষের ক্ষতি হয় অপূরণীয়। ৩'২৫ লক্ষ একরে আউশ, আমন, পাট ও ইক্ষুর চাষ যা নষ্ট হয়েছিল তার মূল্য কমপক্ষে ১২ কোটি টাকা। মাঠে জল বহুদিন থাকায় চারা বাঁচতে পারেনি।

বন্যায় পাকা রাস্তাগুলির নিদারুণ ক্ষতি হওয়ায় এবং রাস্তার উপর দিয়ে জলস্রোত চলতে থাকায় কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাস্তা, কৃষ্ণনগর-মাজদিয়া রাস্তা, হাঁসখালি-নোনাগঞ্জ রাস্তা, কৃষ্ণনগর-রাণাঘাট রাস্তা, কৃষ্ণনগর-দেবগ্রাম রাস্তা, হাঁসখালি-আড়ংঘাটা রাস্তা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাস্তায় কয়েক সপ্তাহের জন্য সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল ও যাতায়াত বন্ধ থাকে। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে জেলার সদর কৃষ্ণনগরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে অনেক দিন। কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ রেলপথ এক মাসের ওপর বন্ধ থাকে। জেলার করিমপুর, তেহট্ট, কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালী থানা এলাকা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এই সব অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্গতদের খাদ্যশস্য প্রেরণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই সময় বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ভীড় থাকায় তারাও চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, তেহট্ট ও চাপড়ার দুর্গতদের উদ্ধারের ভার সৈন্যবাহিনীর হাতে দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে জনস্বাস্থ্যেরও অবনতি দেখা দেয়। নবদ্বীপ শহর অনেকদিন বন্যাকবলিত থাকায় সেখানে মহামারী দেখা দেয় এবং কিছু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

জেলা-কর্তৃপক্ষ বন্যার্তদের উদ্ধার ও সাহায্যের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করে ব্লক উন্নয়ন অফিসসমূহের কর্মচারীদের সহায়তায় দুর্গতদের উদ্ধার করে স্কুলবাড়ী বা উঁচু জায়গায় আশ্রয় শিবির স্থাপন করে তাতে হাজার হাজার বন্যাদুর্গতদের আশ্রয় দেওয়া হয় এবং তাদের গম, চিড়া প্রভৃতি বিনামূল্যে কয়েক সপ্তাহ বিতরণ করা হয়। বন্যার জল নেমে গেলে দুর্গতদের ৭ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ, ৫ লক্ষ টাকা বলদ ক্রয় ঋণ, ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা গৃহনির্মাণ সাহায্য, ১২ লক্ষ টাকা সার ক্রয় ঋণ প্রভৃতি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। খয়রাতি গম দেওয়া হয়েছিল ১২ হাজার মেট্রিক টন আর গবাদি পশুর খাবার দেওয়া হয়েছিল ৪৫ লক্ষ টাকার।

১৯৭২ সালের খরা:

১৯৭১ সালের বন্যার জের কাটতে না কাটতেই নদীয়ার ভাগ্যে দেখা দিয়েছে ১৯৭২ সালের প্রচণ্ড খরা। গত বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের আশা নিয়ে নদীয়ার চাষীরা নবোদ্যমে আউশ ও পাটের চাষ করেছিল এ বছর। কিন্তু বৃষ্টিপাত একেবারে না হওয়ায় আউশের জমির শতকরা ৫৫ ভাগে এবং পাটের জমির শতকরা ৪৭ ভাগে বীজই রোপণ করা যায় নি। এবার কালবৈশাখী একেবারেই দেখা যায় নি। এপ্রিল-মে মাসে আউশ ও পাট (এ দু'টিই নদীয়ার প্রধান শস্য) লাগানো হয়। গোটা এপ্রিল ও মে মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত কোন বৃষ্টি হয় না। মে মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ১০৩'৫০ মিঃ মিঃ-এর স্থলে এবার বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ৩৪ মিঃ মিঃ। জুন মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ২৬৭ মিঃ মিঃ-এর স্থলে বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ১১৭ মিঃ মিঃ,। জুলাই মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ২৮৬ মিঃ মিঃ-এর স্থলে বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ১৬৭'২৫ মিঃ মিঃ। এই নিদারুণ খরার ফলে আমন ধানেরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। মোট ২ লক্ষ ২০ হাজার আমন জমির শতকরা ভাগে চাষ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ফলন স্বাভাবিকের ৩০ ভাগও হয়নি। গমের চাষও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭১ সালে যেখানে

১ লক্ষ ৬৯ হাজার জমিতে গম চাষ করা হয়েছিল, সেখানে এবার গম চাষ করা হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে।

খরার দরুন গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপের জল নিঃসরণের পরিমাণও অনেক কমে যায়। এ জেলায় সকল সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে ১ লক্ষ একরের মত জমিতে সেচ করা যায় সেখানে ৭০ হাজারের বেশী জমিতে সেচ করা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসন থেকে খরাদুর্গত অঞ্চলে মোট ৫৬০টি পানীয় জলের নলকূপ বসানো হয়। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে টেস্ট-রিলিফ কাজের দ্বারা দুর্গত অঞ্চলে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় ৪০৫টি টেস্টরিলিফের কাজ তখন চালু ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ২,০৩,৭১৬ ইউনিট। এছাড়া প্রচুর টাকা কৃষি ঋণ, বলদ ক্রয় ঋণ, সার ক্রয় ঋণ হিসেবে দুর্গত এলাকায় দেওয়া হয়েছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তি

বহু মনীষির জন্মধন্য নদীয়া। তাঁদের গৌরবে নদীয়া আজ উজ্জ্বল। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নদীয়ার শুধু সুসন্তানদের বর্ণানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া হলো।

১৪০৭ শকে বাসন্তী সন্ধ্যায় ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে (১৪৮৬ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী) শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। অদ্বৈতের সহধর্মিণী সীতাদেবী সদ্যপ্রসূত শিশুর নাম রাখেন—নিমাই। নবদ্বীপে নিমাই সকলের আদরে লালিতপালিত হয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। ক্রমশঃ বিদ্যালাভ করে নিমাই পণ্ডিত ব'লে পরিচিত হন ও খ্যাতিলাভ করেন। ছোট থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। এদেশে নিমাই পণ্ডিত যে ধর্ম প্রচার করলেন তা আজ সারা বিশ্বে সুপ্রচারিত। নিমাই পরে—শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীচৈতন্যদেব নামে সারা ভারতে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। কেবল নূতন ধর্মমতই নয়, বৈষ্ণবসাহিত্যে তিনি এক নূতন আলোড়ন এনে দেন। ধর্মে, কর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, গানে, জ্ঞানে যে বিপ্লব তিনি এনেছিলেন তার ধাবা আজও বয়ে চলেছে। তাঁর প্রচারিত নামকীর্তন আজ সারা বিশ্বে প্রচারিত। ১৪৩১ শকের (১৫১০ খ্রীঃ) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্বদিন নিমাই গৃহত্যাগ করেন এবং কাটোয়ায় গিয়ে শ্রীকেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতী নিমাইয়ের সন্ন্যাসের নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর বলেছিলেন—"জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া আছে, তোমা হইতে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে চৈতন্য হইবে। অতএব এই নামই তোমার উপযুক্ত।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কীর্তনে মেতে উঠলেন, তিনি প্রচার করলেন কলিতে হরিনাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভারতের সবত্র তিনি প্রচার করতে লাগলেন হরিনাম, আর রাতদিন মুখে তার:

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা॥

এই ভাবে দেশের সর্বত্র হরিনাম প্রচার করে সকলকে মাতিয়ে তুলে তিনি এক নূতন ধর্মমত ও পথের প্রবর্তন করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীধামে নবদ্বীপের নদীয়াসুন্দর, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে লীলা সংবরণ করেন। তাঁর তিরোভাব সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। ১৪৫৫ শকে ৩১শে আষাঢ় শুক্লাসপ্তমী রবিবার (১৫৩৩ খ্রীঃ ২৯শে জুন) মহাপ্রভুর তিরোভাব তিথি—চৈতন্যজাতক পৃঃ ১৮।

(২) অদ্বৈতাচার্য:

শ্রীহট্টের নবগ্রামে আদিবাস হলেও তাঁর পিতা কুবের পণ্ডিত ও মাতা নাভাদেবী গঙ্গাস্নানের জন্য শান্তিপুরে আসেন এবং কিছুদিন বসবাসের পর শান্তিপুরেই দেহত্যাগ করেন। তাঁদেরই একমাত্র পুত্র কমলাক্ষ। কমলাক্ষ শান্তিপুরেই থেকে যান। বিবাহাদি করে শান্তিপুরে টোল স্থাপনা করে অধ্যাপনা সুরু করেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং পরমভক্ত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভগবৎপরায়ণতার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করতেন। সেই জন্য তাঁর নাম অদ্বৈত হয়। কমলাক্ষ পরে অদ্বৈতাচার্য হন এবং মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যই হরিদাসকে শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় আশ্রয় দেন এবং তাঁরই উপদেশে হরিদাস নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেব আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে নদীয়ায় অনেক ভক্তসাধক জন্মগ্রহণ করে তাঁর আসার পথকে কেবল প্রশস্তই করেন নি—প্রেমধর্ম প্রচার করে এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। অদ্বৈতাচার্য এঁদের সর্বাগ্রগণ্য।

(৩) অক্ষয়কুমার মৈত্র:

জন্ম ১৮৬১ সালে ১লা মার্চ অপরাহ্নে নদীয়ার অন্তর্গত নওয়াপাড়া থানার সিমলা গ্রামে। ১৯৩০ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী (২৭শে মাঘ, ১৩৩৬) মৃত্যু। তাঁর কিছু সংখ্যক রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪) অক্ষয়কুমার দত্ত:

জন্ম ১৮২০ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই (১২২৭ সাল, ১লা শ্রাবণ)। পূর্বে নদীয়া বর্তমানে বর্ধমান জেলার চুপীগ্রামে জন্ম। ১৮৮৬ খ্রীঃ ২৮শে মে মৃত্যু (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি যে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন তা চিরস্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করেন। পিতার নাম রামদুলাল আর মাতার নাম দয়াময়ী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'।

(৫) অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

বিল্বগ্রামে জন্ম। উপনিষদ সম্বন্ধে গ্রন্থ আছে।

(৬) অনন্তহরি মিত্র:

পিতা রামলাল মিত্র। বাগআঁচড়ায় বাড়ী কিন্তু অনন্তহরি জন্মগ্রহণ করেন মাতুলালয়ে চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর গ্রামে ১৯০৪ খ্রীঃ (বর্তমানে বাংলাদেশ)। ম্যাট্রিক পাশ করার পর

কৃষ্ণনগরে আসেন ১৯২১ সালে। এ্যাসোসিয়েশন অফিসে হল তাঁর আস্তানা। শরীর চর্চার সঙ্গে বন্দুক, রিভলভার শিক্ষাও গোপনে চলতে লাগল। কৃষ্ণনগরের তরুণ ও ছাত্র সমাজ তাঁকে পেয়ে ধন্য হলো। মরণবিজয়ী অনন্তহরি মিত্র দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় ১৯২৬ খ্রীঃ দশবছর জেলে যান। কিন্তু ঐ বৎসরেই ২৪শে সেপ্টেম্বর আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে তার ফাঁসী হয় গোয়েন্দাবিভাগের পুলিশ সুপার ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে জেলের মধ্যে হত্যা করার অপরাধে।

(৭) আশানন্দ মুখোপাধ্যায়:

শান্তিপুরে এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পূজা প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও শরীরের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। পরদুঃখকাতর, নির্ভীক, শক্তিধর, মাতৃভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী, সুপুরুষ ছিলেন আশানন্দ। কুলবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের নিত্যপূজা করতেন। তার সেই বিগ্রহ আজও যে পাড়ায় আছে তার নাম আশানন্দ পাড়া বা ঢেঁকি পাড়া। একবার এক শিষ্যবাড়ী গিয়ে ঢেঁকি ঘুরিয়ে ডাকাতদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর হতে তিনি আশানন্দ ঢেঁকি বলে পরিচিত হন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ, কবিতা আছে—

আশানন্দ ঢেঁকির ছিল শান্তিপুরে ঘর।
ভীমের মত শক্তি ছিল সাহস ভয়ঙ্কর॥
—স্বদেশরেণু

শান্তিপুরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি ব্যায়ামাগার, একটি রাস্তা ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

(৮) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত:

নদীয়ার কল্যাণীর কাছেই কাঞ্চনপল্লীগ্রামে কবিরাজ শ্রীহরিনারায়ণ গুপ্তের ঘরে ১৭৩২ শতকে ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার (১২১৮ সাল) তাঁর জন্ম হয়। মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবি প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুখে মুখে ছড়া কেটে সকলকে অবাক করে দিতেন। স্কুলের লেখাপড়ার সুযোগ যদিও তাঁর হয়নি তবুও স্বভাব কবি হিসাবে নিজেই তিনি একটি যুগ সৃষ্টি করে গেছেন। তিনিই প্রথম দেশকে জননীজ্ঞানে কল্পনা করে কবিতা লেখেন। কলকাতায় মতুলালয়ে থাকাকালীন তাঁর কবি প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় সুরু হয়। তিনি মনে প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে (১৮৫৯ খ্রীঃ) ১২৬৫ সালের ১০ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি খাঁটী স্বভাবকবি ছিলেন— গুপ্তকবি বলে তিনি পরিচিত।

(৯) উমেশচন্দ্র দত্ত:

১৮২৯ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে উমেশচন্দ্র দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ সিনিয়র স্কলারসিপ পাশ করে প্রথমে চট্টগ্রামে শিক্ষকতা করেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষও হন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ চাকরীজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৮০ বৎসর বয়সে ১৯১৬ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণনগরে তাঁর বাড়ি 'গুপ্তনিবাস' বলে পরিচিত। তাঁর তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত কৃষ্ণনগরের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

(১০) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়:

১৮৭৭ সালে ১৯শে নভেম্বর শান্তিপুরে জন্ম। আজীবন সাহিত্যসাধনা ও কাব্যচর্চা করে গীতিকাব্যে যে নূতন ধরনের প্রকৃতিপ্রেমযুক্ত করেছেন, তা তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিত্বের নিদর্শন। রবীন্দ্র-অনুগামী কবিদের অগ্রগণ্য ছিলেন কবি করুণানিধান। ভাষায় লাবণ্য, শব্দচয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য ও শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ ফুটিয়ে তোলার শক্তি তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায়। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত ১৩০৮ সালে, 'প্রসাদী'— ১৩১১, 'ঝরাফুল'—১৩১৮, 'শান্তিজল'—১৩২০, 'ধানদূর্বা— ১৩২৮, কাব্যসংকলন 'শতনরী'—১৩৩৭, 'রবীন্দ্র-আরতি'— ১৩৪৪। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'গীতারঞ্জন' এবং 'সর্বেশ্বর' অপ্রকাশিত।পরিণত বয়সে ১৯৫৫ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রবীন কবি করুণানিধান শান্তিপুর হেলথ্ সেন্টারে পরলোক গমন করেন।

(১১) কাজী নজরুল ইসলাম:

কাজী নজরুলের সাহিত্যজীবন কৃষ্ণনগরে কেবল সুরু নয় সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কৃষ্ণনগরেই কাটে। সেই সময় বহু বিখ্যাত গান ও কবিতা রচনা করেন। নদীয়ার আর এক সুসন্তান হেমন্ত সরকার কাজীকে ১৮২৬ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন। প্রমীলা সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং সপরিবারে তিনি দীর্ঘদিন কৃষ্ণনগরে কাটান। সৈনিকের কার্যভার ত্যাগ করে সাহিত্যচর্চা সুরু করেন ১৯২১ খ্রী.। প্রথমে হেমন্ত সরকারের বাড়ীতে, পরে বর্তমান পাওয়ার হাউসের জায়গায় 'গ্রেস কটেজ' নামে যে বাড়ী ছিল সেখানে থাকতেন। এখান থেকেই বিখ্যাত গান—'দুর্গমগিরি কান্তার মরু', এবং 'কুহেলিকা', 'মৃত্যুক্ষুধা' নামে দু'খানি উপন্যাস এবং বিখ্যাত গজল গান—'বুল বুলি তুই ফুলশাখাতে' রচনা করেন। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন তৎকালীন বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯২৭ সালে তিনি কলকাতায় চলে যান। বর্তমানে মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে থেকেও তিনি আজ নিস্তব্ধ।

(১২) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী:

১২৫৩ সালে ২০শে অগ্রহায়ণ নবদ্বীপে তন্তুবায় কুলে জন্ম। পিতা দীননাথ রাঢ়ী, মাতা অন্নপূর্ণা দাসী। প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাত্মা-

গণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ১২৮১ সালে তাঁর রচিত 'ভারতের ইতিহাস' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। শিক্ষকতা ত্যাগ করে মোক্তারি সুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে কাজ করলেও নবদ্বীপ তাঁর প্রাণ ছিল এবং নবদ্বীপের গৌরবে তাঁর ছিল গর্ব। পণ্ডিতদের মুখে শুনে এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি পড়ে নবদ্বীপের ইতিহাস সংকলনে ব্রতী হন এবং ১২৯৮ সালে 'নবদ্বীপ মহিমা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করেন। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও এই গ্রন্থের প্রশংসা করা হয়। এই পুস্তকখানি তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১৩২১ সালে ২৬শে ভাদ্র হুগলীতে তিনি মারা যান।

(১৩) কার্তিকেয়চন্দ্র রায়:

কৃষ্ণনগরে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন রাত্রে কার্তিকেয়চন্দ্রের জন্ম। পিতা উমাকান্ত রায়। নদীয়ার রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে সঙ্গীতের পুস্তক 'গীতমঞ্জরী' প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' গ্রন্থটিই তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১৮৮৫, ২রা অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

(১৪) কুমুদনাথ মল্লিক:

রাণাঘাটে বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্ম। এই মল্লিক পরিবারের আদি নিবাস ছিল মাটীয়ারীতে। পরে মল্লিকদের কিছু পরিবার রাণাঘাটে গিয়ে বসবাস সুরু করেন। কুমুদ-নাথের পিতার নাম কালীকুমার মল্লিক। ১৯১০ সালের ৩০শে আগস্ট (সন ১৩২৭ সালের ১৪ই ভাদ্র) কুমুদনাথ মল্লিক রচিত 'নদীয়াকাহিনী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সময় একক চেষ্টায় এই ধরনের গ্রন্থ রচনার কাজ কত যে কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 'সতীদাহ' নামে আর একখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেন।

(১৫) কৃত্তিবাস ওঝা:

বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাংলাতে রামায়ণ মহা-কাব্য রচনা করে আজও অমর হয়ে আছেন। তাঁর রচনা হতেই তাঁর কুলপরিচয় জন্ম ইত্যাদি জানা যায়——

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণমাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
* * *
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারী ওঝার নাতি।
তাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতি॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
* * *
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

শ্রীরামের আগে ষাট হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোকত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ॥

শান্তিপুরের কাছে গঙ্গার তীরে সুন্দর মনোরম স্থান। ছোটবড় নানান গাছের ছায়ায় ঢাকা আর ফুলের মালঞ্চের জন্যই হয়ত জায়গাটীর নাম হয়-ফুলিয়া। ফুলিয়াকে গ্রামরত্ন বলা হত। এই গ্রামেই বিখ্যাত 'মুখুটী' বংশে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এক রবিবারে। বালক কৃত্তিবাস ক্রমশঃ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে গুরুর কৃপায় নানা ভাষায় কৃতী হয়ে ওঠেন। সরস্বতীর বরপুত্র কৃত্তিবাস রাজাদেশে বাল্মীকির রামায়ণ বাংলায় লিখে, এক মহাকাব্য সৃষ্টি করে, আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে অমর হয়ে আছেন।

(১৬) কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ:

শ্রীধাম নবদ্বীপেই আগমবাগীশ ভট্টাচার্যের জন্মস্থান। পিতা মহেশ্বর গৌড়দেশ হতে এসেছিলেন বলে উপাধি ছিল গৌড়াচার্য। কৃষ্ণানন্দ জ্যেষ্ঠ পুত্র। পরে তিনিই 'আগমবাগীশ' নামে বিখ্যাত হন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িকই ছিলেন না কেবল, তাঁর সহাধ্যায়ীও ছিলেন।

যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
—চৈতন্য. ভা. আ. ৬ষ্ঠ অ.

কৃষ্ণানন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শক্তিমন্ত্রগ্রহণ করে তিনি ঘোর তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। তন্ত্রের নামে চারি-ধারে ব্যাভিচার, নিষ্ঠুরতা, মদ্যপান প্রভৃতি যে ভাবে তখন চলছিল তার হাত থেকে সকলকে বাঁচাবার জন্যে তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলনে তিনি ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তিনিই তন্ত্রসার নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। বর্তমানে কার্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামাপূজা হয়ে থাকে সেই শ্যামামূর্তি ও পূজাপদ্ধতি আগমবাগীশের আবিষ্কৃত। এর পূর্বে ঐ মূর্তির প্রচলন ছিল না। ঘটে পূজা প্রচলিত ছিল। আগমবাগীশ নিজেই ঘটে পূজা করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঘট আজও নবদ্বীপে পূজিত হয়ে আসছে। 'আগমেশ্বরী' নামে বিখ্যাত বিরাট শ্যামামূর্তি প্রতিবছর রাসের সময় আজও পূজিত হয়ে থাকে। 'তন্ত্রসার' ছাড়াও 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর বাড়ীর এলাকার পল্লীটি আগমেশ্বরী-তলা বলে খ্যাত।

(১৭) কৃষ্ণকোমল গোস্বামী :

ভাজনঘাটে বাড়ী। বিচিত্রবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

(১৮) কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :

শিবনিবাসে বাড়ী। 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ছিলেন।

(১৯) কৃষ্ণনাথ সিংহরায় :

নাকাশীপাড়ায় বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ধামিক হিসাবে নাম ছিল। 'ভক্তি ও ভক্ত', 'ষটচক্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ১২৯৮ সালে ১৪ই চৈত্র তিনি পরলোক গমন করেন।

(২০) কৃষ্ণচন্দ্র পান্তী :

১১৫৩ সালে রাণাঘাটে জন্ম। পিতা সহস্ররাম পান্তী অত্যন্ত দুঃস্থ ছিলেন। অধ্যাবসায়, ন্যায়নিষ্ঠায় ক্রমশঃ ব্যবসায়ে উন্নতি করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। নদীয়ার তদানীন্তন মহারাজা শিবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সখ্য ছিল। মহারাজা তাঁকে 'পালচৌধুরী' উপাধি দেন। সেই অবধি তাঁরা রাণাঘাটের পালচৌধুরী নামে পরিচিত। রাণাঘাটে পালচৌধুরী স্কুল তাঁদেরই অধস্তন পুরুষের কীর্তি। কাজে সততা ও নিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ১২১৬ বঙ্গাব্দে ৬০ বছর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

(২১) কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ :

১৮৩৮ খ্রীঃ ২রা সেপ্টেম্বর উলাবীরনগরে প্রসিদ্ধ জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মৌস্তফির গৃহে জন্ম। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, গৃহস্থজীবনে কেদারনাথ দত্ত নামে পরিচিত। তাঁর জীবনে বহু মহাপুরুষ ও বৈষ্ণবের আশীর্বাদ আছে। প্রথমে শিক্ষকতা পরে চাকরী করেন। বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে জৈবধর্ম, প্রেমদীপ, শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধাম মায়াপুরে গৌড়ীয় মঠের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। স্বরূপগঞ্জে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী ও সমাধিমন্দির 'সানন্দ সুখদকুঞ্জ' নামে আজও বিরাজমান। ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরলোকগমন করেন। স্বরূপগঞ্জে 'সুরভিকুঞ্জ' ও 'স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ' বৈষ্ণবগণের কেবল দ্রষ্টব্যস্থানই নয় পবিত্র স্থানও।

(২২) খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক :

নদীয়ার একজন সুসন্তান। বৃটিশ আমলে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার, এসেম্বলীর স্পীকার ও ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন। শান্তিপুরে জন্ম হলেও কৃষ্ণনগর ছিল কর্মকেন্দ্র।

(২৩) গদাধর পণ্ডিত :

মাধব মিশ্রের পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্য সঙ্গী গদাধর পণ্ডিত ১৪৮৬ খ্রীঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে বসবাস করেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে টোটা গোপীনাথের সেবক নিযুক্ত করেন। গদাধর ঐ স্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন।

(২৪) গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ :

পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খ্যাতনামা বাগ্মী, সাংবাদিক ও কংগ্রেসসেবক। মাতা যূথেশ্বরী দেবী। ১৯২৮ সালে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মাতুলালয় বর্ধমানে গোপেন্দুভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে কালনা হতে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় রিপণ কলেজে ভর্তি হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র গোপেন্দুভূষণ তাঁরই আহ্বানে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর সুরু সংস্কৃত টোলে শিক্ষা। নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করে সংস্কৃতে নিজেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। নিজে সংস্কৃতে অনর্গল কথাবার্তা, বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর লেখা সংস্কৃত নাটক সুধী-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ১৩৫০ সালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সংস্কৃত গদ্যানুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানস গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ এর পর প্রকাশিত করেন। এই দুইটি গ্রন্থ গোপেন্দুভূষণকে সারা ভারতের খ্যাতি এনে দেয়। বেদের বাংলা গদ্য অনুবাদ কাজে হাত দেন। ৫০ খণ্ডের মধ্যে ১০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। তাঁর আর একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'। নবদ্বীপ পণ্ডিতদের সভা 'বঙ্গ বিবুধজননী সভা'র তিনি দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন। নবদ্বীপে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণকে ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। ১৭ই জুলাই, ১৯৭২ নবদ্বীপে এই ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

(২৫) গোলাম জিলানী :

দেবগ্রামের অধিবাসী। তখনকার দিনে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেন এবং জেলে মারা যান।

(২৬) চন্দ্রশেখর কর :

কৃষ্ণনগর ঘূর্ণী অঞ্চলে জন্ম। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাবিনোদ উপাধি দেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখ্য— 'অনাথবালক', 'সুরবালা', 'সৎকথা' প্রভৃতি।

(২৭) চন্দ্রশেখর বসু :

উলাবীরনগরে জন্ম। 'অধিকারতত্ত্ব', 'পরলোকতত্ত্ব', 'প্রলয়-

তত্ত্ব' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

(২৮) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় :

বাঘআঁচড়ায় জন্ম। 'ভূতের খেলা', 'স্বদেশরেণু' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

(২৯) চণ্ডীচরণ দে :

শান্তিপুরে জন্ম। তাঁর রচিত কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে—'বীর আশানন্দ' আজও শান্তিপুরের বীরত্ব প্রকাশ করছে।

(৩০) জগদীশ্বর গুপ্ত :

মেহেরপুর (বর্তমানে বাংলাদেশ) জন্মস্থান। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলি—'মির্জাপুর', 'লীলাস্তবক', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি।

(৩১) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার :

১৭৭৫ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর (২২শে আশ্বিন, ১১৮২ সন) বজরাপুর গ্রামে জন্ম। শিক্ষাসাগর, চণ্ডী, বাল্মিকীকৃত রামায়ণ, মহাভারত, পারসিক অভিধান, বঙ্গাভিধান প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রেখেছে।

(৩২) জগদানন্দ রায় :

কৃষ্ণনগর রায়পাড়ায় বিখ্যাত জমিদার বংশে জগদানন্দ রায় ৩রা আশ্বিন, ১২৭৬ সালে (১৮৬৯ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়। বি. এ. পাশ করার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন ও শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। ১১ই আষাঢ়, ১৩৪০ সাল (১৯৩৩ খ্রীঃ) আবাল্য বিজ্ঞানসাধক ও প্রাবন্ধিক জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু হয়। 'প্রকৃতি পরিচয়', 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'গ্রহনক্ষত্র', পোকামাকড়', 'গাছপালা'. 'শব্দ', 'বাংলার পাখী', 'আলো', 'চুম্বক' প্রভৃতি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন।

(৩৩) জলধর সেন :

১৮৬০ খ্রীঃ ১৩ই মার্চ (১২৬৬ সাল, ১লা চৈত্র) কুমারখালি গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জলধর সেনের জন্ম। পিতার নাম হলধর সেন। তাঁর সম্পাদনায় পর পর কয়েকটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাখানি দীর্ঘদন স্থায়ী হয়। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা অনেক। ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৩৯ খ্রীঃ, ১৫ই মার্চ (১৩৪৫ সাল, ২৬শে চৈত্র) তাঁর মৃত্যু হয়।

(৩৪) জয়গোপাল গোস্বামী :

শান্তিপুরে জন্ম। 'সীতাহরণ', 'শৈবলিনী' প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা।

(৩৫) জীতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় :

নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত মুড়াগাছায় জন্ম। 'অনাথা', 'অভিশপ্ত' প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা।

(৩৬) তারাশঙ্কর তর্করত্ন :

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নাকাশীপাড়া থানার কাঁচকুলি গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম। পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৮ সালের শেষার্ধে মৃত্যু। বাবলি, কাদম্বরী, পত্রাবলি, বাসেলাস প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁকে আজও অমর করে রেখেছে।

(৩৭) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় :

১৮৩৩ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর (১২৫০ সাল ১৬ই কার্তিক) নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রামে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তারকনাথেব জন্ম হয়। পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। পিতার ইচ্ছানুযায়ী ডাক্তারি পড়েন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ এল্. এম্. এস. উপাধি লাভ কবেন। তারপর সুরু হয় সরকারী চাকরী জীবন। কিন্তু তাঁর মন ছিল সাহিত্যানুরাগী। তিনি কয়েকটি গল্পের বই, উপন্যাস রচনা করেন। ললিত-সৌদামিনী (১২৮৮), হরিষেবিষাদ (১২৯৪ সাল), অদৃষ্ট (১২৯৯ সাল), বিধিলিপি (উপন্যাসটি 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় উপন্যাসটি শেষ হয়নি। তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানি তাঁকে কেবল যশস্বীই কবে যায়নি তাঁকে অমর কবে রেখেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'স্বদেশ ও সমাজ হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের।' ১৮৯১ খ্রীঃ ২২শে সেপ্টেম্বর পক্ষাঘাত রোগে বকসারে তারকনাথের মৃত্যু হয়।

(৩৮) তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :

নদীয়ার জনপ্রিয় দরদী নেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার নাটশিমুলিয়া গ্রামে ১৮৯৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসেন এবং সি. এম. এস. স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে পড়ার সময় হতেই জনহিতকর ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নদীয়ার সমস্ত আন্দোলনের বা সংগঠনের ছিলেন প্রাণ-স্বরূপ। বিপ্লবী দলের সঙ্গে ছিল তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারারুদ্ধ হন। বহু নির্যাতন, কারাবরণের পর দেশ স্বাধীন হলে তিনি সমস্যাবহুল নদীয়ার কর্ণধাররূপে স্বীকৃতি পান। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, নদীয়া স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান, নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রভৃতি এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর মত অনলস কর্মী, উদ্বাস্তুদের দরদী বন্ধু, নদীয়ার সুহৃদ একালে আর দেখা যায় না। জনসেবা ও রাজনীতি ছাড়াও তাঁর অন্তরে ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি

অনুরাগ। তাঁর চেষ্টাতেই কৃষ্ণনগরে পর পর কয়েকবার নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য সম্মেলন হয়। ১৯৫৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টা নাগাদ শান্তিপুর ও ফুলিয়ার মাঝামাঝি ৩৪ নং জাতীয় সড়কে এক জীপ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

(৩৯) দামোদর মুখোপাধ্যায়:

শান্তিপুরে জন্ম। 'মৃন্ময়ী', 'সোনার কমল', 'মা ও মেয়ে' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

(৪০) দীননাথ সান্যাল:

১৮৫৪ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে জন্ম। 'মেঘনাদ বধ', 'কাব্যসমালোচনা', 'সীতা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৩৫ খ্রীঃ মৃত্যু।

(৪১) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়:

১২৭০ সাল ৪ঠা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই) কৃষ্ণনগরে বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন নাট্যকার। হাসির গান ও স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সাহিত্যের অনেক বিভাগে তিনি ছিলেন প্রথম পথ-প্রদর্শক। নাটকে তাঁর নিজস্ব একটা ভঙ্গি প্রবর্তন করেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব বিশেষ সুর সঙ্গীতজগতে একটা নূতন ধারা এনে দেয়।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৮০ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ, ১৮৮৩ সালে হুগলী মহসীন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসীডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করেন। তারপর স্টেট স্কলারসীপ পেয়ে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য লণ্ডন যান। ১৮৮৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু সমুদ্রপাড়ির জন্য তদানীন্তন সমাজ তাঁকে একঘরে করেন। ১৮৮৭ সালে সুরবালা দেবীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন কিন্তু স্বাধীনচেতা হবার জন্য চাকরীজীবনে উন্নতি করতে পারেন নি। ১৮৮৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৯০৯ সালের ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকালে বাংলার ভূমিরাজস্বক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা করেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার মূলে ছিল গভীর দেশানুরাগ ও প্রীতি। তাছাড়া তাঁর ব্যঙ্গাত্মক তির্যক রচনা ও হাসির গানগুলি অবিস্মরণীয়। তিনি বহু ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক রচনা করে সেকালে সৌখীন রঙ্গালয়ের চাহিদা মিটিয়েছিলেন। পত্নী বিয়োগের পর তাঁর সাহিত্যসাধনা ভক্তিমার্গের দিকে যায়। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন দিলখোলা। তাঁর লেখা কয়েকটী পুস্তকের নাম এখানে দেওয়া হলো—আর্যগাথা, ১ম ও ২য় খণ্ড, বিরহ (১৮৯৭), হাসির গান (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত ও মন্ত্র (১৯০২), দুর্গাদাস (১৯০৬), আলেখ্য (১৯০৭), নূরজাহান ও মেবারপতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) ত্রিবেণী (১৯১২)। তাঁর প্রথম ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ 'Lyrics of Ind.' ১৮৮৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩২০ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৯১৩ খ্রীঃ ১৭ই মে) অপরাহ্নে সদালাপী, দেশপ্রেমিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্মভিটার বাড়ী আজ নিশ্চিহ্ন। সেই ভিটায় সামান্য জমির ওপর একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অতীতকে। আর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আজও দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক বাড়ীর প্রবেশপথের দুটী থাম অবহেলিত হয়ে, রেলসীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র, সুগায়ক দিলীপকুমার রায় আজও জীবিত এবং পুনাতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ভজনপূজনে জীবন অতিবাহিত করছেন।

(৪২) দীনবন্ধু মিত্র:

১২৩৮ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াঘাড়া স্টেশনের কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'নীলদর্পণ' তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। তাছাড়া— 'নিমচাঁদ', ঘটিরাম, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, সুরধনী, লীলাবতী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন স্মৃতিতে আজও সজীব। তাঁর বিয়েপাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, জামাই বারিক, কমলে কামিনী প্রভৃতি চিরস্মরণীয়। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। ১৮৭৩ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

(৪৩) দীনেন্দ্রকুমার রায়:

১২৭৬ সালের ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার (১৮৬৯ খ্রীঃ ২৬শে আগস্ট) নদীয়ার মেহেরপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশ) দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম। পিতার নাম ব্রজনাথ রায়, কৃষ্ণনগরের এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। দীনেন্দ্রকুমারের কলেজ-জীবন কৃষ্ণনগরে সুরু। কর্মজীবন সুরু হয় রাজসাহীতে। ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর যথেষ্ট এবং লিখতেও সুরু করেন। তাঁর পুস্তকের সংখ্যা প্রচুর। রহস্য-লহরী সিরিজেই তাঁর ২১৭ খানি বই ছাপা হয়েছে। তাঁর পল্লীচিত্র, পল্লীকথা, পল্লীবধূ, পল্লীচরিত্র পুস্তকগুলি আজও তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর লেখায় গ্রাম্য চিত্র ও চরিত্র প্রস্ফুটিত। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য বই —নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, চীনের ড্রাগন, নানাসাহেব, তালপাতার শিপাই প্রভৃতি একদিন গল্পপিপাসু বাঙ্গালীর মনে রসদ যুগিয়েছিল। ১৩৫০ সালে ১২ই আষাঢ় (১৯৪৩ খ্রীঃ ২৭শে জুন) তাঁর নিজগ্রাম মেহেরপুরে দীনেন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয়।

(৪৪) দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়:

উলাবীরনগরে জন্ম। তাঁর লেখা গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

(৪৫) দেবনাথ মল্লিক:

নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার রুকুনপুর গ্রামে দেবনাথ মল্লিকের জন্ম। শিক্ষকতা করতেন। পরে মিশনারীদের সঙ্গে

মতানৈক্যের ফলে স্বতন্ত্রভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁরই চেষ্টাতে ১৮৭৩ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর কৃষ্ণনগরে দেবনাথ স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেবনাথ বাবুর নাম আজও স্মরণ্য। ১৮৯৩ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

(৪৬) দেবী ঘটক :

শান্তিপুরে পিতামহ আচার্য নলিনীমোহন সান্যালের গৃহে ১৯১০ খ্রীঃ ১৬ই নভেম্বর দেবী ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিরাপদ ঘটক। কৈশোরেই স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। দেবী ঘটক কিন্তু নৃত্য, গীত ও চিত্রশিল্পে ছিলেন নিপুণ শিল্পী। তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছিল। সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে ১৯৪৫ সালে তাঁর ছবি 'Pay of Life' প্রথমস্থান অধিকার করে মহীশূর রাজপ্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করেন। মাদ্রাজে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর সেরেব্রাল থ্রম্বসিস রোগে হঠাৎ মারা যান।

(৪৭) নিরঞ্জন চক্রবর্তী :

অখণ্ড নদীয়ার মেহেরপুর শহরে (বর্তমানে বাংলাদেশ) নিরঞ্জন চক্রবর্তীর আদি নিবাস হলেও কৃষ্ণনগর শহরে থেকেই লেখাপড়া শেখেন ও মানুষ হন। পিতার নাম হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হন। বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয়ে কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বৎসর তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং সংস্কৃত বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯২১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এচ. ডি. লাভ করেন। তারপর ১৯২৪–২৬ প্যারিসে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রথম জীবনে কলকাতায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টরের পদ পান। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়া হত। স্বাধীন ভারতে তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল হন। আমাদের রাষ্ট্রপতির পতাকার পরিকল্পনা তাঁরই প্রদত্ত। কৃষ্ণনগর সমাজজীবনে তাঁর কার্যাবলী অবিস্মরণীয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ইউরোপীয় পত্নী মুসৌরীতে বসবাস করেন।

(৪৮) নীহাররঞ্জন সিংহ :

কাব্যপ্রাণ নীহাররঞ্জন ৭২ বছর পূর্বে অখণ্ড নদীয়ার বোয়ালমারী গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ১৩০৬ সালে ৩রা পৌষ রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফণীন্দ্রনাথ সিংহ। মাতা শরৎকুমারী নাবালক শিশুপুত্র নীহাররঞ্জনকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস সুরু করেন। ৮ বৎসর বয়সে পিতৃহারা এবং ১৫ বৎসর বয়সে নীহাররঞ্জন মাতৃহারা হন। ছোট থেকেই কবিতা লিখতে সুরু করেন। ১১ বছর বয়সে প্রথম লেখা কবিতা :

> দিনের কাজ করি সমাপন,
> অস্তে গেলেন রবি,
> এমনকালে গিয়ে দেখি মাঠে,
> সে কি অপূর্ব ছবি।

১৮ বছর বয়সে তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'রেণুকা' এবং পর বৎসর 'পছন্দ' নামক পঞ্চমাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়। ২০ বছর বয়সে কলকাতা থেকে 'বাঁশরী' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ২১ বৎসর বয়সে উমাশশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪২ সালে তাঁর কব্যগ্রন্থ 'রূপায়ণ' সকলের প্রশংসাই লাভ করে। তিনি কেবল কবি ছিলেন না—একাধারে, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সাহিত্যিক ছাড়াও সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ, দরদী লেখক ছিলেন। সদাহাস্যময়, সুন্দরের পূজারী কাব্যপ্রাণ নীহাররঞ্জন ১১ই মার্চ ১৯৭২ তাঁর কৃষ্ণনগরস্থ বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

(৪৯) প্রমথ চৌধুরী :

বাংলার বীরবলের জীবন, সাহিত্য সব কিছুই কৃষ্ণনগরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর আত্মকথায় সে কথা তিনি বার বার স্বীকার করেছেন—'আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূলপুঁজি, তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে।...আমার ভাষার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।' ১৮৬৮ সালে যশোহরে প্রমথ চৌধুরীর জন্ম। আদি বাড়ী পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। কিন্তু পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসেন। কৃষ্ণনগর থেকেই বাল্যজীবন, সাহিত্য-জীবন সবকিছু সুরু, সেই জন্য তাঁকে কৃষ্ণনাগরিক বলেই ধরা যেতে পারে। বীরবলের লেখায় রস নেই কিন্তু রসিকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রছটায় আলোকিত না হয়ে নিজের ভাবকে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তোলা কম কথা নয়। তাঁদের কৃষ্ণনগরের বাড়ী 'রাণীকুটীর' আজও বর্তমান। তবে হস্তান্তর হয়ে গেছে।

(৫০) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী :

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ী শান্তিপুরে হলেও তাঁর জন্ম হয় শিকারপুরে, মাতুলালয়ে ১২৪৮ সনে ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার তাঁর মাতামহ গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার সেই সময় খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের পিতা প্রভুপাদ আনন্দ-কিশোর গোস্বামী অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। মাতার নাম স্বর্ণময়ী। শান্তিপুরের, অদ্বৈত বংশে জন্ম। ছোট থেকেই তাঁর জীবনে ভক্তিভাব ফুটে ওঠে। অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয় যোগমায়া দেবীর সঙ্গে। ধর্মসাধনে সর্বদা তিনি স্বামীর সহায়স্বরূপা ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম-মতের পরিবর্তন হয়। তাঁর জীবনীতে, তিনি এক জায়গায়

লিখেছেন, "হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম, এই বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।" কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের অগাধ কৃপা ছিল। যখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হলেন তখনও শ্যামসুন্দর তাঁকে ছাড়েননি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমি না মানলে তিনি কখনও আমায় ছাড়েন নাই।" প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামসুন্দরের সঙ্গে খেলা করতেন, কথা বলতেন। ধর্মের পাঁচটী স্তরের বর্ণনা তিনি করেছেন––নীতি, ধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা এবং তিনি তাঁর জীবনে এই স্তরের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। মিথ্যাকে তিনি জীবনে ঘৃণা করতেন। আশৈশব শ্যামসুন্দরের পূজা করে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি দেশ পর্যটন করেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হয়ে। কাশীতে দেখা পেলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে গেলেন রামগয়ায়। মনে পড়ল পূর্বজন্মের কথা। এখানে দেখা পেলেন পরমহংস ব্রহ্মানন্দের। দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে, ফিরে এলেন বিজয়কৃষ্ণ। হরিহরানন্দের কাছে নিলেন সন্ন্যাসধর্ম। শেষে মানসিক পরিবর্তন ঘটলে ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। দিনরাত নাম, হরি-সংকীর্তনে বিভোর থাকতেন। মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পুরীধামে শ্রীক্ষেত্রে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে দেহরক্ষা করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধুকুলের অন্যতম হচ্ছেন–– বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর মত ছিল––বিশ্বপ্রেমই মানুষের নিত্যধর্ম আর জনকল্যাণ সাধনই শ্রেষ্ঠ কর্ম। তিনি ছিলেন সত্য-সন্ধানী সাধক পুরুষ।

(৫১) বুনো রামনাথ:

নবদ্বীপের কাছেই একটী তেঁতুলতলায় তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত একটি টোল চালু করেন। চারিধারে গাছপালায়, বনজঙ্গলে ছিল আচ্ছাদিত। বনবাসী পণ্ডিত বলে সকলে বুনো রামনাথ বলতেন। তাঁর সহধর্মিণীও ছিলেন স্বামীর মত নির্লোভ। নির্লোভ দরিদ্র পণ্ডিত রামনাথ কোন দিন কারও কাছ হতে সাহায্য না নিয়ে নবদ্বীপ তথা সমগ্র বাংলার মান সম্মান রক্ষা করে গেছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

নবদ্বীপে বহু পণ্ডিত নব্যন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র, জ্যোতিষ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতির বহু গ্রন্থ রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা নবদ্বীপের মুখোজ্জ্বল করে সমগ্রদেশে নবদ্বীপকে বাংলার অক্সফোর্ড (Oxford of Bengal) বলে সুপরিচিত করে গেছেন।

•

(৫২) ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়:

কৃষ্ণনগরের কাছে শোনডাঙ্গা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা রামতনু মুখোপাধ্যায়, মাতা ত্রিলোচনী দেবী। শিক্ষা-জীবন শেষ করে শিক্ষকতা সুরু করেন। কৃষ্ণনগরে এ ভি. স্কুল (Anglo Vernacular) প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর নাম উল্লেখ্য। মিশনারীদের ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হয়ে চাকরী ছেড়ে নিজেই একটী পাঠশালা স্থাপন করেন নেদেরপাড়ার বারোয়ারী তলায় (১৮৪৯)। পরে আমিনবাজার বারোয়ারী তলায়, কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মমন্দিরে এই পাঠশালা হয়। শেষে ১৮৬৩ খ্রীঃ এ, ভি, স্কুল স্থাপন করেন। আজও ব্রজবাবুর স্কুল বলেই প্রাচীন লোকদের কাছে পরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রজবাবুর পাঠশালা দেখতে আসেন।

(৫৩) ভারতচন্দ্র রায়:

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বর্ধমান জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ১৭১৫ খ্রীঃ জন্ম। কিন্তু নদীয়ার রাজসভা থেকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অমর কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী' আজও সমাদৃত। ১৭৬০ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫৪) মদনমোহন তর্কালঙ্কার:

নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার বিল্বগ্রামে ১৮১৭ খ্রীঃ জন্ম, পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। শিশুশিক্ষায় তাঁর দান কোনদিন ভোলবার নয়। 'পাখীসব করে রব রাতি পোহাল...' কবিতাটি শিশুমনে চিরকাল রেখাপাত করবে। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্বীকৃত।

তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিত ছিলেন। সমাজসেবায় তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট। 'বাসবদত্তার' কবিকে কেউ ভুলতে পারে না। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৮ খ্রীঃ ৯ই মার্চ কান্দিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫৫) মনমোহন ঘোষ:

১৮৪৪ খ্রীঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্ম হলেও মনমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগর থেকে লেখাপড়া শিখে বড় হন। সকলেই তাঁকে কৃষ্ণনগরের লোক বলেই জানেন। বিলেত গিয়ে ১৮৬৬ খ্রীঃ ৬ই জুন ব্যারিস্টার হন। ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট। জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ছিল গভীর, স্ত্রী–শিক্ষা প্রসারে ছিলেন তিনি অন্যতম উদ্যোগী। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকরের সাহেবদের বর্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে তিনি লেখেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বর্তমানে কৃষ্ণনগর সরকারী স্কুল (কলেজিয়েট স্কুল) গৃহটী মনমোহন ঘোষের বসতবাড়ী ছিল। ১৮৯৬ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে পক্ষাঘাত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণনগরে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হলে তিনি সহসম্পাদক হন। তিনি নদীয়ার প্রথম প্রেস রিপোর্টার।

(৫৬) মীরমসরফ হোসেন :

এ দেশের মুসলমান সমাজে তিনিই প্রথম সাহিত্যশিল্পী। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' সেকালে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। ১৮৪৭ খ্রীঃ ১৩ই নভেম্বর লাহিনী পাড়ায় জন্ম (১২৫৪ ২৮শে কার্তিক)। তিনি কলেজিয়েট স্কুলের (কৃষ্ণনগর) ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্যের সেবা করে মীর মসরফ হোসেন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ১৩১৮ সালের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫৭) মুন্সী মোজাম্মেল হক :

শান্তিপুরে জন্ম। সুসাহিত্যিক, 'শাহনামার' বাংলা অনুবাদ করেন।

(৫৮) যতীন্দ্রমোহন বাগচী :

১৮৭৮ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর নদীয়ার যমশেরপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ জমিদার 'বাগচী' পরিবারে জন্ম। গ্রামের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর টান। স্বদেশী প্রতিটী জিনিষের উপর তাঁর ছিল মমত্ব। তিনি বিদেশীদ্রব্য বর্জন করেছিলেন। নিজে খদ্দর পরতেন। তাঁর লেখা—রেখা, লেখা, অপরাজিত, নাগকেশর, জাগরিণী, নীহারিকা, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি পুস্তকগুলি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। তিনি কেবল কবিই ছিলেন না, মজলিসীমানুষ হিসাবে তাঁর নাম যথেষ্ট ছিল। ১৯৪৮ খ্রীঃ ৩১শে জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫৯) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় :

অবিভক্ত নদীয়ার কুষ্টিয়া শহরের কাছে কয়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র আর মাতার নাম শরৎশশী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহারা যতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে আসেন মামার বাড়ীতে। ১৮৯৮ খ্রীঃ এ. ভি. স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ছোট থেকেই সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। ২৭ বছর বয়সে কয়া গ্রামে মামাত ভাইয়ের সঙ্গে শিকারে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে বাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে বাঘেমানুষে লড়াই, শেষপর্যন্ত বাঘটী মারা যায়। সেই থেকে তাঁর নাম হয় 'বাঘাযতীন'। চাকুরীজীবনে সুরু হয় তাঁর বিপ্লবী কার্য-কলাপ। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটী উজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। বালেশ্বরের বুড়ি-বালামের তীরে সশস্ত্র, পুলিশবাহিনীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম হয়েছিল তা আজও চিরস্মরণীয়। ১৯১৫ খ্রীঃ ৯ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ (বাঘাযতীন) বালেশ্বরের হাসপাতালে মারা যান।

(৬০) যদুনাথ পাল :

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল। কেবল কৃষ্ণনগর, বা নদীয়া নয়, সারা বাংলা তার গৌরবে গৌরবান্বিত। বিগত শতকের প্রথমার্ধে ঘূর্ণীতেই তাঁর জন্ম। পিতা আনন্দ পালও একজন মৃৎশিল্পী। যদুনাথের শিল্প ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ভারতের বাইরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং যদুনাথের শিল্প বিশ্ববন্দিত হয়। শিল্পখ্যাতি বিলাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কানে পৌঁছালে তিনি শিল্পীকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু যদুনাথ নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। ১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ঘূর্ণীতে মৃৎশিল্পের এক বিরাট প্রদর্শনীতে তদানীন্তন বাংলার লাটসাহেব লর্ড লিটন কৃষ্ণনগরে প্রদর্শনীতে আসেন এবং যদুনাথের বাড়ীতে গিয়ে বৃদ্ধ শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে করমর্দন করেন। কেবল তিনিই নন, লর্ড নর্থ ব্রুক, লর্ড কারমাইকেল, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি অনেকেই যদুনাথের বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর শেষজীবন কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে কাটে এবং প্রায় ১০০ বছর বয়সে কাশীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

(৬১) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ :

রাণাঘাট সাবডিভিশনে শিমহাট গ্রামে মাতামহের গৃহে যোগেন্দ্রনাথ ১৮৪৫, ১২ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস সুবর্ণপুর গ্রামে। যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় আর্যদর্শন ১২৮১ বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৪) মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদই কেবল বৃদ্ধি করেন নি পাঠ্যপুস্তক ও আইন পুস্তকও অনেকগুলি রচনা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি হন। ১৩০৬ (ইং ১৯০৪ সালের ১২ই জুন) তাঁর মৃত্যু হয়।

(৬২) রঘুনাথ শিরোমণি :

পনের শতকের কথা। নবদ্বীপে তখন বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ছাত্ররা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করতেন। ছোট্ট শিশু রঘুনাথের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে সার্বভৌম নিজে তার শিক্ষার দায়িত্ব নেন। তারপর নিজ মেধায় ও বুদ্ধিতে রঘুনাথ নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করে বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন। নবদ্বীপের পাঠ শেষ হলে গুরুদেবের আদেশে তিনি মিথিলায় শ্রেষ্ঠ উপাধি আনতে যান। কিন্তু তিনি সঙ্কল্প করেন এ প্রথার রহিত তিনি করবেনই। মিথিলায় গিয়ে অধ্যাপক মিশ্রের টোলে ভর্তি হয়ে অল্পকাল মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করে ফেলেন। সেখানে 'তার্কিক শিরোমণি' উপাধি লাভ করে দেশে ফেরেন। তখনকার দিনে পুঁথি লিখে নকল করে আনা নিষিদ্ধ ছিল। তাই রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে দেশে ফিরে নিজেই নবদ্বীপে টোল খুলে বসে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা সুরু করলেন। সারাজীবনে তিনি ৩৮ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত ন্যায়শাস্ত্রের ঠিকানা 'চিন্তামণি দীধিতি' সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। ষোলশতকের শেষভাগে রঘুনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। যতদিন ন্যায়শাস্ত্র থাকবে ততদিন নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী রঘুনাথ শিরোমণি অমর হয়ে

থাকবেন। একটী চোখে তাঁর দৃষ্টি ছিল না বলে অনেকে কানা ভট্ট বা কানা শিরোমণি বলতেন। বাবার নাম গোবিন্দ চক্রবর্তী আর মায়ের নাম গীতাদেবী।

(৬৩) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় :

অখণ্ড নদীয়ার গোস্বামী দুর্গাপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশে) বাংলা গদ্যে ও পদ্যের সব্যসাচী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; ১৮৪৫ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাজকৃষ্ণের স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি ; ২৫শে আশ্বিন ১২৯৩ (১৮৮৬ খ্রীঃ ১০ই অক্টোবর) রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

(৬৪) রাজশেখর বসু :

আদি বাড়ী বীরনগর (উলা), কিন্তু রাজশেখরের জন্ম বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে। পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখরের সাহিত্যসাধনার ফলস্বরূপ তিনি জগত্তারিণী মেডেল, সরোজিনী মেডেল, পদ্মভূষণ, রবীন্দ্র পুরস্কার, একাডেমি পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেন। তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে গড্ডালিকা, কজ্জলি, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পসল্প প্রভৃতি রসবোধের পরিচয় দেয়। চলন্তিকা, মহাভারত ও রামায়ণ (সংক্ষিপ্ত) প্রকাশ করেন। তিনি বাহিরে খুব গম্ভীর প্রকৃতির থাকলেও অন্তরে ছিলেন রসিক। ১৮৮০ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ জন্ম। ৮০ বছর বয়সে ১৯৬০ সালের ২৭ এপ্রিল মৃত্যু।

(৬৫) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ :

মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকে ২৯ মাঘ বুধবার পালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২রা মার্চ ১৮৪৫ রবিবার (২০শে ফাল্গুন) ৫৯ বছর বয়সে রামচন্দ্রের মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদে। অভিধান, বিপদচিন্তামণি, নীতিদর্শন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

(৬৬) রামতনু লাহিড়ী :

কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে বারুইহুদা গ্রামে ১৮১৩ খ্রীঃ রামতনু লাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে বিদ্যাশিক্ষা সুরু। পিতার নাম রামকৃষ্ণ লাহিড়ী। কৃষ্ণনগরের তাঁদের বাড়ীটী আজও বর্তমান, তবে হস্তান্তর হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শ শিক্ষাব্রতী। প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক এবং সাহিত্যসাধক হিসাবেও যথেষ্ট নাম ছিল। বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য নদীয়া তথা সারা বাংলায় তাঁর দান সর্বদা স্মরণীয়। ৩২ বছর শিক্ষকতা করার পর ৫২ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩ই আগস্ট ১৮৯৮ খ্রীঃ কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

(৬৭) রূপচাঁদ দফাদার :

রূপচাঁদ দফাদার প্রটেস্টেন্ট খ্রীস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি ছিলেন প্রিয়, সকলেই মাস্টারমশাই বলে ডাকত। ছোট বড়, ইতর ভদ্র সকলের সঙ্গেই তাঁর সমান সদ্ভাব। পিতার নাম নবীনচন্দ্র দফাদার, মাতার নাম প্রসন্নময়ী। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার হিসাবে নাম থাকলেও ক্রিকেট, টেনিস, হকি, বাসকেট বল প্রভৃতি সবখেলাতেই পারদর্শী ছিলেন। শিকার করতেও খুব ভালবাসতেন। কলকাতার মাঠে এরিয়ান্স ক্লাবে প্রথম প্রবেশ করেন, পরে মোহনবাগানে যোগদান করেন। সেই সময় তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ড্রিবলিং কায়দার সঙ্গে তিনি এত দ্রুত দৌড়াতে পারতেন যে সকলেরই সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বাংলার ফুটবলে এক বৎসরে উনপঞ্চাশটী গোল করে তাঁর বেশী গোলকরার রেকর্ড হয়ে আছে। কৃষ্ণনগর কলেজের ক্রীড়াশিক্ষক হিসাবে বহুদিন তিনি কাজ করেন। সদাহাস্যময় মাস্টারমশাই সকলেরই প্রিয় ছিলেন, সকলকে ভালবাসতেন। কৃষ্ণনগরের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন।

(৬৮) ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :

নাকাশীপাড়া থানার কাঁচকুলি গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর 'পাগলাঝোরা' তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

(৬৯) ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় :

জন্ম ১৮৭৩। সুধাস্মৃতি, সুধাকণা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ১৩৪৪ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ৭৬ বৎসর বয়সে ৬ই জুন ১৯৪৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বিবাহ হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণের তৃতীয়া কন্যা সুধাময়ীর সঙ্গে। তিনি নদীয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

(৭০) লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র :

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ১৮৯৫ সালের ২৩শে জুলাই ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আদিনিবাস শান্তিপুরে। শান্তিপুরের পৈত্রিক বাসভবন আজও বর্তমান। পিতার নাম রজনীকান্ত মৈত্র। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে 'ল' পাশ করে কৃষ্ণনগরে জজ আদালতে আইনব্যবসা সুরু করেন। তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় বহু কমিটীর ও বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কৃষ্ণনগরের বাড়ীটী আজও বর্তমান।

(৭১) লালমোহন বিদ্যানিধি :

নদীয়ার বনগ্রাম সাবডিভিসনে মহেশপুর গ্রামে ১২৫১ সালের চৈত্র মাসে তাঁর জন্ম। পিতার নাম রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মুগ্ধবোধ

ব্যাকরণটী লালমোহন সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে পারতেন। কাব্যনির্ণয়, সম্বন্ধনির্ণয়, মেঘদূতম্ কবিকল্পদ্রুমঃ, শিক্ষাসোপান প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ১৩২৩ সালের ১২ই আশ্বিন (১৯১৬ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর) ভোর রাত সাড়ে চারটায় শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৭২) লালমোহন ঘোষ :

১৮৪৯ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর লালমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে, কৃষ্ণনগর কলেজে ছাত্রজীবন কাটিয়ে মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৮৬৯ খ্রীঃ ব্যারিস্টারী পড়তে বিলাত যান। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাতে পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সের নির্বাচনে লিবারেল পার্টীর প্রার্থী মনোনীত হন। বিলাতে বিভিন্ন স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে প্রসিদ্ধ বাগ্মী বলে খ্যাতি লাভ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন (১৯০৩)। সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ১৯০৯ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাড়িটি বর্তমান তবে হস্তান্তরিত।

(৭৩) লোহারাম শিরোরত্ন :

কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়ায় বাড়ী। তিনি সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। মালতীমাধব, মুগ্ধবোধসার গীতিপুষ্পাঞ্জলি, বাংলাব্যাকরণ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। তিনিই প্রথম বাংলাভাষায় ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ১৮৬১ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

(৭৪) শ্যামাচরণ লাহিড়ী :

মহাত্মা শ্যামাচরণ লাহিড়ী কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণী অঞ্চলে ১২২৫ সাল, ১৬ই আশ্বিন (১৮৮২ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা গৌরমোহন (সরকার) লাহিড়ীও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন কালক্রমে সেটি নদীর স্রোতে ধ্বংস হয়ে যায়। পরে স্বপ্নাদেশে সেটিকে তুলে এনে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। আজও সেটা যেখানে আছে তা ঘূর্ণী শিবতলা নামে খ্যাত। তাঁর মায়ের নাম মুক্তকেশী। দীক্ষা গ্রহণের পরও শ্যামাচরণ লাহিড়ী ২৫ বছর চাকরী করেন। চাকরী করলেও তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন। তিনি সর্বজীবে, সর্বভূতে নারায়ণ দেখতেন। তাঁর সাধনপ্রণালী অনেক সাধুসন্ন্যাসীও তাঁর কাছ হতে গ্রহণ করেছেন। যোগবিভূতির অধিকারী মহাসাধক শ্যামাচরণ লাহিড়ী ২৩ বছর বয়সে চাকুরি-জীবন সুরু করলেও তাঁর পথ হতে কোন দিন সরেননি। যোগীরাজ শ্যামাচরণ পদ্মাসনে বসে ১৮৯৫ খ্রী ২৬শে সেপ্টেম্বর শারদীয়ার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে (১৩২০ সাল ১০ই আশ্বিন) মহাপ্রয়াণ করেন। দীর্ঘদিন পূর্তবিভাগে চাকরি করলেও তার পথ ও মত থেকে কোনদিন কখনও সরে যাননি। চাকরীর সময়ে হঠাৎ রাণিক্ষেতে বদলী এবং সেখানে দ্রোণগিরি পর্বতে অলৌকিকভাবে গুরুদেবের দর্শন, দীক্ষা প্রভৃতি গতজন্মের সুকৃতির ফলেই সম্ভব হয়। তাঁর জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে ও বিভূতি দেখা যায়। তাঁর বহু শিষ্য ছিল। বর্তমান যুগে গার্হস্থ্য জীবনকে অব্যাহত রেখে গোপনভাবে যোগসাধনা করতে তিনি নির্দেশ দিতেন।

(৭৫) শ্যামাচরণ শর্মা সরকার :

পিতা হরনারায়ণ সরকারের চাকরীস্থল পুর্ণিয়াতে ৮ই চৈত্র ১২২০ (১৮১৪ খ্রীঃ ২০শে মার্চ) শ্যামাচরণের জন্ম। আদি নিবাস চূর্ণীনদীর তীরবর্তী মামজোয়ানি গ্রামে। ১৪ বছর বয়সে তাঁর খুল্লতাত হরচন্দ্র তাঁকে কৃষ্ণনগরের নিজ বাটীতে আনেন। কারণ ৫ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীনাথ লাহিড়ীর কাছে শ্যামাচরণ ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্য, কৈশোরে জীবন নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটে। তারপর নিজ চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আরবী, ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা লাভ করে সুপণ্ডিত হন এবং ১৮৭২ খ্রীঃ বাঙালীদের মধ্যে প্রথম 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে মনোনীত হন। তখন এই পদের দক্ষিণা ছিল দশ হাজার টাকা। ১৮৭৪ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। বাঙ্গলা ব্যাকরণ, ব্যবস্থাদর্পণ, পাঠ্যসার, নীতিদর্শন প্রভৃতি ছাড়াও ইংরাজী ভাষায় কয়েকটী পুস্তক রচনা করেন।

(৭৬) শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী :

১২৮০ বঙ্গাব্দ ২৩শে মাঘ কৃষ্ণপঞ্চমীতে (১৮৭৪ খ্রীঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী) পুরীধামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, মাতা শ্রীমতী ভগবতী দেবী। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন এবং 'জ্যোতিবিদ' এবং 'বৃহস্পতি' সম্পাদন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে সুরু করেন। পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। দেশে-বিদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার সুরু করেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার, বহু মৌলিক বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা, পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রভৃতির দ্বারা মানুষের মনে ভগবৎ বিশ্বাস, ধর্মে আস্থা আনার চেষ্টা করেন। শ্রীধাম মায়াপুরে মঠ, স্থাপন করে আপন সাধনায় মগ্ন থাকেন। জনহীন পল্লীকে মন্দিরময় করে তোলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৬ই পৌষ (১৯৩৭ সাল ১লা জানুয়ারী) কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন।

(৭৭) শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী :

কৃষ্ণনগরে ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর নাম স্মরণীয়। রামতনু লাহিড়ীর তিনি অনুজ।

পিতার নাম রামকৃষ্ণ লাহিড়ী। হেয়ার সাহেবের তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১২৪৩ সালে নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগরের নিজ গৃহে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই ইংরাজীশিক্ষা দিতেন। ১৮৪৬ সালে ১লা জানুয়ারী কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রসাদ তাঁর ছাত্রদের কলেজে পাঠিয়ে দেন। ইংরাজী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। কৃষ্ণনগর জর্জ আদালতে তিনি সামান্য ৮০ টাকা বেতনের সেরেস্তাদার ছিলেন। এই সামান্য অর্থের সামান্য অংশ নিজের জন্য খরচ করতেন, বাকী বিলিয়ে দিতেন দরিদ্রদেব মধ্যে।

(৭৮) কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস:

১৮৬১ খ্রীঃ কৃষ্ণগঞ্জেব কাছে ইছামতী নদীর তীরে নাথপুর গ্রামে কর্ণেল সুবেশচন্দ্র বিশ্বাসেব জন্ম। পিতা গিবীশচন্দ্র বিশ্বাস। ছোট হতেই সুরেশচন্দ্র ছিল দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ। মাত্র ১৪ বছব বয়সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে পথে পথে ঘুরে রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে ঘুরে এক জাহাজে চাকবী নিয়ে লণ্ডন যান। সেখানে নানান কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন, জ্যোতিষ, গণিত ও অনেক ভাষায় জ্ঞান লাভ কবে এক সার্কাসদলে যোগ দেন। ব্রেজিলে গিয়ে সেনা-বিভাগেব কাজে যোগদান করেন। পরে নিজ অধ্যবসায়ে কর্ণেল পদ লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ৪৫ বছর বয়সে ব্রেজিলের বাজধানী রাই-ও-ডি-জেনিবোতে কর্ণেলেব মৃত্যু হয়।

(৭৯) সুরেশচন্দ্র মজুমদার:

১২৯৫ সাল ৮ই পৌষ (১৮৮৮ খ্রীঃ) সুরেশচন্দ্রের জন্ম। পিতা মহেন্দ্রনাথ দাশমজুমদার নদীয়া জেলাবোর্ডের ওভারশিয়ার ছিলেন। মাতার নাম উপেন্দ্রমোহিনী দেবী। কৃষ্ণনগরেই সুরেশচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সুরু। কিশোর বয়সে যতীন মুখার্জীর সঙ্গে কৃষ্ণনগরেই পরিচয় হয় এবং জীবিকার সংগ্রামের পরিবর্তে দেশের মুক্তিসংগ্রামে বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। তারপর কয়েক বছর জেলখাটার পর হঠাৎ শ্রীমতী সরলাবালা সরকারের নজরে পড়ে যান। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ১৯১৪ সালে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ক্ষুদ্রাকারে কলকাতায় সুরু করেন এবং নূতন ব্যবসায়ে মন দিলেও সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলতেন। সুরেশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি—দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ। ১৯২২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন প্রথম আনন্দবাজার প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ কাজে নূতন নূতন সৃষ্টি, দ্রুত মুদ্রণ, লাইনোটাইপ প্রভৃতি মুদ্রণজগতে তিনিই প্রথম রূপান্তর আনলেন। ক্রমশঃ সাপ্তাহিক দেশ, দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

(৮০) হরিদাস ঠাকুর:

হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব জীবনী কিছু বিশেষ জানা যায় না। তবে চৈতন্যমঙ্গলে আছে –

> উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর ॥
> সুরনদী তীরে ভাট কলাগাছি গ্রাম।
> হীনকুলে জন্ম হয়ে উপরি পূর্ব নাম।
> —জয়ানন্দ, চৈ. ম.

ইনিই যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একজন সাধক কুলরত্ন। তাঁর ন্যায় নির্যাতন ভোগ আব কেউ করেছেন কিনা জানা নেই। তখনকার দিনে কাজীর বিচাবে দু'একটি বাজারে নয়, বাইশ বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খালিগায়ে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। তথাপি তিনি হবিনাম ছাড়েননি। নামগানের এরূপ মহিমা বিরল। প্রতিদিন তিনি লক্ষ 'হরেকৃষ্ণ' নাম মহামন্ত্র কীর্তন করতেন। শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় এসে তিনি ভজনসাধন সুরু করেন ও সিদ্ধি লাভ করেন। অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে তাব এই সময় দেখা হয়। এবং প্রায় প্রত্যহই ভাগবত পাঠ, কীর্তনে যোগ দিতেন। এর পরেই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনলাভ তিনি পান। সেই থেকে নদীয়ায় হরিনাম প্রচার কার্যে শ্রীগৌরাঙ্গের একজন প্রধান সহায় হন। ফুলিয়ায় 'হরিদাসের গুম্ফা' আজও আছে।

(৮১) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়:

টডের রাজস্থান রচয়িতা হবিমোহন মুখোপাধ্যায়েব বাড়ী ছিল শান্তিপুরে।

(৮২) হরিধন মজুমদার:

১৮৩৩ খ্রীঃ (১২৪০ সাল শ্রাবণ মাস) হরিধনের জন্ম হয় কুমারখালিতে (বর্তমানে বাংলাদেশ)। বিজয়বসন্ত, পদ্য পুণ্ডরিক, কাঙ্গাল ফকিরচাঁদ, ফকিরের গীতাবলী প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাহিত্য ছাড়াও দেশের কাজে তাঁর দান অতুলনীয়। তিনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিতি লাভ করেন। ৬৩ বৎসর বয়সে (৫ই বৈশাখ ১৩০৩) ১৮৯৬ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিল পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তাঁর মৃত্যু হয়।

(৮৩) হরিপদ চট্টোপাধ্যায়:

নদীয়া জেলার এক বিখ্যাত পরিবারে ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট প্লীডার ছিলেন। তাঁর ভাগ্নে যতীন মুখার্জী (বাঘাযতীন) তাঁদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করতেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯১৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ হতে আই, এস-সি, এবং ঢাকা কলেজ হতে ১৯১৮ সালে বি, এ, পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠাতে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে কয়েকবার কারা-

বরণ-করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ জেলার সংযোগস্থলে জলঙ্গীনদীর ধারে সুন্দর শান্ত পরিবেশে 'সাহেবনগর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠান' নামে একটী আশ্রম ও একটী গোপালন, কৃষিক্ষেত্র ৪০৪ বিঘা জমি নিয়ে সুরু করেন। ১৯৩৬ সালের ৫ই জানুয়ারী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানটীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার এবং পরে এসেম্বলীর সভ্য নির্বাচিত হন। তার বাগ্মিতা সকলকে বিস্মিত করত। পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন অনেক দিন। বাংলার রাজনৈতিক ও সংগঠন কর্মক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট। ১৯৪০ সালে শ্রীমতী প্রীতি দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সেকেন্ড লেফটেনান্ট অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

(৮৪) হেমচন্দ্র বাগচী :

১৯০৪ খ্রীঃ (১৯শে আশ্বিন) রবিবার মহালয়ার দিন মধ্য রাত্রে হেমচন্দ্র বাগচীর জন্ম হয় কালীগঞ্জ থানার গোকুলনগর গ্রামে। পিতা রাখালদাস বাগচী, মাতা নিলাজবরণী দেবী। ছোট হতেই তাঁর কবি-মন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যেত। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা সুরু করেন। ছোট হতেই কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাবই তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। নিজবৈশিষ্ট্যে যে কাব্য রচনা সুরু করলেন তা কেবল নূতন ধারারই সৃষ্টি করেনি, চাঞ্চল্য এনেছিল সাহিত্যজগতে। তাঁর 'দীপান্বিতা' পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন তা, হেমচন্দ্রের প্রতিভাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর লেখা কয়েকটি বই---দীপান্বিতা (১৩৩৫), তীর্থপথে (১৩৩৯), মায়াপ্রদীপ (১৩৪১), তপনকুমারের অভিযান (১৩৪৪), মানসবিরহ (১৩৪৫), কবিকিশোর (১৩৪৮) প্রভৃতি। এ ছাড়াও বহু পত্রপত্রিকায় বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন। বহু পাণ্ডুলিপি আজও পড়ে আছে। কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণীতে তাঁদের বাড়ীতে দীর্ঘ দিন কাটান। সেই সময় 'বৈশ্বানর' নামে একখানি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আজ কবি অসুস্থ, গ্রামের বাড়ীতে আছেন। কল্লোলযুগের কবি নদীয়ার একটী উজ্জ্বল রত্ন আজ সাহিত্যজগতে বিস্মৃতপ্রায়। জীবিত থেকেও আজ তিনি মৃত।

(৮৫) হেমন্তকুমার সরকার :

১৮৯৫ সালে ৫ই মে কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মদনমোহন সরকার। মাতার নাম নিরোদবরণী দেবী। নদীয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে হেমন্তকুমার একটী উজ্জ্বল রত্ন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল শান্তিপুরের কাছে বাগআঁচড়া গ্রামে। তিনি বাল্যকাল হতেই একজন কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ হতে বি, এ, পাশ করেন এবং ঈশান স্কলারশিপ পান। কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকার তিনিই প্রথম ছাত্রসম্পাদক। ১৯১৯ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এম, এল, সি, নির্বাচিত হন। নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রথম সভাপতি তিনিই। দেশের কাজে তিনি কয়েকবার কারা-বরণ করেন। স্বরাজ্যদলের চিফ হুইপ হন। তিনি সুভাষচন্দ্রের একান্ত বন্ধু ছিলেন। সুযোগ পেলেই সুভাষচন্দ্র কৃষ্ণনগরে তাঁর কাছে আসতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর কাছে কৃষ্ণনগরে এসে থেকেছেনও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তিনি ছিলেন একান্ত সচিব ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে সংবাদপত্র-জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি ২১ খানি গ্রন্থের প্রণেতা। বিদ্রূপাত্মক রচনায় তাঁর নাম ও খ্যাতি ছিল। 'সুভাষের সঙ্গে বার বছর' নামে বইখানি হতে তাঁর সঙ্গে সুভাষের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের কথা জানা যায়। সদাহাস্যময়, সুরসিক, কৃষ্ণনাগরিক, নদীয়ার সুসন্তান হেমন্তকুমার ২৯শে নভেম্বর ১৯৫২ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

(৮৬) হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী :

রামচন্দ্রেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ১৭৬২ খ্রীঃ পালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর যেমন জ্ঞান তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করলে তাঁর নাম হয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত এবং এই নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩২ থেকে জানা যায় ৭০ বৎসর বয়সে ১৭ই জানুয়ারী ১৮৩২ (মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে) কাশীতে তিনি পরলোক-গমন করেন।

(৮৭) ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় :

নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় পিতার মতই বিদ্যোৎ-সাহী, সংস্কৃতি অনুরাগী, সাহিত্য ও সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন। নদীয়া জেলাবোর্ডের তিনি প্রথম বেসরকারী সভাপতি (Chairman) হন। তাঁর চেষ্টাতেই ১৯২৭ সালে নভেম্বর মাসে মনমোহন ঘোষের সুন্দর বিরাট বাড়ীতে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের হিন্দুছাত্রাবাসটী ১৯২৭ সালে ১১ই জুলাই মহারাজা উদ্বোধন করেন। অনেকগুলি মন্দির তিনি সংস্কার করেন। মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র বাংলার লাট কাউন্সিলের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। বহু জনহিতকর কাজ করে তিনি সকলেরই প্রশংসা লাভ করেন। ২২শে মে ১৯২৮ তাঁর মৃত্যু হয়।

(৮৮) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় :

কৃষ্ণনগরে বাড়ী। পতাকা, নবপ্রভাত সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সুসাহিত্যিক ছিলেন।

বিশিষ্ট স্থান

ঐতিহ্যমণ্ডিত জেলা এই নদীয়া। এ জেলার অনেক প্রাচীন বিখ্যাত গ্রাম আজ হয় নিশ্চিহ্ন না হয় হতশ্রী। তবু যেসব গ্রাম আছে তার মধ্যে ইতিহাসের দিক থেকে, প্রাচীনত্বের দিক থেকে দেখবার ও জানবার আছে। নতুন নতুন যে সব জনপদ গড়ে উঠেছে সেগুলিও দেখবার। পুরনো ও নতুন মিলিয়ে বর্তমান নদীয়ায় আজও যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

(১) নবদ্বীপ :

হিন্দুরাজত্বের শেষভাগে লক্ষ্মণ সেনের আগমনে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল এই নবদ্বীপ। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এখনও নবদ্বীপের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলে। নবদ্বীপের ইতিহাস নিয়েই নদীয়া তথা বাংলার ইতিহাস। নূতন দ্বীপ, নয়টী দ্বীপ বা নয়াদ্বীপ থেকে নবদ্বীপ। আর নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামের উৎপত্তি। এই নবদ্বীপে সেকালে ভারতবর্ষের সকল স্থান থেকে বিদ্যার্থীরা শিক্ষালাভ করতে আসতো। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের টোলে শিক্ষালাভ না করলে তখনকার দিনে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হত না। নবদ্বীপে বিভিন্ন বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতরা কেবল বসবাসই করতেন না, সারাদেশে শিক্ষা দিতেন। নবদ্বীপ থেকেই ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্য নবদ্বীপকে Oxford of Bengal বলা হত। নদীয়া নামের উৎপত্তি নবদ্বীপ, নয়টী দ্বীপ বা নদীয়া থেকে।

নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥

১৪০৭ শকে বাসন্তী সন্ধ্যায় ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমা তিথিতে (১৪৮৬ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী) নদীয়াসুন্দর গৌরচন্দ্র এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে নবদ্বীপকে পবিত্র করেছেন। সেই পুণ্যভূমি নবদ্বীপ সমস্ত হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান। শ্রীচৈতন্যদেব সারা দেশে নতুন মত পথ প্রচার করে সকলকে প্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়ে ধর্মের নতুন এক দিক তুলে ধরেছেন। প্রাচীনকাল থেকে আজও তাই নবদ্বীপ বাংলার গুপ্ত বৃন্দাবন হিসেবে এক মহাতীর্থস্থান। এই নবদ্বীপে প্রচুর মন্দির, মঠ, দেবস্থান আজও বর্তমান। বৈষ্ণবদের আখড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বড় আখড়া বা তোতারাম বাবাজীর আখড়া, সিদ্ধ চৈতন্যদাসের আখড়া, সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজীর আখড়া, নৃসিংহদেবের আখড়া, শ্রীবাসঅঙ্গন, সমাজবাড়ী প্রভৃতি। মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বুড়োশিবতলা, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মন্দির, গোবিন্দজীউর মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির, পোড়ামাতলা প্রভৃতি। সারা নবদ্বীপে অসংখ্য মঠ মন্দির আছে, আর আছে বহু প্রাচীন টোল, বঙ্গবিবুধ জননী সভা, রাধারমণ সেবাশ্রম, প্রাচীন লাইব্রেরী। নবদ্বীপের তাঁত, কাঁসাপিতল শিল্পের আজও নাম আছে। প্যাক কোম্পানীর ঘড়ির কারখানা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতে স্নানাদির জন্য প্রত্যহ লোকসমাগম হয়। রাস-উৎসব এখানকার বিশেষ উৎসব। কয়েকটি ধর্মশালা ছাড়াও বহু হোটেল আছে। বহু ঠাকুরবাড়ীতে প্রাসাদের ব্যবস্থাও আছে। নবদ্বীপের একপ্রান্তে গঙ্গাতীরে বঙ্গবাণীতে শ্রীঅরবিন্দের পূতঃ স্মৃতিসৌধ রয়েছে। ডঃ মহানাম ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম ও মন্দির পোড়ামাতলার কাছেই নতুন হয়েছে। হাওড়া থেকে ট্রেনে নবদ্বীপধাম রেল স্টেশনে এসে নামা যায়, তাছাড়া কলিকাতা থেকে বরাবর সড়ক পথেও নবদ্বীপে আসা যায়। কৃষ্ণনগর থেকে ছোট লাইনে নবদ্বীপঘাটে আসা যায়। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে নবদ্বীপ মাত্র ৮ মাইল। নবদ্বীপঘাট স্টেশন থেকে গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপে যেতে হয়। পারাপারের সুবন্দোবস্ত আছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ এখানে পৌরসভার কাজ সুরু হয়। নবদ্বীপ নদীয়ার মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল শহর। এখানে কয়েকটি স্কুল এবং একটি কলেজ আছে।

(২) শ্রীধাম মায়াপুর :

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এক সম্প্রদায়ের মতে শ্রীধাম মায়াপুরেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতে গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে আসল জন্মস্থান লুপ্ত হয়েছিল, পরে কয়েক জন বৈষ্ণব ভক্তের ঐকান্তিকতায় শ্রীমায়াপুর উদ্ধার হয়। এখানে সুউচ্চ মন্দির স্থাপন ও শ্রীশ্রীগৌর, বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর স্থানটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান হতে ভারতের সর্বত্র শ্রীনাম প্রচারের ব্যবস্থা হয়। বর্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ সারা বিশ্বে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম ও তার ভাবধারা প্রচার হচ্ছে এবং তাঁরই চেষ্টায় কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট এক বিরাট মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণব উৎসবগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। দর্শকদের ও ভক্তদের থাকবার জন্য কয়েকটি ধর্মশালা ও ছোট ছোট বাড়ী আছে। পল্লীর শান্ত পরিবেশে শ্রীমায়াপুর একটি মনোরম স্থানই কেবল নয়, ভজনপূজনের একটি আদর্শ জায়গা। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বৈদ্যুতিক আলো আছে। কৃষ্ণনগর থেকে সড়ক পথে যাবার ব্যবস্থা আছে। বাস চলাচল করে। নবদ্বীপ থেকে গঙ্গাপার হয়েও শ্রীমায়াপুরে যাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযোগপীঠ (মহাপ্রভুর জন্মস্থান), খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা (শ্রীবাস অঙ্গন), আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়ী, শ্রীচৈতন্যমঠ।

(৩) বামুনপুকুর :

শ্রীমায়াপুরের পাশেই প্রাচীন পল্লী বামুনপুকুর। এই গ্রামের সন্নিকটে বল্লালঢিবিটি আজও বল্লাল সেনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গ্রামেই চাঁদকাজীর সমাধি দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণনগর থেকে সড়কপথে বাস চলাচল করে। কাছাকাছি উল্লেযোগ্য গ্রাম স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ, বিল্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর। বেলপুকুরে বহু পণ্ডিতের বসবাস।

(৪) হরধাম :

রাণাঘাটের নিকটে চূর্ণী নদীতীরে প্রাচীনগ্রাম এই হরধাম। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জেলায় কয়েকটি স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন—তার মধ্যে হরধাম অন্যতম। আজ এই গ্রাম শ্রীহীন, নগণ্য পল্লীতে পরিণত হলেও একদিন লোকজনে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে এই নগণ্য গ্রাম অবহেলিত হলেও ঐতিহাসিকদের কাছে এই গ্রামের মূল্য আজও আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীর দুই তীরে দুটি বাটি নির্মাণ করেন, একটির নাম হরধাম অপরটির নাম আনন্দধাম রাখেন। হরধামের নামানুসারেই গ্রামের নাম হয়। মতান্তরে আনন্দধামের বাড়ীটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরে রাজকুমার ঈশানচন্দ্রের নির্মিত। হরধামের সুরম্য প্রাসাদটি যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর। বিরাট এলাকা নিয়ে কয়েক মহলে সাজানো প্রাসাদ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র হরধাম প্রাসাদে বসবাস করেন এবং বহু আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণদের এই গ্রামে নিয়ে এসে জমি দান করে বসবাস করান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্কিত বংশাবলী আজও এই নগণ্য গ্রামে অতি হীন অবস্থায় বিদ্যমান।

(৫) বাগআঁচড়া :

আর একটি প্রাচীন গ্রাম। ঐতিহাসিকদের কাছে এই গ্রামটীর যথেষ্ট মূল্য আছে। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মাঝে এই গ্রাম বাগআঁচড়া। শ্রীশ্রীবাগদেবীমাতার স্থান বলে বাগ-আঁচড়ার খ্যাতি। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলে এই স্থানটীকে সিদ্ধাশ্রমও লোকে বলে থাকে। বাগদেবীর বিল বা গোপেয়ার বিলের ধারে চাঁদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দিরটী বট অশ্বত্থ গাছে ধ্বংসপ্রায়। মন্দিরের গায়ে খোদিত শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৮৫৭ শকে (১৬৬৫ খ্রীঃ) চাঁদ রায় এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই চাঁদ রায় কে তা সঠিক জানা যায় না। নানাজনের নানামত চাঁদ রায় সম্বন্ধে, তবে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে উল্লেখ আছে—'প্রিয় জাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়'। চাঁদ রায়ের নামানুসারে এই গ্রামকে অনেকে চাঁদড়া বা চাঁদুড়াও বলে থাকে। পাশেই ব্রহ্মশাসন প্রাচীন গ্রামটী আজ ধ্বংসপ্রায়। মহারাজ রুদ্র ১০৮ ঘর সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিয়ে গিয়ে এই গ্রামে বসান এবং জমি দান করেন। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম বলে এর নাম হয় ব্রহ্মশাসন। এই গ্রামেরই একজন তান্ত্রিক সাধক চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি মহারাজা গিরীশচন্দ্রের সময় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

(৬) শিবনিবাস :

কলকাতা থেকে ৬৫ মাইল দূরে মাজদিয়া স্টেশনের মাত্র দু মাইল দূরে প্রাচীন শিবনিবাস গ্রামটী চূর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। কৃষ্ণনগর-মাজদিয়া রাস্তায় বাস চলাচল করে। কৃষ্ণনগর থেকে ১৪ মাইল দূরে শিবনিবাস। প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রাম শিবনিবাসকে পূর্বে কাশীর সংগে তুলনা করা হত।—

শিবনিবাস তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি, নীচে বাজে ঠন্‌ঠনা॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নসরত খাঁ নামক জনৈক দস্যুকে দমন করার জন্য এইখানে শিবির সন্নিবেশ করেন। সেই সময় স্থানটি তাঁর পছন্দ হয় এবং তিনদিকে চূর্ণীনদী প্রবাহিত থাকায় সুরক্ষিত বলেও মনে করেন। অবশেষে এখানে নগর প্রতিষ্ঠা করে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও নাম রাখেন 'শিবনিবাস'। কেউ বলেন শিবের নামানুসারে নগরের নাম রাখেন শিবনিবাস, আবার কেউ বলেন পুত্র শিবচন্দ্রের নামানুসারে নগরের নামকরণ করা হয়। বিরাট প্রাসাদ, মন্দির, পূজাবাড়ী আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবলমাত্র তিনটি মন্দির অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশপ হিবর ১৮২৪ খ্রীঃ শিবনিবাসে এসেছিলেন। তিনি তাঁর লিখিত বিবরণে রাজবাড়ীর প্রবেশদ্বারের 'গথিক' কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং ৪টি মন্দিরেরও উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে তিনটি মন্দির বর্তমান এবং প্রতিটি মন্দিরে শিলালিপি আছে। দুটি শিবমন্দির, অপরটি রামসীতার মন্দির। স্থানটি মনোরম। মাজদিয়াতে জেলাপরিষদের ডাকবাংলো আছে। রাজরাজেশ্বর শিব ও রামচন্দ্রের মন্দির প্রাঙ্গণে ভীম একাদশীর মেলাটি প্রাচীন।

(৭) ফুলিয়া :

ফুলিয়ার নাম মহাকবি কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করে। আজও ফুলিয়া গেলে কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভের ফলকের লেখা দেখা যাবে—

হেথা দ্বিজোত্তম্
আদি কবি বাংলার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণাম।

এই গ্রামরত্ন ফুলিয়াতেই ১৪৪০ খ্রীঃ মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। 'ফুলেমেলের' সৃষ্টি এখান হতেই। কৃত্তিবাস-কূপ ও কৃত্তিবাস স্মৃতি-বিদ্যালয় অতীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি বছর মাঘ মাসে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এখানে কৃত্তিবাসের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

ফুলিয়া কেবল কৃত্তিবাসের জন্মস্থানই নয়, ইহা যবন হরিদাসের সাধনপীঠ। সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে আগমন করেন। তাঁরই আদেশে জগদানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার বিগ্রহ আজও নিত্য সেবিত হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রামরত্ন ফুলিয়ার নিকটেই গড়ে উঠেছে ফুলিয়া উপনগরী। রাণাঘাট-শান্তিপুর লাইনে ফুলিয়া স্টেশন আছে। তাছাড়া রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর যাবার সড়কপথের দুধারে প্রাচীন ও নবীন ফুলিয়ায় যাতায়াত করা যায়। কৃত্তিবাসের ফুলিয়া যবন হরিদাসের ফুলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণস্পর্শে পবিত্র গ্রামরত্ন ফুলিয়া এবং তার কাছেই উপনগরী ফুলিয়া সকলেরই দ্রষ্টব্য স্থান। ফুলিয়া উপনগরীর তাঁতশিল্প এখন বিখ্যাত।

(৮) দিগনগর :

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রাম দিগনগর। কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর ছোট লাইনের স্টেশন দিগনগর। তাছাড়া জাতীয় সড়ক ৩৪ নং-এর ধারেই এই প্রাচীন গ্রামটি স্বাধীনতালাভের পর লোকজনের বসবাসে আবার জমজমাট হয়ে উঠেছে। এই গ্রাম কৃষ্ণনগর থেকে ছ'মাইল আর শান্তিপুর থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত। রাজা রুদ্র যে পথটি বহুকাল পূর্বে নির্মাণ করান আজ সেই পথই জাতীয় সড়কে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজা রাঘব এই গ্রামে জলকষ্টের সংবাদ পেয়ে এখানে বিরাট একটি দীঘি কাটান। তখনকার দিনে এই দীঘি কাটতে খরচ হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। দীঘির বাঁধান ঘাট, বাড়ী, মন্দির আজ লুপ্ত, তবে একটু দূরেই আর যে দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তা আজও অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাঘবেশ্বর মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ দেখবার মত। মন্দিরগাত্রের উৎকীর্ণ শ্লোক থেকে জানা যায় ১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খ্রীঃ) রাজা রাঘব এই দীঘি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামে 'কল্পতরু' বৃক্ষ বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থস্থানস্বরূপ। বৎসরান্তে উৎসব হয়।

(৯) গঙ্গাবাস :

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গঙ্গাবাস আজ বিস্মৃতির পথে। আজও অবশ্য শেষ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হরিহরের মন্দির, বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আর বিগতযৌবনা অলকানন্দা। কৃষ্ণনগর থেকে পাঁচ মাইল দূরে আমঘাটার কাছেই এই প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ যাবার পথে এবং ছোট লাইনে আমঘাটা স্টেশনের কাছেই এই গ্রাম।

(১০) ধর্মদা :

নাকাশীপাড়া থানার একটি প্রাচীন পণ্ডিতবহুল গ্রাম। কৃষ্ণনগর-লালগোলা লাইনে মুড়াগাছা স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যেতে হয়। মুড়াগাছা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানেও অনেক বড় পণ্ডিত ও ধনী শিক্ষিত ব্যক্তির বসবাস ছিল। ধর্মদা গ্রামে পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী, নৈয়ায়িক পণ্ডিত জগৎচন্দ্র তর্কালঙ্কার, ব্যাকরণ ভাষাবিদ অধ্যাপক দেবেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে কেবল ধর্মদাই নয় সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। এই গ্রাম এককালে সংস্কৃতশিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। কাঁসাপিতলের শিল্পে ধর্মদা একদিন সুনাম অর্জন করেছিল। আজও শিল্পটি টিকে আছে।

(১১) নাকাশীপাড়া :

কৃষ্ণনগর-লালগোলা লাইনে বেথুয়াডহরী স্টেশন থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে এই প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। কৃষ্ণনগর থেকে বাসও এই গ্রামে চলাচল করে। এখানকার প্রাচীন শিবমন্দির, প্রাচীন জমিদারবাড়ীর ঠাকুরদালানের কারুকার্য দেখবার মত। এককালে এটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। নাকাশী-পাড়ার পাশেই ব্রহ্মাণীতলায় ও গোটপাড়ায় যথাক্রমে ব্রহ্মাণী পূজার মেলা ও স্নানযাত্রার মেলা প্রতি বৎসর হয়।

(১২) দেপাড়া :

দেবপল্লী বা দেপাড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল দূরে এই প্রাচীন গ্রামটী অবস্থিত। গ্রামটী যে খুব বড় বা নামকরা গ্রাম ছিল তা নয়, এখানকার নৃসিংহদেবের মন্দির ও মূর্তিটীই স্থানটির প্রাচীনত্ব, ইতিহাস ও গ্রামের নাম বজায় রেখেছে। কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ যাবার ছোট লাইনে কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যাওয়া যায় অথবা কৃষ্ণনগর হতে ভালুকা যে বাস যাতায়াত করে সেই বাসেও যাওয়া যায়। বৃহৎ কষ্টি পাথরের উপর খোদিত নৃসিংহদেবের মূর্তিটী প্রায় চার ফুট। এই মূর্তি ও মূর্তির অঙ্গহানি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রতি বছর বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এখানে উৎসব হয়।

(১৩) ঘোষপাড়া :

নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার সঙ্গম স্থলে নদীয়ার প্রায় শেষ প্রান্তে কল্যাণীর পাশেই ঘোষপাড়া গ্রাম অবস্থিত। এখান-কার আউলবাউলের মেলাই ঘোষপাড়ার নাম বজায় রেখেছে। ফাল্গুনমাসে দোল পূর্ণিমার আগের দিন এখানে উৎসব সুরু হয় ও পরদিন শেষ হয়। কর্তাভজা দলের অনুগামীদের ও ভক্তদের এই মেলা ও উৎসব। সতীমায়ের সমাধি ও সতীমায়ের সিদ্ধিলাভের স্থান ডালিমতলায় আজও ভক্তবৃন্দের ভীড় জমে।

(১৪) বিল্বগ্রাম :

নাকাশীপাড়া থানার একটি প্রাচীন পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম। এককালে প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণের বসবাসে এই গ্রামটি সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং বহু টোল ছিল। এখানকার নীলমাধব তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ভুবন বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামেই ১২১২ সালে

মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করে সুধী পন্ডিতসমাজে বিল্বগ্রামকে চিরস্মরণীয় করে গেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে এই বিল্বগ্রামে কালিদাস সিদ্ধান্ত নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ৺রাধামদনমোহন বিগ্রহ এখানে আজও নিত্যসেবিত হয়ে আসছেন। দ্রষ্টব্য মধ্যে প্রাচীন মদনমোহন মূর্তি ও মদনমহিম তর্কালঙ্কারের জন্মভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ।

(১৫) দেবগ্রাম :

রাণাঘাট-লালগোলা লাইনে দেবগ্রাম স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়। জাতীয় সড়ক ৩৪ নং-এ বাসেও যাতায়াত করা যায়। প্রাচীন দেবগ্রাম পূর্বে দেবপল্লী নামে পরিচিত ছিল এবং এখানে রাজা দেবপালের রাজধানী ছিল। আজ অতীতের সব ইতিহাস হারিয়ে বর্তমান দেবগ্রামে নূতন জনপদ গড়ে উঠছে। ব্যবসাবাণিজ্যে, চাষবাসে সবদিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে দেবগ্রাম। এখানে হাই স্কুল, ব্লক অফিস, হেল্‌থ সেন্টার প্রভৃতি আছে। জেলা পরিষদের একটি ডাকবাংলো স্টেশনের কাছেই আছে। কয়েক মাইল ভিতরে কালীগঞ্জ থানা। এখানকার (কালীগঞ্জ) শোলার কাজ এককালে কেবল খ্যাতি অর্জনই করেনি অর্থ উপার্জনও হত। আজ শোলাশিল্পটী ধ্বংসপ্রায়। কালীগঞ্জ থানায় ঘোড়াইক্ষেত্র, নোয়াসা, পাগলাচণ্ডী প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রাচীন।

(১৬) বেথুয়াডহরী :

নাকাশীপাড়া থানার একটী বিশেষ ব্যবসাকেন্দ্র। লোক-জনে, দোকানপাটে জমজমাট বর্তমান বেথুয়াডহরী একটী বিরাট গঞ্জে পরিণত। এখানে ছেলেদের ও মেয়েদের হাই স্কুল, ৫০ শয্যার হাসপাতাল, পাঠাগার, ব্লক অফিস, থানা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস, সাবরেজিস্ট্রী অফিস, সিনেমা, ব্যাঙ্ক, মিল্ক-চিলিং সেন্টার, গো-মহিষ উন্নয়ন কার্যালয় প্রভৃতি বহু অফিস জায়গাটীর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে কৃষি বিভাগের ইক্ষুগবেষণা কেন্দ্র স্থপিত হয়েছে। একটি হরিণ উদ্যান সমন্বিত বনবিভাগে স্থানীয় বাংলোটি মনোরম। এখানে জেলা পরিষদেরও একটি ডাকবাংলো আছে।

(১৭) ধুবুলিয়া :

এককালে নগণ্য গ্রাম ছিল মাত্র। পরে দেশবিভাগের পর এখানে উদ্বাস্তুশিবির স্থাপিত হয়। বর্তমানে স্কুল, হাসপাতাল, দোকানপাট ও উদ্বাস্তুশিবির মিলিয়ে এক বিরাট জনপদে পরিণত হয়েছে। রেলপথে ধুবুলিয়া স্টেশন আছে। তাছাড়া ৩৪ নং জাতীয় সড়কপথে বাসেও যাতায়াত করা যায়। এখানে পশ্চিমবংগ সরকারের এক হাজার শয্যাযুক্ত যক্ষ্মা-হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর ২নং ব্লকের ব্লক অফিসও আছে।

(১৮) পলাশী :

পলাশী লালগোলা লাইনে নদীয়া জেলার শেষ রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশন থেকে প্রায় দুমাইল পশ্চিমে ইতিহাসবিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তর অবস্থিত। ইংরাজের রাজত্বের পত্তনের স্মৃতিস্তম্ভটী আজও অতীতের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পি, ডব্লু ডির একটী সুন্দর ডাকবাংলো আছে এবং ডাকবাংলোতেই তদানীন্তন যুদ্ধের একটী নক্সা ও মডেল আছে। এখানকার চিনির কল নদীয়ার একটী বৃহৎ শিল্প। চিনির কল, পলাশী স্টেশন ও সংলগ্ন জাতীয় সড়ককে কেন্দ্র করে দোকানপাট, বৈদ্যুতিক আলো, স্কুল, সিনেমা, ব্যবসা-বাণিজ্যে পলাশী দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

(১৯) বানপুর মাটিয়ারী :

সীমান্তবর্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। রাণাঘাট-গেদে লাইনে বানপুর স্টেশন থেকে প্রায় একমাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। যাতায়াতে সড়কপথেও সুবিধা আছে। ঐতিহাসিক গ্রাম বানপুর মাটিয়ারী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে তাঁর পৌত্র রাজা রাঘব এখান হতে রাজধানী কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করেন। এই গ্রামেই পীর মল্লিক গস্ নামে জনৈক মুসল-মান ফকিরের সমাধি আছে। প্রতি বছর অম্বুবাচীর সময় এখানে মেলা হয়।

(২০) আড়ংঘাটা :

কলকাতা হতে ৫৬ মাইল দূরে রাণাঘাট-গেদে লাইনে আড়ংঘাটা অবস্থিত। যুগলকিশোরের মন্দির এবং পূজা ও মেলার জন্য গ্রামটী খ্যাত। গঙ্গারাম দাস নামক জনৈক বৈষ্ণব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপিত হয়। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার মূর্তি স্থাপন করে—যুগলকিশোর নাম রাখেন। গ্রামটী প্রাচীন। রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরের সঙ্গে সড়ক পথেও যোগাযোগ আছে।

(২১) কৃষ্ণগঞ্জ :

কৃষ্ণগঞ্জ, মাজদিয়া, ভাজনঘাট কয়েকটী প্রাচীন গ্রাম। মাজদিয়ায় জিলাপরিষদের ডাকবাংলো আছে। তাছাড়া স্কুল ও কলেজ আছে। এককালে গ্রামগুলি বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। মাঝে ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই সব প্রাচীন গ্রাম আবার লোকজনের বসবাসে, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই গ্রামগুলি নদীয়া সীমান্তে অবস্থিত। কৃষ্ণগঞ্জে থানা অবস্থিত।

(২২) করিমপুর :

করিমপুর থানার সদরও পাটব্যবসায়ের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে ৪১ মাইল।

(২৩) শিকারপুর :

নদীয়ায় সীমান্তগ্রাম শিকারপুর করিমপুর থানার অন্তর্গত। কৃষ্ণনগর থেকে সড়কপথে বাসে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

এখানে হাই স্কুল ও ব্লক অফিস আছে। থানা করিমপুর। শিকারপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। আগে নীলকর সাহেবের একটি কুঠি ছিল। প্রাচীন গ্রাম শিকারপুরেই ১২৪৮ সনের প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(২৪) চাপড়া:

কৃষ্ণনগরের সন্নিকটেই কৃষ্ণনগর সীমান্ত সড়কে চাপড়া অবস্থিত। পূর্বে বাঙ্গালঝি গ্রামটী ছিল বর্ধিষ্ণু। কিন্তু সীমান্ত সড়কটী চাপড়া দিয়ে যাওয়ায় এর উন্নতি হয়েছে। প্রাচীন মিশনারী স্কুল ও গির্জা এখানকার দ্রষ্টব্য। ব্লক অফিস, থানা, সাব রেজিস্ট্রী অফিস ও জেলা পরিষদের একটী ডাকবাংলো আছে।

(২৫) তেহট্ট:

একটী প্রাচীন গ্রাম। কৃষ্ণনগর থেকে সীমান্ত পর্যন্ত যে সড়ক গেছে সেই পথে ২৭ মাইল পরেই তেহট্ট। স্কুল, থানা, ব্লক অফিস, সিনেমা, বাজার ও দোকানপাট আছে। এখানকার প্রাচীন কৃষ্ণ রায়ের মন্দির ও মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কাজ সকলকেই আকর্ষণ করে। এখানে জেলা পরিষদের একটী ডাকবাংলো আছে। একটী ডাক্তারখানা আছে। প্রাচীন গ্রামটীর নীচ দিয়ে বয়ে গেছে জলঙ্গী বা খড়ে।

(২৬) বিরহী:

জাতীয় সড়ক ৩৪ নং-এর উপর প্রাচীন গ্রাম বিরহী অবস্থিত। রাস্তার দুধারে দোকানপাট, হাট বাজার বসে গ্রামটিকে কর্মচঞ্চল করে তুলেছে। রাণাঘাট থেকে কলকাতা যাবার সড়কপথে বিরহী। বিরহীর মদনমোহন স্থানটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই মদনমোহনকে কেন্দ্র করেই প্রতিবৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে মেলা বসে। ব্রাহ্মণরা মদনমোহনের কপালে এবং অব্রাহ্মণরা মন্দিরের দরজায় ফোঁটা দেয়, মেলা বসে। এই ধরনের উৎসব বিরল।

(২৭) কুলিয়ার পাট:

কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরপূর্বে নদীয়া জেলার 'অপরাধভঞ্জন' বা কুলিয়ার পাট অবস্থিত। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিনদিন-ব্যাপী উৎসব ও মেলা হয়। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব ফুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণবনিন্দুক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন। সেই থেকে ফুলিয়া অপরাধভঞ্জনের পাট নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ফুলিয়ার পাটে দ্বাদশ বকুল নামে কুঞ্জ বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। এখানে একটি সুন্দর মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহ নিত্য পূজিত হন। বৈষ্ণবদের পবিত্র ও প্রিয় স্থান। নিকটেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য গবেষণা-কেন্দ্র ও পিঁজরাপোল সোসাইটির পিঁজরাপোল।

(২৮) যশোড়া:

কলকাতা থেকে ৩৬ মাইল দূরে শিমুরালী স্টেশনে নেমে প্রায় এক মাইল দূরে যশোড়া গ্রাম অবস্থিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। জগন্নাথদেবের মন্দিরটীও প্রাচীন। জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চটীর গঠনপ্রণালী সুন্দর। বছরে দুটি উৎসবের সময় প্রচুর লোকসমাগম হয় স্নানযাত্রার সময় আর পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে--জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে।

(২৯) মাঝের গ্রাম:

রাণাঘাট স্টেশন হতে ৯ মাইল দূরে এই গ্রাম। এখান থেকে ৩ মাইল উত্তরে 'দেগাঁর ঢিবি' নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। দেবপাল বা দেপাল নামক কুম্ভকারজাতীয় রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। এ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। এরই নিকটবর্তী চৌবেড়িয়া গ্রামটিও প্রাচীন

(৩০) চাকদহ:

কলকাতা থেকে ৩৮ মাইল দূরে চাকদহ স্টেশন। প্রাচীন নাম চক্রদহ বা চক্রদ্বীপ। প্রবাদ গঙ্গা আনয়নের সময় ভগীরথের রথের চাকা গভীর খাত খনন করেছিল ও গঙ্গাজলে ভর্তি হয়েছিল সেই খাল। তারই ফলে নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ। বর্তমানে গঙ্গা বহুদূরে সরে গেছে। এককালে চাকদহ একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বড় বড় বাড়ী ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ আজও অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। চাকদহে পৌরসভা সুরু হয় ১৮৮৬ খ্রীঃ। বর্তমানে নবাগত উদ্বাস্তুদের আগমনে ব্যবসাবাণিজ্যে দোকানপাটে জমজমাট হয়ে উঠেছে চাকদহ। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, থানা, ব্লক অফিস, সিনেমা প্রভৃতি আছে। চাকদহের নিকটেই পালপাড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। সম্প্রতি এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে। এই গ্রামে প্রাচীন মন্দির দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ 'কুলার্ণবতন্ত্র' প্রণেতা তান্ত্রিক পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার পালপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীঃ লর্ড বিশপ হিবর তাঁর রোজনামচায় এই পণ্ডিতের উল্লেখ করে গেছেন।

(৩১) রাণাঘাট:

কলিকাতা লালগোলা লাইনে একটি বড় জংশন রাণাঘাট স্টেশন। কলকাতা থেকে ৪৬ মাইল দূরে চূর্ণীনদীর তীরে রাণাঘাট শহর অবস্থিত। নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা শহর এই রাণাঘাট। বহু পূর্বে রণাসর্দার নামে এক ডাকাত এখানে বসবাস করত। রণার ঘাঁটি বা আড্ডা থেকেই নাকি রাণাঘাট নাম। রণাকালী বা সিদ্ধেশ্বরীকালী রণারই প্রতিষ্ঠিত। আজও সেই কালী নিত্য সেবিতা ও পূজিতা হয়ে আসছেন। আর একটি মত হচ্ছে চূর্ণী নদীতে কোনকালে কোন রাণা বা রাজা ঘাট নির্মাণ করেন। সেই

রাণার ঘাট থেকেই নাকি রাণাঘাট নাম হয়েছে। এখানকার বিখ্যাত পালচৌধুরী জমিদারদের সেকালের বাড়ীটি দেখবার মত ছিল। আজ সব ধ্বংসপ্রায়। আশেপাশের গ্রামগুলিও প্রাচীন ইতিহাসে ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল। এখন সেই গ্রামগুলি প্রায় শ্রীহীন, যেমন—মাঝের গ্রাম, গোপালনগর, চৌবেড়িয়া, হরধাম, আনন্দধাম, আনুলিয়া প্রভৃতি। ১৮৬৪ সালে রাণাঘাটে পৌরসভা সুরু হয়। রাণাঘাট স্টেশন থেকে একটি লাইন লালগোলা পর্যন্ত, আর একটি লাইন ফুলিয়া হয়ে শান্তিপুর পর্যন্ত, আর একটি লাইন বনগ্রাম পর্যন্ত এবং আর একটি লাইন বাংলাদেশের দিকে মাজদিয়া হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে গেদে পর্যন্ত গিয়েছে। চারিদিকে চারটি লাইন যাওয়ায় কেবল জংশন স্টেশনটিরই গুরুত্ব বাড়েনি, সারা শহরটিরও গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

এখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আদালত, কয়েকটি সিনেমাগৃহ, রেজিস্টারী অফিস, থানা, রবীন্দ্রভবন প্রভৃতি আছে। জেলাপরিষদের একটি ডাকবাংলো আছে। বিখ্যাত পালচৌধুরী বংশ ও দে চৌধুরীদের বংশ নিয়েই রাণাঘাটের ইতিহাস। রাণাঘাটে ৺সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা, ৺নিস্তারিণীদেবীর মন্দির, ৺মদনমোহনের বিগ্রহ ও মন্দির প্রভৃতি দেবস্থানগুলি প্রাচীন ও দ্রষ্টব্য। এছাড়া পালচৌধুরীদের বিরাট ধ্বংসপ্রায় বাড়ী, হাঁসমুরগীর সরকারী খামার, উন্নতপ্রথায় ধানচাষের কৃষিখামার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর লোকজনের বসবাস বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্বদিক দিয়ে রাণাঘাটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩২) বীরনগর :

বীরনগরের অপর নাম উলা। উলা বীরনগর একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। ১৮৫৬ সাল থেকে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় বহু লোক মারা যাওয়ায় এবং অনেকে স্থানান্তরে চলে যাওয়ায় লোকসংখ্যা কমে যায়। কলকাতা হতে ৫১ মাইল দূরে বীরনগর স্টেশন। উলুবনের জঙ্গল কেটে গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এর নাম উলা। পরে এতদঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব হয় এবং গ্রামের সমবেত চেষ্টায় ডাকাতদের অনেককেই ধরা হয় বলে বীরত্বের জন্য গ্রামের নাম বীরনগর হয়। আজও বহু বড় বড় বাড়ী, দীঘি, মন্দির ভগ্ন অবস্থায় অবহেলিত দেখতে পাওয়া যায়। এককালে পণ্ডিতদের বসবাস ছিল। দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে বটবৃক্ষতলে প্রাচীন উলাইচণ্ডীদেবী, দ্বাদশ মন্দির, মুস্তাফিদের জোড়বাংলা মন্দির, ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্মভিটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রশেখর বসু, হেমচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বীরনগরের অধিবাসী ছিলেন। এই বীরনগর হতেই ডাকের সাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম, পালিতপাড়ার কানাইলাল ও নীলমণি আচার্য নামে দুই ভাই এই ডাকের সাজের সৃষ্টি করেন। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য গ্রাম হচ্ছে পাহাড়পুর, খিসমা, রঘুনাথপুর, মামজোয়ান, আড়বান্দী, বাদকুল্লা। বীরনগরে পৌরসভার কাজ সুরু হয় ১৮৬৯ সালে। দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তুরা আসায় স্থানটীতে পুনরায় লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থখানি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (উলানিবাসী) রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উলাইচণ্ডীর পূজা, বারইয়ারী পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। কয়েকটী প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে জোড়বাংলার মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কাজ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৩৩) শান্তিপুর :

কলকাতা থেকে ৫৮ মাইল দূরে প্রাচীন শহর শান্তিপুর। শান্ত নামক জনৈক মুনির বাসস্থান থেকেই শান্তপুর বা শান্তিপুর নামকরণ হয়। গঙ্গাতীরে, এককালে সত্যিই স্থানটী শান্তিপূর্ণ ছিল। বৈষ্ণবদের পরম পবিত্র শ্রীপাট এই শান্তিপুর। শ্রীচৈতন্যভাগবত হতে জানা যায়—

অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার ॥

অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে বসেই আরাধনার দ্বারা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে সাধনার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা আহ্বান জানালে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য বহুবার অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে আসেন। শান্তিপুরে বহু মন্দির আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামচাঁদের মন্দির, ১৭২৬ খ্রীঃ নির্মিত, গোকুলচাঁদের মন্দিরটী ১৭৪০ খ্রীঃ নির্মিত, জলেশ্বর মন্দিরটী নির্মিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া তোপখানার মসজিদ (১৭০৫ খ্রীঃ) ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ নির্মাণ করেন। বর্তমান যুগের অন্যতম মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কবিমপুর থানার শিকারপুরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর ধর্মীয় জীবন কাটে শান্তিপুরেই। শান্তিপুরে রাস-উৎসব প্রধান উৎসব এবং ভাঙ্গা রাস নামে বিখ্যাত। মুসলমান আমলেও শান্তিপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্রশিল্পের জন্য শান্তিপুর বিখ্যাত। নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, রমানাথ তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে শান্তিপুরে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে এক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এঁর গায়ে যেমন শক্তি ও মনে যেমন সাহস ছিল সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যায়। একবার এক ডাকাতদলকে ইনি ঢেঁকি দিয়ে তাড়িয়েছেন। সেই থেকে ইনি আশানন্দ ঢেঁকি নামে পরিচিত হন। শান্তিপুরে এই মহাবীরের স্মৃতিস্তম্ভটী দ্রষ্টব্য। শান্তিপুরবাসী হরিমোহন প্রামাণিক সংস্কৃত ভাষায় 'কোকিলদূতম্' নামক কাব্য এবং 'কমলা করুণা বিলাসম্' নামক নাটক লিখে আজও অমর হয়ে আছেন। কবি করুণানিধান শান্তিপুরে বসেই কাব্য চর্চা করে যশস্বী হয়ে-

ছিলেন। ১৮৫৩ সালে এখানে পৌরসভার কাজ সুরু হয়। রিভার টমসন হল, শান্তিপুর সাহিত্য পরিষৎ, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, খোন্দকারদিগের স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কয়েকটী ভাল স্কুল ও কলেজ আছে। কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর যাতায়াতের সুবিধা ট্রেনে ও সড়কপথে আছে। থানা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে।

(৩৪) কৃষ্ণনগর :

নদীয়া জেলার প্রধান ও সদর শহর কৃষ্ণনগর। এর পূর্বনাম ছিল রেউই। তখন ছিল একটী বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের নীচ দিয়েই প্রবাহিত জলঙ্গী বা খড়ে নদী আজও বয়ে চলেছে। রাজা রাঘব মাটিয়ারী থেকে এই রেউই গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন রেউই গ্রামে বহু গোপজাতির বসবাস ছিল এবং তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও পূজারী ছিলেন। রাজা রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্র রেউই নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর।—'কৃষ্ণের নামে কৃষ্ণনগর অন্য নামে নহে।' রাজা রুদ্রের সময়েই চক, পূজার দালান, কাছারি প্রভৃতি সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়। কলকাতা হতে রেলপথে ৬২ মাইল ও সড়কপথে ৭২ মাইল দূরে কৃষ্ণনগর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নদীয়া রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে ওঠে—শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, ধর্মে সর্ববিষয়ে কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করে। কৃষ্ণনগরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে রাজবাড়ী, রবীন্দ্রভবন, আনন্দময়ীতলা, সিদ্ধেশ্বরী ও প্রাচীন দেবস্থানগুলি উল্লেখ্য। কৃষ্ণনগরের কলেজের প্রাচীন ভবনটিও দেখবার জিনিষ। রাজবাড়ীর সুবিশাল প্রাঙ্গণে প্রতি বছর চৈত্রমাসে বারদোল উৎসবটি কেবল প্রাচীনই নয় নদীয়ায় শ্রেষ্ঠ ও বিরাট উৎসব। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প জগৎবিখ্যাত। এখানকার সরভাজা ও সরপুরিয়া উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন। একদিন কৃষ্ণনগরের রাজ সভাতে বসেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। নাট্যকার এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মস্থান কৃষ্ণনগর। মনমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ এবং বহু পণ্ডিত ও সাহিত্যিক কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। মনমোহন ঘোষের প্রাসাদোপম বাড়ীটীতে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত হয়। সেকালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজটি আজও অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কয়েকটি স্কুল ছাড়াও এখানে তিনটি কলেজ আছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চটি দেখবার মত। প্রোটেস্টান্টদের চার্চটি প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। বর্তমানে রবীন্দ্রভবন, স্টেডিয়াম, রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রভৃতি শহরের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, রেজেস্টারী অফিস, সার্কিট হাউস, ফরেস্ট অফিস ও বাংলো, কলেকটরী, জেলাপরিষদের ডাকবাংলো প্রভৃতি আছে। কোতোয়ালী থানাটিও প্রাচীন। কৃষ্ণনগরে ১৮৬৪ সালে পৌর সভার কাজ সুরু হয়। জেলা পরিষদের বাড়ীটীও দেখবার মত। সরকারী উদ্যান-গবেষণা কেন্দ্র, শিল্পবিদ্যালয়, বিরাট হাসপাতাল, ট্যাপস এণ্ড ডাইস প্রভৃতি কৃষ্ণনগরের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কৃষ্ণনগর সাধারণ পাঠাগারটী প্রাচীন। বর্তমানে জেলা লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে ঘূর্ণীতে। প্রাচীন ও নতুন নানা প্রতিষ্ঠানে কৃষ্ণনগর তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিজস্ব উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা ও বারদোল।

(৩৫) কল্যাণী :

কলিকাতা থেকে মাত্র ২৮ মাইল দূরে নতুন উপনগরী কল্যাণী স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা বলে পরিচিত। কলিকাতার ভীড় কমানোর জন্য কলিকাতার কাছেই সকল প্রকার আধুনিক নাগরিক সুবিধাসমন্বিত একটি উপনগরী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই ডাঃ রায় কল্যাণীকে মনোনীত করেছিলেন। কলিকাতা থেকে ট্রেন পথে যেতে কল্যাণীই নদীয়ার প্রথম রেলস্টেশন। আগে এই স্টেশনের নাম ছিল চাঁদমারী। বৈদ্যুতিক ট্রেনে অনায়াসেই কলিকাতা ও কৃষ্ণনগর থেকে কল্যাণী আসা যায়। সড়কপথেও উভয় জায়গা থেকে কল্যাণী সহজগম্য।

কল্যাণী বর্তমানে সর্ববিধ নাগরিক সুবিধাযুক্ত একটি সুপরিকল্পিত উপনগরী। এখানে স্কুল, বাজার, সুবিন্যস্ত পাকা রাস্তা, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, পার্ক, সারাক্ষণ কলের জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি আধুনিক সুবিধাগুলি আছে। কল্যাণী উপনগরীর অভ্যন্তরে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল নামে একটি অতি আধুনিক ৫০০ শয্যার বৃহৎ হাসপাতাল ও একটি ১২৫ শয্যার ই. এস. আই হাসপাতাল আছে। কল্যাণী স্টেশনের অপরপারে মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি হাসপাতাল নামে আর একটি বড় হাসপাতাল ও কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল অবস্থিত। কল্যাণীতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদর দপ্তর, জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, কল্যাণী স্পিনিং মিল, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, কয়েকটি বেসরকারী কারখানা, সরকারী তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের রেডিও ফ্যাকটরী, সরকারী কাষ্ঠশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সরকারী কারিগরি শিক্ষা বিদ্যালয়, সমবায় বিভাগীয় অফিসারদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র, ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চায়েতরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি বি. টি. কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। এ ছাড়া কল্যাণীর প্রশাসনিক ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় অফিস অবস্থিত। কয়েক বছর আগে কল্যাণীতে নতুন থানা হয়েছে।

সমগ্র কল্যাণী উপনগরীটী 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি'—এই চারটি ব্লকে বিভক্ত। 'বি' ব্লকে ৫৬৮৮টি বসবাসের ও দোকান-পাটের প্লট এবং ৪৫টি পার্ক রয়েছে। পুরো 'সি' ব্লক জুড়ে রয়েছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। 'ডি' ব্লকে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প এস্টেট এবং কয়েকটি বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। স্টেশনের সন্নিকটে 'এ' ব্লকটির সম্প্রতি উন্নয়ন করে বসবাসের জন্য জমির প্লট

বিলি করা হয়েছে। কল্যাণীতে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেটও আছে।

কল্যাণীতে পৌরসভা না থাকলেও একটি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নাগরিকদের সুখসুবিধা দেখবার জন্য গঠিত হয়েছে। কল্যাণী ক্লাব ও কল্যাণী টাউনক্লাব এখান-কার দুটি বিশিষ্ট বেসরকারী সংগঠন। কল্যাণীর এস্টেট ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কল্যাণী রেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

(৩৬) হরিণঘাটা :

হরিণঘাটা থানার সদর। কাঁচড়াপাড়া—জাগুলিয়া সড়ক এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়ক দ্বারা সংযুক্ত হরিণঘাটায় কোন রেল স্টেশন নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুপালন কেন্দ্র ও ডেয়ারীফার্মের জন্য হরিণঘাটা বিখ্যাত। এই পশুপালন কেন্দ্র এবং ডেয়ারী ফার্ম সারা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম। কলিকাতার খাটাল অপসারণ করে বেসরকারী গো-মহিষাদি রাখবার জন্য এখানে গোয়ালাদের একটি দুগ্ধ উপনিবেশও স্থাপিত হয়েছে। হরিণঘাটা পশুপালন কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-মহিষাদি, শূকর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির উন্নয়ন। গরুর জাতের উন্নয়ন করার জন্য এখানে নানাবিধ গবেষণার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ১০,০০০ গরু রাখা হয়।

হরিণঘাটা ডেয়ারীতে বিভিন্ন স্থান থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বীজানুমুক্ত করে এবং নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। হরিণঘাটা ডেয়ারী থেকে এখন নদীয়া জেলাতেও দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। এখান থেকে দৈনিক ১ লক্ষ ২০ হাজার লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়।

হরিণঘাটায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি নদী গবেষণা কেন্দ্র আছে। এছাড়া থানা, ব্লক অফিস, ভূমি সংস্কার অফিস আছে। নিকটেই বড় জাগুলিয়ায় প্রজ্ঞানানন্দ সেবা-কেন্দ্র পরিচালিত একটি বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার এবং একটি বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও ছেলেদের বিদ্যালয় আছে।

(৩৭) বগুলা :

হাঁসখালি থানায় একটি ব্যবসাপ্রধান স্থান। কৃষ্ণনগরে রেলস্টেশন হবার আগে কৃষ্ণনগরের যাত্রীদের ট্রেনে যাতায়াত করতে ১১ মাইল দূরে এই বগুলায় আসতে হত। এখানে স্কুল, পাঠাগার ছাড়াও একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

(৩৮) সিমুরালী :

সিমুরালী স্টেশনের অদূরে ভাগীরথী শিল্পাশ্রম অবস্থিত। বিশিষ্ট শিল্পপতি কর্ণেল ডি, এন, ভট্টাচার্য অনাথ বালক-বালিকদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য নানারূপ কারিগরি শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এই আশ্রমটি স্থাপন করেন। শিমুরালীতে বর্তমানে একটি বি, টি, কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

ভ্রমসংশোধন :

১৩০ পৃষ্ঠায় ৩৪নং পংক্তিতে গ্রামের সংখ্যা ১৮৯২-এর স্থলে ১২৮২ হবে।

১৪৩ পৃষ্ঠায় ১০নং পংক্তিতে সংরক্ষিত তপশীলী আসন একটি কংগ্রেসের স্থলে দুইটি হবে।